"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষড়বিংশতিতম বর্ষ | জানুয়ারী, 1973 | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বর্তমান বর্ষে 26তম বর্ষে পদার্পণ করিল। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র এই অগ্রগতি—যাঁহাদের অনলস কর্মোদ্যম, উৎসাহ ও উদার দাক্ষিণ্যে সম্ভব হইয়াছে—সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকে জানাই আমাদের অভিনন্দন।

25 বৎসর পূর্বে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই। এখন বাংলা ভাষায় বহু দক্ষ বিজ্ঞান-লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে এবং হইতেছে। ইঁহাদের একাগ্র নিষ্ঠা ও সাধনায় বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য ক্রমশঃই পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-প্রবন্ধ আজ এইরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে যে, বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং দৈনিক পত্রিকারও ইহা একটি নিয়মিত অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণের বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আকাশবাণী (কলিকাতা কেন্দ্র) নিয়মিতভাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের সমাদরও ক্রমবর্ধমান। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের, বিশেষতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ যে ক্রমশঃই বাড়িতেছে, তাহা শহর এবং গ্রামে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজনের সংবাদ হইতেই উপলব্ধি করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমরা সবিনয়ে উল্লেখ করিতে পারি। বস্তুতঃ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর বহু প্রদর্শনীর আয়োজনে অনুপ্রেরণা দিয়াছে।

25 বৎসর পূর্বে যাঁহারা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচারের কথা বলিয়াছিলেন—তখন অনেকেই তাঁহাদিগকে অবাস্তব স্বপ্নবিলাসী বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আজ তাঁহাদের স্বপ্ন সার্থক রূপায়ণের পথে। কিন্তু তাই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার সময় এখনও আসে নাই। এখনও অনেকেই বাংলা ভাষায় আদর্শ মানের জটিল বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক এবং উচ্চতর শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করেন। উপযুক্ত পরিভাষার অভাব তাঁহাদের আশঙ্কার অন্যতম কারণ। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে, কাজটি কষ্টসাধ্য হইলেও অসাধ্য নয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং অন্যান্য বাংলা সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি এবং বৈজ্ঞানিক বেতার কথিকা তাঁহাদের এই আশঙ্কা নিরসন করিতে পারে। পরিভাষার অভাব তো আছেই, কিন্তু সেই অভাব দূর করিবার আন্তরিক প্রয়াস থাকিলে এই প্রতিবন্ধকতা নিঃসন্দেহে দূরীভূত হইবে। অনেকে বলেন, উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে বাংলায় বিজ্ঞানের প্রবন্ধাদি লেখা খুবই অসুবিধাজনক। কিন্তু লেখার চর্চা থাকিলে ক্রমশঃই প্রয়োজনানুরূপ পরিভাষা আপনিই গড়িয়া উঠিবে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞানের পরিভাষার শব্দভাণ্ডার অনেক বেশী সমৃদ্ধ; আন্তরিক প্রযত্নে ভবিষ্যতে তাহা আরও বেশী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

আমাদের জাতীয় সরকার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন, অদ্যাপি তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় নাই। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে যে লজ্জাজনক অধ্যায়, সেই বিষয়ে সম্ভবতঃ দ্বিমতের অবকাশ নাই। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হিসাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট প্রকাশ্যে (কর্মসচিবের নিবেদন দ্রষ্টব্য—1971, 1972)—বাংলা-ভাষায় উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও—দুঃখের বিষয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের সহযোগিতা গ্রহণে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এই মহান জাতীয় কর্তব্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন করিবার জন্য আমরা পুনরায় তাঁহাদিগকে আমাদের সহযোগিতা গ্রহণের বিনীত আহ্বান জানাইতেছি।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রচারের মহান উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র হিসাবে এই ব্রত উদ্‌যাপনে সর্বপ্রকারে যত্নবান।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদিগকে নিরন্তর উৎসাহিত করিতেছে। তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সদাশয় সরকারের আনুকূল্যে আমাদের অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হইবে—সন্দেহ নাই। আজ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র শুভ নববর্ষের প্রারম্ভে সকলের সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

কৃষিতে রাইজোবিয়াম জীবাণু-সার

নীহারেন্দু সিংহ*

সার বলতে আমরা সাধারণতঃ জৈব ও অজৈব সার বুঝি, কিন্তু এছাড়াও এক বিশেষ ধরণের জীবাণু আছে, যাদের মাটিতে প্রয়োগ করলে বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন (Fixation) করে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। এই ধরণের জীবাণু মাটিতে সারের মত প্রয়োগ করা হয় বলে এদের Bacterial fertilizerr বা জীবাণু-সার বলে। এই ধরণের জীবাণু সারকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(1) মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু (Free living Nitrogen fixing bacteria)—এই জাতীয় জীবাণু মাটিতে মুক্তভাবে বসবাস করে গ্যাসীয় মৌলিক নাইট্রোজেন বন্ধন করে; যেমন—Azotobacter, Clostridium, Beijerinkia, Derxia ইত্যাদি। এরা প্রতি একরে 3 kg থেকে 10 kg নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে।

(2) মিথোজীবী জীবাণু (Symbiotic bacteria)—

এই জাতীয় জীবাণু শীম, ডাল, কড়াইজাতীয় গাছের মূলে গুটি বা অর্বুদ (Nodule) তৈরি করে তার মধ্যে নাইট্রোজেন বন্ধন করে। ডাল, কড়াই চাষে উত্তম গুটি হলে প্রতি একরে 40kg থেকে 125kg পর্যন্ত নাইট্রোজেন মাটিতে সংবদ্ধ হতে পারে। এই জাতীয় জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধন করবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী।

তাছাড়াও কিছু নীল-সবুজ শ্যাওলা (Blue-green algae) আছে, যারা বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। অধুনা জীবাণু-সারের মত এই শ্যাওলাকেও সার হিসাবে জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এদের বলা হয় Algal fertilizer বা শ্যাওলা-সার। এই জাতীয় শ্যাওলা প্রতি একরে 10kg থেকে 20kg পর্যন্ত বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করতে সক্ষম।

এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে Legume-Rhizobium symbiosis-এর ফলে মূলে যে গুটি বা অর্বুদ তৈরি হয়, তার নাইট্রোজেন বন্ধন করবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। তাহলেও কৃষির ক্ষেত্রে Algal এবং Azotobacter fertilizer-এর প্রচলন থাকলেও রাইজোবিয়াম (Rhizobium) জীবাণুর ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। এই রাইজোবিয়াম জীবাণু কি ভাবে বীজে মাখাতে হয়, তার উপকারিতা কি, সে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

শিম্বিজাতীয় শস্য চাষের উপকারিতা

আমরা সবাই জানি যে, ডালকড়াই বা শিম্বি জাতীয় (Legume) শস্যের চাষ করতে নাইট্রোজেনঘটিত সারের তো প্রয়োজনই হয় না, অধিকন্তু এই চাষ মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। সেই জন্যে ডালকড়াই শস্যের আবাদকে পর্যায়ক্রমিক চাষের (Rotation of crop) মধ্যে একান্ত আবশ্যকীয় বলে গণ্য করা হয়। আবার সবুজ সার হিসাবে ব্যবহারের জন্যে এই শিম্বিজাতীয় গাছের মধ্যে ধঞ্চে, শণ ইত্যাদি আমাদের দেশে চাষ করা হয়ে থাকে। মাটিতে কোন রূপ নাইট্রোজেনঘটিত সার না দিয়ে এই ডালকড়াই জাতীয় গাছের চাষ করে প্রতি একরে 40kg থেকে 125kg পর্যন্ত বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই জাতীয় শস্যের

* মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

চাষ করে উৎপাদন তো হচ্ছেই, তাছাড়া মাটি থেকে কোন নাইট্রোজেন না নিয়ে বায়বীয় নাইট্রোজেন ব্যবহার করে গাছ বড় হয় এবং কিছু নাইট্রোজেন মাটিতে থেকে যায়। তার ফলে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে। এই চাষের পর যা চাষ করা হোক না কেন, তাতে নাইট্রোজেন সার না দিলে বা খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করলেও চলে। তাছাড়া ডালকড়াই জাতীয় বীজে প্রচুর উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আছে। এর খাদ্যমূল্য অন্য যে কোন উদ্ভিদের চেয়ে বেশী। তাই পশ্চিম বঙ্গ সরকার সয়াবীনের চাষ বাড়াবার চেষ্টা করছেন।

শুটি বা অর্বুদ তৈরির পদ্ধতি

যদি একটি মটর গাছকে মাটি থেকে মূলসহ খুব সাবধানে উপড়ে ফেলা যায়, তবে ঐ মূলে অনেক ছোট ছোট শুটি বা অর্বুদ দেখতে পাওয়া যাবে। ঐ শুটি বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন হবার কেন্দ্রস্থল। মাটিতে রাইজোবিয়াম নামে একপ্রকার জীবাণু থাকে। যখন এই ডালকড়াই ইত্যাদি মাটিতে উৎপন্ন হয়, তখন ঐ গাছের মূলরোম দিয়ে মূলের মধ্যে ঐ জীবাণু প্রবেশ করে এবং তারা সংখ্যায় বাড়ে। জীবাণুসমূহের এই অবস্থাকে Bacteroid বলে। গাছ ঐ Bacteroid-এর চার দিকে কোষ
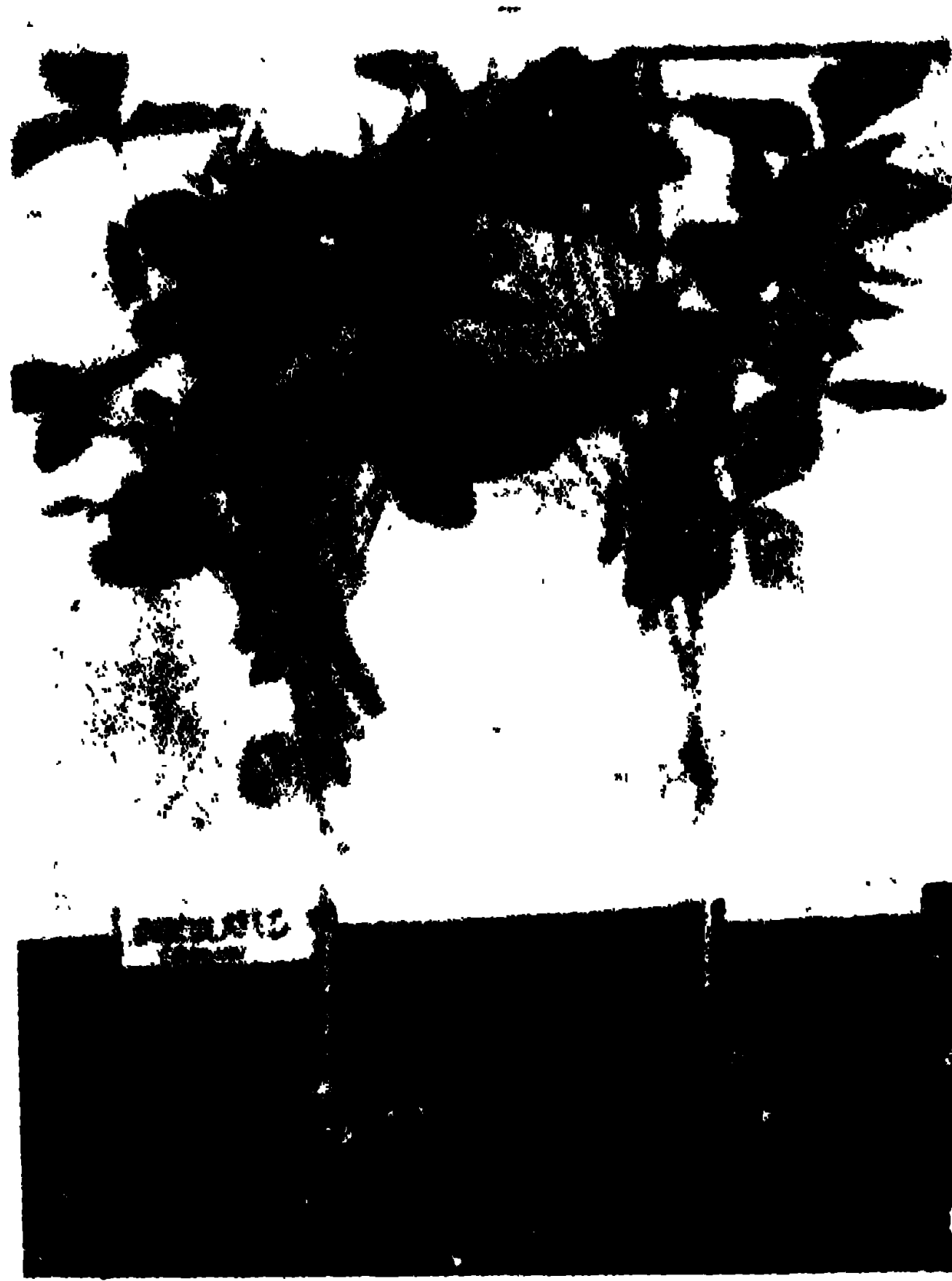
এখানে জীবাণু সার প্রয়োগ করে (Inoculated বাঁ দিকে) এবং প্রয়োগ না করে (Non inoculated-ডান দিকে) সয়াবিনের শুটি (Nodule), শুটি এবং গাছের বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

ঘিরে ঘিরে ফেলে। এর ফলে গোল, লম্বা নানা আকৃতির অর্বুদ তৈরি হয়। এই অর্বুদ হলে গাছের মাটি থেকে নাইট্রোজেন নেবার প্রয়োজন হয় না। ঐ জীবাণু বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে বন্ধন করে। তার কিছু অংশ জীবাণু নিজে ব্যবহার করে, বাকীটা গাছ গ্রহণ করে। পরিবর্তে গাছ থেকে শর্করাজাতীয় খাদ্য জীবাণু গ্রহণ করে থাকে। এইভাবে পরস্পরে বেশ বোঝাপড়া করে অবস্থান করে। সে জন্যে এই পদ্ধতিকে Symbiosis বা মিথোজীবিতা বলে।

ঐ গাছের মূলে গুটি হয় না। বর্ধমানের কয়েক জায়গাতে ছোলা গাছে গুটি হয় না। যদিও বা হয়, তা নিতান্ত ছোট, সংখ্যায় খুব কম—নাই বললেই চলে। আমন ধানের পর যে সব জমিতে খেসারী ইত্যাদি চাষ করা হয়, তাতে একটিও গুটি দেখতে পাওয়া যায় নি। 24-পরগণার কোন কোন জায়গা থেকেও অনুরূপ খবর পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে সয়াবীন চাষ করলে তাতে একটিও গুটি হয় না, আবার গুটি হলেই যে নাইট্রোজেন বন্ধন করবে, তাও জোর করে বলা যায় না। এই জাতীয়

এখানে জীবাণু-সার প্রয়োগ করে (T=Treated) এবং জীবাণু-সার প্রয়োগ না করে (C=Control) ছোলার গুটির (Nodule) সংখ্যা এবং আকৃতির পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

ডালকড়াই জাতীয় গাছ চাষ করলেই মূলে ঐ অর্বুদ বা গুটি হয় না, গাছ যখন বায়বীয় নাইট্রোজেন পায় না, তখন মাটির নাইট্রোজেনের উপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু তখন মাটির নাইট্রোজেন বাড়ছে না বরং কমে যাচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় শুঁটিজাতীয় গাছ উপড়ে দেখেছি—তাদের মধ্যে কতকগুলি জায়গায় সব সময়

গুটিকে অকার্যকর গুটি (Ineffective nodule) বলে। সব সময় ভাবা উচিত নয় যে, যেহেতু শিম্বিজাতীয় গাছের চাষ করা হয়েছে, সেহেতু মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। অনেক ক্ষেত্রে তা কার্যতঃ ব্যর্থ হচ্ছে। এর কারণ অনেক কিছু হতে পারে। যেমন মাটি যদি খুব উষর হয় অথবা অধিক অম্লাত্মক (Acidic) বা ক্ষারীয় (Alkaline)

হয় কিংবা মাটির জৈব পদার্থ কম থাকে ইত্যাদি। মাটিতে যে জাতীয় রাইজোবিয়াম জীবাণু ঐ বিশেষ শিম্বিজাতীয় গাছে গুটি তৈরি করবে, সেই জীবাণু যদি মাটিতে না থাকে বা থাকলেও সংখ্যায় যথেষ্ট না হয়, তাহলেও গাছের গুটি কমে যাবে। বেশী অম্লাত্মক বা ক্ষারীয় মাটি হলে এই জাতীয় জীবাণু বাঁচতে পারে না। এই সবের মধ্যে মাটিতে রাইজোবিয়াম জীবাণুর অভাবই গুটি না হবার অন্যতম কারণ।

বীজে জীবাণু মাখাবার পদ্ধতি

শিম্বিজাতীয় গাছের মূলে সংখ্যায় প্রচুর, বড় আকৃতির এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন গুটি যাতে উৎপন্ন হয়, তার একমাত্র উপায় হলো—যে জমিতে ডালকড়াই চাষ করা হবে, কেবল সেই গাছের জন্যে নির্ধারিত জীবাণু (Rhizobium) বীজ বপনের পূর্বে বীজে মাখিয়ে বপন করলে দেখা যাবে—ঐ গাছের মূলে প্রচুর গুটি হয়েছে, গাছের বৃদ্ধিও দ্রুততর হচ্ছে এবং উৎপাদনও শতকরা 20 থেকে 100 ভাগ বেড়ে গেছে। এই জীবাণু গবেষণাগারে বিশেষ ধরণের তরলের মাধ্যমে, যথা—শর্করা, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গাঁজাতে (Ferment) হয়। তখন লক্ষ লক্ষ জীবাণু বাড়তে থাকে এবং গঁদের (Gum) মত ঘন পদার্থ তৈরি হয়। জীবাণুর এই তরল কাল্চার (Liquid culture) বীজে মাখিয়ে দিয়ে বপন করা হয়, রাইজোবিয়াম জীবাণুর তরল কাল্চার ছাড়াও মাটিতে বা Peat soil-এ জীবাণু মিশিয়ে প্যাকেটে করে সরবরাহ করা হয়। মাটিতে বা Peat soil-এ জীবাণু সরবরাহ করলে, তৈরির পর তা 2/3 মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। আর বোতলে তরল কাল্চার 1½ থেকে 2 মাস ব্যবহার করা যায়।

বীজ বপনের পূর্বে বীজকে 15/20 মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখবার পর ঐ জল ফেলে দিতে হয়। এতে দুটি উপকার পাওয়া যায়—প্রথমতঃ অনেক সময় দেখা গেছে, বীজের খোসায় antibiotic জাতীয় জিনিষ থাকে, দ্বিতীয়তঃ বীজ-ব্যবসায়ীরা ছত্রাক বা পোকার প্রতিষেধক ওষুধ (Fungicide বা Insecticide) বীজে মাখিয়ে রাখে। এই সব জিনিষ রাইজোবিয়াম জীবাণুর পক্ষে ক্ষতিকর, তাই বীজ জলে ভিজিয়ে নিলে তা অনেকটা ধুয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে ওষুধ বীজ বপনের পরে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আধ লিটার জলে 25 থেকে 50 গ্রাম গুড় বা চিনি মিশিয়ে নিয়ে 15-20 মিনিট ফুটাবার পর ঠাণ্ডা করে নিতে হয়। এখন তাতে এক প্যাকেট মাটিতে মেশানো culture (Soil culture), Peat culture বা এক বোতল Liquid culture ঢেলে দিয়ে ভালভাবে মেশানো হয়। এই পরিমাণ জলে মিশ্রিত জীবাণুর এক একরে যে পরিমাণ বীজ লাগে, তা ঢেলে দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হয়, তারপর ছায়াতে একটু শুকিয়ে নিয়ে বপন করা হয়। বীজের উপর মাখানো জীবাণুতে যাতে সূর্যকিরণ না পড়ে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়। গুড় বা চিনির জলের পরিবর্তে ফোটানো দুধ দিয়ে অনুরূপভাবে বীজে জীবাণু মাখানো চলে। এই ব্যাপারে একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে, এক এক ধরণের ডালকড়াই শস্য চাষের জন্যে এক এক ধরণের জীবাণু নির্দিষ্ট থাকে। কেবল সেই বীজের জন্যে সেই জীবাণু প্রয়োগ করতে হয়। অন্য জীবাণু হলে কোন ফল পাওয়া যাওয়া যায় না। আজ এই জীবাণু ভারতে প্রধানতঃ দুটি প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয়। একটি হলো কলিকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মাইক্রোবায়োলজি গবেষণাগার আর একটি হলো Indian Agricultural Research Institute-এর মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—এই পদ্ধতি কি খুব জটিল? জীবাণু-সার ব্যবহারে যে খরচ পড়বে, শস্যের উৎপাদন কি সেই পরিমাণে বাড়বে? প্রথম

কথা—ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয়, চাষীভাইরা যখন যে ডালকড়াই চাষ করবেন, তার নাম এবং কত পরিমাণ জমি চাষ করবেন, তা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে (93/1, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-9) জানালে সেই শস্যের জন্যে জীবাণু-সার পাঠানো হয়ে থাকে। বীজ বপনের পূর্বে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বীজে জীবাণু-সার মাখিয়ে নিয়ে বপন করতে হবে। এই জীবাণু মানুষের কোন ক্ষতি করে না। দ্বিতীয় কথা, এই পদ্ধতিতে চাষ করলে স্বাভাবিক পদ্ধতির চেয়ে উৎপাদন 1½ থেকে 2 গুণ বেড়ে যায়। শিম্বি জাতীয় শস্যের চাষের সময় অজৈব নাইট্রোজেন-ঘটিত সার প্রয়োগ করলে উৎপাদন অনেক সময় কমে যায়। তাই কোনরূপ অজৈব নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ না করে শুধু মাত্র জীবাণু-সার প্রয়োগ করে 1½—2 গুণ উৎপাদন বাড়ে। আগেই বলেছি যদি শিম্বিজাতীয় গাছে ভাল অর্বুদ হয়—প্রতি চাষে একর প্রতি 40 থেকে 125 কিলো পর্যন্ত বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে বন্ধন করতে পারে, তা প্রায় 190 থেকে 595 কিলো অ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান।

বীজে এই জীবাণু-সার মাখাতে একর প্রতি 4–6 টাকা খরচ পড়ে। এই 4—6 টাকার বিনিময়ে শস্যের উৎপাদন বাড়বে 1½ থেকে 2 গুণ। আজ এই পদ্ধতি আমাদের দেশে নতুন হলেও আমেরিকা, জার্মেনী, ক্যানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বহু দিন থেকেই এই পদ্ধতি চালু আছে। আমেরিকায় সাতটি প্রাইভেট লেবরেটরিতে এই রাইজোবিয়াম জীবাণু তৈরি হয়। পশ্চিম বঙ্গে কেবল বসু বিজ্ঞান মন্দিরেই রাইজোবিয়াম প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে প্রতি বছর উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে জীবাণু-সারের হাজার হাজার প্যাকেট রেলযোগে পাঠানো হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিম বঙ্গে এই পদ্ধতি চালু নেই বললেই চলে। মনে হয়, আমাদের চাষীভাইরা এই ব্যাপারে অবহিত নন, তাঁরা যাতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে উপকৃত হন—তার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সমুদ্র-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

সমুদ্র-বিজ্ঞানের প্রাথমিক কিছু তথ্যাদি নিয়ে পূর্ববর্তী একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলাম (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, নভেম্বর, 1971)। বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা আশার কথা, সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতসহ অন্যান্য দেশের সরকার ও বিজ্ঞানীদের সচেতনতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমুদ্রের তলদেশ

সমুদ্রের তলদেশের প্রকৃতি জেনে তার মানচিত্র রচনা করবার প্রয়োজন বিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকে অনুভব করলেও সাজসরঞ্জামের অপ্রতুলতার জন্যে এর আগে বিশেষ কিছুই করা সম্ভব হয় নি। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নততর উপকরণ মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যায় মানুষের সাফল্য ও সমুদ্র সম্পর্কে বর্ধিত জ্ঞান এবং এই সম্পর্কে গবেষণাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ চ্যালেঞ্জার জাহাজের কথা বলা যায়। বৃটেনের রয়েল সোসাইটির উদ্যোগে 1872 সালের ডিসেম্বরে টেম্‌স নদীর মোহানা থেকে যাত্রা করেছিল বিজ্ঞানী ও কর্মীদের নিয়ে বিরাট জাহাজ চ্যালেঞ্জার। সাড়ে তিন বছর পরে জাহাজটি ফিরেছিল পৃথিবীকে নানা পথে প্রদক্ষিণ করে। নানা স্থানে সমুদ্রের গভীরতা মাপবার জন্যে ওজন দড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। দড়ি বেঁধে একটা ভারকে সোজা ডুবিয়ে দেওয়া হতো সমুদ্রের জলে এবং দেখা হতো ভারটা সমুদ্রের তলায় গিয়ে পড়বার পর কতটা দড়ি ডুবলো। আজকাল সমুদ্রের গভীরতা মাপবার জন্যে ব্যবহৃত হয় শব্দতরঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। এক-শ' বছরের মধ্যে বিজ্ঞান অনেক নিখুঁৎ ও সহজসাধ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। চ্যালেঞ্জার জাহাজটির গভীরতা মাপবার পদ্ধতিটি স্থূল হলেও এর অভিযান কিন্তু একটি উপকার করেছিল—তৎকালীন সমুদ্র-সন্ধানীদের একটি ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তখনকার মুখ্য ধারণা ছিল, সমুদ্রের তলদেশ পৃথিবীর সব স্থানেই সমগভীর এবং সমতল। চ্যালেঞ্জারের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমুদ্রে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তা এই ধারণাকে সত্যই চ্যালেঞ্জ করলো।

পরবর্তী কালের গবেষণায় সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আরও বেড়েছে। উপকূল থেকে ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হলে সমুদ্রের তলদেশের চেহারায় পরপর যে বৈচিত্র্য সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়, তা এই রকম—প্রথমে মহাদেশীয় প্রান্ত (Continental margin)। প্রশান্ত মহাসাগরের মহাদেশীয় প্রান্ত অপর সমুদ্রগুলি থেকে একটু পৃথক ধরণের। প্রশান্ত মহাসাগরের অপেক্ষাকৃত কম বয়সই এর কারণ বলে ধরা হয়। মহাদেশীয় প্রান্তের পর আসে মহাদেশীয় ঢাল, তারপর মহাদেশীয় ধাপ। এর পরের অংশের নাম মহাদেশীয় উন্নতি (Continental rise)। এটি কিছুটা উঁচু জায়গা নিয়ে গঠিত, যা নদীবাহিত পলির স্তূপ জমে গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। (প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রই একত্রে 220 কোটি মেট্রিক টনের মত পলি বছরে

বঙ্গোপসাগরে নিয়ে আসে)। নদীবাহিত পলির বেশীর ভাগই মহাদেশীয় প্রান্তে, বদ্বীপ অঞ্চলে ও মহাদেশীয় ঢালে প্রায় 10 কি.মি. পর্যন্ত গভীরতা নিয়ে জমা হয়। সমুদ্রের বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে মিশে এরা নানাবিধ যৌগিক পদার্থ তৈরি করে। মহাদেশীয় উন্নতি পেরিয়ে এই সব পলি সাধারণতঃ গভীর সমুদ্রে যেতে পারে না। মহাদেশীয় উন্নতির পরেই থাকে মহাসাগরের সমভূমি বা উপত্যকা অঞ্চল। আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের তলদেশে সমভূমি বেশী দেখা যায়, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে পাহাড়ী জায়গা বেশী। গভীর সমুদ্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পলির কণা, সামুদ্রিক প্রাণীর দেহজাত বিশেষ এক ধরণের কাদা, ম্যাঙ্গানিজ থেকে উদ্ভূত কর্দম ইত্যাদি দেখা যায়। এই সঞ্চিত পলিতে নানা রকম খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। ভারতের কাছে উপসাগর থেকে পেট্রোলিয়াম উদ্ধার করা হয়। গভীর সমুদ্রে কোবাল্ট, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদিও পাওয়া যায়। কিছু খনিজ সমুদ্র-সৈকতেও মেলে—যেমন কেরলে মোনাজাইটজাতীয় খনিজ।

পৃথিবীর সর্বত্রই গভীরতম সমুদ্রে তাপমাত্রা সমান—চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যে উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই সমুদ্র নামক বিশাল জলরাশির উপর দিকের জল হাল্কা, গতিশীল এবং উষ্ণ। সমুদ্রের তলদেশের সমতল অংশের উপর স্থলভাগের নদীর মত সলিল জলধারা এবং উঁচু জায়গা ও হ্রদ আছে। মেরু অঞ্চল থেকে বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলের ভারী স্রোত ঐসব নদী-নালা ও হ্রদের উপর দিয়ে গড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্র যত গভীর, জল তত ভারী এবং স্থির। গভীরতম সমুদ্রে অনেক স্থানে একেবারে স্রোতহীন বদ্ধ জলও রয়েছে।

মহাদেশীয় ভূত্বক প্রধানতঃ গ্র্যানিটজাতীয় উপাদানে আর মহাসাগরীয় ভূত্বক বেসাল্ট জাতীয় উপাদানে তৈরি। স্থলভূমির পর্বত আর মহাসমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত পর্বতের মধ্যেও প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-চ্যালেঞ্জার ধারণার মত সত্যই তো গভীর সমুদ্র আর সমতল নয়—পাহাড়-পর্বত প্রচুর। এমন দীর্ঘ শৈলশিরাও সমুদ্রগর্ভে দেখা গেছে, যা প্রায় সমগ্র ধরে পাক খেয়েছে, কখনও বা সমুদ্র ফুঁড়ে উপরে মুখ তুলেছে। ঐ রকমই একটা মুখতোলা পর্বতমালার অন্যতম চূড়া হচ্ছে হাওয়াই দ্বীপ। স্থলভাগে এত লম্বা পর্বতমালা আর নেই। এখানে বলে রাখা যায়, সুপরিচিত 'অপসরমান মহাদেশ তত্ত্ব', যাতে বলা হয় একদা অখণ্ড স্থলভূমি ভাগ হয়ে বর্তমান মহাদেশগুলির উৎপত্তি হয়েছে এবং ক্রমশঃ ভেসে ভেসে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে সরে যাবার কারণরূপে এই শৈলশিরাগুলির ক্রমবর্ধমান ফাটলকেই ধরা হয়। এই ফাটলগুলি বাড়ছে বলেই মহাদেশগুলি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ও সমুদ্রতলের বিস্তার ঘটছে।

শুধু শৈলশিরাই নয়—গভীর সমুদ্রে পিচ্ছিল এবং খাড়া পাহাড়ও আছে, যা আমল পর্বতকেও হার মানায়। আবার এমন গভীর স্থানও আছে, যেখানে হিমালয় পর্বতকে ডোবালেও সাত হাজার ফুট জলের উচ্চতা বাকী থাকবে (প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ—সাত মাইল গভীর, পৃথিবীর নিম্নতম স্থান)। সমুদ্র-তলের পাহাড়গুলির গা শুধু যে সময় সময় দেয়ালের মত খাড়া, তা-ই নয়, মসৃণও বটে। বৃষ্টি বা হাওয়ার ঘর্ষণে ভূপৃষ্ঠের পাহাড়গুলির গা ক্ষয়ে যাওয়া, বা বরফ জমা ইত্যাদি কারণে সেগুলি অসমতল না হয়ে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশের গভীরে জলের চলাচল প্রায় না থাকায় এই ঘর্ষণজনিত ক্ষয় হয় না। তার উপর সমুদ্রতলে যেসব মৃত আগ্নেয়গিরি আছে, তার আশপাশগুলি এক অদ্ভুত জলপাতের কাজ

করে। এইসব অববিচ্ছিন্ন বেসিনে স্রোতহীন, আলোড়নহীন জল যুগযুগ ধরে জমে থাকে, যেন কাল স্তব্ধ হয়ে আছে ঐ সব আদিম কূপগুলিতে। অনেক সময় দেখা যায়, সেখানে বহু প্রাগৈতিহাসিক সামুদ্রিক প্রাণী বেঁচে আছে, যা সমুদ্রের অন্যান্য অংশে প্রাকৃতিক নিয়মে বহু দিন আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সামুদ্রিক প্রাণী

সমুদ্রগর্ভ যে শুধু বেশীর ভাগ খনিজ পদার্থের আকর তাই নয়, পৃথিবীতে যত রকম প্রাণী আছে তার বেশীর ভাগই সমুদ্রে পাওয়া যায়। মাছ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য বিচিত্র জীব মিলিয়ে প্রায় হাজার পনেরো প্রাণী আছে সমুদ্রে। এদের অধিকাংশই আবার আণুবীক্ষণিক প্রাণী। এদের সাধারণ নাম প্ল্যাঙ্কটন (Plankton)। সাধারণতঃ গভীর সমুদ্রে এরা থাকে না, সমুদ্রজলের পৃষ্ঠদেশ থেকে এক-শ' ফুটের মধ্যেই এদের পাওয়া যায়।

প্রাণী-বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, পৃথিবীর আদি প্রাণ সমুদ্রেই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণের বিবর্তনের ধারার পরিচয় পাবার জন্যে আদিম যুগের প্রাণীর নমুনা পাওয়া দরকার। সমুদ্রের এককোষী সরল গঠনের প্রাণী ও পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক কূপে আবদ্ধ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা সমুদ্রকে প্রাণী-বিজ্ঞানীদের কাছেও মনোযোগের লক্ষ্য করে তুলেছে।

এক জাতীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্ল্যাঙ্কটনের নাম হচ্ছে ডায়াটম (Diatom), এরা বৃহত্তর প্ল্যাঙ্কটনের খাদ্য। আমরা জানি, ক্ষুদ্র ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা বৃহত্তর ও উন্নত প্রাণীদের খাদ্য হয়, নচেৎ খাদ্য জোগায়। ছোট প্ল্যাঙ্কটনেরা বড় প্ল্যাঙ্কটনের খাদ্য, তারা আবার আরো বড় মাছের খাদ্য, মাছ আবার মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য। এইভাবে এই ডায়াটমগুলি প্রচুর পরিমাণে ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর তাবৎ প্রাণের ভিত্তি রচনা করছে। সমুদ্রে এই ডায়াটমের জন্ম দেবার ও নির্দিষ্ট সংখ্যায় বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রকৃতির যে নিখুঁৎ রাসায়নিক ব্যবস্থা, তা আজ চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে সমুদ্রজল দূষিতকরণের ফলে। বায়ুমণ্ডলে ও সমুদ্রগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি সমুদ্রজলকে বিষাক্ত করছে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অপদ্রব্য আজকাল গভীর সমুদ্রেই ফেলা হচ্ছে, তা ছাড়া আছে কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি আর কলকারখানার আবর্জনা ও মহাজাগতিক রশ্মির বিক্রিয়ায় স্থলভাগের মাটিতে পড়ে ওঠা আইসোটোপ, যেগুলি বৃষ্টিধৌত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এসব দূষিত পদার্থের সমুদ্রে জমে থাকায় তা যেমন সমুদ্র থেকে লবণ ইত্যাদি আহরণকে বিপজ্জনক করে তুলেছে, তেমনই সমুদ্রের প্রাণীসমূহকেও ধ্বংস সর পথে ঠেলে দিচ্ছে, যা স্থলভাগের প্রাণীদেরও ধ্বংসের কারণ হবে। এজন্যেই খ্যাতনামা মার্কিন সমুদ্রচারী ও সমুদ্র-বিজ্ঞানী ডক্টর ডন ওয়াল্শ্ গত বছর ভারতে বলেছিলেন—সমুদ্র দূষিতকরণ বন্ধের জন্যে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন দরকার।

সমুদ্রে অভিযান

সমুদ্রের গভীরে মানুষের অভিযানের কিছু খবর আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলাম। সেখানে মার্কিন প্রচেষ্টায় ওয়াল্শ্ ও পিকার্ডের অভিযানের উল্লেখ ছিল। মার্কিন মহাকাশচারী কার্পেন্টারের সমুদ্রতলে বাসের অভিজ্ঞতাও আলোচিত হয়েছিল। বস্তুতঃ মার্কিন নৌবাহিনীর কমাণ্ডার ডন ওয়াল্শ্ ও সুইস বিজ্ঞানী ডক্টর জ্যাকিউয়েস পিকার্ড সমুদ্রগর্ভের যে স্থানে নেমেছিলেন, সেটি পৃথিবীর গভীরতম স্থান বলে খ্যাত অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। 1960 সালের 23শে জানুয়ারী এঁরা

দু-জন মার্কিন ডুবোযান (ব্যাথিস্কোপ) 'ত্রাইয়েস্ত'-এর ভিতরে বসে ডুব দেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিছু দূরের একটা জায়গায়। সমুদ্র-সন্ধানী জাহাজ চ্যালেঞ্জারের নাম অনুসারী জায়গাটার নাম 'চ্যালেঞ্জার ডিপ'। ডুবোযানটি আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতিতে ছিল একটা গ্যাস বেলুনের মত। ভিতরে কৃত্রিমভাবে বাসোপযোগী ও চাপ প্রতিরোধক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। নিঃশ্বাসের জন্যে ছিল প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষক পদার্থ। তড়িচ্চুম্বকীয় ব্যবস্থায় বুলেটের মত টুকরা টুকরা মোট ষোল টন ওজনের লোহা ডুবোযানের গায়ে লাগিয়ে ভারী করে রাখা হয়েছিল। এই ভাবে যানটি জল ভেদ করে নীচে নামতে থাকে। অবশ্যই উল্লম্বভাবে নামে নি, সমুদ্রজলের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নমুখী স্রোতের ক্রিয়ায় নিমজ্জন-বিন্দু থেকে যানটি মাইল দুই দূরে তল স্পর্শ করে। সাত মাইল নামতে লেগেছিল নয় ঘণ্টা। তলায় আধ ঘণ্টা অবস্থানের পর তড়িচ্চুম্বক অকেজো করে লোহার টুকরাগুলি ঝরিয়ে দেওয়া হয়। হালকা হয়ে সাধারণ গ্যাস বেলুনের মতই ত্রাইয়েস্ত উপরে উঠে এসেছিল তিন ঘণ্টায়। এটি ছিল নিকেল অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাতের প্রায় সাত ইঞ্চি পুরু চাদরে তৈরি—সহ্য করেছিল দু-লক্ষ টনের মত চাপ!

যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কমাণ্ডার ওয়াল্‌শ্‌ বলেছেন, প্রথম দিকে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতেই তাঁরা সমুদ্রের গভীরতা মাপছিলেন, তারপর সমুদ্রতলের কাছাকাছি এসে গ্রেনেড ছুঁড়ে মাপছিলেন। সমুদ্রতলে নিক্ষিপ্ত গ্রেনেড সেখানে ফেটে যে শব্দ সৃষ্টি করে তা কতক্ষণে ফিরে আসে, তা দেখেই গভীরতা নির্ণয় করা হচ্ছিল। যত নীচে নামছিলেন, ওয়াল্‌শ্‌ বলেন, অন্ধকার তত বাড়ছিল। তিন-শ' ফুটের গভীরতায় থেকেই আলো ফুরিয়ে গেল, তারপর একেবারে নিরন্ধ্র অন্ধকার। খুব বড় আকারের কোন সামুদ্রিক প্রাণীর সাক্ষাৎ তাঁরা পান নি, বড় জোর তিন-চার ফুট লম্বা প্রাণী তাঁরা দেখেছিলেন। চিংড়ি দেখা গেছে কয়েক মাইল গভীরতা পর্যন্ত, আর সামুদ্রিক উদ্ভিদও তাঁরা দেখেছেন কিছু কিছু। কোন প্রাণীই ডুবোযানের কাছে আসে নি। সমুদ্রতলে ডুবকের উপর শামুকের মত হাঁটতে দেখেছেন একজাতীয় চ্যাপ্টা আকৃতির প্রাণীকে। অবশ্য তাঁরা বাইরে নজর দেবার সময় বেশী পান নি।

সমুদ্রের তলায় এরপর আরও অভিযান চালানো হয়েছে। এর মধ্যে 1969 সালের মার্কিন অভিযানটি উল্লেখযোগ্য। চারজন মার্কিন তরুণ ভার্জিনিয়া দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রগর্ভে একাদিক্রমে ষাট দিন কাটিয়েছিলেন। এটিই মানুষের সমুদ্রগর্ভবাসের এযাবৎ কালের দীর্ঘতম রেকর্ড। গত বছরের রাশিয়ার দুই সমুদ্র-বিজ্ঞানী আলেকসি নসনভ ও আইগর সুদারকিন সমুদ্রের 15 মিটার নীচে এক গবেষণাগারে কাটিয়েছেন। প্রবল ঝড়ে তাঁদের উপরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তাঁরা বারো দিনের বেশী তলায় থাকতে পারেন নি। মেয়েরাও সমুদ্র-অভিযানে পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি চারজন মার্কিন মহিলা 'টেকটাইট-2' নামক এক সাগর অভিযানে অংশগ্রহণ করে সমুদ্রে 50 ফুট গভীরে শিবিরের মধ্যে দু-সপ্তাহ অতিবাহিত করেন ও প্রয়োজনীয় গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে যান্ত্রিক গবেষণাগার পাঠিয়ে সামুদ্রিক গবেষণার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী তৈরি করেছে। এই সূচীতে সাত বছর ধরে সতেরোটি পর্যায়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন মোট বাহাত্তরজন বিজ্ঞানী।

সমুদ্রতল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের যে সব পদ্ধতি আছে, তাকে মোটামুটি তিনটি ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে মহাকাশীয় কৃত্রিম উপগ্রহ

ও অবলোহিত রশ্মির ফটোগ্রাফি। এটি সম্পর্কে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যান্ত্রিক গবেষণাগার সমুদ্রতলে প্রেরণ। এই জাতীয় সমুদ্রযানের আলোচনা আমরা এখানে করলাম, ঐতিহাসিক ট্রাইয়েস্ত ডুবোযান যার নিদর্শন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রতলে দু-জন অভিযাত্রীর অনায়াসে ষাট দিন বাসোপযোগী একটি আধুনিক যন্ত্রাগারের মডেল প্রস্তুত করেছে। এছাড়াও সমুদ্রের নীচে গবেষণার জন্যে আমেরিকার রয়েছে চারটি অত্যাধুনিক জাহাজ, যার একটি কুড়ি হাজার ফুট জলের নীচে গিয়েও কাজ করতে পারে। সমুদ্র সন্ধানের তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, সমুদ্রতলে ডুবুরি নামানো। বর্তমানে সমুদ্র-বিজ্ঞানকে ডুবুরির উপর যথেষ্ট নির্ভর করতে হয়। ডুবুরির কাজে জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকলেও আমাদের ক্রমপ্রসারমান জ্ঞানের পরিধি বিপদের গণ্ডীকে ক্রমশঃ ছোট করে আনছে। বর্তমান ডুবুরির জন্যে নানা বিজ্ঞানসম্মত সাজ-সরঞ্জাম, কৃত্রিম ফুসফুস ইত্যাদি উদ্ভাবিত হয়েছে। অথচ আজ থেকে ঠিক এক-শ' বছর আগে চ্যালেঞ্জার জাহাজটি অভিযান সুরু করে চার বছর বাদে যখন ফিরেছিল, তখন তার যাত্রীরা ডুবুরী না হওয়া সত্ত্বেও, দু-শ' চল্লিশ জনের মধ্যে সাতজন প্রাণত্যাগ করেন, এগারো জন বিকলাঙ্গ, আর পনেরো জন গুরুতর পীড়িত হয়েছিলেন। আজ এসব আপদ-বিপদ অনেকাংশে দূরীভূত এবং পূর্ব-বর্তীদের বিপদ বরণের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ অনেক বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞও ভাল ডুবুরি হবার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের নিজস্ব গবেষণার খাতিরেই। অভিজ্ঞ ডুবুরির বিশেষজ্ঞ হবার চেয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর ডুবুরি হওয়াই বোধ হয় ভাল।

সমুদ্র-বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব

প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গেও সমুদ্র-বিজ্ঞানের যোগ আছে। সমুদ্রে নিমজ্জিত জাহাজ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের উদ্ধারের জন্যে, জলোচ্ছ্বাস বা ভূমিকম্পে প্লাবিত বন্দর বা দ্বীপে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের সমুদ্রতত্ত্ববিদ ডুবুরির উপর নির্ভর করতে হয়। সমুদ্রে প্রত্নতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যে সমুদ্রের তলদেশ থেকে নমুনা আহরণ ও উত্তোলনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। নানা ঐতিহাসিক তথ্য যাচাই করবার কাজেও সমুদ্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডুবুরির প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিংবদন্তীর নিমজ্জিত মহাদেশ 'আটলান্টিস', যার কথা প্লেটো লিখে গেছেন, তার সত্যতা সম্পর্কে আজকের বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান, কারণ সমুদ্র সম্বন্ধে অনুসন্ধানে এর কোন হদিশ মেলে নি। এছাড়া মাইন ও নাশকতামূলক দ্রব্যাদি অপসারণ করে বন্দর বিপন্মুক্ত করতেও সমুদ্র-বিজ্ঞানীর সহযোগিতার দরকার হতে পারে।

আরও কিছু সম্ভাবনা

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধানের আশু প্রয়োজন কি? আশু প্রয়োজন খাদ্য ও জ্বালানী নিশ্চয়ই। এ ছাড়াও পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বাসস্থান ও খাদ্যের জন্যে ভবিষ্যতে সমুদ্রকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে ভবিষ্যৎ মানুষের উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা ডক্টর ওয়ালেশের মতে অবাস্তব নয়। আর চাঁদে উপনিবেশ গড়বার চেয়ে সেটি হয়তো সহজতরই হবে। মানুষ একবার চাঁদের স্বাদ যখন পেয়েছে, নোনা জলে কি আর তৃপ্তি হবে তার! ডক্টর ওয়ালেশ্ বলেছেন সমুদ্র-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ মহাকাশ-বিজ্ঞানের মতই উজ্জ্বল এবং সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের এই ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। ভারতীয় সমুদ্র বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও দক্ষতার প্রশংসাও ডক্টর ওয়ালেশ্ করেছেন।

সমুদ্রতলদেশ থেকে বস্তু আহরণের নানারকম

পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এরকম একটি পরিকল্পনা হচ্ছে—উপর থেকে সমুদ্রের গভীরে শব্দাকৃষ্ট মাছের ঝাঁকের চতুর্দিকে অতিকম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ পাঠানো হবে। ঐ শব্দের অদৃশ্য বেড়াজাল পেরিয়ে যেতে না পেরে মাছগুলি ঐখানেই থাকবে, ডিম পাড়বে ও সন্তান সৃষ্টি করবে। কেউ কেউ বলেছেন, সমুদ্রের ভিতর স্থলাগত জলধারা যেখানে লবণাক্ত সাগরজলের ধারার সঙ্গে মেশে, সেই সীমারেখার কাছেই নাকি মাছ ভীড় করে বেশী। এসব বিষয়ে অনুসন্ধানের দায়িত্বও সমুদ্র-বিজ্ঞানীর। সমুদ্রের তলদেশ থেকে সার উদ্ধারেরও সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহবস্তু সেখানে সার হয়ে জমে আছে। সমুদ্রতলে পারমাণবিক চুল্লী বসিয়ে জল গরম করে উষ্ণ জলের সঙ্গে সেই সারকে উপরে উঠিয়ে আনবার পরিকল্পনার কারিগরি দিকও অবশ্য রয়েছে। তাছাড়া এসব সম্ভাবনা কতটা সফল হবে বা নূতন কোন সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে কিনা, তা নির্ভর করছে সমুদ্র-বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর।

সাপের ইন্দ্রিয়গত বৈশিষ্ট্য

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

জনসাধারণের কাছে সাপ এক রহস্যময় প্রাণী। অবশ্য এই রহস্যময়তার মূলে অনেকাংশে রয়েছে কল্পনা, তবে বাস্তবতাও যে নেই, তা নয়। সাপের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে বেশ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমে এদের চোখের কথাই বলি। আমাদের চোখে যেমন পাতা আছে, সাপের চোখে তা নেই। সাপের চোখ নিষ্পলক—সব সময়ই খোলা থাকে—এমন কি, ঘুমাবার সময়ও। চোখ খোলা থাকায় কারও নড়াচড়ায় সাপের ঘুম ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার উপস্থিতি তার চোখে ধরা পড়ে। এটা সাপের একটা সুবিধা বলতে হবে। সাপের দৃষ্টি কোন গতিশীল বস্তুর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। সাপ পাখীর বাসা খোঁজে। অভিপ্রায়—ডিম ও বাচ্চা গলাধঃকরণ। কোন কোন পাখী আছে, যারা তাদের লুকায়িত বাসার দিকে অগ্রসরমান সাপ দেখলে দূরে অন্য দিকে গিয়ে ছটফট করতে থাকে—যেন তার ডানা ভেঙে গেছে, উড়তে পারছে না, আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। উদ্দেশ্য, বাসা থেকে সাপের দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করা—তার বাচ্চাদের বাঁচানো। পাখীটার নড়াচড়ায় আকৃষ্ট হয়ে সাপের দৃষ্টি সহজেই সেদিকে পড়ে। সাপ তার দিকেই এগোয়, কাছাকাছি যখন যায়, তখন পাখীটা ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। সাপের গতির দিক পরিবর্তিত হলে কখনও কখনও পাখীটার বিপদও ঘটে। সময়মত উড়ে পালাতে না পারায় সাপ খপ্ করে পাখীটাকে ধরে ফেলে। সাধারণ লোকে এই ধরণের ঘটনা দেখে মনে করে, সাপ বুঝি পাখীটাকে আকর্ষণীয় শক্তি দিয়ে অভিভূত করে তাকে আহার করে। সাপের চোখের এরূপ কোন আকর্ষণী শক্তি নেই। সাপের নিষ্পলক চাউনি তার চোখের আকর্ষণী শক্তির ভ্রান্ত সংস্কারকে আরও পুষ্ট করেছে। গতিশীল কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিশক্তির আকর্ষণ চক্রধর সাপের (Cobra) ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোন চক্রধর সাপের সম্মুখে কেউ একটা হাত নাড়াতে নাড়াতে যদি অপর হাত দিয়ে তার দেহ স্পর্শ করে, তাহলে কদাচিৎ সে ঐ হাতে ছোবল মারবে—

গতিশীল হাতের দিকেই তার নজর নিবদ্ধ থাকবে। যন্ত্রত্রয়ের সাহায্যে সম্মোহিত করে নয়—চক্ষুধরের এই বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নিয়ে সাপুড়েরা সাপ ধরে। কোন উদ্যত-ফণা চক্ষুধরের সামনে সাপুড়ে কোন সরা অথবা ঐ রকমের কোন জিনিষ বাঁ-হাতে ধরে নাড়তে থাকে, আর সুযোগমত ডান হাত দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তার ঘাড় চেপে ধরে। কোন জিনিষ বাঁ-হাতে রেখে নাড়াবার কারণ এই যে, অসাবধানতাবশতঃ সাপ ছোবল দিলেও দংশনের সম্ভাবনা থাকে না, ছোবলের আঘাত ঐ জিনিষের উপর পড়বে। কিছু দূরে একটা ইঁদুর সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে বসে আছে, আর দূরে গাছের উপর একটা পাখী নড়ে উঠলো। ইঁদুর আর পাখী—দুই-ই সাপের খাদ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সাপ যদি কাছের খাদ্য ছেড়ে দিয়ে পাখীর দিকে ছোটে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিছু দূরে ইঁদুরের নিশ্চল অবস্থার চেয়ে অনেক দূরের পাখীর নড়াচড়ায় সাপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। বন্দী একটি ময়াল সাপকে (Python) সদ্যনিহত একটা বড় মেঠো ইঁদুর খেতে দেওয়া হয়েছিল। সর্পরক্ষক ইঁদুরটাকে খাঁচার মধ্যে ফেলে দিল, কিন্তু সাপটার কোন প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। সে যেমন শুয়েছিল, তেমনই পড়ে রইলো। কিন্তু যেই সর্পরক্ষক একটা লোহার শিক দিয়ে ইঁদুরটাকে একটু নাড়িয়ে দিয়েছে, অমনি ময়ালটা বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে গিয়ে তাকে সজোরে কামড়ে ধরলো।

কোন পথচারীর পিছু পিছু কোন কোন সাপকে বেশ খানিকটা পথ চলতে দেখা যায়। এটা তার আক্রমণপ্রবণ মনোভাব নয়। সম্মুখের গতিশীল বস্তুটি কি, তারই 'তদারকি'। গ্রামাঞ্চলে এক দুধ-বিক্রেতা দুধের কেঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পাশের ঝোপ থেকে এক ঢেমনা সাপ (Rat snake) বেরিয়ে তার পিছু নেয়—বেশ খানিকটা যায়। ঢেমনা সাপের এই তদারকি মনোভাব বেশ প্রকট বলে মনে হয়। গ্রামবাসীরা অবশ্য এ ঘটনার ব্যাখ্যা করেছিল, ঢেমনা দুধের লোভে দুধ-বিক্রেতার পিছু নিয়েছিল।

সাপের অন্তঃকর্ণ আছে, কিন্তু বাইরের কর্ণ বা মধ্যকর্ণ নেই। বাইরের কর্ণ ও মধ্যকর্ণ না থাকায় সাপ বাতাসে ভেসে-আসা কোন শব্দ শুনতে পায় না। বস্তুত সাপ যে জগতে বাস করে, সেখানে বায়ু-বাহিত শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়; সেখানে প্রায় সব সময়েই বিধর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। অপর পক্ষে বাতাসে ভেসে-আসা শব্দ শুনতে না পেলেও মাটির সামান্য কম্পনও সাপ 'শুনতে' পায় অর্থাৎ দেহের অনুভূতির সাহায্যে বুঝতে পারে। মাটি কেন, যে কোন নিরেট আধারের উপর সাপ থাকে, তারই সামান্য কম্পন সে অনুভব করতে পারে। এই ক্ষমতা থাকায় আশপাশে কোন শত্রু এলে সাপ তার উপস্থিতি সহজেই বুঝতে পারে এবং তাকে দেখতে না পেলেও সতর্ক হয়। কোন শিকার এলেও বুঝতে পারে এবং অতর্কিতে তাকে ধরবার চেষ্টা করে। কোথাও সাপ বেরিয়েছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না, তবে সেখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। এই অবস্থায় সাপুড়ে ঐ সাপ খুঁজে বের করে তাকে ধরবার জন্যে কি কৌশল অবলম্বন করে? কোন রহস্যময় শক্তির সাহায্যে নয়। সাপুড়ের হাতে থাকে ছোট একটা লাঠি। সে ঐ লাঠি দিয়ে আশপাশের চৌকাঠ বা অনুরূপ সব স্থানে আঘাত করতে থাকে। লাঠির আঘাতে যে মৃদু ভূ-কম্পন হয়, গর্তের ভিতরে থেকে অনেক সময় সাপ তা দেহের সাহায্যে অনুভব করে এবং ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে থাকে। ঐ শব্দে সাপুড়ে বুঝতে পারে সাপ কোথায় আছে। দেহের অনুভূতির সাহায্যে মৃদু ভূ-কম্পনও অনুভব করবার সাপের এই যে ক্ষমতা—তা আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর

আগে ঋগ্বেদের ঋষিরাও লক্ষ্য করেছিলেন : 'লুক্কায়িত সর্প পদ-শব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানতে পারে।' (7. 50 1)

সাপের লকলকে জিভ তার জীবনে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। জিভ বললে তার স্বাদ গ্রহণের শক্তির কথাই প্রথমে আমাদের মনে ওঠে। জিভের যে নিছক স্বাদ-গ্রহণ শক্তি, তা সাপের জিভে নেই। এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্যভাবে প্রকাশ পায়। সাপের মুখের তালুর সামনের দিকে দুটি ছোট গর্ত আছে। এই গর্ত দুটি তীব্র সংবেদনশীল কোষে পূর্ণ। এই গর্ত দুটিকে বলে জ্যাকবসন-অঙ্গ (Jacobson's organ)। সাপ তার লম্বা চেরা জিভের ডগা দিয়ে মাটি বাতাস, জল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা তুলে নিয়ে গর্ত দুটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এই ভাবে সে তার আশপাশের জগৎ সম্বন্ধে সঠিক অনুভূতি ও গন্ধ লাভ করে। সাপের আসল নাক গন্ধ গ্রহণে সাহায্য করলেও জ্যাকবসন-অঙ্গ থাকাতেই সাপের ঘ্রাণশক্তি হয়েছে খুব তীক্ষ্ণ। ঠিকমত কামড়ে ধরতে না পারায় শিকার হয় তো সাপের মুখ থেকে পালিয়েছে। শিকার যে পথ ধরে পালিয়েছে, কোন কোন সাপ ঐ শিকারের গায়ের গন্ধ শুঁকে সে পথে গিয়ে ঠিক তাকে ধরে ফেলে। জলচারী সাপের প্রধান খাদ্য মাছ। কোন কোন জলচারী সাপের গায়ে আঁশটে গন্ধ লেগে থাকায় ঐ গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মাছ ভেবে ঐ সাপ নিজের গায়েই যদি দংশন করে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। সাপের ঘ্রাণশক্তি খুব জোরালো। তা বলে কার্বলিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দিলে—এমন কি, ঘরের মধ্যে রাখলেও তার গন্ধে সাপ পালাতে পথ পাবে না, এই ধারণা ঠিক নয়। ঈশার মূলের গন্ধে ফণা-উদ্যত সাপ বশীভূত হয়, এই কথাও ঠিক নয়। পরীক্ষা করে দেখেছি।

শঙ্খচূড়ের (King cobra) বাসস্থান দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এর প্রধান খাদ্য অন্য প্রজাতির (Species) সাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বন্দী শঙ্খচূড়ের খাঁচায় সে দেশের একটি কৃষ্ণ সাপ (Black snake) ছেড়ে দেওয়া হয়। আমেরিকার কৃষ্ণ সাপের পক্ষে স্বভাবতঃই আগে কোন শঙ্খচূড় সাপ দেখবার সুযোগ হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য, প্রায় দু-মিটার ব্যবধানে থেকে শঙ্খচূড়ের মুখ অন্য দিকে ফেরানো থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ সাপের দেহ টানটান হয়ে উঠলো—তার দেহ রইলো নিশ্চল। মাত্র তার লকলকে জিভটা ধীরে ধীরে আন্দোলিত করে সাপটা এমন ভাব দেখাতে লাগলো, যেন সে কোন অশুভ ঘটনার ইঙ্গিত পেয়েছে। অথচ এই কৃষ্ণ সাপটিকেই যখন বিশালকায় মযাল সাপের খাঁচায় রেখে দেওয়া হলো, তখন সাপটি অতি সহজভাবেই চলাফেরা করতে লাগলো। অতি অবহেলায় সে ময়ালের দেহের উপর দিয়েও নড়াচড়া করতে লাগলো।

কৃষ্ণ সাপটি তার জ্যাকবসন-অঙ্গের সাহায্যে শঙ্খচূড়ের সর্পখাদক স্বভাব বুঝতে পেরেছিল কি? এই প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষার কথা মনে পড়ে। আমেরিকার ঝুমঝুমি সাপ (Rattlesnake) সেখানকার রাজসাপকে (King snake) ভয় করে। কিন্তু শত্রুকে চেনে সে চোখ দিয়ে দেখে নয়—জ্যাকবসন-অঙ্গের সাহায্যে চেনে। ঝুমঝুমি সাপ রাজসাপের দেহের গন্ধ শুঁকে তার উপস্থিতি বুঝতে পারে। চোখবন্ধ-করা ঝুমঝুমি সাপের সামনে রাজ-সাপকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চোখে দেখতে না পেলেও ঝুমঝুমি সাপের ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। অপর পক্ষে চোখ খোলা আছে, কিন্তু জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে—রাজসাপের উপ-স্থিতিতে ঝুমঝুমি সাপের কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নি। চোখে দেখলেও রাজসাপকে ঝুমঝুমি সাপ যেন চিনতেই পারে না।

সাপ আমিষাশী প্রাণী। আমিষ ছাড়া সে

আর কিছু খায় না। কিন্তু আসামের এক চা-বাগানের শ্রমিকেরা একটি ময়ালকে আম খেতে দেখেছিল। ঠিক সন্ধ্যার আগে এক আমগাছের তলায় ময়ালটি শুয়েছিল। সেই গাছ থেকে পড়া একটি আম ময়ালটি গিলছিল। সাপটিকে হত্যা করবার পর তার গলনালীতে চারটি আস্ত আম পাওয়া গিয়েছিল। এই থেকে বোঝা যায়, সাপটি পরপর চারটি আম গিলেছিল। এখন প্রশ্ন, ময়াল আম খেতে গেল কেন? আমগুলি ভাল করে পরীক্ষাতে দেখা গেল, তাদের খোসায় কোন কোন কীটের শূক লেগে আছে। জ্যাকবসন-অঙ্গ ঐ শূকের গন্ধ গ্রহণে সাহায্য করে সাপকে আম গিলতে প্ররোচিত করেছিল। অবশ্য এও অসম্ভব নয়, গাছ থেকে আমগুলি পড়েছিল একটার পর একটা, আর ক্ষুধার্ত সাপ সেগুলির গতিশীলতায় আকৃষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে টপাটপ গিলেছিল শিকার অর্থাৎ কোন জন্তু ভেবে। তবে আগের ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সমীচীন বলে মনে হয়।

মুখতলের গর্ত (Facial pit) সাপের একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়। সব সাপের তা থাকে না। কোন কোন সাপের থাকে। তাদের সুবিধা এই যে, দেখতে না পেলেও কাছের কোন তাপমোচী শিকারকে দংশন করতে এদের কোন অসুবিধাই হয় না। তাপমোচী প্রাণীর দেহের তাপ সাপের দেহের তাপের চেয়ে সামান্য বেশী হলেই সাপের মুখতল গর্তে তা ধরা পড়ে। মুখতল গর্ত যেসব সাপের আছে, তারা ভূমির উপর দিয়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে মন্থর গতিতে চলবার সময় বুঝতে চেষ্টা করে, কোথাও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার তুলনায় বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা কোন কিছু আছে কিনা। কোন পাখী বা ব্যাং বা অন্য কোন প্রাণী থাকলে না দেখেও সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে তাদের উপস্থিতি। ঐ প্রাণী তার আক্রমণের পাল্লার মধ্যে আছে কিনা, তাও সে অনুমান করতে পারে। প্রাণীটার আকার সম্বন্ধেও তার একটা ধারণা হয়। প্রাণীর আকার তেমন বড় হলে সাপের তাকে আক্রমণ না করাই স্বাভাবিক। তাতে তার কোন লাভ নেই, উল্টে বিপদের সম্ভাবনা। অবশ্য কোন মানুষের পা অথবা অন্য কোন বড় প্রাণীর দেহের অংশ তাকে আঘাত হানতে পারে—এই আশঙ্কায় আত্মরক্ষার্থে সাপ ঐ মানুষ বা প্রাণীকে মুখতল গর্তের সহায়তা নিয়ে আক্রমণ করতে পারে। তাপগ্রাহী অপেক্ষা তাপমোচী প্রাণী খেতেই ময়াল আগ্রহ প্রকাশ করে। ময়ালের ওষ্ঠে মুখতল গর্ত আছে। সুতরাং রাত্রির অন্ধকারেও তাপমোচী প্রাণীর উপস্থিতি ময়াল সহজেই বুঝতে পারে। গেছো বোড়ার (Bamboo pit viper) মাথার দু-পাশে নাসারন্ধ্র ও চোখের মধ্যস্থলে মুখতল গর্ত আছে। এর সাহায্যে গেছো বোড়া খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিকার ধরে।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা। চীন আর জাপানের মধ্যে বিবাদ লেগেই আছে। তবে জাপানীরা নৌশক্তিতে প্রবল। তাই তারা জাহাজে করে সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়ায়, আর চীনাদের জাহাজ দেখলেই তাকে আক্রমণ করে।

এই রকম পরিস্থিতিতে একদিন দূরে চীনাদের একটা জাহাজ দেখা গেল। টহলদারী জাপানী জাহাজটা সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ছুটে গেল। গোলন্দাজ সৈন্যেরা প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, চীনা জাহাজটা কখন কামানের আওতার মধ্যে এসে পড়ে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলায় তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

সেনাধ্যক্ষ দূরবীন চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। সুযোগ বুঝে হুকুম দিলেন—কামান দাগ।

কিন্তু একি! গোলন্দাজ সৈন্যটির হাত-পা তখন কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে পড়ে গেল ডেকের উপর।

সেনাধ্যক্ষ ছুটে এসে তার পিঠে চাবুক মারলেন। হেঁকে উঠলেন—এই শয়তান, উঠে দাঁড়া। কামান দাগ জলদি।

কিন্তু হায়, অনেক চেষ্টা করেও সে উঠতে পারলো না। তার হাত-পা ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসতে লাগলো। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে এক বোবা কান্নায় তার মুখ ভরে উঠলো।

সেনাধ্যক্ষের আদেশে আর একজন সৈন্য সেখানে ছুটে এলো, বারুদে আগুন দিল। কিন্তু তার হাত-পা কেমন যেন অবশ। তাই নিশানা ঠিক হলো না। কামান গর্জে উঠলো ঠিকই, কিন্তু কামানের গোলা শত্রুর জাহাজকে আঘাত হানতে পারলো না।

বিপদ বুঝে সেনাধ্যক্ষ জাহাজ নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে এলেন। রাগে ক্ষোভে তিনি ফুঁসতে লাগলেন। তাঁর কেমন সন্দেহ হলো, সৈন্যেরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তিনি গর্জে উঠলেন—বেইমানের দল, সব সারবন্দী হয়ে দাঁড়া।

বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি মৃত্যু। এবার তাদের গুলি করে হত্যা করা হবে।

খবর পেয়ে নৌবাহিনীর বড় ডাক্তার টাকাকী সেখানে ছুটে এলেন। বললেন ক্ষান্ত হোন, ওরা দোষী নয়। ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এক রকম রোগ, যার নাম বেরিবেরি (Beriberi)। এই রোগ হলে কেউ বাঁচে না।

সব কথা শুনে জাপানের সম্রাট এই মারাত্মক রোগ প্রতিরোধের ভার দিলেন টাকাকীর উপর।

তখন নৌসেনাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান ছিল কলেছাটা মিহি চালের ভাত, পরিষ্কার ধবধবে। 1885 খৃষ্টাব্দে টাকাকী বিধান দিলেন, শুধু ভাত খেলেই চলবে না, তার সঙ্গে তরিতরকারী, মাছ, মাংস এবং বার্লিও খেতে হবে—না হলে এই রোগে মৃত্যু অনিবার্য।

কিছু দিনের মধ্যেই দেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখলো, টাকাকীর ব্যবস্থামত খাদ্যগ্রহণ করে নৌসেনাদের কেউ আর এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো না কিংবা মৃত্যুমুখে

---

* রসায়ন বিভাগ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ; কলিকাতা-4

পতিত হলো না। এভাবে টাকাকী একটা নূতন আবিষ্কারের পথ খুলে দিলেন। তবে এই রোগটা কেন হয়, তা ঠিক বলতে পারলেন না।

ডাচ্‌দের অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তখন এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। তাই আইকম্যান নামক একজন চিকিৎসককে সেখানে পাঠানো হলো, এই রোগ সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে।

পাখীদের এক রকম পক্ষাঘাত রোগ হয়, তার নাম পলিনিউরাইটিস (Polyneuritis)। এর সঙ্গে মানুষের বেরিবেরি রোগের খুব মিল আছে। গবেষণা করতে করতে 1897 খৃষ্টাব্দে আইকম্যান আবিষ্কার করলেন যে, মুরগীকে কেবলমাত্র কলেছাটা পরিষ্কার চাল খেতে দিলে তার এই রোগ হয়। কিন্তু ঐ মুরগীকে চালের কুঁড়া খেতে দিলে এই রোগ সেরে যায়। অপর দিকে মুরগীকে সাধারণ আছাটা চাল খেতে দিলে এই রোগ আদৌ হয় না।

এরপর আইকম্যানের স্থলাভিষিক্ত হলেন গ্রীন্স্। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে 1901 খৃষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করলেন যে, চালের কুঁড়ায় (Rice polishings) এমন একটি উপাদান আছে, যা আমাদের স্নায়ুকে সতেজ রাখে। এর অভাবেই মানুষের বেরিবেরি আর পাখীর পলিনিউরাইটিস রোগ দেখা দেয়।

এরপর 1905 খৃষ্টাব্দে ফ্রেচার মালয় দেশের কুয়ালালামপুরের এক উন্মাদাশ্রমে গবেষণা শুরু করলেন। তিনি তাঁর রোগীদের দু-দলে ভাগ করলেন। একদল রোগীকে কলেছাটা পরিষ্কার চালের ভাত খেতে দিতেন, আর অন্য দলকে দিতেন আছাটা লাল চালের ভাত। প্রথম দলের 120 জন রোগীর মধ্যে 36 জনেরই বেরিবেরি হলো এবং 18 জন এই রোগে মারা গেল। অপর দিকে দ্বিতীয় দলের 123 জন রোগীর মধ্যে মাত্র দু-জন আক্রান্ত হলো, আর তাদের রোগও তেমন মারাত্মক হলো না। তারা আবার ভাল হয়ে উঠলো। এই পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হলো 1907 খৃষ্টাব্দে।

এই সময় মালয়ের আর এক জায়গায় রেল লাইন পাতা হচ্ছিল। ফ্রেজার এবং স্ট্যান্টন সেখানকার 300 জন শ্রমিক নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। শ্রমিকদের দু-ভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম দলকে খাদ্যের প্রধান উপাদান হিসেবে দেওয়া হতো কলেছাটা পরিষ্কার চালের ভাত, আর অন্য দলকে সাধারণ আছাটা চালের ভাত। প্রায় তিন মাসের মধ্যেই প্রথম দলের শ্রমিকদের মধ্যে বেরিবেরি রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল, অথচ দ্বিতীয় দলের শ্রমিকদের কিছুই হলো না। এরপর ঐ দু-দল শ্রমিকদের চালের রেশন অদল-বদল করে দেওয়া হলো। এর ফলে প্রথম দলের রোগীরা ক্রমশঃ ভাল হয়ে উঠলো, অপর দিকে বেরিবেরি রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল দ্বিতীয় দলের মধ্যে। এই পরীক্ষার বিবরণ ল্যান্সেট পত্রিকায় প্রকাশিত হলো 1909 খৃষ্টাব্দে।

ইতিমধ্যে 1906 খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী হপ্‌কিন্স এবং মার্কিন বিজ্ঞানী ম্যাক্কলম জানান যে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট (স্নেহপদার্থ), প্রোটিন, লবণ ও জল—এই সব কয়টি উপাদানও জীবদেহের পুষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়। অথচ এদের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা সুরাবীজ (Yeast) মিশিয়ে দিলেই জীবদেহের স্বাভাবিক পুষ্টি অব্যাহত থাকে।

এসব গবেষণার সূত্র ধরে লিস্টার ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী ফাঙ্ক 1911 খৃষ্টাব্দে চালের কুঁড়া থেকে এমন একটি উপাদান পৃথক করতে সক্ষম হলেন, যার সাহায্যে পায়রার পলিনিউরাইটিস রোগ নিবারণ করা সম্ভব হলো। এই সব পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করে তিনি

বললেন, বেরিবেরি হলো খাদ্যে একটি অত্যাবশ্যক পদার্থের অভাবজনিত রোগ। এই অত্যাবশ্যক উপাদানটি থাকে চালের উপরের আবরণে। তিনি আরও বললেন, শুধু বেরিবেরি নয়—স্কার্ভি, পেলাগ্রা এবং সম্ভবতঃ রিকেট্‌স্‌ রোগেরও কারণ এমন সব উপাদান, যেগুলি আমরা সাধারণতঃ খাদ্য থেকেই পেয়ে থাকি। কোন কারণে খাদ্যে এসব উপাদানের অভাব ঘটলেই দেখা দেয় এরূপ অভাবজনিত রোগ। তাই তিনিই সর্বপ্রথম এই জাতীয় অত্যাবশ্যক উপাদানের নাম দেন 'Vitamine' (ল্যাটিন Vita=প্রাণ, amine=অ্যামোনিয়াজাত), কারণ চালের কুঁড়া থেকে যা পাওয়া যায়, তা ছিল অ্যামোনিয়াজাত পদার্থ। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন এই জাতীয় আরও কয়েকটি পদার্থের কথা জানা গেল, তখন বোঝা গেল যে, সবার সঙ্গে অ্যামোনিয়ার সম্পর্ক নেই। এজন্যে ইংরেজী নামের শেষ থেকে 'e' অক্ষরটি বর্জন করে 'Vitamin' নামটি গ্রহণ করা হলো। বাংলায় এদের বলা হয় খাদ্যপ্রাণ।

এদিকে মার্কিন দেশে ওসবোর্ন এবং মেণ্ডেল 1910 থেকে 1913 সালের মধ্যে প্রমাণ করলেন যে, মাখনে এমন একটি উপাদান আছে, যা ইঁদুরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে অত্যাবশ্যক। এরপর ম্যাক্‌কলম এবং ডেভিস্‌ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ডিমের কুসুম, মাখন এবং কড্‌-লিভার তেলে এই উপাদানটির (এখন এর নাম ভিটামিন-A) অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেন। 1915 সালে তাঁরা ঘোষণা করেন যে, "There are necessary for normal nutrition during growth two classes of unknown accessory substances, one soluble in fats and the other soluble in water, but not apparently in fats." অর্থাৎ বৃদ্ধির সময় স্বাভাবিক পুষ্টির জন্যে দুই শ্রেণীর সহায়ক পদার্থের প্রয়োজন হয়—এক শ্রেণীর পদার্থ স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় এবং অপর শ্রেণীর পদার্থ জলে দ্রবণীয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে স্নেহপদার্থে নয়।

যেটি স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় তার নাম দেওয়া হলো ভিটামিন A, আর যেটি জলে দ্রবণীয় তার নাম ভিটামিন-বি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে দুটি উপাদানের মিশ্রণ—একটি অল্প তাপেই বিয়োজিত হয়, যার নাম দেওয়া হলো ভিটামিন-B_1; অন্যটি বিয়োজিত হয় না, তার নাম দেওয়া হলো ভিটামিন-B_2।

কালক্রমে এসব উপাদান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা সম্ভব হলো এবং তাদের অণুর গঠন সম্পর্কেও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। শুধু তাই নয়, গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তাদের প্রস্তুত করাও সম্ভব হলো। ক্রমে আরও কতকগুলি নূতন ভিটামিন আবিষ্কৃত হলো এবং তাদের কার্যকারিতার বিবরণও প্রকাশিত হলো। তার ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রে এলো যুগান্তর।

এখন আমরা জানি যে, খাদ্যের প্রধান উপাদান হলো পাঁচটি—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট (স্নেহপদার্থ), লবণ এবং জল। কিন্তু এসবেও দেহের পুষ্টি হবে না, যদি এদের সঙ্গে নানাপ্রকার ভিটামিন না থাকে। ভিটামিনশূন্য খাদ্য প্রাণহীন পুতুল বা চালকহীন ইঞ্জিনের মত। কাজেই এদের বলা হয়েছে খাদ্যপ্রাণ।

এদেশে সাধারণতঃ যেসব খাদ্য গ্রহণ করা হয়, সেগুলির কোন্‌টির মধ্যে কোন্‌ ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তার একটি তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। এখানে মনে রাখা দরকার যে, রন্ধনের সময় উত্তাপের ফলে কোন কোন ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

ভিটামিনের তালিকা

ভিটামিন	কোন্ পদার্থে দ্রবণীয়	কার্যকারিতা	প্রধানতঃ কোন্ খাদ্যে বেশী পাওয়া যায়
এ	স্নেহপদার্থে	শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ করে এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ায়। এর অভাবে রাত-কানা রোগ এবং অন্যান্য চোখের রোগ হয়।	দুধ, মাখন, মাছ, ডিম, পালং-শাক, মটরশুঁটি, বিলাতি কুমড়া, গাজর, কড্ বা হাঙরের যকৃতের তেল ইত্যাদিতে।
বি (মিশ্রণ)	জলে	এর অভাবে বেরিবেরি, ক্ষুধা-মান্দ্য, দুর্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও নানাপ্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়।	ঢেঁকিছাঁটা চাল, যাঁতায় ভাঙা আটা, দুধ, ডিম, মেটে, শাক-সব্জি, ফলমূল ইত্যাদিতে।
সি	জলে	রক্ত ও দেহযন্ত্রগুলিকে সুস্থ রাখে। এর অভাবে স্কার্ভি রোগ এবং দাঁতের রোগ হয়।	পাতিলেবু, কাগজীলেবু, কমলা-লেবু, টোম্যাটো, কালোজাম, আম, আনারস, আমলকি ইত্যাদিতে।
ডি	স্নেহ পদার্থে	অস্থি, দন্ত ও পেশীর পোষক। শিশুদের রিকেট্স্ বা অস্থি-বিকৃতি রোগ নিবারণ করে।	কড্ মাছের যকৃতের তেল এবং চিতল, চাঁই, হেরিং, স্যামন, সার্ডিন প্রভৃতি তৈলপ্রধান মাছ, ডিম, দুধ, মাখন ইত্যাদিতে। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি গায়ে লাগালে এই ভিটামিন উৎপন্ন হয়।
ই	,,	সন্তানবতী মায়ের জন্যে প্রয়োজন হয়। এর অভাবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হয়।	গম, ছোলা ও ডালের অঙ্কুর, উদ্ভিজ্জ তৈল, মটরশুঁটি, লেটুস ও শাক ইত্যাদিতে।
কে	,,	রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। সুতরাং রক্তে এটি থাকলে সহজেই রক্তপাত বন্ধ হয় নতুবা রক্তপাত বন্ধ হতে দেরী হয়।	মাছ, মাংস, মেটে, মাখন, বাঁধা-কপি, পালংশাক, টোম্যাটো ইত্যাদিতে।

মহাকর্ষ-তরঙ্গ

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেক সময় তত্ত্বগতভাবে অনেক জিনিষের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হলেও পরীক্ষামূলকভাবে তা প্রমাণিত হতে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। এমনই একটি আবিষ্কার হলো মহাকর্ষ-তরঙ্গ (Gravity waves)। 1966 খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে মহাকর্ষ-তরঙ্গের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। আর তা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয় মাত্র তিন বছর আগে 1969 খৃষ্টাব্দে। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বারা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনষ্টাইন দেখেন যে, তাঁর তত্ত্বানুযায়ী নিউটনের সূত্রটির পুনর্গঠন করা প্রয়োজন এবং তা করতে গিয়েই তিনি মহাকর্ষকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের (Gravitational field) দ্বারা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র আছে এমন স্থানে, যেখানে ইউক্লিডের জ্যামিতি খাটে না, রিম্যানিয়ান জ্যামিতি নামে বিশেষ এক জ্যামিতি সেখানে প্রযোজ্য। এই জ্যামিতির সাহায্যে আইনষ্টাইন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সমীকরণগুলি প্রকাশ করেন। তিনি গণনা করে দেখেন যে, যদি সত্য সত্যই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে রিম্যানিয়ান জ্যামিতি প্রযোজ্য হয়, তবে সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের জন্যে গ্রহগুলির কক্ষপথ ও আলোক-রশ্মির গতিপথ সামান্য পরিবর্তিত হবে। গণনা অনুযায়ী সূর্যের কাছ ঘেঁষে আসা আলোক রশ্মিগুলি তাদের ঋজু গতিপথ থেকে 1·75 সেকেণ্ড বিচ্যুত হবে। পরীক্ষায় গণনাটির যাথার্থতা প্রমাণিত হয় 1919 খৃষ্টাব্দের 29শে মার্চ। সে দিন ছিল সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ।

আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী মহাকর্ষ-তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। এথেকে স্বভাবতঃই মহাকর্ষ তরঙ্গের সঙ্গে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সাদৃশ্যের কথা মনে হতে পারে। তবে এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোন বস্তুর উপর তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রভাব মহাকর্ষ-তরঙ্গের প্রভাবের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে মহাকর্ষ বল ও বৈদ্যুতিক বলের অনুপাত প্রায় 10^{-43}। সুতরাং ত্বরণযুক্ত অবস্থায় একটি ইলেকট্রন থেকে যে পরিমাণ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ নির্গত হবে, মহাকর্ষ-তরঙ্গ নির্গত হবে তার তুলনায় 10^{-43} গুণ কম। তাই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রকে দুর্বল ধরে আইনষ্টাইন তাঁর অত্যন্ত জটিল ক্ষেত্র সমীকরণগুলিকে (Field equations) সরল রূপ দান করেন। সরলীকৃত সমীকরণগুলি তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র সমীকরণের অনুরূপ। এথেকেই আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত করেন যে, মহাকর্ষীয় প্রভাব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তরঙ্গ আকারে প্রবাহিত হয়।

সমীকরণের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও মহাকর্ষ-তরঙ্গ ও তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যে একটি মূলগত বিভেদ আছে। তার কারণ আধান (Electric charge) দুই প্রকারের—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক, কিন্তু পদার্থের ভর সব সময়েই ধনাত্মক। সুতরাং একটি বৃহদাকার বস্তু থেকে নির্গত মহাকর্ষ-তরঙ্গসমূহের সংযোগী ব্যতিচার

---

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ; আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার।

(Constructive interference) হবে এবং ফলে মহাকর্ষ-তরঙ্গের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ঐ বস্তুতে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক আধান সমান হওয়ায় বস্তু থেকে নির্গত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের পরিমাণ কম হবে, কারণ ধনাত্মক আধানের জন্যে নির্গত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং ধনাত্মক আধানের কাছাকাছি অবস্থিত ঋণাত্মক আধানের জন্যে নির্গত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যে বিনাশী ব্যতিকরণ (Destructive interference) হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মহাকর্ষ-তরঙ্গ পেতে হলে আমাদের বেশ বেশী ভরের বস্তুর শরণাপন্ন হতে হবে। আর তাই পরীক্ষাগারে মহাকর্ষ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা মাপবার ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। এই কথার যাথার্থতা আইনস্টাইনের গণনা থেকেও পাওয়া যায়। 1916 খৃষ্টাব্দে আইনস্টাইন নিজের কোন একটি অক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান দণ্ডের ক্ষেত্রে তাঁর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করেন। যদি দণ্ডের ভর M, দৈর্ঘ্য l এবং ঘূর্ণনের কৌণিক বেগ w হয়, তবে বিকিরিত মহাকর্ষ শক্তির পরিমাণ হবে $P = 1{\cdot}44 \times 10^{-60} \times M l^2 w^6$। স্পষ্টতঃই দণ্ডের ভর অথবা ঘূর্ণনবেগ খুব বেশী মানের না হলে বিকিরিত মহাকর্ষ-শক্তির পরিমাণ হবে খুবই কম। সুতরাং মহাকর্ষ-তরঙ্গের জন্যে আমাদের পৃথিবীর বাইরে কোথাও খোঁজ করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীর বাইরে যে গ্যালাক্সি আছে, সেখানেই মহাকর্ষ-তরঙ্গের উৎস রয়েছে।

স্প্রিং-এর সাহায্যে কোন আহিত বস্তুকে আধান-নিরপেক্ষ (Neutral) কোন বস্তুর সঙ্গে বেঁধে তার পর স্প্রিংটিকে টেনে ছেড়ে দিলে আহিত বস্তু যে পর্যাবৃত্ত গতি তথা ত্বরণ লাভ করবে, তার ফলে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ নির্গত হবে। এভাবে সহজেই আমরা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারি। মহাকর্ষ-তরঙ্গও অনুরূপে পাওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কম্পনের ফলে উভয় বস্তু থেকেই মহাকর্ষ-তরঙ্গ নির্গত হবে। কিন্তু নির্গত তরঙ্গের পরিমাণ হবে খুবই কম; কারণ কম্পনশীল বস্তু দুটির ত্বরণ পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ায় এক বস্তু থেকে নির্গত মহাকর্ষ-তরঙ্গ অপর বস্তু থেকে নির্গত মহাকর্ষ-তরঙ্গের বিপরীতমুখী হবে এবং ফলে মোট তরঙ্গের পরিমাণ প্রায় শূন্য হবে। অবশ্য বস্তু দুটির অবস্থান ভিন্ন হওয়ায় নির্গত তরঙ্গের পরিমাণ একেবারে শূন্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ প্রত্যেকটি 1000 কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট এমন দুটি বস্তুর গড়-দূরত্ব (Mean separation) 1 মিটার অবস্থায় বস্তু দুটি যদি 1000 H-z- (প্রতি সেকেণ্ডে 1000 বার) কম্পাঙ্কে এবং 1 সেন্টিমিটার বিস্তারে কম্পিত হয়, তবে নির্গত মহাকর্ষ-তরঙ্গের শক্তির পরিমাণ হবে 10^{-40} ওয়াটের মত।

মহাকর্ষ-তরঙ্গ ও তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের নির্দেশনের (Detection) ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান। একটি আধান-নিরপেক্ষ বস্তুর তুলনায় কোন আধানযুক্ত বস্তুর ত্বরণের মানের দ্বারা কোন স্থানের তড়িৎ-ক্ষেত্রের পরিমাপ করা যায়। কিন্তু মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের পরিমাপ এভাবে করা যাবে না; কারণ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অবস্থিত সকল বস্তু-কণা একইভাবে কম্পিত হবে, সকল কণার ত্বরণ হবে একই মানের।

অধ্যাপক ওয়েবার মহাকর্ষ-তরঙ্গ নির্দেশনের কাজে হাত দেন 10-12 বছর আগে। সে সময় অনেকেই ওয়েবারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ওয়েবার সে সন্দেহ অমূলক ছিল বলে প্রমাণ করেছেন। মহাকর্ষ-তরঙ্গ নির্দেশনের জন্যে তিনি একটি নিরেট চোঙাকৃতি দণ্ড ব্যবহার করেন। দণ্ডটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য প্রায় 1·5 মিটার, ব্যাস 0·66 মিটার এবং ভর $1{\cdot}4 \times 10^{3}$ কিলোগ্রাম। এটির নিজস্ব মূল কম্পাঙ্ক (Fundamental frequency) হলো 1661 হার্জ। চোঙটির নিজস্ব কম্পাঙ্কের এরূপ

যার দেবার কারণ এই যে, আমেরিকার বিজ্ঞানী ভাইনবের গণনা অনুযায়ী উচ্চভরসম্পন্ন কোন সৌর বস্তুর [যেমন সুপারনোভা (Supernova)] নিমজ্জনের (Collapse) ফলে যে সমস্ত মহাকর্ষ-তরঙ্গ নির্গত হয়, তন্মধ্যে যে তরঙ্গগুলি সবচেয়ে শক্তিশালী, সেগুলির কম্পাঙ্ক 1660 হার্ৎসের কাছাকাছি। কোন মহাকর্ষ-তরঙ্গ যদি দণ্ডটির উপর লম্বভাবে আপতিত হয়, তবে তা দণ্ডটির দুই প্রান্তে বল প্রয়োগ করবে। ফলে দণ্ডটি হয় প্রসারিত, নয় সঙ্কুচিত হবে এবং দণ্ডটিতে 1660 হার্ৎস কম্পাঙ্কের অনুদৈর্ঘ্য কম্পনের সৃষ্টি হবে। কম্পনের বিস্তৃতি 10^{-14} সেণ্টিমিটারের মত হয়। দণ্ডটির কেন্দ্রস্থলে বিকৃতি (Strain) সর্বাধিক হয়। সুতরাং দণ্ডটির কেন্দ্রস্থল বেষ্টন করে ওয়েবার কয়েকটি পিজোইলেকট্রিক কেলাস (Piezo-electric crystal) লাগিয়ে দিলেন। পিজো-ইলেকট্রিক কেলাসগুলি যান্ত্রিক কম্পনকে অনুরূপ বৈদ্যুতিক কম্পনে রূপান্তরিত করে। কম্পনের বিস্তার খুব কম হওয়ায় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্যে কম্পনের তথা মহাকর্ষ-তরঙ্গের পরিমাপ করা হয়। চোঙের মাঝখানে একটি তার দিয়ে বেড় দেওয়া অবস্থায় তারটির সাহায্যে চোঙটিকে একটি শূন্য প্রকোষ্ঠের মধ্যে অনুভূমিকভাবে ঝোলানো হয়। এর ফলে দণ্ডটি বাধামুক্ত অবস্থায় (Freely) কম্পিত হতে পারে। শূন্য প্রকোষ্ঠটি 304.7 সেণ্টিমিটার লম্বা এবং 213.3 সেণ্টিমিটার ব্যাসযুক্ত। যে তারটির সাহায্যে চোঙটিকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়, সেটির দুই প্রান্ত একটি অনুভূমিক দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা থাকে। শূন্য প্রকোষ্ঠের বাইরের কোন শব্দ যাতে চোঙটির উপর কোনভাবে ক্রিয়া করতে না পারে, সে জন্যে অনুভূমিক দণ্ডটিকে উপযুক্ত শব্দ-নিরোধকের (Accoustic filter) উপর বসানো হয়। এই শব্দ-নিরোধক বাইরের শব্দ থেকে পুরাপুরিভাবে নির্দেশককে রক্ষা করতে পারে। শূন্য প্রকোষ্ঠের বাইরে থেকে নির্দেশকটিতে স্বাভাবিক কম্পন সৃষ্টি করতে হলে প্রকোষ্ঠের দেয়ালে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে হবে। মহাকর্ষ-তরঙ্গ আপতনের ফলে দণ্ডে সৃষ্ট যান্ত্রিক কম্পন পিজোইলেকট্রিক কেলাসের দ্বারা বৈদ্যুতিক কম্পনে রূপান্তরিত হবার পর যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে কম্পনকে বর্ধিত (Amplify) করা হয়, সেই ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মধ্যকার ইলেকট্রন ও পরমাণুগুলির কম্পন যাতে নির্দেশিত (Detected) সংকেতকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে না পারে, সে জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলিকে হিলিয়ামের সাহায্যে খুব কম তাপমাত্রায় (মাত্র কয়েক ডিগ্রী কেলভিন) রাখা হয়, কারণ ঘরের তাপমাত্রাতেও যন্ত্রের পরমাণু ও ইলেকট্রনগুলির কম্পন এত বেশী যে, তার প্রাবল্য (Intensity) মহাকর্ষ-তরঙ্গের জন্যে সৃষ্ট সংকেতের প্রাবল্যের প্রায় সমান। এভাবে তৈরি নির্দেশক বেশ ভাল সুবেদী (Sensitive) এবং এটি চোঙের দৈর্ঘ্যের 10^{-14} সেণ্টিমিটারের মত পরিবর্তনও নির্দেশ করতে পারে।

ওয়েবারের পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের উৎসের সূর্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। মহাকর্ষ-তরঙ্গ আসে ছায়াপথের (Milkyway) দিক থেকে অর্থাৎ আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে। অবশ্য মহাকর্ষ-তরঙ্গ এর বিপরীত দিক থেকেও অর্থাৎ কার্ব নেবুলার (Carb nebula) দিক থেকে আসতে পারে। কিন্তু ওয়েবারের পরীক্ষার ফল ব্যাখ্যা করতে গেলে যে মহাকর্ষ-শক্তির প্রয়োজন, তা বিবেচনা করলে গ্যালাক্সির কেন্দ্রকেই মহাকর্ষ-তরঙ্গের উৎস বলে ধরে নিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হলো এই বিপুল পরিমাণ মহাকর্ষ-তরঙ্গ কিভাবে প্রকৃতিতে সৃষ্ট হচ্ছে? এই বিপুল পরিমাণ মহাকর্ষ-তরঙ্গ সৃষ্টি হতে হলে সূর্যের অথবা ততোধিক ভরসম্পন্ন দুটি বস্তুর

কম্পনের প্রয়োজন। গণনায় দেখা যায় যে, উৎসের আকার 100 কিলোমিটার অপেক্ষা ছোট হতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের উৎসের আকার অনুপাতে ভর অনেক বেশী অর্থাৎ উৎসের ঘনত্ব হবে খুবই বেশী। এই ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা আছে। তা হলো নিউট্রন তারকা (Neutron Stars) এবং ব্ল্যাক হোল (Black hole)। প্রথমটির ভর সূর্যের ভরের কাছাকাছি এবং ব্যাস 20 থেকে 30 কিলোমিটার। নিউট্রন তারকা হলো ঘনীভূত অবস্থায় দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ নিউট্রনসমূহ। নিউট্রন তারকা থেকে নির্গত মহাকর্ষ-তরঙ্গের শক্তির মান ওয়েবারের পরীক্ষা ব্যাখ্যা করতে যথেষ্ট নয়। এখন দেখা যাক, ব্ল্যাক হোল মহাকর্ষ-তরঙ্গের উৎস কিনা। তার আগে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ব্ল্যাক হোলের ধারণা দেয়। নিজের মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের জন্যে যখন কোন তারকা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে, তখন তার মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের মানও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। শেষে তারকাটি এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন তার মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের মান এত বেশী হয়ে পড়ে যে, তারকাটি থেকে কোন আলোকরশ্মি আর নির্গত হতে পারে না। এইভাবে ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয়। ব্ল্যাক হোলের আকার ছোট হওয়ায় এবং সেটি নিষ্প্রভ (Non-luminous) হওয়ায় তাকে সরাসরি দেখা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। এমনও হতে পারে যে, আমাদের গ্যালাক্সির অর্ধাংশের মত ব্ল্যাক হোল অবস্থায় আছে। তারকার সংকোচনের ফলে ব্ল্যাক হোল গঠিত হবার সময় কিংবা দুটি ব্ল্যাক হোল একত্রিত হয়ে একটি ব্ল্যাক হোল গঠনের সময় মহাকর্ষ-তরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তারকার সংকোচনের সময়) নির্গত শক্তির সবটাই মহাকর্ষ-শক্তিরূপে নির্গত হবে, নির্গত শক্তির অন্ততঃ কিছু অংশও তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তিরূপে পাওয়া যাবে না—একথা ভাবা অযৌক্তিক হবে। বর্তমানে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ নির্দেশক যন্ত্রগুলি মহাকর্ষ-তরঙ্গ অপেক্ষা 10^{-11} গুণ কম শক্তিসম্পন্ন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ নির্দেশ (Detect) করতে সক্ষম। কিন্তু ওয়েবারের পরীক্ষায় প্রাপ্ত মহাকর্ষ-তরঙ্গের সঙ্গে এরূপ কোন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় দুই বা ততোধিক ব্ল্যাক হোলের একীভবনের (Merging) মধ্য দিয়ে।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যদি তারকাগুলির সংকোচনের ফলে পদার্থ থেকে সরাসরি মহাকর্ষ-তরঙ্গের জন্ম হয়, তবে যে হারে মহাকর্ষ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে আমাদের গ্যালাক্সির আয়ু হবে মাত্র 10^9 বছর।

প্রশ্ন উঠতে পারে পারে যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গ সত্যই যদি পৃথিবীর বাইরে সৃষ্ট হয়ে পৃথিবীতে আসে, তবে পৃথিবীর সর্বত্রই তা একই সঙ্গে ধরতে পারা উচিত। তা না হলে নির্দেশকের কম্পন কোন স্থানীয় ক্রিয়ার ফল বলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে ওয়াশিংটনের কাছে মেরিল্যাণ্ড (Maryland) এবং চিকাগোর কাছে আরগোন (Argonne) জাতীয় পরীক্ষাগারে দুটি পৃথক নির্দেশক রাখা হয়। এই দুই স্থানের দূরত্ব প্রায় 1000 কিলোমিটার। একটি টেলিফোন লাইন আরগোনে অবস্থিত নির্দেশকের সংকেত মেরিল্যাণ্ডে প্রেরণ করে। দেখা যায়, আরগোন থেকে নির্দেশক-সংকেত মেরিল্যাণ্ডে আসা ও মেরিল্যাণ্ডের নির্দেশকে (Detector) মহাকর্ষ-তরঙ্গ ধরা পড়বার মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র 0·44 সেকেণ্ড। অর্থাৎ প্রায় একই সময়ে পরস্পর 1000 কিলোমিটার

দূরে অবস্থিত দুটি নির্দেশকে মহাকর্ষ-তরঙ্গ ধরা পড়ছে। তাঁর 81 দিনের পরীক্ষায় উপরিউক্ত দুই স্থানের দুই নির্দেশকে ওয়েবার এই রকমের সমপাতন (Coincidence) লক্ষ্য করেন 17 বারের মত। তাছাড়া তিনি আরও কয়েকটি সমপাতন লক্ষ্য করেন। এই সমস্ত সমপাতন পরিসংখ্যানের সাহায্যে আলোচনা করে ওয়েবার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই সমস্ত সমপাতন আকস্মিক হতে পারে না এবং এগুলি মহাকাশ থেকে আগত মহাকর্ষ-তরঙ্গের ফল। তিনি আরও বলেন যে, ঐ দুই বিভিন্ন স্থানে আগত মহাকর্ষ-তরঙ্গের উৎস একই বস্তু। এই সব সিদ্ধান্তের আর একটি কারণ হলো এই যে, নির্দেশকে সৃষ্ট সংকেত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বা অন্য কোনও মহাজাগতিক তরঙ্গের জন্যে হতে পারে না, কারণ অন্য সমস্ত রকমের তরঙ্গ থেকে নির্দেশককে আচ্ছাদিত (Shield) করে রাখা হয়েছিল।

ওয়েবার আরও কম কম্পাঙ্কের মহাকর্ষ-তরঙ্গ নির্দেশন করতে চান। এজন্যে তিনি অ্যালুমিনিয়াম চোঙের পরিবর্তে পৃথিবীকে নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করবার কথা ভাবছেন। তাঁর মতে, চাঁদকে মহাকর্ষ-তরঙ্গের নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ চাঁদে বাতাস বা seismic activity বেশী নেই। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চাঁদ ও পৃথিবীতে মহাকর্ষ-তরঙ্গের সমপাতন হলে মহাকর্ষ-তরঙ্গের অস্তিত্বের পক্ষে তা ভাল প্রমাণ হবে।

সর্বশেষ আর একটা কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধ্যাপক ওয়েবার শুধু যে পৃথিবীর বাইরে থেকে আগত মহাকর্ষ-তরঙ্গ নির্দেশন করছেন তাই নয়, তিনি পরীক্ষাগারে মহাকর্ষ-তরঙ্গের উৎপাদন ও তা নির্দেশন করতে অভিলাষী। এই সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করেই প্রবন্ধে ইতি ঘোষণা করছি—"We must be able to generate and detect gravitational waves in the laboratory.

ভারতের আকরিক সম্পদ—ম্যাঙ্গানিজ

অরবিন্দ দাশ*

প্রকৃতিতে ধাতুসমূহ অধিকাংশক্ষেত্রে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থরূপে (যেমন—তাদের অক্সাইড, কার্বোনেট, সালফাইড, সালফেট, সিলিকেট প্রভৃতি) অবস্থান করে। এই সকল স্বভাবজাত ধাতব যৌগ অন্যান্য পদার্থের মধ্যে প্রায়ই পাথর বা শিলারূপে থাকে। এগুলিকে কখনও ভূপৃষ্ঠে কখনও বা ভূগর্ভে থাকতে দেখা যায়। সচরাচর এই স্বভাবজাত অজৈব বস্তুগুলিকে বলা হয় খনিজ (Mineral)। সব খনিজ পদার্থ থেকে প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়, তবে সম্ভব হলেও নিষ্কাশন কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হয়ে থাকে। যে সব খনিজ থেকে কোন ধাতু নিষ্কাশন করা হয়, সেই সব খনিজকে ঐ ধাতুর আকরিক (Ore) বলা হয়।

বলা বাহুল্য, আকরিক সম্পদ হলো বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ। আর সেই আশীর্বাদ সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। এটাই তাদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করবার অন্যতম প্রধান কারণ। ভূতত্ত্ববিদেরা বিভিন্ন দেশে আকরিকের বিভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। ভারতের আকরিক সম্পদ সম্পর্কে সমীক্ষা খুব বেশী দিন সুরু হয় নি; স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই বিষয়ে খুব নজর দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ম্যাঙ্গানিজ (Manganese, সংকেত—Mn) সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারতের স্থান— যে সব খনিজ পদার্থ ভারতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে রয়েছে, ম্যাঙ্গানিজের আকরিক সেগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারত ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদক। কিন্তু পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধে এই শিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখন এই বিষয়ে ভারতের স্থান রাশিয়া ও ব্রেজিলের পরে, অর্থাৎ তার স্থান হলো তৃতীয়। এই আকরিক ভারতকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে। স্বাধীনতা লাভের পর 1953 সাল ভারতের ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানীর শীর্ষ বছর। ঐ বছর ভারত প্রায় 1,900,000 টন ম্যাঙ্গানিজ আকরিক রপ্তানী করে এবং তাতে প্রায় 29·5 কোটি টাকা অর্জন করে। মোটামুটি হিসেবে দেখা গেছে, আমাদের দেশে এখনো 180 মিলিয়ন টন ম্যাঙ্গানিজ আকরিক মজুত রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, বর্তমানে বিদেশে রপ্তানী আর দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে এই পুঁজিতে আর পাঁচ-শ' বছরের সঙ্কুলান হতে পারে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, ভারতকে বাইরের এই সরবরাহ বজায় রাখতে হলে আর নিজের দেশের শিল্প চালাতে গেলে তখন বছরে তার প্রয়োজন হবে প্রায় 27 লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ-আকরিক। উনিশ-শ' আশির দশকে এই লক্ষ্যমাত্রা গিয়ে ঠেকবে 40 লক্ষ টনে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—ম্যাঙ্গানিজের আকরিক কিরূপে অবস্থান করে এবং কিভাবে আকরিক থেকে ঐ ধাতুটি নিষ্কাশিত হয়? আর কি-ই বা ম্যাঙ্গানিজের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার, যার জন্যে তার এত চাহিদা? সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করতে গেলে

* রসায়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণমিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়; নরেন্দ্রপুর, 24-পরগণা।

রসায়নের সমীকরণগত ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি হবে। নীচে সরল উপায়ে ম্যাঙ্গানিজ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ম্যাঙ্গানিজের আকরিকসমূহ ও ভারতে তাদের প্রাপ্তি—ম্যাঙ্গানিজসমৃদ্ধ যে সকল আকরিকে 40-60% ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়, সেগুলিকে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক বলা হয়। যদি কোন আকরিকে 10-30% আয়রন থাকে, তবে তাকে ফেরুজিনাস ম্যাঙ্গানিজ আকরিক (Ferruginous manganese ore) আর যদি তারও অধিক আয়রন থাকে, তবে তাকে ম্যাঙ্গানিফেরাস আয়রন আকরিক (Manganiferous iron ore) বলে। পাইরোলুসাইট হলো ম্যাঙ্গানিজের প্রধান আকরিক (60-63% ম্যাঙ্গানিজ থাকে)। এছাড়া অপরাপর যে সকল আকরিকগুলি জানা আছে, সেগুলি হলো—ব্রনাইট (63% Mn), ম্যাঙ্গানাইট, হাসম্যানাইট (72% Mn), সিলোমিলেন (45-60% Mn), রোডোনাইট (42% Mn), রোডোক্রোসাইট, ম্যাঙ্গানিজ ব্লেণ্ড ইত্যাদি।

ভারতের উচ্চ মানের ম্যাঙ্গানিজ-আকরিক রপ্তানীর 60%-ই যায় মধ্যপ্রদেশ থেকে। 1829 সালে নাগপুরে প্রথম ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ প্রদেশের বালাঘাট, ভাণ্ডারা, ছিন্দওয়ারা, জব্বলপুর জেলায়ও প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ আকরিক রয়েছে। এতদ্ভিন্ন মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, মহীশূর ও মধ্যভারতে বেশ পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এবার ভারতের ম্যাঙ্গানিজ-আকরিকের অবস্থান সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদ্দের ধারণার কথা আলোচনা করা যাক। ডক্টর ফের্মোর ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন, ম্যাঙ্গানিজের অবস্থান ভারতের প্রায় সমস্ত ভূতাত্ত্বিক স্তরেই (Geological system) থাকা সম্ভব। তবে ধারওয়ার (Dharwar) হলো ম্যাঙ্গানিজ অবস্থানের প্রধান স্তর। ডক্টর ফের্মোর এই স্তরটিকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

(ক) কডুরাইট (Kadurite) শ্রেণী—একে জাতীয় প্লুটোনিক শিলারূপে অবস্থান করতে দেখা যায়। এতে খুবই উচ্চ পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ সিলিকেট, যেমন—ম্যাঙ্গানিজ-গারনেট, রোডোনাইট, ম্যাঙ্গানিজ-পাইরোক্সিন, ম্যাঙ্গানিজ অ্যাম্ফিবল প্রভৃতি রয়েছে। ভিজাগাপট্টমে প্রাপ্ত আকরিকে এই জাতীয় ম্যাঙ্গানিজ সিলিকেট আছে।

(খ) গণ্ডাইট (Gondite) শ্রেণী—মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত পাঁচমহল প্রভৃতি অঞ্চলে এই শ্রেণীর উপস্থিতির কথা জানা গেছে। এই জাতীয় শিলা হলো প্রাচীন শিলাচূর্ণের কণ (Clastic sediment)। এতে আছে বিভিন্ন যুগ ধরে থিতানো ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রনের অক্সাইড, যেগুলি কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে ম্যাঙ্গানিজের বিভিন্ন স্ফটিকাকার আকরিকে; যেমন—ব্রনাইট, হাসম্যানাইট, হলেণ্ডাইট প্রভৃতিতে। ম্যাঙ্গানিজ আকরিক উৎপাদনে গণ্ডাইট স্তূপকেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(গ) ল্যাটেরাইটিক স্তূপ (Lateritic deposits) হলো ধারওয়ার শিলার পরোক্ষ রূপ। কারণ এগুলি শেষোক্ত প্রকার শিলার গঠন ও রাসায়নিক সংযুক্তির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই জাতীয় আকরিক সিংভূম, জব্বলপুর, বেবিলি প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। এগুলি ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রনের অক্সাইড, যেমন—ভ্রিডেনবার্গাইট (Vredenburgite), সিটাপারাইট (Sitaperite)-রূপে; ম্যাঙ্গানেট, যেমন—হলেণ্ডাইট (Hollandite), বেলডোনগ্রাইট (Beldongrite)-রূপে, ম্যাঙ্গানিজ-অ্যাম্ফিবল, যেমন—উইনচাইট (Winchite)-রূপে; ম্যাঙ্গানিজ অভ্র, যেমন, অ্যালুর্গাইট (Alurgite)-রূপে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে অবস্থান করতে পারে।

ম্যাঙ্গানিজ নিষ্কাশনের প্রণালী—ম্যাঙ্গানিজ সাধারণতঃ যে আকরিক থেকে নিষ্কাশিত করা হয়, তাতে আছে প্রধানতঃ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড আর আছে আয়রন অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, সিলিকা প্রভৃতি অবিশুদ্ধি। অবিশুদ্ধিসমূহকে দূর করবার জন্যে আকরিককে ভালভাবে গুঁড়া করে ও শুকিয়ে প্রথমে 'তড়িৎ-চুম্বকীয় পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া' অবলম্বন করা হয় (1নং চিত্র)।
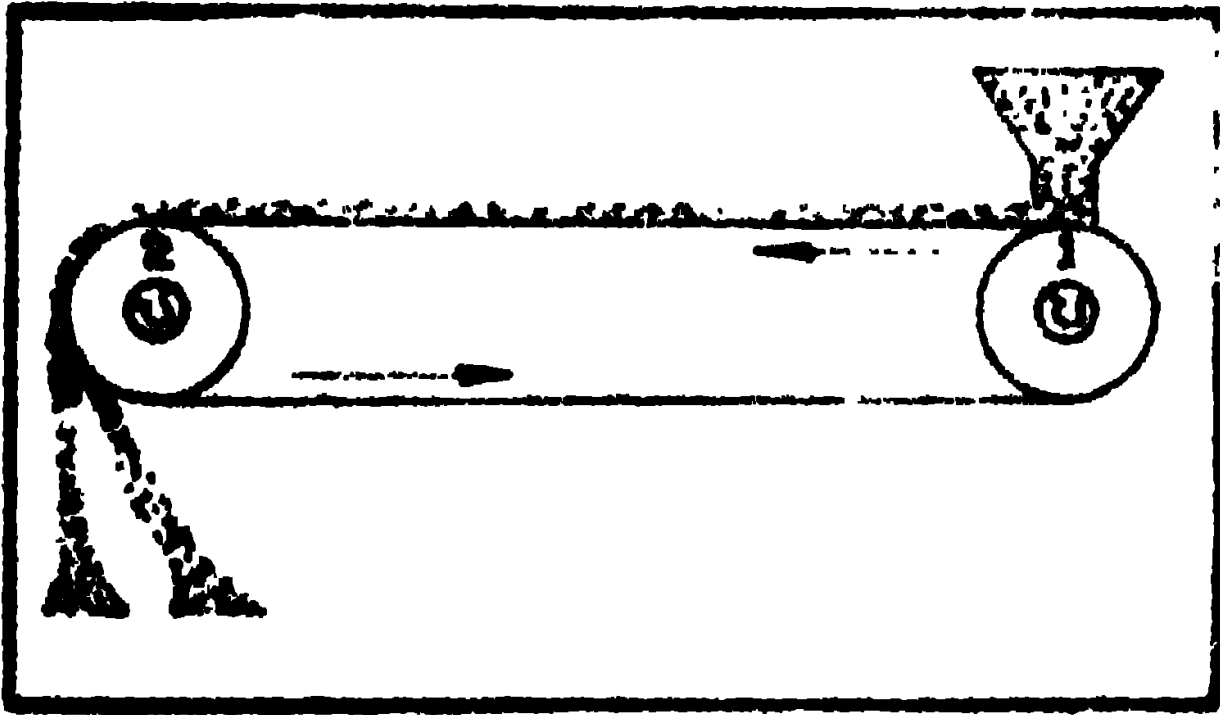
1নং চিত্র

1নং চিত্রে দুটি রোলার একটি কাপড়ের বেল্ট দিয়ে জড়ানো থাকে। রোলার চালালে বেল্টটি ঘুরতে থাকবে। রোলারদ্বয়ের মধ্যে 2নং টি চুম্বকায়িত করা যায়। এখন চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে আকরিকচূর্ণ ঢেলে সেই সঙ্গে বেল্টটি চালনা করলে আয়রন চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তাই চুম্বক রোলার অতিক্রম করে আকরিক নীচে পড়বার সময় পৃথক হয়ে যায়।

এরপর "থার্মিট পদ্ধতি"র সাহায্য নেওয়া হয় (2নং চিত্র)। এই পদ্ধতিতে আকরিককে অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণের সঙ্গে মিশানো হয় এবং একটি অগ্নিসহ মৃত্তিকার (Fire clay) নির্মিত খর্পরে নেওয়া হয়। এখন মিশ্রণের উপরিভাগ চুনোপাথর দিয়ে ঢেকে উপরে মধ্যস্থলে একটুখানি বেরিয়াম পার-অক্সাইড (BaO_2) ও অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ রেখে জলন্ত ম্যাগনেসিয়াম তারের সাহায্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। উত্তপ্ত অ্যালুমিনিয়াম বিস্ফোরণসহ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে ধাতুতে পরিণত করে। গলিত

2নং চিত্র

ধাতু গলিত খর্পরের নীচে জমা হয়। এটি মোটামুটি বিশুদ্ধ।
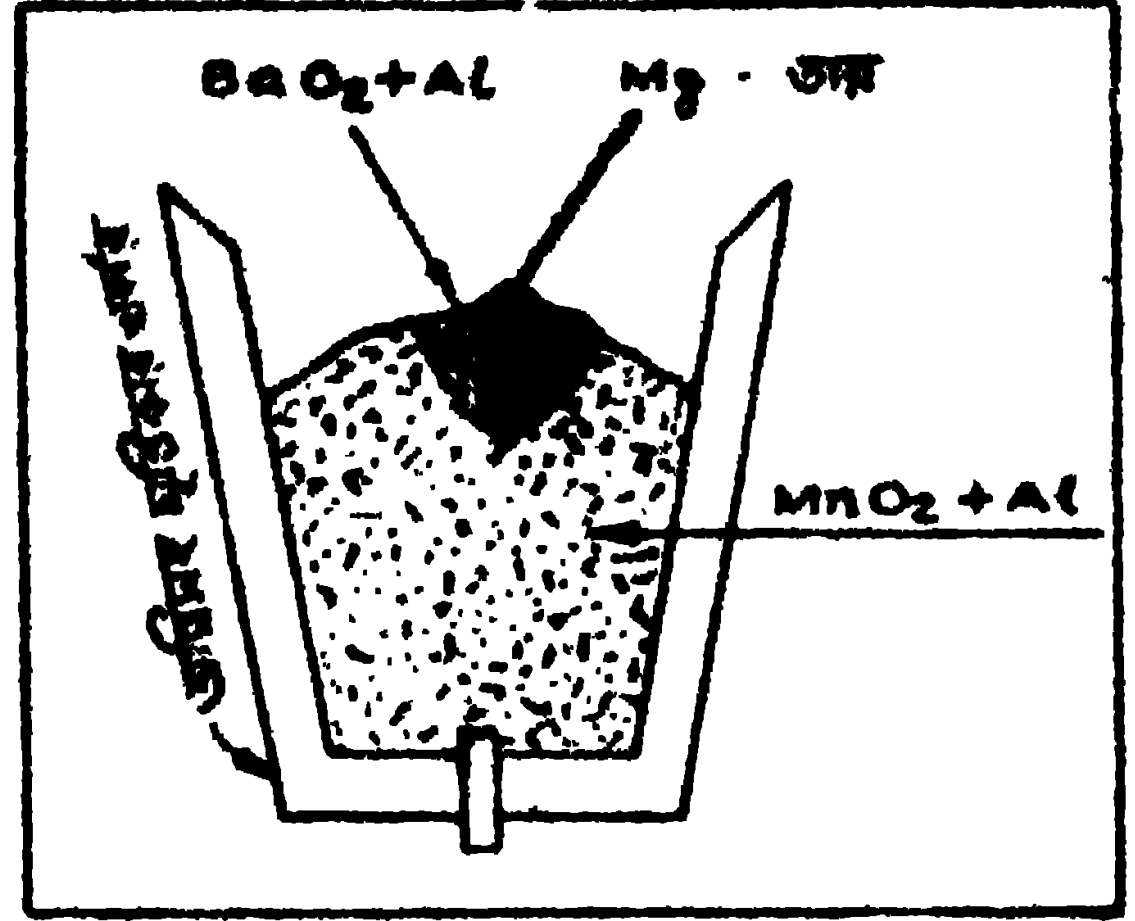
উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিকে রাসায়নিক সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব: $3MnO_2 + 4Al = 2Al_2O_3 + 3Mn$

ম্যাঙ্গানিজ ধাতু ও তার ব্যবহার—ম্যাঙ্গানিজ হলো ধূসর আভাযুক্ত সাদা, কঠিন ও ভঙ্গুর ধাতু। এর গলনাঙ্ক খুবই উচ্চ—1260° সেঃ। বিশুদ্ধ অবস্থায় ধাতুটি বেশ স্থায়ী, কিন্তু এতে কোন অবিশুদ্ধি থাকলে (যেমন—কার্বন) এর উপরিভাগে অক্সাইড আবরণ পড়ায় বিবর্ণ হয়ে যায়।

ম্যাঙ্গানিজের সর্বপ্রধান ও উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো ইস্পাত শিল্পে। ম্যাঙ্গানিজযুক্ত ইস্পাত খুবই দৃঢ় ও ঘাতসহ হয়ে থাকে। এই জাতীয় ইস্পাত তাই খুবই উচ্চ উষ্ণতা সহ্য করতে পারে। ইস্পাত প্রস্তুতের সময় ম্যাঙ্গানিজ যোগ করলে তা গলিত ইস্পাতের অক্সিজেন ও সালফার দূরীভূত হতে সাহায্য করে। ম্যাঙ্গানিজযুক্ত ইস্পাতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার দেওয়া হলো :—

যখন এতে মাত্র 1·6-1·9% Mn থাকে, তখন তা অটোমোবাইল ও লোকোমোটিভ অ্যাক্সেল, জোড়া লাগাবার বল্ড, ক্যাম-শ্যাফ্ট্ ইত্যাদি ও রাইফেল-ব্যারেল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ঠিক ঠিক 1·8% Mn থাকলে তাকে প্রয়োজনীয় মজবুত ছোট ছোট যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে লাগানো হয়। একটু বেশী পরিমাণে—11-13% Mn থাকলে, তা বিভিন্ন মেশিনের যে সমস্ত অংশে প্রচুর ঘাত সহ্য করবার প্রয়োজন হয়, সেগুলি নির্মাণে (যেমন—ক্রাশিং মেশিনারী, জ (Jaws), রেলগাড়ির ক্রশ, বুলেট-প্রুফ বর্ম প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নির্মাণ করতে ব্যবহার করা হয়।

তাছাড়া আরও কয়েক প্রকার ইস্পাত সংকর আছে, সেগুলির ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য : যেমন—ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ, স্পিজেলিসেন উন্নত ধরণের ইস্পাত প্রস্তুতে, ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত রেলের পাটি প্রস্তুতে ও পাহাড় কাটবার যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া স্টেনলেস স্টীল প্রভৃতিতে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করলে তা অধিক ক্রোমিয়াম ও নিকেলযুক্ত সংকরের মতই কাজ করে—এই জাতীয় ইস্পাতের সংযুতি : Cr, 17-19% ; Mn, 8-10% ; Cu, 1%। ইলেকট্রিকের কাজে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণে ম্যাঙ্গানিন নামক সংকর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া ম্যাঙ্গানিজ ব্রোঞ্জ, খনিজ যন্ত্রপাতি নির্মাণে ও টাইটানিয়াম ম্যাঙ্গানিজ সংকরটি প্রকৃত ধাতুসহ বস্তু নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

এবার ম্যাঙ্গানিজের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যৌগ ও সেগুলির ব্যবহারের কথা বলা যাক।

ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (সংকেত MnO_2)—কালো রঙের এই অক্সাইডটি পাইরোলুসাইটেই পাওয়া যায়। এটি একটি সক্রিয় জারক দ্রব্য এবং এর প্রচুর ব্যবহার জানা আছে।

(1) কাচের বিরঞ্জনে এর ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। দেখা গেছে, সাধারণ কাচের সবুজাভ ভাবটি হয় এতে ফেরাস সিলিকেটের উপস্থিতির জন্যে। তাই কাচে MnO_2 যোগ করলে দু-ভাবে কাজ করে। প্রথমতঃ, এটি ফেরাস আয়রনকে ফেরিক অবস্থায় জারিত করে অর্থাৎ সবুজাভ ভাবটি কেটে গিয়ে অপেক্ষাকৃত হাল্কা হলুদ রঙে পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে ম্যাঙ্গানিজ সিলিকেট উৎপন্ন হয়, তার রং বেগুনী। ওদিকে ফেরিক লবণের রং হাল্কা হলুদ—এই দুই রং পরস্পরের পরিপূরক। এইভাবে বর্ণহীন কাচ প্রস্তুত সম্ভব।

(2) ডিপোলারাইসাররূপে (Depolariser) লেক্লান্সেলে MnO_2-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর শুষ্ক সংস্করণ 'শুষ্ক সেল' (Dry cell) এখন ইলেকট্রিক-টর্চ, বেল, টেলিফোন, ও রেডিও সেটে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে।

(3) ল্যাবরেটরীতে পটাসিয়াম ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন প্রস্তুতের সময় MnO_2 অনুঘটক রূপে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো রঙের কাজে শুষ্ককরণের দ্রব্য (Drier) হিসাবে কাজ করে—এখানেও এর ব্যবহার অনুঘটকের মতই। তাছাড়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে ক্লোরিন প্রস্তুতেও এর ব্যবহার দেখা যায়।

উল্লিখিত ব্যবহার ছাড়াও ম্যাঙ্গানিজের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় যৌগ, যেমন—ম্যাঙ্গানেট, পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদি—এমন কি ; ধাতব ম্যাঙ্গানিজও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড থেকে প্রস্তুত করা সম্ভব।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (সংকেত $KMnO_4$) একটি খুবই প্রয়োজনীয় ম্যাঙ্গানিজ যৌগ। বেগুনী রঙের এই যৌগটি জারক দ্রব্য হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া—

(1) বীজঘ্ন হিসাবে এর ব্যবহার বহু দিন

থেকে সুবিদিত। জলের বিশোধনে এটি সচরাচর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(2) উল, সিল্ক, তুলার বিরঞ্জনে এটি ব্যবহার করা হয়। স্যাকারিন, বেনজয়িক অ্যাসিডের পণ্যোৎপাদনে ও মোমের বিরঞ্জনেও এর ব্যবহার দেখা যায়।

(3) বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সনাক্তকরণে (যেমন—ক্লোরাইড, ব্রোমাইড ইত্যাদি) ও পরিমাণ নিরূপণে (যেমন—অক্সালেট ইত্যাদি) এর ব্যবহার খুবই জানা আছে। এর লঘু ক্ষারীয় দ্রবণ (বায়ার বিকারক) জৈব-যৌগের দ্বি-বন্ধী (Double bond) সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।

তাছাড়া ম্যাঙ্গানিজের আরও কয়েকটি প্রধান প্রধান যৌগের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—ম্যাঙ্গানিজ ব্রাউন (সোদক Mn_2O_3) হলো বাদামী-কালো রঞ্জক (Pigment)। কাপড়ে রং করতে ও ছাপার কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যাম্বার (Amber) —প্রাকৃতিক সোদক (Hydrated) ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের সঙ্গে আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামের সোদক অক্সাইড মিশিয়ে গুঁড়া করে পোড়ালে বাদামী রঙের এই রঞ্জক দ্রব্যটি পাওয়া যায়। সোদক ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ($MnSO_4$, $7H_2O$) কীটাণুনাশকরূপে ও টেক্সটাইল, কাগজ ও রঞ্জক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজের অন্যান্য লবণের ব্যবহার উল্লিখিত ব্যবহারগুলির মতই। উল্লিখিত পর্যালোচনা থেকে বলা যায়—এত প্রয়োজনীয় এই ম্যাঙ্গানিজ ধাতুটি ভারতের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

রেল ও সেনাবাহিনীর জন্যে হোভারক্র্যাফ্ট
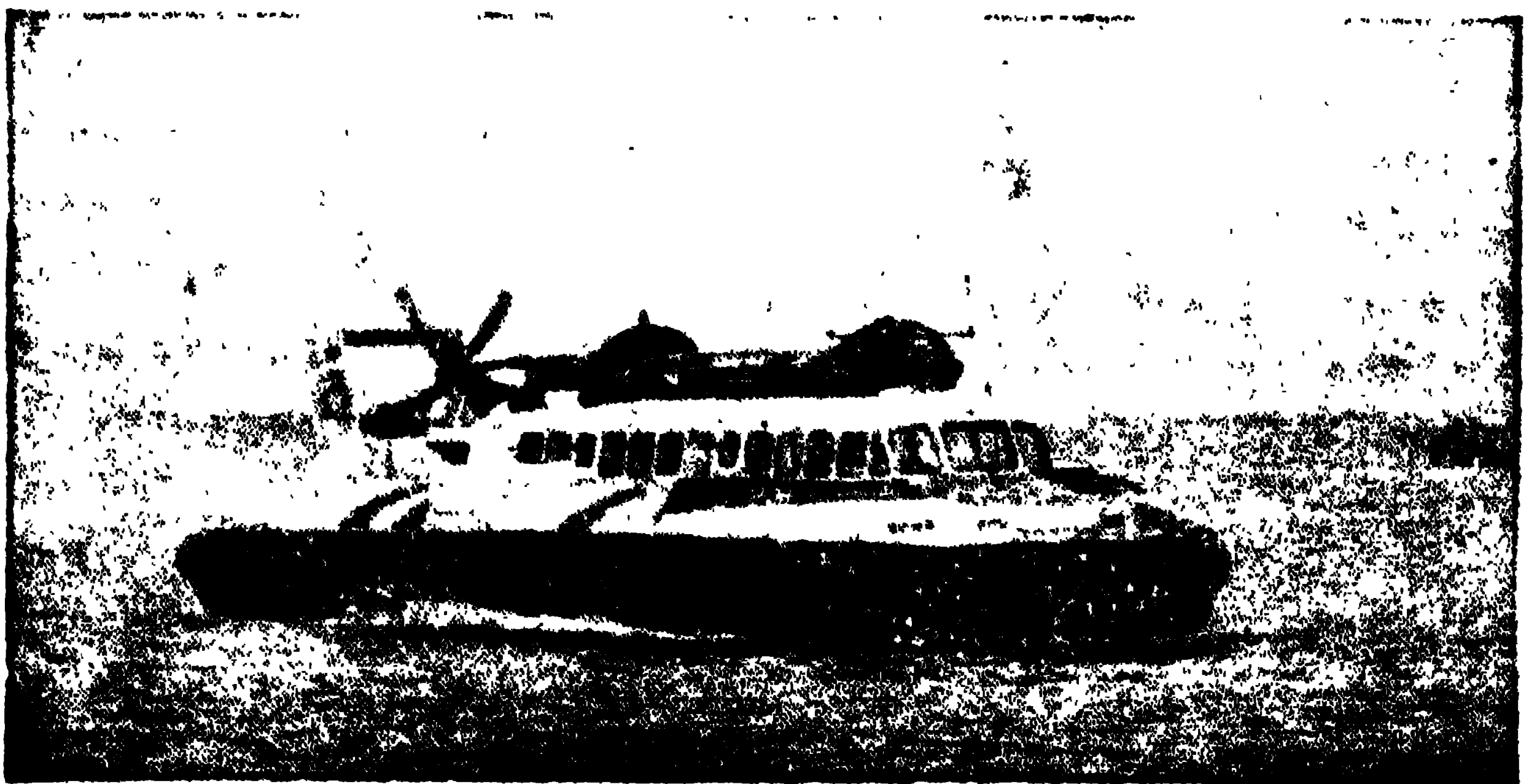
রেল ও সেনাবাহিনীর জন্যে বৃটিশ হোভারক্র্যাফ্ট করপোরেশন কর্তৃক নির্মিত 58 জন যাত্রী বহনের উপযোগী S R N 6 হোভারক্র্যাফ্টটিকে সমুদ্রের উপর চালিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সঞ্চয়ন

ভারতে মৎস্য-গবেষণা—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের আর. রঘুপ্রসাদ ও পি. আর. এস. টাম্পি এই সম্বন্ধে লিখেছেন—পঁচিশ বছর আগে কেন্দ্রীয় মৎস্য-গবেষণা কেন্দ্রগুলি স্থাপন হবার পর থেকেই ভারতবর্ষে মাছের চাষ ও ব্যবসায়ের নানা দিক সম্বন্ধে সুসংবদ্ধভাবে কাজ আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা-লাভের পর এই কয় বছরে মৎস্য-গবেষণার ক্ষেত্রে নানা উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। গত দু-দশকের মাছের উৎপাদনই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সমুদ্র প্রোটিনের উৎস মাছের উৎপাদক হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান সপ্তম আর ভারত মহাসাগর এলাকায় ভারত অবিসম্বাদিতভাবেই প্রথমের সারিতে রয়েছে।

আমাদের দেশের উপকূল রেখা এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মাছ ধরবার কাজ এত অনিয়মিত ও বিচ্ছিন্ন যে, সমস্ত দেশে সারা বছরে মাছের উৎপাদন সম্বন্ধে সঠিক তথ্যই পাওয়া যেত না। এই সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের দেশের মৎস্য-সম্পদ অবহেলিত হয়ে রয়েছে। অনেক অঞ্চলেই মাছ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও কিছুটা অজ্ঞানতাবশতঃ এবং কিছুটা উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের অভাবে আমরা সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারি নি। এসব তথ্য জানবার পর আমরা এই সমুদ্রজাত প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। আর গত দুটি দশক ধরে মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে, মাছ ধরবার প্রক্রিয়ার যান্ত্রিকীকরণের চেষ্টা করে, বিদেশে রপ্তানী করে এই ক্ষেত্রে আমরা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি।

আমাদের দেশে পুকুরে মাছের চাষ করা বহু প্রাচীন রীতি, তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই চাষের কোন চেষ্টা আগে করা হয় নি। গত পঁচিশ বছরে বিভিন্ন জল-হাওয়া ও পরিবেশের উপযুক্ত নানা ধরণের মাছের জাতের নির্বাচনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পোনা মাছের চাষ এখন আমাদের মাছ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুপ্রচলিত। বড় পোনা মাছ কৃত্রিম ও বন্দী অবস্থায় সাধারণতঃ বংশ বৃদ্ধি করে না। সে জন্যে প্রচুর পরিমাণে ছোট ছোট মাছ চারা হিসেবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবার দরকার হয়। আমাদের মৎস্য-গবেষকরা এক্ষেত্রে সম্প্রতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁরা পিটুইটারি হর্মোনের নির্যাস প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে মাছের প্রজনন-ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে ভাল জাতের মাছের চারা পাওয়া যাচ্ছে। কতকগুলি কেন্দ্রীয় এজেন্সিতে সারা বছর যাতে যথেষ্ট পরিমাণে এই হর্মোন ইঞ্জেকশনের সরবরাহ পাওয়া যায়, সে জন্যে এখন কয়েকটি পিটুইটারি ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

কৃষিকাজে যেমন মিশ্রচাষ বা পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তেমনি মাছের ক্ষেত্রেও একক জাতি বা চাষের বদলে কাত্‌লা, রুই, মৃগেল ও বিভিন্ন ধরণের পোনা মাছের কর্মানুবর্তী প্রজনন ও পালনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

জীবজগতে বা উদ্ভিদজগতে সব রকম আকাঙ্ক্ষিত গুণযুক্ত প্রজাতি বিরল। সে জন্যে বিজ্ঞানীরা এখন পশু-পালনের ক্ষেত্রে ও কৃষি-জগতে মিশ্র প্রজনন বা সঙ্করায়ণের দ্বারা কৃত্রিম-ভাবে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ করে নতুন নতুন

বর্ণসঙ্কর (হাইব্রিড) প্রজাতির উদ্ভাবন করেছেন। মাছের ক্ষেত্রেও গবেষকেরা এখন সঙ্করায়ণের দ্বারা নতুন বর্ণসঙ্কর মাছের উদ্ভাবনের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

মাছ ধরবার কৌশল সম্বন্ধেও নানা ধরণের গবেষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের মাছের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে আমাদের মৎস্য গবেষকেরা মাছ ধরবার জন্যে নতুন ধরণের সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবন করছেন। বিভিন্ন আকার ও গঠনের বড় টানা জাল তৈরি করবার ফলে মাছ ধরবার পরিমাণ প্রায় শতকরা 30-70 ভাগ বেড়েছে বলে দেখা গেছে। মাছ ধরবার ডিঙ্গি ডিঙি বা নৌকা তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্য খুব বেশী প্রগতি হয় নি এবং এখন পর্যন্ত 7·6-18·42 মিটার দৈর্ঘ্যের নৌকাতেই তা সীমিত রয়েছে। যাহোক এসব সাজসরঞ্জামের উদ্ভাবন মাছ ধরবার পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

অবশ্য শুধু মাছ ধরবার পরিমাণ বাড়ালেই হবে না। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, ধরা মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাছ ধরবার খুব কম সময়ের মধ্যেই তা পচিয়ে বা পচে যাবার সম্ভাবনা থাকে। মাছ সংরক্ষণ ও দেশ-বিদেশে চালান দেবার ব্যাপারে বরফের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিমঘরে রাখা ও অন্যান্য উপযুক্ত সংরক্ষণ-প্রণালীর উদ্ভাবন করে মৎস্য গবেষকেরা আমাদের দেশের মৎস্য-শিল্পকে সাফল্যের পথে অনেক দূরে এগিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক সুদূর প্রান্তে মৎস্য-ভোজীদের রুচি ও চাহিদা অনুসারে মাছ চালান দেওয়া এবং বিদেশে মাছ রপ্তানী করবার ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত হয়েছে। আমাদের দেশ থেকে প্রায় 39 কোটি টাকার মত মাছ ও সামুদ্রিক উৎপাদন বিদেশে রপ্তানী করা হয় এবং গর্বের বিষয় এই যে, বিদেশের মৎস্যভোজীদের কাছেও তা যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে, গত দুটি দশকে আমাদের মৎস্য শিল্প নানা দিক দিয়েই উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামীন সমাজের এক দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতির সূচনা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু আমাদের এখানেই থেমে গেলে চলবে না। বিরাট সম্ভাবনাময় এক পরিণতির প্রথম কয়েকটি সোপান আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি মাত্র। এখনও আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব রয়েছে। দেশব্যাপী আমিষ খাদ্যের অভাব দূর করতে হবে। জাতীয় স্বার্থে রপ্তানীর দ্বারা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা এবং গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন করবার প্রতি আমাদের আরও বেশী সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে যেমন লাগানো হচ্ছে এই ক্ষেত্রেও তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি-অনুসন্ধান পরিষদ থেকে মৎস্য-গবেষণার সাতটি সর্বভারতীয় সমন্বয়মূলক পরিকল্পনার সূত্রপাত করা হয়েছে। এর ফলে মৎস্য-গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা দেখা দিয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন রাজ্যের নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্ত দেশের মৎস্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এর ফলে আমাদের প্রকৃতিদত্ত মৎস্য সম্পদকে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে লাগাবার কাজে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন।

চণ্ডীগড়ে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের 60তম অধিবেশন (হীরক জয়ন্তী)—1973

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অধ্যাপক এস. ভগবন্তম
মূল সভাপতি

অধ্যাপক ভগবন্তম 1909 সালের 14ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক সি. ভি. রামনের তত্ত্বাবধানে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সে তিনি প্রাথমিক গবেষণা-প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও প্রশাসক হিসাবে তাঁর বহু বছরের অভিজ্ঞতা আছে।

তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের (ওয়ালটেয়ার) পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে তিনি লণ্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনের বিজ্ঞানসংক্রান্ত সংযোগরক্ষাকারী (Liaison) অফিসার, ফিজিক্যাল লেবরেটরিস-এর ডিরেক্টর, হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এর ডিরেক্টর এবং নতুন দিল্লীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ করেন।

তিনি বহু গবেষণা-পত্র এবং 1. Scattering of Light and Raman Effect, 2. Theory of Groups and its application to Physical Problems, 3. Crystals Symmetry and Physical Properties নামক তিনটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। প্রামাণ্য হিসাবে পুস্তক তিনটি প্রশংসা লাভ করেছে।

তিনি অন্ধ্র ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. (Honoris Causa) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সহ-সভাপতি। 1970 সালে তিনি উক্ত অ্যাকাডেমি থেকে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পদক লাভ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি। তিনি ইনস্টিটিউট অব টেলিকমিউনিকেশনের অনারেরী ফেলো এবং এরোনটিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার অনারেরী সদস্য। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (যেমন—ইন্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক ইউনিয়নস—আই. সি. এস. ইউ., ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অব পিওর অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স—(আই. ইউ. পি. এ. পি প্রভৃতি) বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত।

তিনি প্রায় সাত বছর যাবৎ ভারত ইলেক্ট্রনিক্স-এর চেয়ারম্যান এবং অল্পকালের জন্যে হিন্দুস্থান এরোনটিক্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত দুটি কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা সংক্রান্ত কমিটির সদস্য ও পরে চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি টিম অব ইন্টারন্যাশন্যাল স্পেশিয়ালিস্ট কনসালট্যান্টস-এর সদস্য হিসাবে কাজ করেন। এঁরাই রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের নিকট পেশের জন্যে রাসায়নিক ও জীবতাত্ত্বিক যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন। 1970 সালে রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন

এবং তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেছেন।

ডক্টর পি. কে. আয়েঙ্গার
সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে রিসার্চ ওয়ার্কার হিসাবে ডক্টর আয়েঙ্গার কাজ সুরু করেন এবং 1952 সালে সেখান থেকে চলে আসেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন—সলিড স্টেট ফিজিক্স এবং রিয়্যাক্টর ফিজিক্স বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। তিনি ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের (ট্রম্বে) ফিজিক্স গ্রুপের ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হন। নিউট্রন স্ক্যাটারিং-এর গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাই রিয়্যাক্টর টেকনোলজির উন্নতিবিধানে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। ভারতের দ্রুতগতিসম্পন্ন পরমাণু-চুল্লী PURNIMA-র পরিকল্পনা ও নির্মাণে ডক্টর আয়েঙ্গার এবং তাঁর সহকর্মীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

1955 সালে তিনি অ্যাটমিক এনার্জি এস্টাব্লিশমেন্ট-এ (বর্তমানে BARC) যান এবং ক্যানাডার চক রিভারে অল্প দিন থাকবার পর ফিরে এসে ট্রম্বের APSARA এবং CIRUS রিয়্যাক্টরে তাঁর নিউট্রন স্ক্যাটারিং পরীক্ষা সুরু করেন। ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির উদ্যোগে 1964 সালে বম্বেতে অনুষ্ঠিত 'Inelastic Scattering of Neutron' সংক্রান্ত সম্মেলন তাঁরই ব্যবস্থাপনায় সুসম্পন্ন হয়। তিনি তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন এবং নতুন যন্ত্রপাতিসমূহ নির্মাণ করেছেন। তিনি অনেক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। "Thermal Neutron Scattering" শীর্ষক পুস্তকের (অ্যাকাডেমিক প্রেস, 1965) 'Crystal spectrometry' অধ্যায়ের অধিকাংশই তিনি লিখেছেন। 'Mossbauer Spectroscopy' সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন।

রিসার্চ রিয়্যাক্টর ইউটিলাইজেসনের ক্ষেত্রে ডক্টর আয়েঙ্গারের নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক মহলে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করেছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গবেষক গোষ্ঠির উন্নতিবিধানে ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সী নানা উপলক্ষে তাঁর উপদেশ চেয়েছেন।

Neutron scattering, lattice dynamics, ম্যাগনেটিজম এবং রিসার্চ রিয়্যাক্টর সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ বৃহৎ পারমাণবিক শক্তি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ক্যানাডার বিভিন্ন গবেষণাগারে বক্তৃতা প্রদান করেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রেরিত প্রতিনিধিদলের তিনি সদস্য ছিলেন এবং ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির সভায় তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কালপাক্কামের রিসার্চ রিয়্যাক্টর সেন্টারের জন্যে গঠিত প্ল্যানিং অ্যাণ্ড কো-অর্ডিনেশন কমিটির তিনি সদস্য। তিনি অ্যাটমিক পাওয়ার অথরিটি, রাজস্থান ও মাদ্রাজের অ্যাটমিক পাওয়ার প্রোজেক্ট-এর সদস্য। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো, বোম্বে ও ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ষ্টাডিজ ইন ফিজিক্স-এর সদস্য।

অধ্যাপক আর. সি. কাপুর
সভাপতি—রসায়ন শাখা

অধ্যাপক কাপুর 1927 সালের 22শে ডিসেম্বর বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। কানপুরের বি. এন. কে. হাই স্কুল, ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষালাভ করেন। 1946 সালে অধ্যাপক এস. আর. ধরের তত্ত্বা-

যেখানে তিনি গবেষণা শুরু করেন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1948 সালে এবং 1957 সালে যথাক্রমে ডি. ফিল এবং ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

1947-1963 সাল পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে রসায়নের লেক্চারার, পরে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। 1963 সালে তিনি যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। 1970 সালে তিনি সিনিয়র অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আই. এম. কলথফের গবেষণাগারে polarography সংক্রান্ত ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু করেন। 1953-1956 সালের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড, পেপ-টাইড এবং প্রোটিনের মধ্যে Sulphydryl-disulphide বিনিময় প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। 1962-63 সালে পুনরায় তিনি এক বছরের জন্যে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে (Stillwater) যান।

DME এবং সলিড ইলেক্ট্রোড-সহ পোলারো-গ্রাফি ও ভোল্টামেট্রি এবং মেটাল কমপ্লেক্স অনু-শীলনে তাদের প্রয়োগ, থায়োল-ডাইসালফাইড সিস্টেমস এবং পরাবর্ত (Reversible) ও অপরাবর্ত (Irreversible) ইলেক্ট্রোড সিস্টেম প্রভৃতি তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র।

অধ্যাপক কাপুর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এসব দেশ হলো—চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, জাপান, হংকং, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি।

যুক্তরাজ্যের পোলারোগ্রাফিক সোসাইটি, আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটি, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস (ভারত), ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। রুমানিয়ার "Cellulose Chemistry and Technology" জার্নালের উপদেষ্টা পর্ষদে তিনি আছেন। 1969 সালে তিনি ইলেক্ট্রোঅ্যানালিটিক্যাল ডিভিশন অব দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পিওর অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রির সহযোগী সদস্য নির্বাচিত হন।

হিন্দী ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে তিনি খুব উৎসাহী। তাঁর রচিত হিন্দী পুস্তক পরমাণু বিখণ্ডন (পরমাণু বিভাজন)-এর জন্যে তিনি হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের 'মঙ্গলাপ্রসাদ পারি তোষিক' পুরস্কার লাভ করেন। তিনি 1969 সাল থেকে 1962 সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান পরিষদের (হিন্দী) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়াও তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

অধ্যাপক আর. পি. বাম্বা
সভাপতি—গণিত বিভাগ

আর. পি. বাম্বা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের (চণ্ডীগড়) সেণ্টার ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন ম্যাথামেটিক্স-এর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তিনি 1925 সালের 30শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। 1945 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। লাহোরে রিসার্চ স্কলার এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন লেক্চারার হিসাবে কাজ করবার পর তিনি কেম্ব্রিজে যান এবং 1950 সালে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। 1952 সালে তিনি কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন্স কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডির সদস্য (1952-54), যুক্তরাষ্ট্রের নোটারডাম (1957-58) এবং ওহিও স্টেট (1964-68, 69, 70, 71, 72) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক/পরি-দর্শক অধ্যাপক। তিনি ইউ. জি. সি. ন্যাশনাল

লেকচারার। তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো, ইণ্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক (এডিটর) ও সভাপতি। জার্নাল অব নাম্বার থিওরী ও ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব পিওর অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্সের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

Number Theory বিশেষতঃ Geometry of Numbers, Packing and Covering and Discrete Geometry সম্পর্কিত গবেষণায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছেন।

Theories of lattice and non-lattice coverings সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক অবদান—অন্যান্য দেশের গণিতজ্ঞদের গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছে।

ডক্টর এম. টি. ম্যাথিউ
সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

1915 সালের 23শে নভেম্বর এম. টি. ম্যাথিউ কেরালায় জন্মগ্রহণ করেন। গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করে দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। থীসিস পেশ করে মাদ্রাজ থেকে এম. এস-সি. এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে অ্যান্থ্রোপোমেট্রিতে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। মাদ্রাজে তিনি বিখ্যাত গণিতবিদ আর. বৈদ্যনাথস্বামী, অর্থনীতিবিদ্ পি. জে. টমাস এবং পরিসংখ্যানবিদ্ এস. এস. আর. শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। 1937 সালে মাদ্রাজে তিনি হাতের তালুর ছাপ পরিমাপ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিসংখ্যানগত গবেষণা করেন এবং 'সংখ্যা' পত্রিকায় তাঁর গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়।

1940 সালে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। অধ্যাপক মহলানবিশের তত্ত্বাবধানে "Theory and practice of large scale sample survey" সম্বন্ধে কাজ সুরু করেন। তিনি বাংলা ও বিহারে, পরে ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। 1969 সালে তিনি ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার চীফ ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল সম্বন্ধে ডক্টর ম্যাথিউ কাজ সুরু করেন। ভারতে SQC (Society for Quality Control) আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং অপারেশন্যাল রিসার্চ সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনস্টিটিউশনের স্থাপনাবধি তিনি এর সঙ্গে যুক্ত এবং এর স্যাম্পলিং কমিটির চেয়ারম্যান। তাছাড়াও তিনি অ্যান্থ্রোপোমেট্রি, বায়োলজিক্যাল অ্যাণ্ড জেনেটিক স্ট্যাটিস্টিক্স, ডেমোগ্রাফি, সোস্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ইকোনমিক প্ল্যানিং সম্বন্ধেও কাজ করেন।

বর্তমানে ডক্টর ম্যাথিউ সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর, প্ল্যানিং কমিশন ও ভারত সরকারের যুগ্ম-সচিবের উপদেষ্টা। তিনি কয়েক বছর আগে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর এবং ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভের চীফ ডিরেক্টর ছিলেন। ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন এবং Quality Control এবং Standardisation সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড নেশনস স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি।

শ্রী এস. এস. বালসুব্রহ্মণ্যম
সভাপতি—ভূগোল ও ভূতত্ত্ব শাখা

1914 সালের 23শে নভেম্বর শ্রীবালসুব্রহ্মণ্যম

মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন। 1935 এবং 1937 সালে যথাক্রমে বি. এস সি এবং বি. এস-সি (অনার্স) পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। 1935 সালে ভূতত্ত্বে পারদর্শিতার জন্যে রায় বাহাদুর নারায়ণ রাও পুরস্কার লাভ করেন।

আসাম তৈল কোম্পানীতে এক বছর চাকুরী করবার পর 1940 সালে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় যোগদান করেন এবং 1956 সালে তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং 1969 সালের 26শে সেপ্টেম্বর ডিরেক্টর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন।

1946 সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্বে উচ্চশিক্ষার জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়। 1964 সালে পশ্চিম বার্লিনে অনুষ্ঠিত জিওলজিক্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন শীর্ষক আলোচনা-সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং 1970 সালে নিউজীল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত রিসেন্ট ক্রাস্ট্যাল মুভমেন্ট অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটেড সিসমিসিটি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেন। 1970 সালে প্যারিসে এবং 1972 সালে মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র সংক্রান্ত অধিবেশনে তিনি সি. জি. এম. ডাব্লিউ-র এশিয়ার সহ-সভাপতি হিসাবে যোগদান করেন। 1972 সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত রিজিওন্যাল টেকটনিক ম্যাপ-এর কনসাল-টেটিভ গ্রুপ মিটিংয়ে যোগদানের জন্যে তিনি প্রেরিত হন। 1972 সালে আগষ্ট মাসে ক্যানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসের 24তম অধিবেশনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে যোগদান করেন। ত্রিশ বছরেরও বেশী কর্মজীবনে তিনি সিস্টেম্যাটিক ম্যাপিং, খনিজ সন্ধান, ভূকম্পন সম্বন্ধে অনুসন্ধান, ভূগর্ভস্থ জলসমীক্ষা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং জিওলজিক্যাল অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করেন।

তিনি আই. ইউ. জি. এস/আই. জি-সি-এর পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র সম্পর্কিত কমিশনের সহ-সভাপতি, ইণ্টারন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজির কার্যকরী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, ইণ্ডিয়ান জিওসায়েন্স অ্যাসো-সিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও সভাপতি, জিও-লজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সহ-সভাপতি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ইঞ্জিনীয়ারিং জিওলজির সভাপতি। এছাড়াও তিনি আরও নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

তিনি 60টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক অরুণকুমার শর্মা
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক শর্মা 1924 সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তিনি 1948 সাল থেকে সাইটোজেনেটিক্স এবং সাইটোকেমিষ্ট্রি সম্পর্কে এক উদ্যোগী গবেষক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন। 40 জন গবেষক-কর্মী মানব-প্রজনন ও উদ্ভিদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণারত আছেন। উদ্ভিদের যে কোন অংশের ক্রোমোসোমের সবিশেষ গঠন-বিন্যাসের অনুশীলনের জন্যে কয়েকটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন বিষয়ে তাঁর এবং সহকর্মীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদ-ক্রোমোসোমের রাসায়নিক প্রকৃতি অনুশীলনের কেন্দ্র হিসাবে ভারতে তাঁর গবেষণাগারই প্রথম। অযৌন উপায়ে প্রজনিত উদ্ভিদের প্রজাতি সংগঠন সম্পর্কে তাঁর গোষ্ঠী নতুন ধারণার বিকাশসাধন করে তা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক জীবের ক্রোমোসোমের স্থায়িত্ব সম্পর্কিত পুরাতন ধারণার স্থানে এটি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। তাঁর গোষ্ঠী রাসায়নিক উপায়ে পরিণত নিউ-ক্লিয়াস বিভাজনে প্ররোচনা দিতে সক্ষম

হয়েছে—কোষের নবতারুণ্য প্রাপ্তিতে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। পৃথকীকৃত নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমের প্রকৃতিও তাঁরা বের করেছেন। তাঁর গোষ্ঠির গবেষকেরা তাঁদের দ্বারা উদ্ভাবিত উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে প্রায় সকল একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী পরিবারের অধিকাংশের ক্রোমোজোমের গঠন-বিন্যাসের অনুশীলন করেছেন এবং উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগে আলোকপাত করেছেন।

তাঁর "Chromosome Techniques—Theory and Practice" শীর্ষক পুস্তকটি (ডক্টর অর্চনা শর্মার সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত) পৃথিবীর সকল গবেষণাগারে আদর্শমানের পাঠ্য ও তথ্য পুস্তক হিসাবে গণ্য। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি প্রায় 300 গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

ডক্টর শর্মা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো। তিনি বিভিন্ন সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত আছেন। সাইটোলজি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক পত্রিকা 'The Nucleus'-এর তিনি প্রধান (ডক্টর এ. শর্মার সঙ্গে যুগ্মভাবে) সম্পাদক। Cytologia (জাপান), Proceedings of the Indian National Science Academy, Science & Culture প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি সদস্য। 1958 সালে মণ্ট্রিলে, 1963 সালে হেগে এবং 1968 সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব জেনেটিক্স, 1964 সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব সাইটো অ্যাণ্ড হিস্টোকেমিষ্ট্রি, 1969 সালে Seattle-এ অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশন্যাল বটানিক্যাল কংগ্রেসে এবং 1967, 70 সালে অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত ক্রোমোজোম সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন। 1968 সালে কলকাতায় তিনি আন্তর্জাতিক ক্রোমোজোম সম্মেলন আহ্বান করেন। 1967 সালে তিনি জীববিজ্ঞানে শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর পদক পুরস্কার পান। 1972 সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ফেলো পদ এবং 1973-74 সালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ন্যাশন্যাল লেকচারারের পদ লাভ করেন।

ডক্টর অশোক ঘোষ

সভাপতি—প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখা

ডক্টর ঘোষ 1927 সালের 20শে জানুয়ারী জামালপুরে (বর্তমানে বাংলা দেশ) জন্মগ্রহণ করেন। 1948 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্যানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শারীরসংস্থানবিদ্যায় এম. এস-সি ডিগ্রী এবং 1955 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে প্রাণিবিদ্যার লেকচারার (1950-1952) ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস-এ জুনিয়র স্পেশ্যালিস্ট (পশুপালন) 1953, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে (মণ্ট্রিল) প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সহকারী (1954-1955), কলকাতার বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজে হিস্টোলজির সহ-অধ্যাপক (1955-1956) হিসাবে তিনি কাজ করেন। 1957 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যার লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। 1971 সালে তিনি প্রাণিবিদ্যার রীডার নিয়োজিত হন। ডক্টর ঘোষের প্রধান উৎসাহ পাখীর এণ্ডোক্রাইনোলজি এবং হিস্টোকেমিষ্ট্রি সম্পর্কিত গবেষণায়। পাখীর অ্যাড্রিন্যালের হিস্টোফিজিওলজি বিষয়ক গবেষণায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। অ্যাড্রিনোকর্টিক্যাল ফাংশন, হর্মোন্যাল কন্ট্রোল অব দি কর্টিক্যাল টিস্যু, ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপ অব অ্যাড্রিনো-মেডুলারি হর্মোন প্রভৃতির সমস্যা সম্পর্কে ডক্টর ঘোষ বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর

গবেষণার কর্মরতী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পর্ষৎ (সি. এস. আই, আর), ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ সমর্থন করেছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ডক্টর ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা এক-শ'-এরও বেশী গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

হিস্টোকেমিক্যাল সোসাইটির 5ম বার্ষিক অধিবেশনে (আটলান্টিক সিটি, 1954), ষোড়শ আন্তর্জাতিক প্রাণিবিদ্যা কংগ্রেসে (ওয়াশিংটন, ডি. সি. 1963), 'কম্পেয়ারেটিভ এণ্ডোক্রাইনোলজী' সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে (অইসো, জাপান-1961), (নতুন দিল্লী 1957) এবং পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক পক্ষী-বিজ্ঞান কংগ্রেসে (হেগ-1970) তিনি অংশগ্রহণ করেন। ইউরোপীয়ান সোসাইটি অব কম্পেয়ারেটিভ এণ্ডোক্রাইনোলজি-র তিনি বৈদেশিক সদস্য। 1962-63 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাণিবিদ্যার রেকর্ডার ছিলেন। 1961 সালে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বার্কলে) তিনি ভিজিটিং অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রিসার্চ এণ্ডোক্রাইনোলজিষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি Gegaca International Institute of Comparative Endocrinologists-এ (নাইরোবি, কেনিয়া) সেই কোলাবোরেটর হিসাবে আমন্ত্রিত হন। তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশন ইকুইপমেণ্ট গ্র্যাণ্ট (1962) এবং পপুলেশন কাউন্সিল (ইউ. এস. এ) বুক অ্যাণ্ড ইকুইপমেণ্ট অ্যাওয়ার্ড (1966) লাভ করেন।

ডক্টর প্রবোধকুমার ভৌমিক
সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

ডক্টর প্রবোধকুমার ভৌমিক (জন্ম-1929) বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের রীডার। তাছাড়াও তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

মেদিনীপুর জেলায় (পশ্চিমবঙ্গ) তাঁর বাড়ী। মেদিনীপুর জেলায় তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করেন। বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় তিনি 1942 সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 1945 সালে তিনি সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1949 সালে নৃতত্ত্বে অনার্সসহ বি. এস-সি এবং 1951 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1959 এবং 1967 সালে নৃতত্ত্বে যথাক্রমে ডি-ফিল এবং ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এপর্যন্ত তিনিই একমাত্র সামাজিক নৃতত্ত্বে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেছেন। 1952-1962 সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গবাসী কলেজে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ডক্টর ভৌমিকের মতে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি-বিধানে এই দেশের সমাজ-বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব আছে। তিনি লোধা উপজাতিদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান। এক সময়ে লোধারা অপরাধ-প্রবণ উপজাতি হিসাবে পরিগণিত হতো। এই অনুসন্ধানের ফলে লোধাদের এবং সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতির গোষ্ঠির প্রতি সরকারের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। ডক্টর ভৌমিক লোধা এবং সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতির গোষ্ঠির লোকেদের উন্নতিবিধানের কাজে রত আছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি 1. মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের বিদিশায় সমাজ সেবক সঙ্ঘ 2. ইনষ্টিটিউট অব সোসাল রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড অ্যানথ্রোপলজি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর মূল কার্যালয়) ও 3. সংস্কৃতি পরিষদ নামে—তিনটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন।

তিনি এক-শ'-এরও বেশী গবেষণা-পত্র বিভিন্ন

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। Lodhas of West Bengal, Four Midnapore Villages, Occupational Mobility and Caste Structure in West Bengal, Socio-Cultutal Profile of Frontier Bengal প্রভৃতির তিনি রচয়িতা। তিনি বাংলা ভাষার একজন সুলেখক এবং সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের বাংলা পরিভাষা রচনায় সচেষ্ট। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ও অন্যত্র তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে একদল নবীন সমাজ-বিজ্ঞানী বর্তমানে গবেষণারত আছেন।

অধ্যাপক পি এন. ওয়াহি
সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

অধ্যাপক ওয়াহি লক্ষ্ণৌর কিং জর্জেস মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক। তিনি লক্ষ্ণৌ ও লণ্ডনে তাঁর স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করেন। তিনি রয়্যাল কলেজ অব প্যাথোলজিস্টস (লণ্ডন), ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব মেডিক্যাল সায়েন্স, ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সাইটোলজি ও ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা-ফেলো এবং রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস (লণ্ডন)-এর ফেলো। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চে যোগদানের পূর্বে তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা ও প্যাথোলজি, বিশেষতঃ ক্যান্সার সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি প্রধানতঃ উৎসাহী। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব মেডিক্যাল এডুকেশনের সভাপতি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষাসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীর সদস্য। 1970 সালে তিনি জেনিভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সভার একটি আলোচনা অধিবেশনের চেয়ারম্যানরূপে আমন্ত্রিত হন।

ক্যান্সার সম্বন্ধীয় তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক-ভাবে স্বীকৃত। মুখের ক্যান্সার বিষয়ক ইন্টার ন্যাশন্যাল রেফারেন্স সেন্টারের তিনি প্রধান ছিলেন। মুখের টিউমারের তালিকাকরণ সম্বন্ধে তিনি একটি মনোগ্রাফ প্রকাশ করেছেন। তিনি সায়েন্টিফিক কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়ন এগেনস্ট ক্যান্সারের সদস্য, ইন্টারন্যাশন্যাল এজেন্সি ফর ক্যান্সার রিসার্চের ভাইস-চেয়ারম্যান।

1970 সালে তিনি পদ্মভূষণ উপাধি এবং 1964 সালে কলকাতায় তিনি [illegible] ব্রহ্মচারী রীডারশিপ লাভ করেন। তিনি সার নীলরতন সরকার স্মৃতি বক্তৃতা (1964), ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব মেডিক্যাল সায়েন্সের অ্যাকাডেমি বক্তৃতা (1957), ডাঃ সুবোধ মিত্র এবং অরুণ মুখার্জী স্মৃতি বক্তৃতা (1969), ক্যান্সার বিষয়ে সাহেব সিং সোখে এবং ডাঃ শান্তিলাল শেঠ বক্তৃতা (1970), চিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষা বিষয়ে ডক্টর কমলা [illegible] বক্তৃতা (1970), 4র্থ আন্তর্জাতিক সাইটোলজি কংগ্রেসে (লণ্ডন, 1971) বক্তৃতা প্রদান করেন।

1971 সালে যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির বিশ্বম্ভরনাথ চোপরা লেকচারারশিপ, ক্যান্সার বিষয়ে গবেষণার জন্যে ভাটনাগর পুরস্কার, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সাইটোলজির স্বর্ণপদক তাঁকে প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক ওয়াহি চিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা সম্বন্ধে প্রায় 300-এর বেশী মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ডক্টর এম. জে. থিরুমালাচার
সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

ডক্টর এম. জে. থিরুমালাচার 1914 সালের 22শে সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্গালোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি এবং মাইকোলজিতে ডি. এস-সি

ডিগ্রী লাভ করেন। 1946 সালে তিনি উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ল্যান্ট প্যাথোলজি সম্বন্ধে কাজ করেন এবং সেখান থেকে ডক্টর অব ফিলোসফি ডিগ্রী অর্জন করেন। 1947 সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইকোলজি ও প্ল্যান্ট প্যাথোলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1951 সালে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পোটাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (পাটনা, বিহার) যোগদান করেন। 1953 সালে তিনি পিম্প্রির হিন্দুস্তান অ্যান্টিবায়োটিক্সে মুখ্য মাইকোলজিস্ট হিসাবে বদলী হন এবং 1958 সাল থেকে তিনি ঐ সংস্থার রিসার্চ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে আসীন হন।

সাধারণ মাইকোলজি, মেডিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মাইকোলজি, প্ল্যান্ট প্যাথোলজি ও প্যারাসাইটোলজি প্রভৃতি তাঁর গবেষণার বিষয়ীভূত। তাঁর অনেক গবেষণা-পত্র স্বর্গীয় অধ্যাপক এম. জে. নরসিংহম ও ডক্টর বি. বি. মাণ্ডকরের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মোট প্রকাশিত 380টি গবেষণা-পত্রে 25টি নতুন গণ ও 350টি নতুন প্রজাতির কথা প্রকাশিত হয়। উদ্ভিদের রোগ ও নিবারণ (অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে) বিষয়ে তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি ও ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো। তিনি দু-বার ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইণ্টারন্যাশন্যাল বটানিক্যাল কংগ্রেসের (মন্ট্রিল, ক্যানাডা-1959 এবং সিয়াটেল, ইউ. এস. এ-1969) সহ-সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক মাইকোবায়োলজিক্যাল কংগ্রেসের (মন্ট্রিল, 1962 এবং টোকিও, 1969) চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন। তাছাড়াও তিনি অন্যান্য আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অধিবেশনেও অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি হিন্দুস্তান অ্যান্টিবায়োটিক্স বুলেটিনের প্রধান সম্পাদক এবং অ্যাপ্লায়েড মাইক্রোবায়োলজি (ইউ. এস. এ), অ্যান্টিবায়োটিক্স ইণ্টারন্যাশন্যাল জার্নাল (জাপান), Sydowia Annales Mycologici (ভিয়েনা), ইণ্ডিয়ান ফাইটো প্যাথোলজি, ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব এক্সপেরিমেণ্টাল বায়োলজির সম্পাদক মণ্ডলীতে আছেন। 1967 সালে তিনি শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার এবং সুন্দরলাল হোরা পদক লাভ করেন।

ডক্টর এস. কে. মুখার্জী

সভাপতি—শারীরবৃত্ত শাখা

ডক্টর মুখার্জীর ছাত্রজীবন বরাবরই কৃতিত্বপূর্ণ। 1950 সালে কলিকাতায় স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ ফেলো হিসাবে তিনি যোগদান করেন। এরপর তিনি মেডিক্যাল কলেজে শারীরবিদ্যার লেকচারার হিসাবে কাজ করেন এবং 1954 সালে লক্ষ্ণৌর সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। Reversal of experimental alloxan diabetes-এ প্যানক্রিয়েটিক এজেন্ট ও তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করেন এবং এরূপ বিপর্যয়ের হিস্টোলজি সংক্রান্ত প্রমাণ প্রদর্শন করেন। 1957 সালে ডক্টর মুখার্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ডি. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ সালেই তাঁকে কলম্বো প্ল্যান ফেলোশিপ প্রদান করা হয় এবং টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সি. এইচ. বেস্টের (এফ-আর-এস) তত্ত্বাবধানে তিনি ডায়াবেটিস এবং ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রাইনোলজি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। বিদেশে যাবার আগে এবং প্রত্যাবর্তনের পরে ভারতে প্রাপ্ত উপাদান (গাছ-গাছড়া বা সিন্থেটিক) ব্যবহারে সেবনযোগ্য ডায়াবেটিস প্রতিরোধক পদার্থ প্রস্তুতের বিষয়ে অনুসন্ধান চালান। সম্প্রতি তিনি ও তাঁর সহযোগীরা সেবনযোগ্য হাইপোগ্লাইসিমিক যৌগ

(Quinazolone) প্রস্তুত করেন এবং এই সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা চালান।

ডায়াবেটিস সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধানের ফল 1954 ও 1970 সালের ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ডায়াবেটিস ফেডারেশনে প্রেরিত হয় এবং প্রশংসা লাভ করে। 1965 সালে তিনি আমেরিকার ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করেন এবং সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন ডিভিশনে ক্লিনিক্যাল টক্সিসিটি অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি বিজ্ঞানী গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি আই. সি. এম. আর-এর কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করেন। ডক্টর মুখার্জি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিওলজির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং বিভিন্ন জার্নালের রেফারী। তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন (আই-এস-আই)-এর এ. এফ. ডি. সি-30 উপ-সমিতির সদস্য।

তিনি দেশ-বিদেশের জার্নালে 60টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি এক্স-পেরিমেন্টাল মেডিক্যাল ডিভিশনের প্রধান হিসাবে কাজ করছেন।

অধ্যাপক বি. কুপ্পুস্বামী

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা

অধ্যাপক কুপ্পুস্বামী 1917 সালের অক্টোবর মাসে মহীশূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ও মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে (যুক্তরাষ্ট্র) শিক্ষালাভ করেন। তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের সিনিয়র অধ্যাপক। 1942 সালে তিনি মনস্তত্ত্বের লেকচারার হিসাবে কাজে যোগ দেন। আট বছর বাদে তিনি মনস্তত্ত্বের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1958 সালে তিনি মনস্তত্ত্বের রীডার হন। 1962 সাল থেকে তিনি মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে স্নাতকোত্তর বিভাগ পরিচালনা করছেন।

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হবার পরেই তিনি প্রাণী-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় জীব-মনস্তত্ত্ব গবেষণাগার স্থাপন এবং তার ও উন্নতিবিধান করেন। তাছাড়াও বর্তমান বিভাগের সম্প্রসারণের মূলেও তাঁর কৃতিত্ব আছে। তিনি তিনটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মান নির্ণয় করেন—1. স্বভাবের পরিমাপ, 2. ব্যক্তিত্ব নিরূপণ, 3. কলেজ পর্যায়ে ছাত্রদের অনুশীলনাভ্যাসের পরিমাপ। দেশের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগারে এই তিনটি পরীক্ষা-পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। সাইকোলজিক্যাল ষ্টাডিজ নামক গবেষণা-পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তিনি মহীশূর মনস্তাত্ত্বিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং নিখিল ভারত বৃত্তি ও শিক্ষাগত পরিচালন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির সভাপতি ছিলেন। তিনি মনস্তাত্ত্বিক শব্দাবলীর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার কাজেও ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কানাড়া ভাষায় মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করেন এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সেটি প্রকাশিত হয়। তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। এন. সি. ই. আর. টি-র (নতুন দিল্লী) পরীক্ষণ, পরিচালনা, পরিমাপ ও মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করছেন। অধ্যাপক কুপ্পুস্বামী অনেক গবেষণা-পত্রও প্রকাশ করেছেন। মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় কমিটিতে তিনি আছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।

ডক্টর জি. আর. ডমনিয়াল

সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

ডক্টর ডমনিয়াল 1904 সালের 21শে

জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1926 সালে পদার্থবিদ্যায় এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরলোকগত অধ্যাপক এম. এন. সাহার (এফ. আর. এস) তত্ত্বাবধানে তিনি গবেষণা করেন। 1927 সাল থেকে 1945 সাল পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে রত থাকেন এবং 1927 সালে রেডিও রিসার্চ লেবরেটরির প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই তিনি এটিকে সংগঠিত করেন। 1936 সালে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন। আয়নোস্ফীয়ার, স্পেক্ট্রোস্কোপী ও এক্স-রে সম্বন্ধে তিনি প্রায় 25টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। আয়নমণ্ডলীয় ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে—রেডিও তরঙ্গের ত্রয়ী বিদারণের (Triplet splitting) পরীক্ষামূলক আবিষ্কার।

তিনি 1938 সালে ইনস্টিটিউট অব রেডিও ইঞ্জিনীয়ার্সের (নিউইয়র্ক) পূর্ণ সদস্য এবং 1943 সালে ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার্সের (নিউইয়র্ক) সিনিয়র এবং 1972 সালে আজীবন সদস্য নির্বাচিত হন। 1943 সালে তিনি ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের (বর্তমানে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি) ফেলো নির্বাচিত হন। 1945 সালে তিনি ভারতের আবহতত্ত্ব বিভাগে আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ হিসাবে যোগদান করেন। 1945-'46 সাল পর্যন্ত তিনি এই বিভাগের দিল্লীর গবেষণাগার ও কারখানার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। পরে তিনি এই বিভাগের ভূকম্পন বিষয়ক কাজের ভারপ্রাপ্ত হন। তাঁর চাকুরীর শেষভাগে তিনি কোদাইকানালের চৌম্বক মানমন্দিরকে পুনরায় চালু করেন। এটি অনেক বছর যাবৎ বন্ধ ছিল।

1948 সালে তিনি সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসায় সুরু করেন। তিনি তসনিবাল ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ-এর পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান এবং তসনিবাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি অল ইণ্ডিয়া ইনস্ট্রুমেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাণ্ড ডীলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (1965-67) এবং আজমীর ইঞ্জিনীয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (1969-70) সভাপতি ছিলেন। তিনি এখন ইনস্টিটিউশন অব টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ার্সের সভাপতি (1972)। তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন সমিতি ও সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে ভরবর্ণালীমিতি

কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়*

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে[1] শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ধনাত্মক আয়নের স্থায়িত্বের উপর আণবিক আয়নের উৎপত্তি ও তার খণ্ডীয়করণ নির্ভর করে এবং ধনাত্মক আয়নের স্থায়িত্ব যৌগের কাঠামো ও বিভিন্ন পরিবর্তপুঞ্জের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ আয়নের উৎপত্তি ও তার খণ্ডীয়করণ বিবেচনাধীন জৈব যৌগের জ্যামিতিক গঠনের উপর নির্ভরশীল। যৌগের জ্যামিতিক গঠন আণবিক আয়নের উৎপত্তি ও তার খণ্ডীয়করণ প্রক্রিয়াকে ঠিক কি ভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে, তারই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

জৈব যৌগের খণ্ডীয়করণ[2] প্রধানতঃ দু-ভাবে ঘটতে পারে—

(ক) সরল খণ্ডীয়করণ: এই ধরণের খণ্ডীয়করণে শুধুমাত্র এক বা একাধিক বন্ধ খণ্ডিত হয়, কিন্তু খণ্ডীয়করণ চলাকালীন বিবেচনাধীন যৌগের বা তার কোন খণ্ডিত অংশের কোন রকম পুনর্বিন্যাস ঘটে না।

(খ) জটিল খণ্ডীয়করণ: এই খণ্ডীয়করণ প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক বন্ধ ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাধীন যৌগটির বা তার কোন খণ্ডিত অংশের পুনর্বিন্যাস ঘটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সরল ভরখণ্ডীয়করণ প্রক্রিয়ায় ভরখণ্ডের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা খুব একটা কঠিন নয়, কিন্তু খণ্ডীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বিন্যাস ঘটলে ভরখণ্ডের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় বেশ জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে পরীক্ষাধীন যৌগের জ্যামিতিক গঠন সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অতএব জৈব যৌগের ভরবর্ণালী বিশ্লেষণের পূর্বে বিভিন্ন প্রকার খণ্ডীয়করণ প্রক্রিয়া এবং সেগুলির উপর কাঠামোর সঠিক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি ভর বর্ণালীমিতিতে প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়।

দুই কার্বন পরমাণুর মধ্যস্থিত সম্পৃক্ত বন্ধের খণ্ডীয়করণ

দুই কার্বন পরমাণু সম্পৃক্ত বা সিগ্‌মা বন্ধের সাহায্যে সংযুক্ত থাকলে সেই বন্ধের বিভাজনের ফলে কার্বনিয়াম আয়ন তৈরি হয় (সমীকরণ-1)

$$-\overset{|}{\underset{|}{C}}-\overset{|}{\underset{|}{C}}-\Big]\rightarrow -\overset{|}{\underset{|}{C}}{}^{+}+{}^{\cdot}\overset{|}{\underset{|}{C}}- \quad \cdots(1)$$
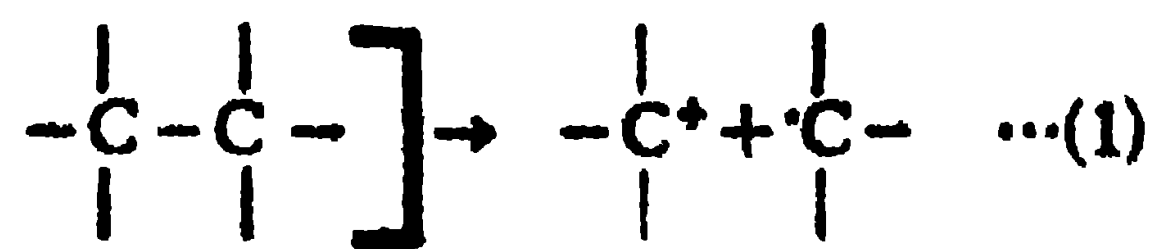
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোন যৌগে একাধিক সিগ্‌মা বন্ধ থাকলে (যা অধিকাংশ জৈব যৌগে থাকে) সাধারণতঃ সেই বন্ধটিই খণ্ডিত হয়—যেটির ভাঙবার ফলে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে স্থায়ী ও শক্ত কার্বনিয়াম আয়ন তৈরি হবার সম্ভাবনা বেশী। উদাহরণস্বরূপ হেপ্টাডেকেন শ্রেণীর যৌগগুলির ভরবর্ণালীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর 2 এবং 3নং যৌগে অনেকগুলি সিগ্‌মা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও চিহ্নিত স্থানেই খণ্ডীয়করণ ঘটে, যার ফলে 2নং যৌগের ভরবর্ণালীর m/e 85 ও m/e 169 স্থানে এবং 3নং যৌগের ভরবর্ণালীর m/e 141 স্থানে মুখ্য

1. জ্ঞান ও বিজ্ঞান, নভেম্বর, পৃ 671, 1970
2. যৌগের খণ্ডীয়করণ বলতে এখানে যৌগের আণবিক আয়নের খণ্ডীয়করণই বোঝানো হয়েছে।

* বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

দেখা যায়। কারণ ঐ চিহ্নিত স্থানে খণ্ডিত হলে তুলনামূলকভাবে বেশী শক্ত ও স্থায়ী, সেকেণ্ডারী কার্বনিয়াম আয়নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু 1নং যৌগের ক্ষেত্রে সেরকম কোন স্থায়ী কার্বনিয়াম আয়নের উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকায় আণবিক আয়নটি পূর্বোক্ত যৌগগুলির মত যথারীতি m/e 226 স্থানে দেখা গেলেও উপরিউক্ত খণ্ডগুলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।

1. $CH_3-(CH_2)_{14}-CH_3$
(M⁺, 226)

2. $CH_3-(CH_2)_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-(CH_2)_9-CH_3 \rightarrow CH_3-(CH_2)_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{+}{C}H}} + \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{+}{C}H}}-(CH_2)_9-CH_3$
(M⁺, 226) m/e 85 m/e 169

3. $CH_3-(CH_2)_5-\underset{\displaystyle (CH_2)_2-CH_3}{\underset{|}{CH}}-(CH_2)_5-CH_3 \rightarrow \underset{\displaystyle (CH_2)_2-CH_3}{\underset{|}{\overset{+}{C}H}}-(CH_2)_5-CH_3$
(M⁺, 226) m/e 141
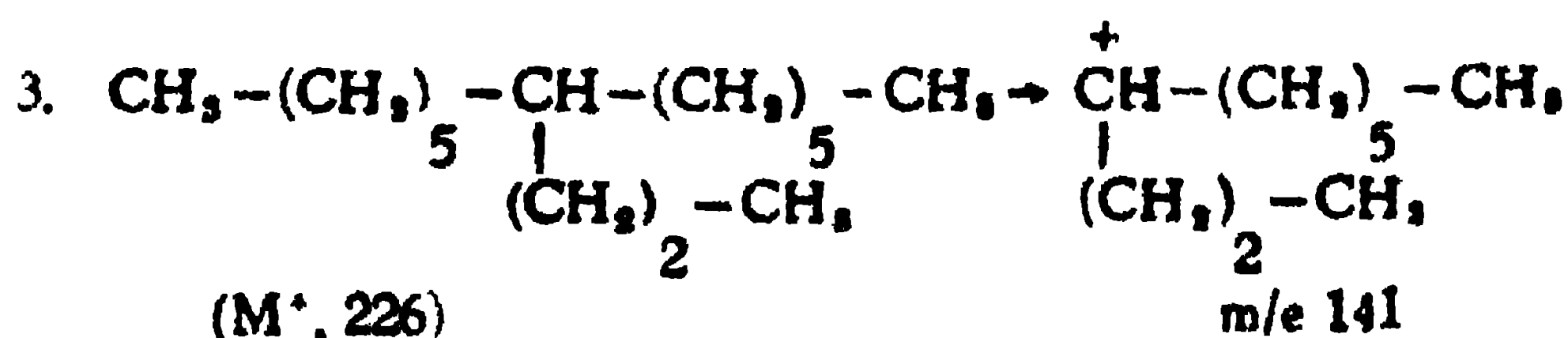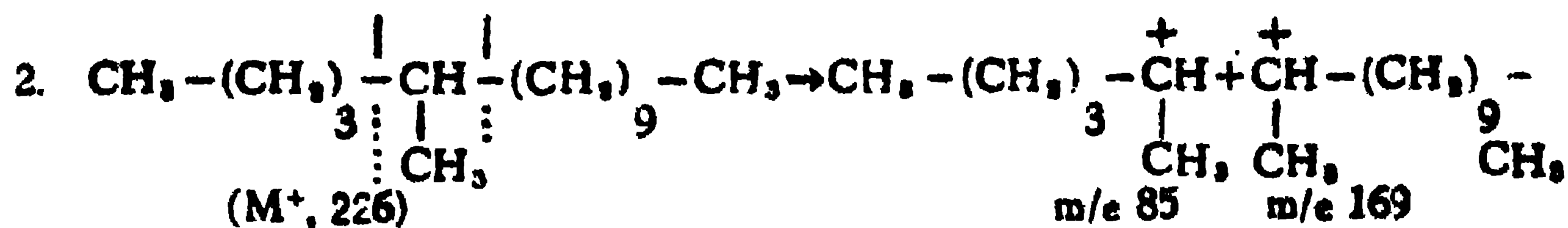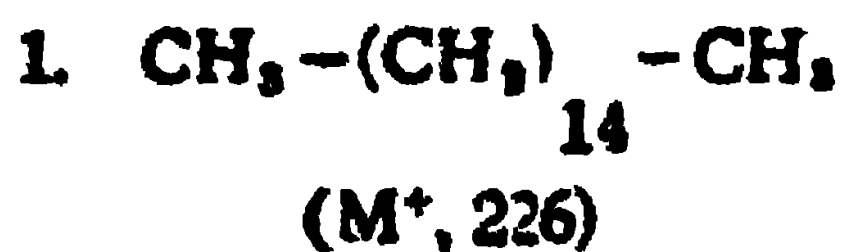
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরিউক্ত যৌগগুলি আইসোমেরিক হলেও কিন্তু প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একই ভরখণ্ডের উৎপত্তি হয় না। পৃথক পৃথক ভরখণ্ডের উৎপত্তিহেতু অ্যালকিলপুঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন আকার এবং সেগুলির পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থান। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে যে, ভর বর্ণালীর বিশ্লেষণ ঠিকমত করতে পারলে জৈব যৌগে, বিশেষ করে হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর যৌগে অ্যালকিলপুঞ্জের সঠিক অবস্থান ও তার আকার নির্ণয় করা সম্ভব।

পাইবণ্ডের প্রভাব

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে দুই কার্বন পরমাণুর মধ্যস্থিত সিগ্‌মা বণ্ডের খণ্ডীকরণ পরীক্ষাধীন যৌগে পাইবণ্ডের উপস্থিতির ফলে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হতে পারে এবং এর ফলে পূর্বোক্ত খণ্ডন প্রক্রিয়ার যে সকল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সেগুলির মধ্যে নীচের দুটিই প্রধান।

(ক) অ্যালাইলিক প্রক্রিয়া—মুক্ত শৃংখল জাতীয় জৈব যৌগে অসম্পৃক্ত বা পাইবণ্ড থাকলে সেই পাইবণ্ডের β স্থানে অবস্থিত, দুই কার্বনের মধ্যবর্তী সিগমাবণ্ডের খণ্ডীকরণ ঘটে থাকে এবং এর ফলে একটি স্থায়ী অ্যালাইলিক কার্বনিয়াম আয়নের[3] সৃষ্টি হয় (সমীকরণ-2)

$$\left[>C=C-C-C-C-\right]^{\cdot +} \rightarrow \left[>C=C-C^{+} \longleftrightarrow >\overset{+}{C}-C=C\right] + \dot{C}-C-\cdots \quad (2)$$

(অ্যালাইলিক কার্বনিয়াম আয়ন)
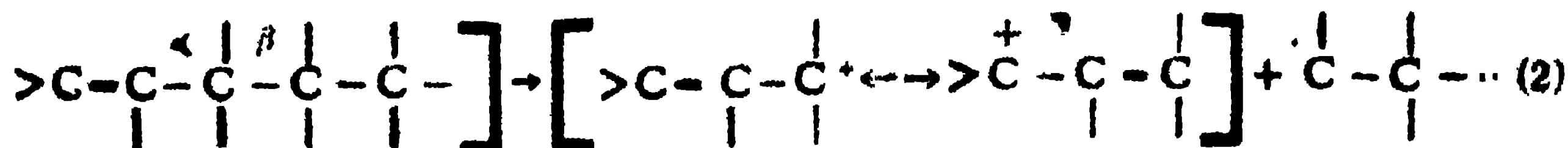
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের খণ্ডীকরণের ফলে যে ভরখণ্ডটির সৃষ্টি হয়, সেটির উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলে পাইবণ্ডের উপস্থিতি ও তার স্থান নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আণবিক আয়নের পাইবণ্ডগুলি গতিশীল এবং খুব সহজেই স্থানান্তরিত হতে পারে (সমীকরণ-3)

3. অ্যালাইলিক কার্বনিয়াম আয়নটি অনুনাদের ফলে স্থায়িত্ব লাভ করে।

$$-\overset{|}{\underset{|}{C}}-\overset{\beta}{\underset{H}{C}}-\overset{\alpha}{C}=C-\underset{H}{C}-\rightarrow-\underset{|}{C}-\overset{\beta}{\underset{H}{C}}-\overset{\alpha}{\underset{H}{C}}-C=C< \cdots\cdots \quad (3)$$
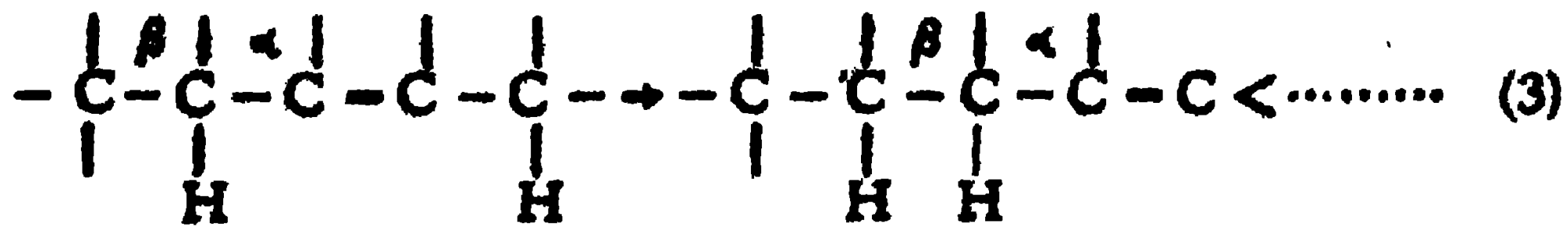
অতএব পাইবণ্ডের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে এই ধরণের স্থানান্তরজনিত ঘটনা বিষয়ে অবহিত থাকা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য পাইবণ্ডের কাছাকাছি কোন কার্যকরীপুঞ্জ থাকলে বা পরীক্ষাধীন যৌগটি চক্রাকার হলে উপরিউক্ত স্থানান্তরের সম্ভাবনা তেমন থাকে না এবং সে ক্ষেত্রে অ্যালাইলিক খণ্ডন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আয়নখণ্ডের উৎপত্তি ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাইবণ্ডের উপস্থিতি এবং অবস্থান সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে স্টেরয়েড শ্রেণীর অ্যালকালয়েডে পাইবণ্ডের উপস্থিতি ও স্থান নির্ণয়ে এই খণ্ডন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সারাকোসিন ও সারাকোডিনের[4] উল্লেখ করা যেতে পারে। সারাকোডিনের ক্ষেত্রে C_3-C_4 এবং C_2-C_3 বণ্ড বরাবর আলাদা খণ্ডন এবং পরবর্তী কালে ঐ খণ্ডিত অংশগুলির পুনর্বিন্যাসের ফলে যথাক্রমে A (m/e 84) এবং B (m/e 110) এই দুটি আয়নখণ্ডের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু সারাকোসিনে C_5-C_6 বণ্ডের মধ্যে পাইবণ্ড উপস্থিত থাকায় C_3-C_4 বণ্ড বরাবর অ্যালাইলিক খণ্ডনের প্রবণতা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, C_2-C_3 বণ্ড বরাবরই আলাদা খণ্ডন আদৌ ঘটে না, যার ফলে এই যৌগে B (m/e 110) আয়নখণ্ডটির সৃষ্টি হয় না। অতএব আলোচ্য শ্রেণীভুক্ত যৌগে B কিংবা অনুরূপ আয়নখণ্ডের অনুপস্থিতির ভিত্তিতে C_5-C_6-এর মধ্যে পাইবণ্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়।

এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবেই একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, C-C বণ্ডের পাশে অ্যারোমেটিকপুঞ্জ থাকলে ঐ একই ধরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং অ্যালাইলিক খণ্ডন প্রক্রিয়ার মত অ্যারোমেটিকপুঞ্জের β স্থানে অবস্থিত C−C বণ্ডের খণ্ডীকরণ ঘটে এবং এর ফলে যে কার্বনিয়াম আয়নটির সৃষ্টি হয়, সেটি খুব তাড়াতাড়ি ট্রপিলিয়াম আয়নে রূপান্তরিত হওয়ায় ফলে স্থায়িত্ব লাভ করে।

(খ) ডিলস অ্যালডারের বিপরীত বিক্রিয়া—অসম্পৃক্ত চক্রাকার যৌগগুলির (Cyclic olefins) খণ্ডীকরণে বেশ অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের যৌগে খণ্ডীকরণের সময় পাইবণ্ডের β-স্থানে অবস্থিত দুটি বণ্ড ভেঙে যায় এবং এর ফলে ঐ অণুটি থেকে দুটি স্থায়ী অসম্পৃক্ত আয়নখণ্ডের উৎপত্তি ঘটে, কিন্তু তার জন্যে হাইড্রোজেন বা অন্য কোন পরমাণুর স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না।

এই ধরণের প্রক্রিয়া হচ্ছে সাধারণ ডিলস অ্যালডার[5] বিক্রিয়ার ঠিক বিপরীত এবং সে জন্যেই এই খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় বিপরীত ডিলস-অ্যালডার খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া (Retro Diles Alder Collapse)। এই বিক্রিয়াটি অসম্পৃক্ত চক্রাকার যৌগের আয়নখণ্ডীকরণের একটি খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং বিশেষ কোন কার্যকরীপুঞ্জের প্রভাব না থাকলে এই শ্রেণীর যৌগগুলির খণ্ডীকরণ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

জৈব যৌগের খণ্ডীকরণে হেটারো অ্যাটমের প্রভাব

জৈব যৌগে হেটারো অ্যাটমের উপস্থিতি

4. এ, চ্যাটার্জী, বি, দাস, সি, পি, দত্ত এবং কে, এস, মুখার্জী, টেট্রাহেড্রন লেটার্স পৃ, 67, 1965

5. সাধারণ ডিলস-অ্যালডার বিক্রিয়ায় দুটি অসম্পৃক্ত যৌগ থেকে একটি চক্রাকার যৌগ উৎপন্ন হয়।

খণ্ডীকরণে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দেখা যায়, যৌগে হেটারো অ্যাটমের উপস্থিতির ফলে খণ্ডীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং খুব সহজেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবখণ্ডের উৎপত্তি ঘটে। এজন্যেই ভর বর্ণালীবিধি হেটারো অ্যাটমিক জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। হেটারো অ্যাটমের উপস্থিতি বিবেচনাধীন যৌগে খণ্ডীকরণ পদ্ধতিকে যে সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত করতে পারে, সেগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) কার্বন ও হেটারো অ্যাটমের মধ্যবর্তী বন্ধের খণ্ডীকরণ: কার্বন ও হেটারো অ্যাটমের মধ্যস্থিত সম্পৃক্ত বা সিগমা বন্ধের $\left(-\overset{|}{\underset{|}{C}}-X\right)$ খণ্ডীকরণের ফলে সাধারণতঃ হেটারো অ্যাটমের সঙ্গে যুক্ত অংশটি নিউট্র্যাল খণ্ড আকারে অপসারিত হয় এবং হেটারো অ্যাটম অংশটি কার্বনিয়াম আয়নের সৃষ্টি করে (সমীকরণ-4)। কিন্তু সৃষ্ট ঐ কার্বনিয়াম আয়নটি তেমন শক্ত বা স্থায়ী না হলে পুনর্বিন্যাস জাতীয় প্রক্রিয়ার ফলে ঐ কার্বনিয়াম আয়নের পরিবর্তে অন্য অবখণ্ডের সৃষ্টি হয় (সমীকরণ-5)। যেহেতু কার্বন পরমাণুতে অ্যালকিলপুঞ্জের সংখ্যা বাড়লে কার্বনিয়াম আয়নের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়, সে জন্যেই লক্ষ্য করা যায়, হেটারো অ্যাটমের সঙ্গে সংযুক্ত কার্বনে যত বেশী সংখ্যক অ্যালকিল পুঞ্জ থাকে, ততই ঐ বন্ধটির $\left(-\overset{|}{\underset{|}{C}}-X\right)$ ভাঙবার প্রবণতা বাড়তে থাকে। তাই দেখা যায়, টারশারী কোহলগুলি খুব সহজেই $-OH$ পুঞ্জ অপসারিত করে ভরবর্ণালীতে $(M-OH)$ স্থানে শৃঙ্গ প্রদর্শন করে। কিন্তু প্রাইমারী শ্রেণীর কোহলগুলির ক্ষেত্রে—OH পুঞ্জের অপসারণের ফলে যে কার্বনিয়াম আয়নটির সৃষ্টি হয়, সেটি তেমন শক্ত ও স্থায়ী না হওয়ায় জলের (H_2O) অপসারণই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে এবং তাদের ভরবর্ণালীতে $(M-18)$ স্থানে বেশ তীব্র শৃঙ্গ দেখা যায় (সমীকরণ-5)

$$\geqslant C-X \longrightarrow \geqslant \overset{+}{C}+\dot{X} \cdots\cdots\cdots(4)$$

(X-এর স্থান, $-OCOR$, $-OH$, $-NH_2$, $-OR$, ইত্যাদি)

$$CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}-OH \xrightarrow{-OH} CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C^+}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots(4a)$$

$$CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{-H_2O} CH_2-CH_2 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(5)$$

(খ) আলফা খণ্ডন—উপবিষ্টক বন্ধ খণ্ডীকরণ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, অনেক সময় হেটারো অ্যাটমের অ-বন্ধন ইলেকট্রন যুগল (Non-bonding electron pair) ঐ হেটারো অ্যাটমের সঙ্গে সংযুক্ত কার্বনে ধনাত্মক আধানের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং এর ফলে 4নং সমীকরণ অনুযায়ী $C-X$ বন্ধটি না ভেঙে ঐ হেটারো অ্যাটমের ঠিক পরের $C-C$ বন্ধটি খণ্ডিত হয় (সমীকরণ-6)

$$R\overset{\alpha}{-}\overset{|}{\underset{\underset{X}{|}}{C}}\overset{\alpha'}{-}R \rightarrow R^{\cdot}+{}^{+}\underset{\underset{:X}{|}}{C}-R \leftrightarrow \underset{\underset{X^+}{\|}}{C}-R \cdots(6)$$
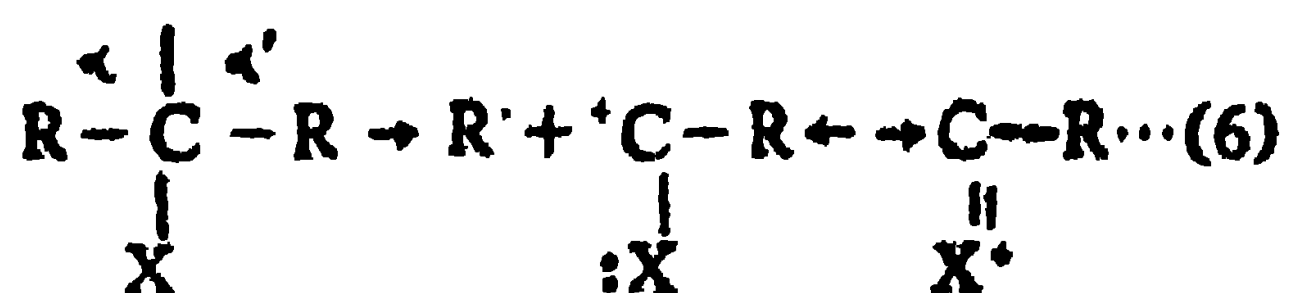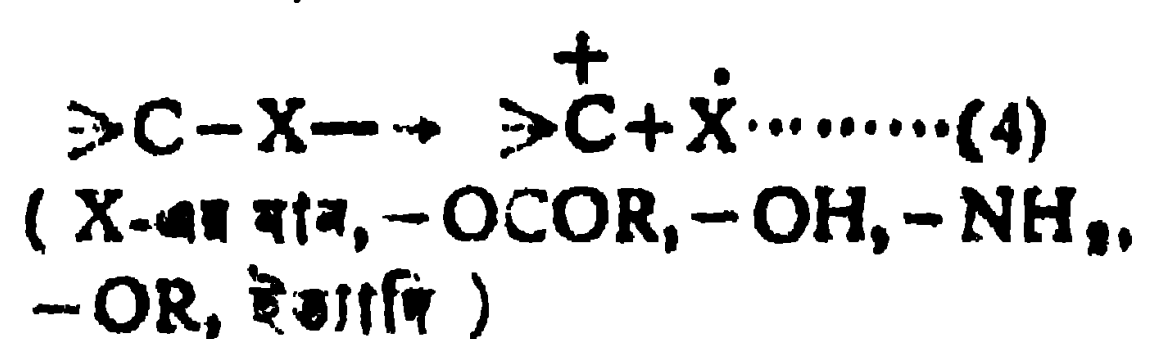
এই প্রক্রিয়ায় অবখণ্ডীকরণের প্রবণতা প্রধানতঃ কোহল, ঈথার এবং অ্যামিন শ্রেণীর যৌগগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রায়শঃই এই সমস্ত শ্রেণীভুক্ত যৌগগুলির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় $C-X$ বন্ধটির α-স্থানে অবস্থিত বন্ধটি খণ্ডিত হয়, সেইহেতু এই খণ্ডীক-

বণ্ড প্রক্রিয়াটিকে আলফা খণ্ডন (α−cleavage) বলা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 6নং সমীকরণে C−X বণ্ডের উভয় পার্শ্বের বণ্ড দুটির (α ও α') মধ্যে যে বণ্ডটি খণ্ডিত হলে তুলনামূলকভাবে বেশী ভরের নিউট্রাল বণ্ডের বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, সাধারণতঃ সেই বণ্ডটি খণ্ডিত হয়। এই খণ্ডন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী ও টারশারী এই তিন শ্রেণীর কোহলের পার্থক্য খুব সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব (সমীকরণ-7, 8, 9)

$$R-CH_2(OH) \xrightarrow{-R^{\cdot}} \overset{+}{C}H_2(OH) \leftrightarrow CH_2=\overset{+}{O}-H \quad \cdots(7)$$

m/e 31

$$R-CH(OH)-R-R' \xrightarrow{+} \overset{+}{C}H(OH)-R \leftrightarrow CH(=\overset{+}{O}H)-R \quad \cdots(8)$$

m/e (30+R)

$$R-C(R)(OH)-R-R^{\cdot} \longrightarrow R-\overset{+}{C}(R)(OH) \leftrightarrow R-C(R)=\overset{+}{O}H \quad \cdots(9)$$

m/e (29+R+R)

7, 8 এবং 9নং সমীকরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিন শ্রেণীর কোহলের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ভরবর্ণালীতে পৃথক পৃথক স্থানে শৃঙ্গ দেখা যাবে। সুতরাং ঐ শৃঙ্গগুলি ঠিকমত অনুধাবন করতে পারলে এই তিন শ্রেণীর কোহলের পৃথকীকরণ যে মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, তা স্পষ্টতঃ অনুমেয়।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 6নং সমীকরণে C−X বণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থিত দুটি বণ্ডই (α ও α') খণ্ডিত হতে পারে। তবে উভয় বণ্ডের খণ্ডিত হবার ফলে সৃষ্ট ভরখণ্ডটির স্থায়িত্ব এত কমে যায় যে, সাধারণতঃ উভয় বণ্ডের খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বিশেষ কাঠামো বিশিষ্ট জৈব যৌগের ক্ষেত্রে উভয় বণ্ডই খণ্ডিত হতে পারে। দেখা গেছে, C−X বণ্ডটির β-স্থানে অবস্থিত কার্বন পরমাণুতে হাইড্রোজেন থাকলে এবং সেই হাইড্রোজেন পরমাণুটি যদি খুব সহজেই স্থানান্তরিত হতে পারে, তা হলে উভয় বণ্ডই খণ্ডিত হয় (সমীকরণ-10)

$$H-\overset{H}{C}\overset{\beta}{-}C\overset{\alpha}{-}C(X)\overset{\alpha'}{-}R \xrightarrow{-R^{\cdot}} H-\overset{H}{C}\overset{\beta}{-}C\overset{\alpha}{-}\overset{+}{C}(X) \longrightarrow H-C=C+\overset{H}{\overset{+}{C}}(X) \quad \cdots(10)$$

$$H-CH_2\overset{\beta}{-}CH_2\overset{\alpha}{-}CH(OH)\overset{\alpha'}{-}R \longrightarrow CH_2=CH_2+\overset{+}{C}H_2(OH)+R^{\cdot} \quad \cdots(10a)$$

m/e 31

উপরের (10a) নং সমীকরণে লক্ষণীয়, ভরখণ্ডের m/e31 কিংবা অনুরূপ ভরখণ্ডের কিছু কিছু যৌগ (কোহল, অ্যামিন ইত্যাদি) প্রাইমারী শ্রেণীর (সমীকরণ-6) না হলেও তাদের ভরবর্ণালীতে দেখা দিতে পারে। সুতরাং শুধুমাত্র উক্ত শৃঙ্গটির উপস্থিতির ভিত্তিতেই পরীক্ষাধীন যৌগটি প্রাইমারী কিংবা সেকেণ্ডারী এই ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে পরীক্ষাধীন যৌগে ঐ বিশেষ শৃঙ্গটির তীব্রতা ও তৎসহ ভরবর্ণালীতে প্রাপ্ত অন্যান্য শৃঙ্গগুলি একই সূত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে,

মূল যৌগ থেকে (সমীকরণ-6) সৃষ্ট ভরখণ্ডপুঞ্জের তীব্রতা স্থানান্তরজনিত প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট (সমীকরণ-10) ঐ একই ভরখণ্ডপুঞ্জের তীব্রতার চেয়ে অনেক বেশী।

(গ) একাধিক হেটারো অ্যাটমের উপস্থিতির প্রভাব—জৈব যৌগে একাধিক হেটারো অ্যাটম সম্পৃক্ত বা সিগ্‌মা বন্ধের সাহায্যে যুক্ত থাকলে ঐ সকল হেটারো অ্যাটমের পার্শ্ববর্তী C–C বন্ধগুলি 6নং সমীকরণ (আলফা-খণ্ডন) অনুযায়ী খণ্ডিত হয়, যার ফলে একাধিক ভরখণ্ডের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ একাধিক ভরখণ্ডপুঞ্জের তীব্রতা এক নয়। দেখা যায় পুঞ্জগুলির তীব্রতা হেটারো অ্যাটমগুলির অবস্থানের উপর নির্ভরশীল (সমীকরণ 11, 12),

$$CH_3-\underset{OH}{\overset{CH_3}{C}}-\cdot CH_2-\underset{NH_2}{CH_2}- \longrightarrow \underset{OH}{\overset{CH_3}{CH_3C^+}} + \underset{NH_2}{\overset{+}{C}H_2} \qquad \cdots(11)$$

$$\qquad\qquad m/e\ 59 \qquad m/e\ 30$$

$$CH_3-\underset{NH_2}{\overset{CH_3}{C}}-CH_2-\underset{OH}{CH_2}- \cdot\cdot\to CH_3-\underset{NH_2}{\overset{CH_3}{C^+}} + \underset{OH}{\overset{+}{C}H_2} \qquad \cdots(12)$$

$$\qquad\qquad m/e\ 58 \qquad m/e\ 31$$
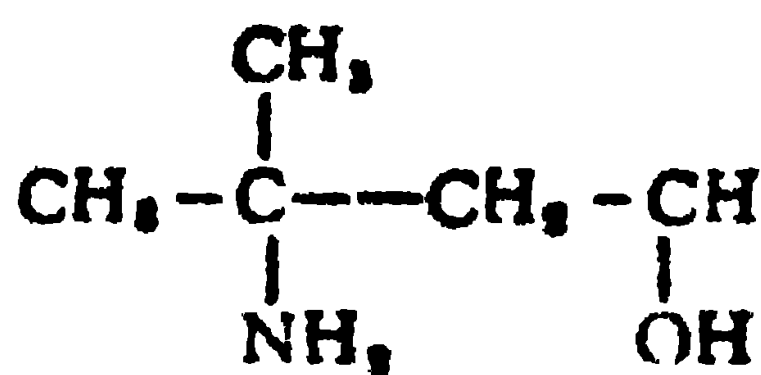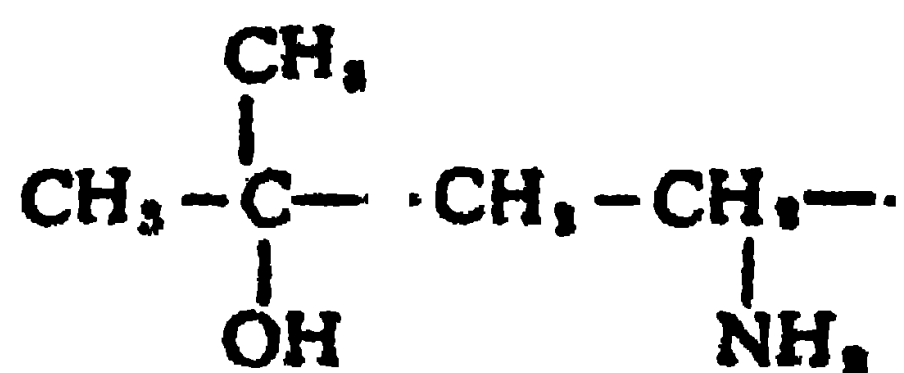
উপরিউক্ত পুঞ্জগুলির মধ্যে প্রথম যৌগে m/e 30-র তুলনায় m/e 59 এবং দ্বিতীয়টিতে m/e 31-এর তুলনায় m/e 58 পুঞ্জগুলির তীব্রতা বেশী, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে ঐ আয়নগুলি (সেকেণ্ডারী-কার্বনিয়াম আয়ন) অন্য আয়নগুলির (প্রাইমারী কার্বনিয়াম আয়ন) চেয়ে বেশী স্থায়ী ও শক্ত। সুতরাং এই শ্রেণীভুক্ত (একাধিক হেটারো অ্যাটমবিশিষ্ট) যৌগের ভরবর্ণালীতে প্রাপ্ত পুঞ্জগুলির তীব্রতার ভিত্তিতে বিভিন্ন হেটারো অ্যাটমগুলির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব।

(ঘ) আলফা-খণ্ডনে পাইবন্ধের প্রভাব—জৈব যৌগে হেটারো অ্যাটমটি অসম্পৃক্ত বা পাইবন্ধের সাহায্যে কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ কার্বনে ধনাত্মক আধানের স্থায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে আলফা-খণ্ডন প্রক্রিয়া খুব সহজেই ঘটে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কার্বনীল শ্রেণীর যৌগের খণ্ডীকরণ উল্লেখ করা যেতে পারে (সমীকরণ-13)

$$R-\underset{\overset{\|}{O}}{C}-R \longrightarrow {}^{+}\underset{\overset{\|}{O}}{C}-R \longleftrightarrow \underset{\overset{|||}{\dot{O}^{+}}}{C}-R \qquad \cdots(13)$$

$$m/e\ (28+R)$$

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, 13নং সমীকরণে প্রাপ্ত ভরখণ্ডটি (28+R) কার্বনীল শ্রেণীভুক্ত যৌগের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী ভরখণ্ড এবং যে কোন কার্বনীল যৌগের ভরবর্ণালীতে ঐ বিশেষ ভরখণ্ডপুঞ্জটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কার্বনীল শ্রেণীভুক্ত যৌগগুলি (28+R) ভরখণ্ড থেকে নিউট্রাল কার্বন-মনো-অক্সাইড অপসারিত করে অন্য একটি ভরখণ্ডের উৎপত্তি ঘটায় এবং এই ভরখণ্ডটির উৎপত্তি কার্বনীল শ্রেণীর যৌগের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

$$R-C\equiv\overset{+}{O} \xrightarrow[-28]{-CO} R^{+}+CO \qquad \cdots(14)$$

$$m/e\ (28+R)$$
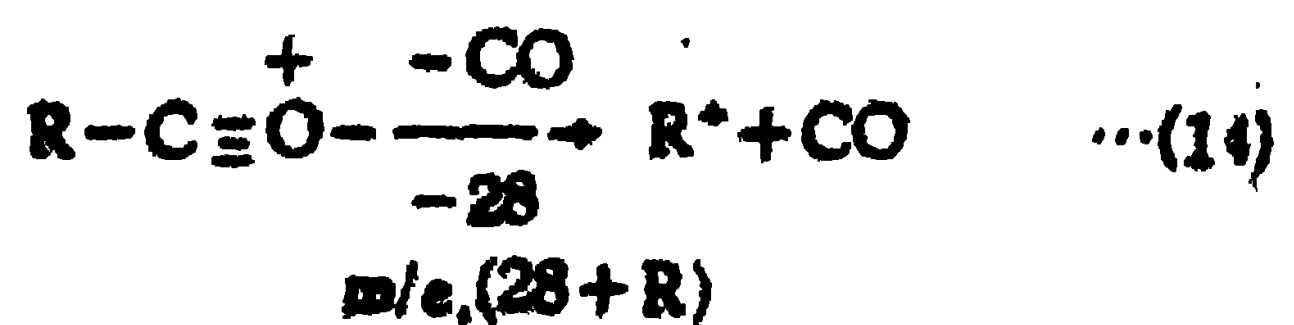
(ঙ) পুনর্বিন্যাসজাতীয় খণ্ডীকরণ—পূর্বেই বলা হয়েছে, ভরখণ্ডীকরণ চলাকালীন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষাধীন যৌগের বা তার কোন খণ্ডিত অংশের পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে। ভর বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিতে যে সকল পুনর্বিন্যাসজাতীয় খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া জানা আছে, সেগুলির মধ্যে নীচেরগুলিই উল্লেখযোগ্য।

কিছু কিছু কার্বনীল শ্রেণীভুক্ত জৈব যৌগ এক বিশেষ ধরণের প্রক্রিয়ায় খণ্ডিত হয়। এই খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়ায় বিবেচনাধীন যৌগের পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং এই পুনর্বিন্যাসের ফলে মূল যৌগ থেকে অসম্পৃক্ত (অলিফিন) শ্রেণীর যৌগের একটি নিউট্রাল অণুর অবলুপ্তি ঘটে। এই ধরণের পুনর্বিন্যাসের জন্যে পরীক্ষাধীন যৌগে কার্বনীলপুঞ্জের সঙ্গে কমপক্ষে আরও তিনটি কার্বন পরমাণু যুক্ত থাকা দরকার এবং কার্বনীলপুঞ্জের কার্বন পরমাণুর γ-স্থানে কমপক্ষে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর উপস্থিতি প্রয়োজন। ম্যাক্লাফার্টির মতে, এই ধরণের কাঠামোবিশিষ্ট যৌগটি প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ষড়ভুজীয় চক্রাকার অবস্থান্তর স্তরে (Transition state) রূপান্তরিত হয় এবং পরে উল্লিখিত γ-স্থানের হাইড্রোজেন পরমাণুর পুনর্বিন্যাসের ফলে ঈপ্সিত ভরখণ্ডের সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত পুনর্বিন্যাসজাতীয় খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া ম্যাক্লাফার্টির পুনর্বিন্যাস নামে পরিচিত এবং উল্লেখ করে রাখা ভাল যে, এই পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ার ব্যবহার শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কাঠামো বিশিষ্ট কার্বনীল শ্রেণীর যৌগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অসম্পৃক্ত শ্রেণীভুক্ত যৌগগুলিতে পূর্বোক্ত অবস্থান্তর স্তরের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঠামোর উপস্থিতি থাকলে এই ধরণের খণ্ডীকরণ ঘটতে পারে। যেমন দেখা যায় প্রপাইল বেঞ্জিন ও পারস্পরিক দুই পরিবর্তপুঞ্জবিশিষ্ট অ্যারোমেটিক (Ortho disubstituted benzene) যৌগের ক্ষেত্রে।

বিশেষ বিশেষ কাঠামোর এস্টার, কোহল ও অ্যামাইড শ্রেণীর যৌগগুলির ক্ষেত্রেও খণ্ডীকরণের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বিন্যাস ঘটে। এই সকল যৌগগুলির মধ্যে কোহলের খণ্ডীকরণে পুনর্বিন্যাসের যে সকল ঘটনা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (সমীকরণ-5, 10)। এস্টার যৌগে এস্টারপুঞ্জের β-স্থানে অবস্থিত কার্বন পরমাণুতে কমপক্ষে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকলে সেই হাইড্রোজেনের পুনর্বিন্যাসের ফলে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের অবলুপ্তি ঘটে এবং ভরবর্ণালীর $(M-60)$ স্থানে শৃঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু β-স্থানে অবস্থিত কার্বন পরমাণুতে হাইড্রোজেন পরমাণু না থেকে যদি β'-স্থানের কার্বন পরমাণুতে কমপক্ষে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে (যা প্রায়ই থাকে), তা হলে কিটিনের উৎপত্তি খুব সহজেই ঘটে থাকে এবং সৃষ্ট ঐ কিটিন-ভরখণ্ডটি ভরবর্ণালীতে বেশ তীব্র শৃঙ্গ প্রদর্শন করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এই দুটি ভরশৃঙ্গের উপস্থিতি এই বিশেষ কাঠামোর এস্টার যৌগের বৈশিষ্ট্য, অবশ্য কিটিন ভরখণ্ডের উৎপত্তি বিশেষ শ্রেণীর অ্যামাইডেরও (CH_3—COপুঞ্জ সমন্বিত) বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যখন কোন যৌগের খণ্ডীকরণ ঘটতে থাকে, তখন যৌগের কাঠামো অনুযায়ী উপরে আলোচিত প্রক্রিয়াগুলি একই সঙ্গে কিংবা পৃথক পৃথক ভাবে কার্যকরী হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ভরখণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ভরবর্ণালীতে এক বা একাধিক ভরশৃঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। অতএব যৌগের কাঠামো সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পূর্বে ভরবর্ণালীতে প্রাপ্ত সকল ভরশৃঙ্গের তীব্রতা ও সেগুলির ব্যাখ্যা ঠিকমত অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

1972 সালের বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ও ভেষজ-বিজ্ঞানে যেসব যুগান্তকর আবিষ্কারের জন্যে 1972 সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, আগামী কয়েক দশকে মানুষের জীবনের উপর ঐ আবিষ্কারগুলির গভীর প্রভাব পড়বে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞান

শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞানে এবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যৌথভাবে দু-জন বিজ্ঞানীকে। তাঁদের একজন হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-ইয়র্ক শহরের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেরাল্ড এম. এ. ডেলমান এবং অপরজন ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর রোড্নি আর. পোর্টার। তাঁরা দু-জনে পৃথকভাবে যে গবেষণা করেছেন, তাতে জীবদেহের সহজাত রোগ প্রতিরোধক বস্তু (Antibody) বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

পোর্টার 1950 সালে লণ্ডনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চে খরগোশের অ্যান্টিবডি নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। ইতি-পূর্বে কার্ল ল্যাণ্ডস্টেনার এবং লাইনাস পাউলিং আবিষ্কার করেন যে, আগ্রাসী রোগ জীবাণুর (অ্যান্টিজেন—Antigen) সঙ্গে অ্যান্টিবডির সংযুক্তি ঘটে। বিশেষ ধরণের অ্যান্টিবডি বিশেষ ধরণের অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পোর্টার যে মূল ধারণা নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন, তা হচ্ছে অ্যান্টিবডির বিশেষ কার্যকারিতা নষ্ট না করে তাকে বিশ্লিষ্ট করা যায়। তিনি এনজাইম পেপসিন দিয়ে অ্যান্টিবডি পরিভক্ত করেন। এর

ডক্টর রোডনি আর পোর্টার

ডক্টর জেরাল্ড এম. এডেলম্যান

ফলে তাদের অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সংযুক্তির ক্ষমতা বজায় থাকে বটে, তবে প্রত্যেকটি অ্যান্টিবডি অণু অংশবিশেষে বিশ্লিষ্ট হয়।

1959 সালে পোর্টার দেখতে পান, পেপসিন অ্যান্টিবডি অণুকে তিনটি বড় অংশে বিভক্ত করে। তার দুটি অংশ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তৃতীয় অংশটির ঐ ধরণের কোন ক্ষমতা থাকে না।

এডেলম্যানও এই ধারায় গবেষণা করেন, তবে ভিন্ন পদ্ধতিতে। 1961 সালে তিনি একটি গবেষণা-পত্রে প্রকাশ করেন, অ্যান্টিবডিকে মৃদু বিজারণ ক্রিয়ায় ডাইসালফাইড বন্ধন ভাঙা ও ঘন ইউরিয়া দ্রবণে রাখবার পর দুটি অংশে বিশ্লিষ্ট করা যায়। এই অংশগুলি ভিন্ন আকারের এবং পোর্টারের বিশ্লিষ্ট অংশগুলির সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য দেখা যায় না। এই গবেষণার ফলে প্রকাশ পায় যে, ডাইসালফাইড বন্ধনের দ্বারা সংযুক্ত পলিপেপটাইড শৃঙ্খল দিয়ে অ্যান্টিবডি গঠিত।

পোর্টার-এডেলম্যানের গবেষণা থেকে জানা গেছে, মানুষের দেহে সহজাত প্রতিরোধক বস্তু (অ্যান্টিবডি) কিভাবে আগ্রাসী রোগ-জীবাণুকে (অ্যান্টিজেন) আক্রমণ করে পরাভূত করে।

তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সূত্রেই হয়তো শেষ পর্যন্ত দেহে বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের মত বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধের জন্যে প্রতিরোধক বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, অ্যালার্জির বিরুদ্ধে দেহের সংগ্রামের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাবে, দেহের সহজাত প্রতিরোধক বস্তুর গঠন-প্রকৃতির সামান্য তারতম্য ঘটিয়ে নানা ধরণের রোগবাহী ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে তাকে অধিকতর কার্যকর করে তোলা সম্ভব হবে অথবা গবেষণাগারে কৃত্রিম প্রতিরোধক বস্তু তৈরি করা যাবে।

রসায়ন-বিজ্ঞান

এবার রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে যৌথভাবে তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানীকে। তাঁরা হলেন ওয়াশিংটন ডি সি-এর নিকটস্থ ইউ. এস. ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের ডক্টর ক্রিশ্চিয়ান বি. আনফিনসেন (56), নিউ ইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর স্ট্যানফোর্ড মুর (59) এবং ডক্টর উইলিয়াম এইচ. স্টাইন (61)।

ডক্টর আনফিনসেনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কোষোকোষ এবং জিন-এর রাসায়নিক গঠন-প্রকৃতির সম্পর্কে গবেষণার জন্যে। এই বস্তু দুটি বংশপরম্পরাগত বৈশিষ্ট্যের বাহক। ডক্টর মুর এবং ডক্টর স্টাইন রিবোনিউক্লিয়াস বিশ্লেষণের জন্যে পুরস্কার পেয়েছেন। এই বস্তুটি দেহকোষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যামিনো অ্যাসিড বিশ্লেষণের জন্যে পদ্ধতি উদ্ভাবন থেকে সুরু করে তাঁরা বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। প্রোটিনের পারম্পর্য নির্ধারণের পন্থা তাঁরা দেখান। তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে, স্বয়ং-ক্রিয় অ্যামিনো অ্যাসিড বিশ্লেষণ ব্যবস্থার উদ্ভাবন। বর্তমানে এই ব্যবস্থা প্রত্যেক প্রাণ-রসায়নিক পরীক্ষাগারে অনুসৃত হয়ে থাকে।

1906 সালে মুর এবং স্টাইন তাঁদের এই পদ্ধতির সাহায্যে রিবোনিউক্লেজ এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিডের পারম্পর্য নির্ধারণ করেন। এই এনজাইমটি রিবো নিউক্লিক অ্যাসিডকে (RNA) তার সাব-ইউনিটে বিভক্ত করে।

এনজাইম হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরস্পর সংযুক্ত দীর্ঘ শৃঙ্খল। প্যাঁচানো আকৃতিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। প্রোটিন হচ্ছে অত্যন্ত সংবেদী—তাদের আকৃতিতে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটলে তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

কেন এবং কিভাবে প্রোটিনসমূহ তাদের যথাযথ আকৃতিতে বিন্যস্ত হয়—সেই সমস্যার সমাধান করেন আনফিনসেন। 1960 সালে তিনি প্যানক্রিয়েটিক রিবোনিউক্লেজের সাহায্যে

সর্বপ্রথম দেখান যে, প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক আকৃতির পারম্পর্য অবিকলভাবে নির্ধারণ করা যায়।

ডক্টর ক্রিস্টিয়ান বি. অ্যানফিনসেন ডক্টর উইলিয়াম এইচ. স্টাইন ডক্টর স্ট্যানফোর্ড মুর

মুর, স্টাইন এবং অ্যানফিনসেনের যে সব গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আবিষ্কার করেছেন, তার ফলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বংশপরম্পরাগত দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, সম্ভব হবে বংশগত রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করা।

পদার্থ-বিজ্ঞান

এবার পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যৌথভাবে তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানী। তাঁরা হলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জন বার্ডীন (49), রোড আয়ল্যাণ্ডের প্রভিডেন্স শহরের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লিও কুপার (42) এবং ফিলাডেলফিয়ার পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জন শ্রিফার। এঁদের মধ্যে ডক্টর বার্ডীনই সর্বপ্রথম পদার্থ-বিজ্ঞানে দু-বার নোবেল পুরস্কার পেলেন। ট্রানজিস্টর উদ্ভাবনের জন্যে 1956 সালে উইলিয়ম শকলে এবং ওয়াল্টার ব্রাটেনের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সুপারকণ্ডাকটিভিটি (Superconductivity) বা অতি-পরিবাহিতার ক্ষেত্রে মৌলিক তত্ত্বীয় অবদানের জন্যে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 1911 সালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ক্যামেরলিং ওনেস প্রথম হিলিয়াম গ্যাসকে তরলীকৃত করতে সক্ষম হন। তারপর থেকে অতি-পরিবাহিতা সম্পর্কে গবেষণা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অতি-পরিবাহিতা প্রকাশ পায়। যখন কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থকে পরম শূন্য তাপমাত্রার (—273°C) কাছাকাছি শীতল করা হয়, তখন তার বৈদ্যুতিক রোধ ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পায়। এই অবস্থায় সেই মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ অদ্ভুত ধর্ম লাভ করে। এর ফলে আংটি আকৃতির ঐরূপ ধাতুর টুকরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ অনির্দিষ্ট কাল প্রবাহিত হতে থাকবে, শক্তি আদৌ কমবে না।

1957 সালে বার্ডীন, কুপার এবং শ্রিফার অতি-পরিবাহিতা সম্পর্কে তাঁদের বি সি এস (B C S) তত্ত্ব (তিনজনের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে নামকরণ) পেশ করেন। তাঁরা বলেন, পরম শূন্য তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জোড় বন্ধন ঘটে এবং তার ফলে অতি-

মাত্রায় সংসক্তি (Coherence) দেখা দেয়। সরলভাবে বলতে গেলে, যদি ইলেকট্রনগুলিকে বস্তু-তরঙ্গ হিসাবে ভাবা হয়, তাহলে লেসার-রশ্মির তরঙ্গের মত তারা অতিমাত্রায় সংসক্ত হয়ে যাবে। এই অবস্থায় পরিবাহী বস্তুতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ কোন রোধের সম্মুখীন হবে না।

ধাতুর এই আচরণের কার্যকারণ অবগত হয়ে বিজ্ঞানীরা এখন এর চেয়ে কম উত্তাপে অনুরূপ-ভাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন। সেটা সম্ভব হলে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন দিয়ে এটা কার্যকর করা যাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইঞ্জিন ও জেনারেটর নির্মাণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কাজে লাগানো হচ্ছে।

—র. ব.

ডক্টর জন বারডীন ডক্টর লিও এন. কুপার ডক্টর জন আর. শ্রিফার

"......বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।...যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাততঃ মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিজ্ঞান সভা সার্থক হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী — 1973

ষড়বিংশতিতম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

অভিনব করাত

সম্প্রতি লণ্ডনে আয়োজিত 19তম আন্তর্জাতিক হস্তশিল্প ও "নিজে কর" প্রদর্শনীতে একটি অভিনব করাত প্রদর্শিত হয়েছে। এর নাম এভেন কোপিং করাত (Aven Coping Saw)। ফ্রেট-স (Fret-saw)-এর মত এই ক্ষুদ্র করাতটিকে নানা প্রকার সূক্ষ্ম ও জটিল কাজের জন্য
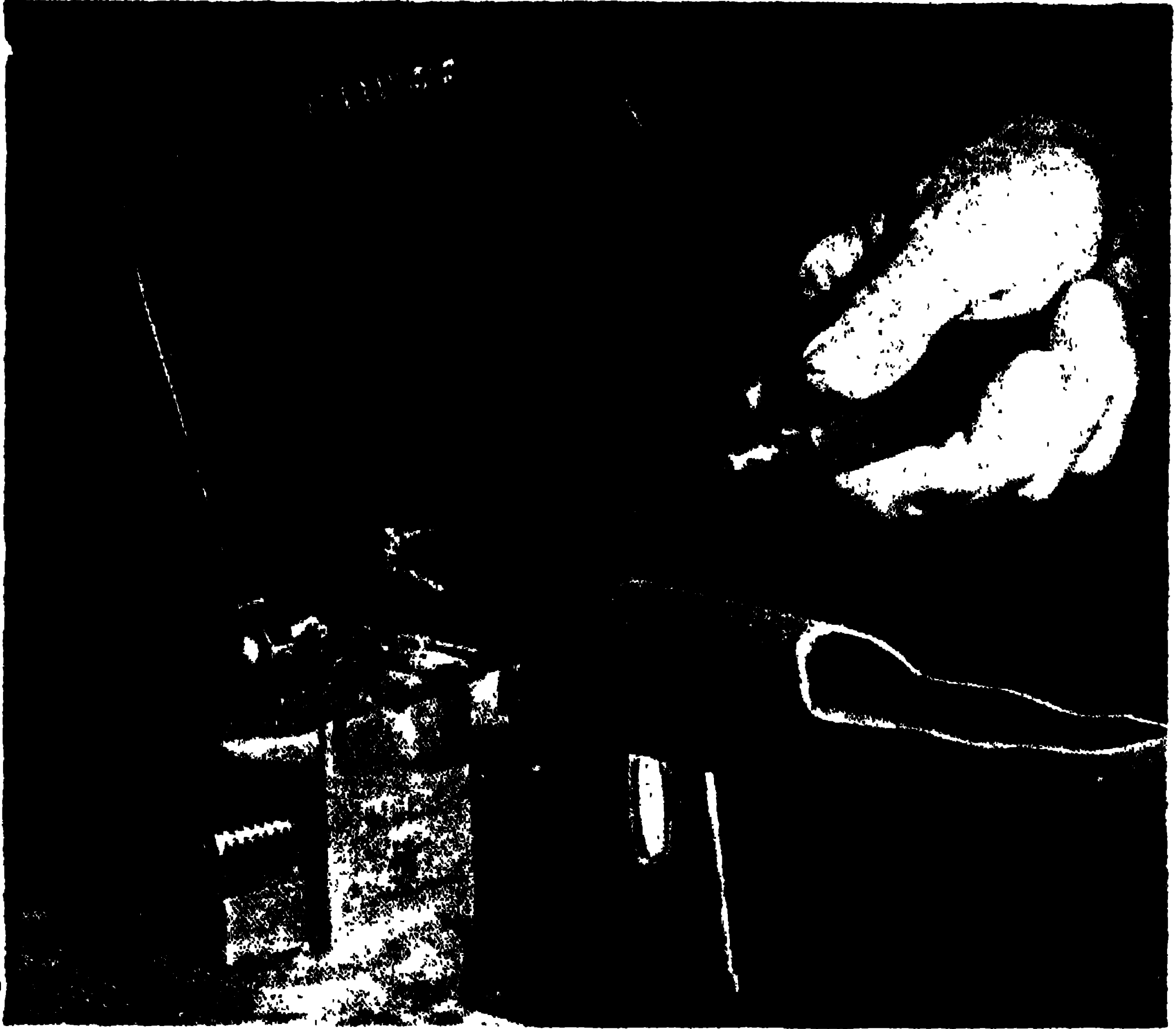
ব্যবহার করা যেতে পারে। প্লাইউড, প্লাস্টিকের পাত, গ্লাস ফাইবার (কাচতন্তু) ইত্যাদি,—এমন কি নরম ধাতুকেও এই করাতের সাহায্যে বক্রাকারে বা নানাকারে কাটা যায়। কার্বন-ষ্টীলের দ্বারা নির্মিত এই করাতের প্রতি ইঞ্চিতে 14টি করে দাঁত আছে। প্রয়োজনমত করাতের ফলকটিকে যে কোন কোণে ঘুরিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

পরিব্রাজক পাখী

পৃথিবীতে কয়েক জাতের পাখী দেখা যায়, যারা নির্দিষ্ট ঋতুতে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে নিকটবর্তী বা বহু দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যায় আবার নির্দিষ্ট সময়ে স্বস্থানে ফিরে আসে। প্রতি বছর শীতের সুরুতে কলকাতা চিড়িয়াখানার জলার ধারে যে হাজার হাজার পাখীকে উড়ে আসতে দেখা যায়, তারা এই সহরে আসে সুদূর মানস সরোবর অঞ্চল থেকে। শীতের শেষে ওরা আবার আগেকার জায়গায় ফিরে যায়। এগুলিকেই সাধারণতঃ বলা হয় পরিব্রাজক পাখী।

স্নাইপ পাখী দলবদ্ধভাবে জাপান থেকে তাসমানিয়া পর্যন্ত (দূরত্ব প্রায় 3000 মাইল) না থেমে স্বচ্ছন্দে উড়ে যেতে পারে। উড্ কককেরা শীতের সুরুতে হিমালয় থেকে নীলগিরি অঞ্চল পর্যন্ত 1500 মাইল পথ সোজা চলে আসে। ক্ষুদ্রাকৃতির ইউরোপীয় চড়ুই পাখীদের কাছে জিব্রাল্টার প্রণালী পারাপার করা তো কিছুই নয়। একটানা ওড়বার ব্যাপারে সম্ভবতঃ অ্যালব্রেটসের তুলনা নেই। এরা পর-পর দু-বার ডিম পাড়বার মধ্যবর্তী সময়ে সমুদ্রের উপর ডানা মেলে একটানা ভেসে বেড়ায়।

পাখীদের দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করবার কথা বললাম, কিন্তু সকল জাতের পাখীই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে ভালবাসে না। আবার এমন পাখীরও অভাব নেই, যারা নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তেই চায় না। আমাদের আশেপাশে, বাড়ীর দেয়ালে কিম্বা নর্দমার ধারে যে সব কাক, শালিক প্রভৃতি পাখী দেখা যায়, তারা কখনই খুব একটা দূরে যায় না। দিনের সুরুতে নিজের বাসার আশেপাশে খাবারের সন্ধানে ঘোরাফেরা করে দিনের শেষে আবার বাসায় ফিরে যায়। মেরু অঞ্চলের পেঙ্গুইন পাখীরা কখনই নিজেদের অঞ্চলের বাইরে যায় না।

দূর বা নিকটবর্তী যে ধরণের ভ্রমণই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিকদের কাছে সব রকম ভ্রমণেরই গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতিতে বিনা কারণে কোন ব্যাপারই ঘটে না, পাখীদের এই ভ্রমণের পিছনেও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, উত্তর গোলার্ধে শীতের সুরুতে পাখীদের মধ্যে দক্ষিণ গোলার্ধে উড়ে যাবার প্রবণতা বেড়ে যায়। এর কারণ সম্ভবতঃ ঐ সময়ে উত্তর গোলার্ধে অসহনীয় ঠাণ্ডা এবং খাদ্যাভাব। আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিদ্দের মতে, কেবল শীত এবং খাবারের অভাবই পাখীদের এক দেশ থেকে অপর দেশে যেতে বাধ্য করে না, উড়ে বেড়ানোটা পক্ষিকুলের স্বভাবজাত ধর্ম, এক কথায় ওরা বেড়াতে ভালবাসে তাই উড়ে বেড়ায়। বিজ্ঞানীদের আরো ধারণা যে, ডিম পাড়বার উপযুক্ত স্থানের সন্ধানের জন্যেও ওরা অন্য দেশে পাড়ি জমায়।

পাখীদের বিদেশ যাত্রার মধ্যে কতকগুলি মজার ব্যাপার দেখা যায়। যখন কোন এক জাতের পাখী বিদেশের পথে রওনা হয়, তখন তাদের মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ (যারা আগেও বিদেশ ভ্রমণ করেছে) তারাই প্রথম রওনা হয়। এদের পিছনে চলতে থাকে অপেক্ষাকৃত তরুণের দল। শুধু তাই নয়, পরিব্রাজক পাখীরা যাত্রার আগে পুরনো পালক খসিয়ে ফেলে দেয় ; তার জায়গায় জন্মায় নূতন পালক।

পাখীদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো—এদের দিক্ নির্ণয়ের অসাধারণ ক্ষমতা। মাঝে মাঝে দু-একটা দলছুট পাখী তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল থেকে পথ হারিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে, এমন খবরও সময়ে সময়ে শোনা যায়। কিন্তু একদল পাখী পথ হারিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে, এমন কোন ঘটনার কথা আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। ইউরোপের বর্ণাঢ্য পল্তার পাখী আলাস্কার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ডিম পেড়ে সেখান থেকে রওনা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে তার গ্রীষ্মাবাসে নির্ধারিত সময়ে অবতরণ করতে কখনই ভুল করে না। বিখ্যাত জার্মান পক্ষিতত্ত্ববিদ্ G. V. T. Mathews এবং Gustav Karmer সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, সাধারণভাবে দিনের বেলায় সূর্য এবং রাতের তারা পাখীদের পথ চিনে নিতে সাহায্য করে। কিন্তু এটাই পাখীদের পথ চিনে নেবার ব্যাপারে শেষ কথা নয় ; কেন না মেঘলা রাতে যখন আকাশে গ্রহ-তারা কিছুই দেখা যায় না—তখনও কিন্তু পাখীদের পথ চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। পায়রাদের পথ চিনে নেবার ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এরা পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর মধ্যে অবস্থিত চৌম্বক ক্ষেত্রকে অনুধাবন করতে পারে এবং অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে এলেও সহজেই পথ চিনে নিজের বাসায় ফিরে আসতে পারে।

যাই হোক না কেন, পাখীদের দিক নির্ণয়ের ক্ষমতা যে অসাধারণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি সূর্য ও তারার অবস্থিতি লক্ষ্য করে পথ চিনে চলতে হয়—তাহলে স্বীকার করতেই হবে, এদের দিক নির্ণয় করবার ক্ষমতা আধুনিক কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। আবার এমনও হতে পারে, বয়স্ক এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাখীরা তাদের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে বিদেশের পথে পাড়ি জমায় আর তরুণের দল তাদের লক্ষ্য করে এগিয়ে চলে।

খগেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী

পারদর্শিতার পরীক্ষা

তারিখ ও বার সংক্রান্ত 2টি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। তোমাদের উত্তর অনুযায়ী বুদ্ধির সমস্যার সমাধানে তোমাদের কার কেমন পারদর্শিতা, তা বুঝতে পারা যাবে।

1.

জানুয়ারী, অক্টোবর	রবি	সোম	মঙ্গ	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
মে	সোম	মঙ্গ	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি
অগাস্ট	মঙ্গ	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম
ফেব্রুয়ারী, মার্চ, নভেম্বর	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গ
জুন	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গ	বুধ
সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গ	বুধ	বৃহ
এপ্রিল, জুলাই	শনি	রবি	সোম	মঙ্গ	বুধ	বৃহ	শুক্র
1973		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

উপরের ছকটি হচ্ছে 1973 খৃষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার (এতে মঙ্গল ও বৃহস্পতিকে সংক্ষেপে 'মঙ্গ' ও 'বৃহ' লেখা হয়েছে)। কোন তারিখ কি বার জানতে হলে তারিখটির যে মাস, সেই মাসের সারি এবং যে দিন, সেই দিনের স্তম্ভ—ঐ সারি ও স্তম্ভ অনুসারে বারটি দেখে নিতে হবে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, 15ই অগাষ্ট কি বার জানতে হবে। অগাষ্ট আছে তৃতীয় সারিতে এবং 15 আছে দ্বিতীয় স্তম্ভে। তৃতীয় সারি ও দ্বিতীয় স্তম্ভ অনুসারে বার হলো বুধ। সুতরাং 1973 খৃষ্টাব্দের 15ই অগাষ্ট বুধবার।

এইবার উপরের ছকটির মত 1379 বাংলা সালের একটি ক্যালেণ্ডার তোমরা নিজেরা তৈরি করো তো। তোমাদের বলে দিচ্ছি, এই সালের পয়লা বৈশাখ ছিল শুক্রবার এবং

বিভিন্ন মাসের দিন-সংখ্যা হলো : বৈশাখ—31, জ্যৈষ্ঠ—31. আষাঢ়—32, শ্রাবণ—32, ভাদ্র—31, আশ্বিন—30, কার্তিক—30, অগ্রহায়ণ—29, পৌষ—30, মাঘ—29, ফাল্গুন—30 এবং চৈত্র—30।

2. নিম্নলিখিত তারিখগুলি কি কি বার ছিল ?—

ক) 1947 খৃষ্টাব্দের 15ই অগাষ্ট

খ) 1950 খৃষ্টাব্দের 26শে জানুয়ারী

গ) 1969 খৃষ্টাব্দের 21শে জুলাই

ঘ) 1971 খৃষ্টাব্দের 16ই ডিসেম্বর

(উত্তরের জন্যে 61নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

স্কার্ভি রোগ ও ভিটামিন-সি

1747 সালে ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূল থেকে শত্রু জাহাজকে দূরে রাখবার জন্যে স্যালিসবারি যুদ্ধজাহাজটিকে তিন মাস ধরে টহল দিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। কিন্তু শত্রুর কোন যুদ্ধ জাহাজ তো দূরের কথা, মনে রাখবার মত কোন যুদ্ধও সেখানে হয় নি। কিন্তু এই যুদ্ধজাহাজটির টহলদারীর সঙ্গে ভিটামিন-সি আবিষ্কারের একটা ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত ছিল। শত্রুসৈন্যের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এক অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলায় এই জাহাজের বহু সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে। এই অদৃশ্য শত্রু হলো স্কার্ভি নামে একপ্রকার রোগ। কেউ জানতো না, কেমন করে এই রোগের প্রতিকার করা যায়।

31 বছর বয়স্ক স্কচ্ মেডিকেল অফিসার ডাঃ জেমস লিণ্ড স্কার্ভি রোগ প্রতিকারের উপায় বের করেন। সমুদ্রযাত্রার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করেন যে, নাবিকেরা অনেকেই খুব দুর্বল বোধ করছে, কেউ কেউ মারা যাচ্ছে।

ডাঃ লিণ্ড এর আগে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভূমধ্যসাগরে অনেকবার পাড়ি দিয়েছেন এবং দেখেছেন স্কার্ভিতে আক্রান্ত হয়ে নাবিকেরা কিরূপ অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। অতি প্রাচীন কালেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এমন কি, বাইবেলে দেখা যায় যে, জব তার খাদ্যসামগ্রী ও মেষপাল সবই হারায়। তারপরে তার অসুখ করে, যার ফলে তার সারা গায়ে ঘা হয় এবং শরীরটা বেঁকে যায় কোটের বাঁকা কলারটার মত, চামড়া কালো হয়ে যায় এবং শরীরের হাড়গুলিতে প্রচণ্ড জ্বালাবোধ করতে থাকে। বাইবেলের এই

কাহিনী পড়ে ডাঃ লিণ্ড অনুমান করেন যে জবের স্কার্ভিই হয়েছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর ডাঃ লিণ্ড সিদ্ধান্ত করেন—টাট্‌কা খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সঙ্গে এর একটা যোগাযোগ রয়েছে।

খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতকে গ্রীক বৈজ্ঞানিক হিপোক্রেটিসই প্রথম স্কার্ভি রোগ নির্ণয় করেন। ইতিহাসের পুরনো পাতা খুঁজতে খুঁজতে ডাঃ লিণ্ড আরও দেখলেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ভাস্কো-ডি-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ পরিক্রমা করে ভারতে আসেন এবং পুনরায় পর্তুগালে ফিরে যান, তখন তাঁর জাহাজের নাবিকদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্কার্ভি রোগে মারা যায়। আবার 1535 সালে ফরাসী নাবিক জ্যাক কার্তিয়ের সেণ্ট লরেন্স নদীতে দারুণ শীতের মধ্যে বহু দিন থাকতে বাধ্য হন এবং তাঁর জাহাজের নাবিকদের মধ্যে স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইউরোপীয় নাবিকদের রোগযন্ত্রণায় সহানুভূতি প্রকাশ করে সেখানকার আদিবাসীরা সবুজ গাছপালা শাকসজী সিদ্ধ করে ঐ নাবিকদের মধ্যে আহার্য হিসাবে বিতরণ করতে থাকেন। ফলে দেখা যায়, মাত্র 6 দিনের মধ্যে শতকরা 80% জন আরোগ্য লাভ করেন।

1564 সালে একটি ওলন্দাজ জাহাজ স্পেন থেকে দেশে ফেরবার পথে নাবিকেরা স্কার্ভি রোগের কবলে পড়ে। সৌভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা স্পেন থেকে প্রচুর টাট্‌কা কমলালেবু ও পাতিলেবু সংগ্রহ করেছিল একজন ওলন্দাজ ব্যবসায়ীর সওদা হিসাবে। কয়েক জন মৃত্যুপথ যাত্রী নাবিক ক্যাপ্টেনের কাছে কয়েকটি কমলা ও পাতিলেবুর রস পান করবার বাসনা প্রকাশ করে। ক্যাপ্টেন তাদের তা দেন। অবাক কাণ্ড—দেখা যায় যে, লেবুর রস পান করবার পর স্কার্ভি রোগাক্রান্ত নাবিকেরা দ্রুত আরোগ্যের পথে যেতে থাকে।

1747 সালের 20শে মে ডাঃ লিণ্ড বারো জন স্কার্ভি রোগাক্রান্ত নাবিককে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন। দু-জন দু-জন করে বারো জনকে ছয়টা দলে ভাগ করেন। প্রথম দলের দু-জনকে ডাঃ লিণ্ড প্রতি দিনের খাদ্য ও পানীয় ছাড়া দু-কাপ করে আপেলের রস দিতে থাকেন। দ্বিতীয় দলের দু-জনকে দিনে তিনবার করে দু-চামচ ভিনিগার দেওয়া হয়, আরেকটি দলের দু-জনকে দেওয়া হয় Elixir vitriol নামে একটি ওষুধ, যাতে থাকে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল, যেটা আদা ও বড় এলাচের গন্ধে ভরপুর। আরেক দলের দু-জনকে রসুন, সরষে ও একটি বিশেষ জাতের গুল্ম শুকিয়ে গুঁড়া করে ওষুধের মত খাওয়ানো হতো। পঞ্চম দলকে দেওয়া হলো আধ বোতল করে সমুদ্রের লবণাক্ত জল এবং শেষের দলকে দেওয়া হলো দুটি করে কমলালেবু ও একটা করে পাতিলেবু। সবাইকে ছয় দিনের জন্যে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হয়। দেখা গেল, যারা কমলা ও পাতিলেবু খেয়েছিল, তারাই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ডাঃ লিণ্ড ফিরে এসে স্বার্ভি রোগ সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করেন। তিনি সেই থেকে প্রতিবার সমুদ্রযাত্রার সময় বেশ কিছু কমলা ও পাতিলেবু সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক 1768 সালে তাঁর পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় প্রচুর পরিমাণে কমলা ও পাতিলেবু সঙ্গে নেন এবং ফিরে আসা অবধি তার কোন নাবিকই অসুস্থ হয়ে পড়েন নি। এর জন্যে প্রত্যাবর্তনের পর রয়েল সোসাইটি থেকে তাঁকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। কিন্তু স্বার্ভি রোগ প্রতিরোধের আসল নায়ক ডাঃ লিণ্ড কোন স্বীকৃতিই পেলেন না।

1795 সালে ডাঃ লিণ্ডের মৃত্যুর এক বছর পরে বৃটিশ সরকার প্রত্যেক জাহাজেই নাবিকদের জন্যে প্রচুর পরিমাণে পাতি লেবু ও কমলালেবু মজুত রাখবার নির্দেশ জারি করে নাবিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করেন। 1912 সালে একজন পোলিশ রসায়নবিদ লণ্ডনে ডাঃ লিণ্ডের অনুসন্ধানকে কাজে লাগিয়ে ভিটামিন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তারপর আরও দুই শতক বাদে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক সিট্‌সবার্গ লেবুর রস থেকে ভিটামিন-সি আবিষ্কার করেন। প্রতিদিন এক হাজার থেকে দেড় হাজার আন্তর্জাতিক ইউনিট বা 50-75 মিলিগ্র্যাম অ্যাস্করবিক অ্যাসিড প্রত্যেকেরই অবশ্য গ্রহণীয়। এই অ্যাস্করবিক অ্যাসিডই হলো ভিটামিন-সি।

এতক্ষণে এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে, ভিটামিন-সি-এর অভাবজনিত রোগ হলো স্বার্ভি। আর তার লক্ষণগুলি হলো দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, চামড়া, পেশী কিংবা অস্থি-র বহিরাবরণের নীচে কিংবা বৃক বা অন্ত্রের মধ্যে রক্তপাত ইত্যাদি।

কমলা লেবু পাতিলেবু, সরবতী লেবু, বাতাবী লেবু, মুসাম্বি, টোম্যাটো, আমলকি, প্রায় সব রকম তাজা ফল, শিকড়জাত তরকারি ও সব্জিতে ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। গরুর দুধে ভিটামিন-সি থাকে কম। তার উপরে পাস্তুরীকরণ পদ্ধতির ফলে দুধের সমস্ত ভিটামিন-সি-টুকুই নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্যে মাতৃস্তন্যপায়ীদের মধ্যে স্বার্ভির প্রকোপ খুবই কম; কারণ দুধের ভিটামিন-সি সবটাই তারা পায়।

শ্রীআরতি নন্দী

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1.

বৈশাখ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
পৌষ	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি
	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম
জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, মাঘ	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল
ফাল্গুন	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ
কার্তিক	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ
আষাঢ়, চৈত্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র
1379						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31	32					

[1379 বাংলা সালের একটি ক্যালেণ্ডার উপরে দেওয়া হয়েছে। এর ছকটি সাজানো হয়েছে এইভাবে :—প্রথমতঃ 1973 খৃষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডারে যে ভাবে 'রবি', 'সোম' প্রভৃতি বারগুলির বিন্যাস আছে, সেইভাবে এখানেও লেখা হলো। তারপর প্রথম সারির বাঁ দিকে 'বৈশাখ' লেখা হয়েছে। পয়লা বৈশাখ যেহেতু শুক্রবার, সেজন্যে প্রথম সারির যে ঘরে 'শুক্র' আছে, সেই ষষ্ঠ ঘরে বারগুলির তলায় '1' বসানো হলো। এবার '1'-এর পর '2', '3' ..'32' পরপর বসিয়ে দেওয়া গেল। এখন বাকী রইল 'জ্যৈষ্ঠ', 'আষাঢ়' প্রভৃতি মাসগুলি লেখা। বৈশাখ মাসের দিন-সংখ্যা 31—সুতরাং পয়লা বৈশাখ ও পয়লা জ্যৈষ্ঠের মধ্যে 31 দিন অর্থাৎ 4 সপ্তাহ 3 দিনের তফাৎ। পয়লা বৈশাখ শুক্রবার হওয়ায় পয়লা জ্যৈষ্ঠের বার 3 দিন এগিয়ে থাকবে, অর্থাৎ পয়লা জ্যৈষ্ঠ হলো সোমবার। যে ঘরে '1' বসানো হয়েছে, সেই ষষ্ঠ ঘরের চতুর্থ সারিতে 'সোম' আছে। সেজন্যে ঐ চতুর্থ সারির বাঁ দিকে 'জ্যৈষ্ঠ'

লেখা হলো। পয়লা জ্যৈষ্ঠ ও পয়লা আষাঢ়ের মধ্যে তফাৎ 31 দিনের বা 4 সপ্তাহ 3 দিনের। পয়লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার হওয়ায় পয়লা আষাঢ় হবে বৃহস্পতিবার। ৪র্থ স্তম্ভের সপ্তম সারিতে 'বৃহ' আছে। সুতরাং সপ্তম সারির বাঁ দিকে 'আষাঢ়' লেখা হলো। এইভাবে পয়লা শ্রাবণ, পয়লা ভাদ্র প্রভৃতির বার স্থির করে নিয়ে '1'-এর স্তম্ভ অর্থাৎ ৪র্থ স্তম্ভে বারগুলির অবস্থান অনুযায়ী 'শ্রাবণ', 'ভাদ্র' ইত্যাদি যথাযথ সারির বাঁ দিকে লিখে দিলে ক্যালেণ্ডার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হলো।

বার, দিন ও মাসকে অন্যভাবে সাজিয়েও এইরকম ক্যালেণ্ডার তৈরি করা যায়। তবে সাধারণ প্রথা অনুযায়ী যদি বারগুলির মধ্যে 'রবি'কে এবং মাসগুলির মধ্যে 'বৈশাখ'কে প্রথমে বসানো যায়, তাহলে প্রদত্ত ক্যালেণ্ডারটিই হবে ঈপ্সিত ক্যালেণ্ডার।

তোমরা চেষ্টা করে দেখো তো। 1894 শকাব্দের ক্যালেণ্ডার তৈরি করতে পারো কি না।]

2. (ক) শুক্রবার

[1নং প্রশ্নে প্রদত্ত 1973 খৃষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডারে দেখা যাচ্ছে, ঐ খৃষ্টাব্দের 15ই অগাষ্ট হচ্ছে বুধবার। এখন সাধারণতঃ বছরে 365 দিন বা 52 সপ্তাহ 1 দিন থাকে, লীপ-ইয়ারে থাকে 52 সপ্তাহ 2 দিন। 1947 ও 1973 খৃষ্টাব্দের মধ্যে 7টি লীপ-ইয়ার ও 19টি সাধারণ বছর রয়েছে। সুতরাং বারের হিসাবে 1973 খৃষ্টাব্দের 15ই অগাষ্টের তুলনায় 1947 খৃষ্টাব্দের 15ই অগাষ্ট $7 \times 2 + 19 \times 1 = 33$ দিন বা 4 সপ্তাহ 5 দিন পিছিয়ে ছিল। 15ই অগাষ্ট, 1973 যেহেতু বুধবার, 1947 খৃষ্টাব্দের 15ই অগাষ্টের বার ছিল 5 দিন পিছিয়ে অর্থাৎ শুক্রবার।]

(খ) বৃহস্পতিবার

(গ) সোমবার

(ঘ) বৃহস্পতিবার

[(ক)-এর মত একই পদ্ধতিতে (খ), (গ) ও (ঘ)-এর ক্ষেত্রে বার নির্ণয় করা যায়।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1.: দেহের মেদবৃদ্ধির কারণ কি? তার প্রতিকার সম্পর্কে কিছু বলুন।

কবিতা চক্রবর্তী, বহরমপুর।

উত্তর 1.: শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে মেদবৃদ্ধি হয়। এছাড়া কম শারীরিক পরিশ্রম, আলস্য, দিবানিদ্রা, শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির অস্বাভাবিক অবস্থা মেদবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় ঘি, চিনি, শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রভৃতির পরিমাণ বেশী থাকলে শরীরের মধ্যে তা স্বাভাবিকভাবে বর্জিত হয় না। ফলে এজাতীয় খাদ্য দেহকে মেদবহুল করে তোলে। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ক্ষুধাবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন কারণে হাইপোথ্যালামাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে অত্যধিক ক্ষুধার উদ্রেক হয়, যা মেদবৃদ্ধির কারণ হয়ে পড়ে। এছাড়াও থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ হ্রাস পেলে শরীরকে

মেদবহুল করে তোলে। কেননা এই হ্রাসে দেহের মধ্যেকার দহনক্রিয়া হ্রাস পায়, ফলে খাদ্য বেশী হয়ে গিয়ে শরীরে জমে যায়, যা মেদের সৃষ্টি করে। মানসিক কারণেও মেদবৃদ্ধি হয়ে থাকে। মেদবহুল শরীরে হৃৎপিণ্ড, অগ্ন্যাশয়, বৃক, হার্নিয়া থ্রম্বোএমবলিজম প্রভৃতি রোগের ক্রত প্রকাশ পায়।

মেদ কমাবার জন্যে বাজারে কিছু কিছু ওষুধের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তা খুবই অস্থায়ী। এ সমস্ত ওষুধের মূলে আছে দেহের দহনকার্য বাড়িয়ে দেওয়া, যার ফলে মেদ হ্রাস পায়। কিন্তু এ সব ওষুধ ব্যবহারে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, ধমনীর গতিবৃদ্ধি, জ্বর ইত্যাদি বিপত্তির প্রকাশ পায়। শারীরিক পরিশ্রম বৃদ্ধি, ব্যায়াম, নিয়মিত সাঁতার, অঙ্গ-মর্দন, প্রভৃতির মাধ্যমে দেহের মেদ অপসারণ করা সম্ভব। কেননা এ সবের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি দেহের সঞ্চিত মেদই সরবরাহ করে থাকে।

মেদ অপসারণের জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য হ্রাস করা। তাছাড়া খাদ্যতালিকায় প্রোটিনবহুল খাদ্যদ্রব্যই প্রধান হওয়া প্রয়োজন। ঘি, মিষ্টান্ন, মাখন, শর্করাজাতীয় খাদ্য ইত্যাদি যত কম গ্রহণ করা যায়, ততই ভাল।

শরীরের মধ্যে খাদ্য জীর্ণ হওয়ার সময় যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, তা দিয়েই খাদ্যকে পরিমাপ করা হয়। এই উত্তাপ থেকেই শরীর শক্তি পায়। কাজেই মেদবহুল ব্যক্তির খাদ্যে উত্তাপের পরিমাণ যাতে কম থাকে, তার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন তবে এই খাদ্যের পরিমাণ দৈনন্দিন পরিশ্রমের অনুপাতেই নির্ধারিত হবে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

অ্যাপোলো-17-এর চন্দ্রাভিযান

গত 7ই ডিসেম্বর ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে অ্যাপোলো-17 মহাকাশযান চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেছিল। এবারের অভিযানেই প্রথম একজন পেশাদার বিজ্ঞানী যাত্রী ছিলেন 37 বছর বয়স্ক হ্যারিসন এইচ. শ্মিট। তিনি ভূতত্ত্বে পি-এইচ. ডি। তিনি চন্দ্রাবতরণের যানটি (লুনার মডিউল) চালিয়ে-ছিলেন।

অভিযাত্রীদের নেতা অর্থাৎ অ্যাপোলো-17-এর পরিচালক ছিলেন ইউজিন সারনান (বয়স 40)। সারনান এবং শ্মিট চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। অভি-যানের তৃতীয় যাত্রী ছিলেন রোনাল্ড ই ইভান্স (বয়স 37)। তিনি মূল যানে করে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন।

অ্যাপোলো-17 অভিযানে এই তৃতীয়বার উন্নত ধরণের মহাকাশযান ব্যবহৃত হয়। এই অভিযানে ব্যাটারীচালিত চাঁদের গাড়ী (লুনার রোভিং ভেহিক্‌ল্) বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

অ্যাপোলো-17 অভিযানে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যন্ত্রগুলির একটি হলো লুনার সারফেস গ্র্যাভিমিটার। এটির কাজ

ছিল চন্দ্রের উপর পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মহাকর্ষ প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা। অপর একটি যন্ত্র চন্দ্রের অভ্যন্তর থেকে নির্গত অতি অল্প পরিমাণ গ্যাসের অণুগুলিকে বিশ্লেষণ করেছিল। তৃতীয় একটি যন্ত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাকাশ থেকে কি পরিমাণ ধূলি এসে জমবে, তার পরিমাপ করে এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে উল্কার সংঘাতে উৎক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ডের পতনের ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠে ভূমি অবক্ষয়ের হিসাব নেয় এবং চতুর্থ যন্ত্রটি চন্দ্রপৃষ্ঠে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কম্পনের হিসাব নেয়, যার সাহায্যে চাঁদের ভৌত উপকরণগুলির বিস্ফোরণ সম্ভব হবে। অ্যাপোলো-17 এছাড়া অপর যে সকল যন্ত্র নিয়ে গিয়েছিল, তার একটি হলো 'চন্দ্রপৃষ্ঠের বৈদ্যুতিক গুণাগুণ' সম্পর্কিত যন্ত্র। এর সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের তলাকার স্তর-বিন্যাস নির্ণয় করা হয়। চন্দ্রে জলের অস্তিত্ব আছে কি না, তা নির্ণয়ের পক্ষে এটি সহায়ক। অপর একটি যন্ত্র হলো 'লুনার গ্র্যাভিটি ট্রাভার্স'। যন্ত্রটি চাঁদের গাড়িতে বসানো হয় এবং মহাকাশচারীরা যে সব অঞ্চলে অভিযান চালান, সেখানকার অভিকর্ষের হদিশ পাওয়া যায় এর সাহায্যে। আর একটি যন্ত্র 'লুনার নিউট্রন প্রোব' চাঁদে ভূমির অবক্ষয় অথবা তার বৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।

12ই ডিসেম্বর 1972 ভারতীয় সময় রাত্রি 1-25 মিনিটে সারনান এবং স্মিট চান্দ্রযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে টরাস লিট্রো এলাকায় অবতরণ করেন। 15ই ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রি 4-26 মিনিটে তাঁরা চান্দ্রযানে চড়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণরত মূল যান অ্যাপোলো-17তে আসেন। 20শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রি 12-54 মিনিটে তাঁরা নিরাপদে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করেন। অ্যাপোলো-17 অভিযানের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে অ্যাপোলো প্রকল্পে কোন মনুষ্যবাহী মহাকাশযান চাঁদে আর পাঠানো হবে না।

প্রতিবাদ

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পি. দত্ত ও এস. দত্ত প্রণীত 'গণিতের নব রূপায়ণ' (প্রকাশিকা: সুদীপা দত্ত, ভূতপূর্ব রাজবন্দী গ্রন্থাগার, 2নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-12) পুস্তকটির লেখকদ্বয়ের একান্ত অনুরোধে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কর্মসচিব হিসাবে আমি পুস্তকটির মুখবন্ধরূপে প্রকাশের জন্য প্রায় দুই মাস পূর্বে ঐ পুস্তক সম্পর্কে আমাদের অভিমত লিখিয়া দিয়াছিলাম। আমাদের অভিমতকে সুষম ও নিরপেক্ষ রাখিবার উদ্দেশ্যে উহাতে একদিকে যেমন পুস্তকখানির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণীয়তার উল্লেখ ছিল, অন্যদিকে তেমন উহার কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে মন্তব্য করা হইয়াছিল। পুস্তকটি প্রকাশের পর আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের বক্তব্যের মধ্যে সমালোচনামূলক অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়া এবং অবশিষ্ট অংশকেও স্থানে স্থানে বিকৃত করিয়া সেই খর্ব ও বিকৃত সত্যকে উক্তি হিসাবে পুস্তকটির মুখবন্ধরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এইরূপ নিন্দার্হ কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো আমি আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

জয়ন্ত বসু

তাং 4. 1. 73 কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষড়বিংশতিতম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, 1973 | দ্বিতীয় সংখ্যা

অধ্যাপক নির্মলকুমার স্মরণে

আজীবন জ্ঞানতপস্বী, নৃ-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। গত 15ই অক্টোবর '72 এই প্রোজ্জ্বল দীপশিখা চিরতরে নির্বাপিত হইয়াছে। ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল, মনীষায় ভাস্বর অধ্যাপক নির্মলকুমার ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। নির্মলকুমার ছিলেন গান্ধী-বাদের একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতা। তাঁহার পরলোকগমনে ভারত এক মহান সমাজ-সেবককে হারাইল আর আমরা হারাইলাম আমাদের একজন পরম বান্ধবকে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহিত অধ্যাপক নির্মলকুমারের ছিল সুগভীর আত্মিক সংযোগ। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য ছিলেন। বিজ্ঞান পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠান তাঁহারই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহী ব্যক্তিদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ বলিয়া বিবেচিত হয়।

অধ্যাপক নির্মলকুমার ছিলেন একাধারে সমাজ-সেবক, বিজ্ঞান-সাধক, সুলেখক এবং সর্বোপরি অকৃত্রিম মানবপ্রেমিক। যাহারাই তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার বিনয়, সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। দুর্বিসহ রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্তব্যভার সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

নির্মলকুমারের জীবনে ঘটিয়াছিল জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব সমন্বয়। বিজ্ঞানের নীরস তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণে আজীবন ব্যাপৃত থাকিলেও অসহায় মানুষের করুণ ক্রন্দন তিনি কখনও উপেক্ষা করেন নাই। এই সুগভীর মানবপ্রেমের আকর্ষণেই তিনি একদা মহাত্মা গান্ধীর একান্ত সচিবরূপে দাঙ্গাপীড়িত দুর্গত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

নির্মলকুমারের বহুমুখী প্রতিভা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বর্তমান সংখ্যাটি আমরা এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও মানবদরদীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গ করিলাম।

নির্মল

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

নির্মলকে বরাবর এক ভাবেই দেখে এসেছি—খদ্দর, মজবুত দেহ—দৃঢ় প্রত্যয়শীল কথাবার্তা আর স্নিগ্ধ কমনীয় হাসি। অসুখের পর যেদিন প্রথম নার্সিং হোমে দেখতে যাই—কোন বিশেষ মানসিক পরিবর্তন দেখি নি—কথাবার্তা, বসা, হাসি, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তরে শারীরিক দুর্বলতার কোন চিহ্ন দেখা যায় নি। কিন্তু দ্বিতীয় বার নার্সিং হোমে যাবার পর শরীরের অবস্থা দেখে মনে হলো আর বুঝি বেশী দিন ধরে রাখা যাবে না—ব্যাধাতুর, যন্ত্রণাকাতর মুখ কিন্তু তার মধ্যেও যেন সে নির্লিপ্ত—নিজেকে হারিয়ে ফেলে নি। বরাবরই নির্মল একভাবে কাটিয়ে গেল—কাজ তো কম করে নি—তার কত রকমের কাজ। 'Man in India'-র সুদক্ষ সম্পাদক—তার সঙ্গে ভারতবর্ষের দেব-দেউলের গবেষণা, কোণারক মন্দিরের অপরূপ ভাস্কর্যের কাহিনী সাধারণের কাছে সহজভাবে তুলে ধরা, গান্ধীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা, আদিবাসীদের জীবনধারার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ণধাররূপে ভারত-কোষ যাতে নিখুঁত হয়, তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম—নির্মল এই সব কাজগুলি একান্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতা সহকারে করেছে; এছাড়া Anthropology-র অধ্যাপনা, Asiatic Society-র সভাপতির কাজ, বোলপুরে খাদি আশ্রম করা এবং ভারত সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কেবলটা গান্ধীজীর একান্ত সচিব, University-র অধ্যাপক নির্মল এই কাজগুলি কি করে করতে পেরেছিল।

সব কাজেই গভীর নিষ্ঠা অথচ নির্লিপ্ততা তার জীবনের বৈশিষ্ট্য। গান্ধীজীকে সে গ্রহণ করেছিল তাঁর অহিংস-পথের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্যে এবং এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তির উপর; তাই অন্ধ-বিশ্বাসী সহকর্মীদের সঙ্গে নির্মলের মতের মিল হতো না। নির্মল মহাত্মা গান্ধীর অনুরাগী ছিল, কিন্তু গান্ধীজীর সব কথা কখনও গ্রহণ করে নি, তৎসত্ত্বেও কোন দিন তাঁর স্নেহলাভে বঞ্চিত হয় নি। গান্ধীজী নির্মলকে ভালভাবেই জানতেন। গান্ধীজীকে নির্মল বলে রেখেছিল, যে কয় দিন সে গান্ধীজীর সঙ্গে থেকে কাজ করবে তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সব ব্যাপারে নিজের জীবনে গান্ধীজীকে গ্রহণ করবে। নির্মলের এই পরিষ্কার কথায় গান্ধীজী কোন দিন অসন্তুষ্ট হন নি এবং দু'জনের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ছাত্রদের সঙ্গে নির্মলের সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। বাইরে থেকে নির্মলকে দেখে অনেকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হতো না যে, ভিতরে একটা স্নেহকোমল মন লুকিয়ে আছে। কিন্তু যে সব ছাত্র তার সঙ্গে গবেষণা করেছে, তারা নির্মলকে কোন দিনই ভুলতে পারবে না, কারণ নির্মল ছিল একাধারে শিক্ষক ও একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুধু যে নির্মলের বিষয় নিয়ে তার কাছে যারা পড়াশুনা করেছে তাদের মধ্যেই যে স্নেহ সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়—যে কোন বিষয়ের ছাত্র সব সময় তার কাছে সমান সাহায্য পেয়েছে আর এই সাহায্য এমনরূপে দেওয়া দিত, যাতে কোন দিন

সাহায্যকারীর অকৃত্রিম স্নেহ সম্বন্ধে কারুর মনে সন্দেহ হবার অবকাশ হতো না।

রাজনীতিতে তার মনোভাব ছিল অনন্য-সাধারণ। যে কোন মত বা পথের রাজনীতি হোক না কেন, নির্মল সকলেরই বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করতো। নিজের মতবাদে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও অপরের মত ও পথের পিছনে কি যুক্তি আছে, তা সে বোঝবার চেষ্টা করতো। তার সঙ্গে তর্ক করে কেউ কোন দিন মনে করে নি যে, তার গোঁড়ামি তাকে অপরের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে বাধা দিচ্ছে।

আমি সাহিত্যচর্চা করি না, কিন্তু যেটুকু বুঝি তাতে বলতে পারি যে, নির্মল যে কখানি বই লিখে গেছে, সাহিত্য-বিচারে তার দামও কম নয়। সাহিত্যিকদের মধ্যেও তার এমন একটা স্থান ছিল, যা অনেকের পক্ষে কাম্য। ছোট এবং বড়, খ্যাত এবং অখ্যাত বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে তার এমন সম্পর্ক ছিল যে, মনে হতো যেন পরস্পর পরমাত্মীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এক সময় বাঙালীর গৌরবের বিষয় ছিল, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক কিছুকাল থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যেন অনাদৃত—অবহেলিত। নির্মল অন্তরঙ্গ থেকে এবং প্রকাশ্যভাবে যুক্ত হয়ে সাহিত্য পরিষদের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে এবং জীবনের শেষ দিনেও সে ভাবতো যে, ভারতকোষের পঞ্চম খণ্ড কবে কত তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে।

বিত্তবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সাধারণভাবেই নির্মল প্রাত্যহিক জীবনযাপন করতো এবং এতই সাধারণভাবে যে, অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতো। রাঁচিতে চাকরি করতে করতে তিন মাইল দূরে নদীতে হেঁটে গিয়ে মুখ ধুয়ে আবার তিন মাইল হেঁটে ফিরে আসা অথবা কলকাতা সহরে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে কেউ ওঠবার আগে টুং টুং করে সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ীর লোককে সচকিত করে দিয়ে চা খাওয়া বা হঠাৎ হাজির হয়ে একটা বই অথবা ত্রিশ বছরের আগেকার খবরের কাগজের কাটিং বের করে বলা "তুমি তো এটাই খুঁজছিলে, আমি পেয়ে গেলুম তাই এনেছি।" যারা তার ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের কাছে এগুলো খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যারা ভাল করে জানতো না তাকে, তারা অবাক হয়ে যেত।

রোগ ধরা পড়বার কিছু দিন আগে দক্ষিণ কলকাতার এক সভা থেকে ট্রাম-বাস বন্ধ থাকায় হেঁটেই বাড়ী এসেছিল। কি উড়িষ্যার গভীর নির্জন জঙ্গলে ঘোরা কিংবা মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের মধ্যে বাস করা অথবা রাজস্থানের অখ্যাত স্থানে ঘুরে বেড়ানো আবার আমেরিকায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করা বা অধ্যাপক হলডেনের সঙ্গে গভীরভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা অথবা গ্রামের কর্মীর সঙ্গে আলাপ করা—এ সবই নির্মলের কাছে সমান ছিল।

নির্মল চলে যাওয়ায় ভারতবর্ষ এক মহান সন্তান হারিয়েছে। আর আমরা যারা তার ঘনিষ্ঠ ছিলাম, কি হারিয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

নির্মলকুমার বসু

শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজে এমনই একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যা সহজে পূর্ণ হবার নয়।

নির্মলবাবু বিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন। বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন গান্ধীবাদী। গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাঁর গভীর, ব্যাপক ও বিশদ আলোচনার জলন্ত সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর 'Selections from Gandhi' নামক অমূল্য পুস্তকে। এই বইখানি সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটনার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

1945 সনের 30শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধী কাঁথী আসেন এবং তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। তৎপূর্বে 1লা ডিসেম্বর থেকে গান্ধীজী শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানের আশ্রমে ছিলেন। 30শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে মহাত্মাজী যখন কাঁথীতে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট আবাসের সম্মুখে এসে পৌঁছুলেন, তখন জীপ গাড়ীতে তিনি একা (অবশ্য ড্রাইভার পার্শ্বে ছিল)। তাঁকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্যে ঘটনাক্রমে আমিও সেই আবাস-স্থলের সম্মুখে তখন একা। লোকসংঘট্ট এড়াবার জন্যে গান্ধীজীর গাড়ীকে চিহ্নিত পথ ত্যাগ করে অন্য পথে আনা হয়েছিল। আমি তখন একান্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সসম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে সেই মহান অতিথিকে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট ঘরটিতে আনলুম। তাঁর জন্যে ঘরের মেঝের উপর একখানি খাদির আসন পাতা ছিল—সম্মুখে একটি জলচৌকি—তার দু-ধারে দুটি মোমের বাতি জ্বলছে। চৌকির উপর আমি আমাদের বন্ধু নির্মল বসুর 'Selections from Gandhi' বইখানি রেখে দিয়েছিলুম। তখন বইখানি ছিল খুব ছোট সংস্করণের—পকেটে রাখা যায়। সেদিন মহাত্মাজীর মৌন দিবস ছিল। পথশ্রান্ত তাঁর ক্লান্ত মুখমণ্ডলে আনন্দ ও প্রসন্নতার কি দিব্য দীপ্তি! খুশী হয়ে তিনি সেই ছোট বইখানি উল্টে-পাল্টে দেখলেন। এই 'Selections from Gandhi' বিভিন্ন সংস্করণে ক্রমে ক্রমে আকারে বর্ধিত হয়ে বর্তমানে একখানি প্রামাণিক বড় বই হয়েছে—'নবজীবন' প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত। বইখানি গান্ধী-চিন্তার অপূর্ব দিগ্‌দর্শন। এই বহু মূল্যবান বইখানি সঙ্কলনের জন্যে নির্মলবাবু গান্ধী-চিন্তা-সাগরে ডুব দিয়ে রত্নরাজি উদ্ধার করে বইখানির বিভিন্ন অঙ্গ সাজিয়ে দিয়েছেন। এজন্যে তাঁকে দীর্ঘ-কালব্যাপী যে গভীর অধ্যয়ন ও কঠোর শ্রম করতে হয়েছে, তার তুলনা বিরল। বইখানি নির্মলবাবুর গান্ধী-অনুরাগের সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত পরিচয়। 'Selections from Gandhi' পুস্তক-খানির বর্ধিত বৃহৎ সংস্করণের ভূমিকা-স্বরূপ গান্ধীজী লিখে দিয়েছেন—

"The following pages represent a labour of love,...The selections made by the author show the thoroughness with which he has gone into his subjects. Those who are interested in my writings will not fail to appreciate the author's labours."

1946-47 সনে নোয়াখালিতে হিন্দুনিধনের বীভৎস দাঙ্গার পর গান্ধীজী যখন শান্তি ও

বিশ্বাস পুনঃস্থাপনের আশায় সেই সময়ে নিজের মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর ঐতিহাসিক পদযাত্রা করেছিলেন তখন নির্মলবাবু ছিলেন গান্ধীজীর একান্ত সচিব। নোয়াখালি পরিক্রমায় নির্মলবাবু সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত্রি সকল সময় গান্ধীজীর নিকটে থেকে তাঁর স্থানীয় ও মহাভারতীয় সকল কার্য সম্পাদনে সহায়তা করেছেন। এই সব সান্নিধ্যহেতু তিনি গান্ধীজীর আরও গভীর ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ে সমৃদ্ধ হন। এই কারণে তাঁর 'গান্ধীচরিত' নামক পুস্তকখানিতে আমরা গান্ধীজীর তৎকালীন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি অনেক বিষয় জানতে পারি।

ছাত্রজীবনে নির্মলবাবু সমুজ্জ্বল মেধার পরিচয় দেন। 1920 সনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। ছাত্র-আন্দোলনের প্রবলতার সময় তিনি কলেজের বাইরে ছিলেন। আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হলে তিনি সুবিখ্যাত আশু মুখুজ্যে মহাশয়ের ঐকান্তিক আহ্বান ও প্রেরণায় নৃতত্ত্ব বা Anthropology-তে প্রথম শ্রেণীর সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এম. এস-সি. পাশ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, মানবিক ভূগোল (Human Geography) ও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনা করেন।

কিন্তু গান্ধী, গান্ধীবাদ ও গান্ধী আন্দোলনই ছিল তাঁর প্রাণের প্রাণ। এই সকল আলোচনায়ও তাঁর দৃষ্টি ছিল বৈজ্ঞানিক। গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত থাকলেও নির্মলবাবু অসহযোগ আন্দোলনের সকল পর্যায়ে সাড়া দেন। 1930-32-এর লবণ সত্যাগ্রহে এবং 1942 সনের 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কারাবরণ করেন। কারাগারের অভ্যন্তরে তিনি মেথর-হরিজন কয়েদীগণের সঙ্গে নিয়মিত মেলামেশা করে তাদের জীবনযাত্রা ও জীবনসমস্যার সম্যক পরিচয় সংগ্রহ করেন। আবার নানা দলের ও নানা মতের রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলতো। বিশেষ যোগ্যতা ও পারদর্শিতা সহকারে তিনি গান্ধীবাদের পক্ষে তাঁর মত সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন। দেখা গেছে, কারাগারের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা সভা-সমিতিতে অনুরূপ তর্কপ্রসঙ্গে গান্ধীবাদের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি জাগতিক সমস্যার সমাধানে কমিউনিজম প্রভৃতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করতেন। তর্কশক্তি তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ, তীব্র—এই সকল ব্যাপারে তাঁর একটা যোদ্ধার ভাব প্রকাশ পেতো। জেলের অভ্যন্তরে তিনি অনেক সময় তরুণদের নিয়ে আলোচনা-সভা বা ক্লাস করতেন। ক্লাসে গান্ধীবাদ, রাজনীতি, সমাজনীতি কখনও বা প্রত্নতত্ত্ব ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়। জেলের ভিতর আর একটি কার্য তিনি অবশ্য কর্তব্যহিসাবে সম্পন্ন করতেন। সেটি হলো নিয়মিত চরকা-কাটা। গান্ধীজীর গঠনকর্মের প্রতি তিনি অবহিত ছিলেন। বীরভূম জেলার বোলপুরে তাঁর একটি ছোট গঠন-কর্মকেন্দ্র ছিল। আবার টোটকা ঔষধাদি সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ ছিল। এর ফলাফল তিনি হাতে হাতে পরীক্ষা করতেন। তিনি খুব ভাল ফটোগ্রাফার ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তাঁর সম্মানের স্থান ছিল। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘকালব্যাপী। 1972-এর (ডিসেম্বর) পৌষে বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎসবে তাঁর সমাবর্তন ভাষণ পঠিত হয়েছিল—নির্মলবাবু তৎপূর্বে স্বর্গগত হয়েছেন।

নির্মলবাবু ভারত-সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগে পাঁচ বছর পরিচালক (Director) ছিলেন।

তৎপর আরও তিন বছর ঐ সরকারের অনুন্নত ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগে পরিচালকের কাজ করেন। এই সকল কাজ তিনি কঠোর নিষ্ঠা ও দক্ষতাসহকারে সম্পাদন করেন। বিভাগীয় কার্যোপলক্ষে তিনি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করেন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তাঁর খ্যাতি পৃথিবীর বহু দেশে ব্যাপ্ত হয়েছিল। আমেরিকার চিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, কলম্বিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি একাধিকবার সেখানে গিয়ে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, গান্ধীবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষেরও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ কার্য সম্পাদনের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হন।

নৃতত্ত্বের আলোচনা ও প্রসারের চেষ্টায় তিনি ভারতের, বিশেষভাবে উড়িষ্যার উপজাতিদের মধ্যে ভ্রমণ করেন। উড়িষ্যার পার্বত্য বন-অঞ্চলের জুং উপজাতি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা মাঝে মাঝে কৌতুকপ্রদ হতো। তিনি রহস্য করে বলতেন—জুংদের ঘরে প্রাচীনা ঠাকুমা পরিধান করতেন পাতায় গাঁথা কাপড়। নবীনা নাৎনীকে মোটা কার্পাস বস্ত্র অর্থাৎ গড়ে কাপড় পরিধান করতে দেখে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করে প্রাচীনা ঠাকুমা বলতেন—"তোরা সব একালের হতচ্ছাড়া বেহায়া।"

1950 সন থেকে তিনি 'Man in India' নামক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার জন্যে নিজে প্রবন্ধ লেখা এবং অপরকে দিয়ে লেখানো, প্রবন্ধাদি সংশোধন, নৃতত্ত্ববিষয়ক নানা পুস্তক সমালোচনা তিনি প্রায় একাকীই করতেন। পত্রিকার মুদ্রণ ব্যাপারে প্রুফ-সংশোধনের কাজও তিনি নিজেই করতেন। এই ব্যাপারে তাঁর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না।

তাঁর অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাঁরই নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে গবেষণা-কার্য সম্পন্ন করে নৃতত্ত্বে (Anthropology) ডক্টরেট পেয়েছিলেন। তিনি নিজে কিন্তু ডক্টর ছিলেন না।

ভারতীয় মন্দিরসমূহের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে নির্মল বসুর গভীর আলোচনা ও জ্ঞান ছিল। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি এই সকল বিষয়ে অবহিত হন এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে ভারতের নানা স্থান, নানা তীর্থ, নানা পর্বত-গুহাদি বিভিন্ন সময়ে পরিভ্রমণ করেন। বাংলার বহু গ্রামেও তিনি এই উপলক্ষে ভ্রমণ করেন। প্রথম বয়সেই তিনি উড়িষ্যার কোণারক মন্দির সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ উপাদেয় বই লেখেন। বইখানি বাংলা সাহিত্যে তখন অভিনব। তিনি জীবনে বহুবার কোণারক মন্দির দেখতে যান। একবার পুরী থেকে কোণারক প্রায় 22 মাইল পথ তিনি বন্ধু সমভিব্যাহারে হেঁটে যান। ঐ রাস্তা প্রায় সমুদ্রের নিকটবর্তী। পরিণত বয়সে 'কোণারকের মন্দির' বইখানি আরও বিশদ ও চিত্রসম্বলিত করে নূতন করে লেখবার আয়োজন তিনি করছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁকে টেনে নিলেন।

মন্দিরচিত্র প্রদর্শনের জন্যে তাঁর ম্যাজিক লণ্ঠন ছিল। চিত্রও ছিল বহু বিচিত্র ও বহু সংখ্যক। তাঁর ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের কৌতূহল মিটিয়ে তাদের মন হরণ করতো। মন্দিরের ভিত্তি থেকে আরম্ভ করে কটিদেশ, স্কন্ধদেশ, শিরোদেশ, আমলক ও কলসসহ তাদের চূড়া-শিখরাদি এবং নানা স্থানে খোদিত বিভিন্ন দেবমূর্তি এবং নানা জাতীয় নরনারীর মূর্তি তিনি এঁকে এঁকে দেখাতেন, বক্তৃতায় মন্দিরের খাপখোপ, নানা রকমের রেখা, কোণ, কার্নিশ ও তাদের স্থাপত্য-বিভাগের সামঞ্জস্যযুক্ত অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা তিনি সুমিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলতেন। উড়িষ্যার মন্দির সম্বন্ধে তাঁর কথা বিদ্বজ্জনসমাজে চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

1934 সালে বোম্বাই কংগ্রেস থেকে আমরা কয়েকজন বন্ধু অজন্তা-ইলোরা গুহা দেখতে গিয়েছিলাম। নির্মলবাবু ছিলেন আমাদের পুরোভাগে। যাত্রাপথে ঔরঙ্গাবাদ ধর্মশালায় যখন আমাদের রাত্রি শেষ হচ্ছে, তখন তিনি শান্তিভাবতায় সুন্দর একখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে আমরা বাসযোগে পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর দিয়ে অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রায় 70 মাইল দূরে বিশ্ববিখ্যাত অজন্তায় এলাম। কত দেখা হলো চোখ ভরে—প্রাণ ভরে. ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির সাগরসঙ্গমে সে কি পুণ্যস্নান, আনন্দময় অবগাহন! অন্য দিন ঔরঙ্গাবাদ থেকে 22 মাইল দূরবর্তী বিচিত্র ইলোরা গুহাবলি এবং পথে দেবগিরি দুর্গ দেখা হলো। এই সকল ব্যাপারে চিরকুমার সেই বন্ধুর আলাপ-আলোচনা ও সঙ্গ ছিল কত চমৎকার! বন্ধু চলে গেছেন। আজ কত কথাই মনে পড়ে! ওঁ শান্তি।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

[জন্ম : 22শে জানুয়ারী, 1901 মৃত্যু : 15ই অক্টোবর, 1972]

পূর্ণিমা সিংহ

পারিপার্শ্বিক মানবসমাজ যখন উদ্দেশ্যহীনতা, তামসিকতা, দুর্বলতা ও মানবতাবোধশূন্য অবস্থায় আচ্ছন্ন থাকে, তেমন অনুর্বর জমিতেও কখনও কখনও অলৌকিকভাবে এক-একটি মহামানব অকস্মাৎ মহীরুহের মত উদ্দীপনা ও সংসাহস নিয়ে মানবতাবোধ জাগ্রত করবার অবিচল উদ্দেশ্যে পারিপার্শ্বিকের দুর্বল আগাছাগুলির কাছে বিরাট আশার আশ্বাস নিয়ে উদিত হয়। আধুনিক ভারতের মেরুদণ্ডহীন অবশ সমাজে নির্মলকুমার বসু তেমনি একটি মহীরুহ।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে বিস্মিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছিলেন—"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন বলা কঠিন"—তা নির্মল বসু সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে প্রযোজ্য।

নির্মলবাবুর পোষাক-পরিচ্ছদ, স্বভাব, আচরণ সাধারণ ভারতবাসীর প্রকৃতিতে যেমন গভীর মমত্ববোধে সুদৃঢ়ভাবে স্থিত ছিল, তেমনি দেশ-বিদেশের যা কিছু ভারতের পক্ষে গ্রহণীয়, তার প্রতি তাঁর মন আগ্রহশীলভাবে উন্মুক্ত ছিল। তিনি ভারতীয় নানা ভাষা ও ইংরেজীতে সমান দক্ষতায় সাবলীলভাবে অপূর্ব বক্তৃতা ও গল্প করতেন। আমাদের বিদেশী অনুকরণপ্রিয়তা অথবা অন্ধ প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন বর্তমান সমাজে এমন ভারসাম্য বিরল। সারাজীবন স্বদেশে বাস করে প্রবীণ বয়সে স্বল্পকালের জন্য আমেরিকায় আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্দির-স্থাপত্য, পুরাতত্ত্ব, আদিবাসী সমস্যা, মানব-বিজ্ঞান, গান্ধীবাদ বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তীক্ষ্ণ-গতিতে বক্তৃতা দিয়ে গতিশীলতায় বিখ্যাত মার্কিনীদেরও চমৎকৃত করেছিলেন। এমন কি, তাঁর ইংরেজী বক্তৃতার সাবলীলতায় বিস্মিত হয়ে

তাঁর বক্তৃতাবলি বাচনভঙ্গীর একটা আদর্শ মান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে রেকর্ডে রক্ষিত হয়েছে। ও দেশের নানা বিষয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গেও সহজেই তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

তাঁর বিশেষ চর্চার বিষয় নৃতত্ত্বে তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান সম্বন্ধে বিচারের আমার অধিকার নেই। তাঁর বহু ছাত্র-ছাত্রীর কাছে সে বিষয়ে শুনেছি এবং সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের ও ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাই তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর দেবে। কিন্তু আমি দেখেছি, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে উদ্দীপিত করবার অসাধারণ প্রক্রিয়া; মানুষ হিসাবে তাঁর দরদী মনের অসংখ্য খুঁটি-নাটি প্রকাশ। দরিদ্র ছাত্র বা রোগপীড়িত মানুষের জন্যে প্রবীণ বয়সে অবলীলাক্রমে মাইলের পর মাইল সাইকেল চালিয়ে প্রয়োজনীয় বই বা ওষুধ পৌঁছে দিতে তিনি আনন্দ পেতেন। একদিকে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করতে, অন্য দিকে অসহায় মানুষের সাহায্য করতে তিনি সর্বদা এগিয়ে যেতেন। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অতি সহজ ভাষায় গল্প করে ছোট্ট শিশু থেকে সুদক্ষ পণ্ডিত পর্যন্ত যে কোন শ্রোতার দলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার অপরিসীম ক্ষমতা ও উৎসাহ দেখেছি। এমন দক্ষতার সঙ্গে আনন্দের পরিবেশে জ্ঞান বিতরণের ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর জ্ঞান আহরণের বিশিষ্ট নিজস্ব প্রক্রিয়া থেকে। তাঁর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র গতানুগতিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানাভাবে নানা অবস্থায় ভারতের সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তিনি বিতরণ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব-বিজ্ঞান শিক্ষা করবার বহু পূর্বে 1917 সালে 17 বছর বয়সে তিনি বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে জনসেবার কাজ করতে গিয়ে গ্রামের অসংখ্য পরিবারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করেন। 1921 সালে ফিজি-প্রত্যাগত ভারতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ করেন। এখানেও তিনি 450টি পরিবারের 1050 ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ ও ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করে রাখেন। ভারতীয় গ্রামীন সমাজের খুঁটিনাটি সামাজিক সংস্কার কি ভাবে পদে পদে পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে, তার বিবরণও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেন। 1922-এ প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতত্ত্বের মেধাবী ছাত্র নির্মল বসু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার তাগিদে সরকারী কলেজ ত্যাগ করেন। পরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের স্নাতকোত্তর বিভাগে যোগ দেন। 1930-36 সালে বোলপুরের কাছে একটি গ্রাম সংগঠনের কাজে বস্তীতে বাস করে দরিদ্র ভারতবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে আরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। পুরীর দরিদ্র চিত্রকর ও ভাস্কর শিল্পীদের সাহচর্যে থেকে তিনি ভারতীয় নিজস্ব ধারার শিল্পচর্চার মান উন্নত রাখবার উপযুক্ত পরিবেশের সমস্যা, শিল্পী-গোষ্ঠির সমাজ-জীবনের নানা সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁর প্রতি দিনের সংগৃহীত তথ্য ও চিন্তা পরিচ্ছন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ করবার অভ্যাস ছিল। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যের জন্যে নানা তথ্য, পত্র, পত্রিকা তাঁর হাতের গোড়ায় থাকতো। 1938 থেকে 1959 পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব ও ভূ-বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেন। 1959 থেকে 1964 পর্যন্ত তিনি ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার অধ্যক্ষ ছিলেন। 1967 সালে অধ্যাপক বসু উপজাতি ও তপশিলী সম্প্রদায়ের কমিশনার নিযুক্ত হন। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত অবস্থায় অন্তিম শয্যাতেও তিনি

একাধারে এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির কাজ ও Man in India পত্রিকার সম্পাদনার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। যা কিছু দেখেছেন ও বুঝেছেন, তা সকলকে জানাবার আগ্রহে তিনি সাত শতাধিক প্রবন্ধ ও সাইত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 1942-45 সালে কারাবাসের সময় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সঙ্কলনে প্রকাশিত তাঁর বিশেষ গবেষণামূলক গ্রন্থ 'হিন্দু সমাজের গড়ন' লেখেন।

পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও মানুষের সব কিছু থেকে আকুল আগ্রহে অবিচল নিষ্ঠায় তিনি অবিরাম নিজের মনের রসদ গ্রহণ করেছেন। 'নবীন ও প্রাচীন' এবং 'পরিব্রাজকের ডায়েরী'তে তাঁর বিভিন্ন রচনা এই রসগ্রহণ ক্ষমতার পরিচায়ক। এই সত্য ঘটনাভিত্তিক রচনাগুলি ছোট গল্পের নিদর্শন হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে উচ্চ স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীর তুলনায় এই অপূর্ব রচনাগুলিও অকিঞ্চিৎকর।

কোণারকের মন্দির আর হিমালয় ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। তাঁর কোণারক মন্দির সম্বন্ধে গবেষণার কাজে মন্দিরের প্রতিটি খুঁটিনাটি স্থাপত্যের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন আর শিল্পীমনের রসগ্রহণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সারা ভারতের মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ে তাঁর অনেক দিনের সংগৃহীত তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ অসমাপ্ত রইলো।

নির্মলবাবুর সঙ্গে যাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা জানেন বার বার পথে থেমে একটা চেনা ছোট গাছ বা লতা, পাথরের ভিতর বিভিন্ন স্তরের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, কোন ছোট পল্লীর পাড়ার ঘরের চেনা কোন মানুষকে আর একবার নিজে দেখে সঙ্গীদের দেখাবার আকুল তৃষ্ণা। নানা গোষ্ঠির আদিবাসী, চাষী, শিল্পী, কারিগর বন্ধুদের কাজ সঙ্গীদের দেখাবার অক্লান্ত আগ্রহ। সঙ্গে শিশু থাকলে তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেত। বারবার ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর আশা মেটে নি। বয়সের প্রবীণতা তাঁর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি। 72 বছরে তাই তাঁর তিরোধান অকাল মৃত্যু মনে হয়।

তাঁর পাণ্ডিত্য ও সমাজ গঠনের নানা কাজের বহু নিদর্শন বহুজনবিদিত। কিন্তু তাঁর খুঁটিনাটি দরদের অলিখিত ইতিহাসে তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ পরিচিত জনের মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

সমাধানহীন নৈরাশ্যবাদে তিনি কখনও আচ্ছন্ন হন নি। নিম্নবর্গের দরিদ্র মানুষের দুঃখ নিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে তত্ত্বকথাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন নি। দরিদ্র মানুষের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে নিবিড় যোগাযোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন, "দুঃখ কষ্টে মানবাত্মা পরাজয় স্বীকার করে না— কায়মনে শিল্প করে দারিদ্র্যকে আংশিকভাবে পরাহত করে।"

মন্দিরের সৌন্দর্যের রসগ্রহণ প্রক্রিয়া বাঙালী-সুলভ ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাসের ফেনা ফুলে যাতে মিলিয়ে না যায়, তাই তিনি স্থাপত্যের খুঁটিনাটি মাপজোখের কাজ দিনের পর দিন নিজের হাতে করবার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ভাসা ভাসা ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে দরিদ্র মানবসমাজের প্রতি দরদ দেখিয়ে যাতে দম ফুরিয়ে না যায়, সে জন্যে অনগ্রসর মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণে ছাত্র-ছাত্রীদের দীক্ষিত করেছেন। ভারতীয় নৃ-তাত্ত্বিক সমীক্ষার অধ্যক্ষের পদে থেকে তিনি সারা ভারতে কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি থলি ও নোট বই হাতে দেখতে পাঠিয়ে দিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা কি খায়, কি পরে। গরুর গাড়ীর চাকার মাপ থেকে শুরু করে নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মাপজোখ হিসেব করবার কাজের ভার দিলেন তাদের উপর। তিনি

জানতেন যে, ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা নৃতত্ত্বের বিদেশী পণ্ডিতদের তথ্যভিত্তিক তত্ত্বের উপর চিন্তা করে আরও বায়বীয় তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ লিখে বিদেশী পত্রিকায় ছাপিয়ে তাড়াতাড়ি পণ্ডিত বলে গণ্য হতে উৎসুক। শিক্ষা ব্যবস্থার জোয়ারের টান সেই দিকে। একক প্রচেষ্টায় হাল ধরে তিনি কিছু সংখ্যক শিক্ষাব্রতীকে এই প্রতিকূল গতিকে সংহত রূপ দেবার কাজে প্রণোদিত করে ভারতীয় নৃতত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির গোড়াপত্তন করতে চেষ্টা করলেন। এই গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে আজও বসুপ্রণোদিত দৃঢ় ভিত্তি অনুপ্রেরণা জাগিয়ে রেখেছে। তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে উদ্দীপিত হয়ে আছে।

রক্ষণশীল প্রথায় ব্যতিক্রম করে অধ্যাপক বসু নৃতত্ত্বে শিক্ষিত নয়—এমন শিল্পী, সাহিত্যিকদেরও ভারতের অজ্ঞাত নানা দিকের অনুসন্ধানের কাজে লাগিয়ে দিলেন। তাঁরা যাতে জনসাধারণকে ভারতের ব্যাপক সমাজের নানা বিষয়ে আরও সচেতন করে তুলতে পারেন, সহজ ভাষায় লিখে বিস্তৃতভাবে সারা দেশে বাস্তব খবর ছড়িয়ে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনায় ভারতের গঠনমূলক কাজের পথ প্রশস্ত করতে পারেন—সেই দিকে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু এত কঠিন পথে চলতে ক-জন জননায়ক ও জনশাসক প্রস্তুত হবেন? তাঁর একক প্রচেষ্টা এত বড় দেশে একটা অতি বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর অক্লান্ত কর্মজীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ বহু জনের মধ্যে অনাগত ভবিষ্যতের কিছু কিছু তরুণ মনে একটা আদর্শের দীপ জ্বালিয়ে রাখবে।

ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের দিশারী—অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

রেবতীমোহন সরকার*

ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের চত্বরে যে কয়েকজন নৃ-বিজ্ঞানী আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর স্থান তাঁদের পুরোভাগে। আমাদের দেশে নৃ-বিজ্ঞানের চর্চা মূলতঃ বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানীদের উদ্যোগ এবং প্রত্যক্ষ নির্দেশে বিস্তারলাভ করেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র এবং তথ্যাবলী বিদেশী ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, দেশপ্রীতি ও মানবপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী চিন্তাধারাপ্রসূত ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানকে প্রকৃত 'ভারতীয়ত্ব' দান করেছেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদ অলংকৃত করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর অনন্য মেধা এবং কর্মনৈপুণ্য তাঁকে উন্নতির চরম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জীবনযাপনে আড়ম্বরহীন মানুষটি দেশকে ও দেশের মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। তাই গান্ধীজীর ডাকে তিনি সব ছেড়ে দিয়ে দেশোদ্ধারকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। দেশের মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা তাঁকে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে তিনি দৃঢ়পদে অগ্রসর হবার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। অবহেলিত ও নিপীড়িত জনমানসের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস তাঁর অন্তরে দীর্ঘস্থায়ী বেদনার উদ্রেক করেছিল। সেই বেদনাই

* নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

প্রতিফলন দেখা গেছে তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক কাজকর্মে, কথাবার্তায় এবং লেখনীর মুখে। প্রকৃত মানবদরদী ছিলেন বলেই তিনি সার্থক মানব-বিজ্ঞানীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। নৃ-বিজ্ঞানের শতাধিক প্রবন্ধ ও পুস্তকে, সারা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আলোচনা-সভার বক্তৃতায় ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ এবং ভারতের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে তিনি সর্বদাই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতেন। দেশীয় রাজনীতিতে অধ্যাপক বসু যেমন গান্ধীজির মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি অপর দিকে নৃ-বিজ্ঞানের সাধনায় প্রকৃত ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠায় তিনি ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়ের প্রত্যক্ষ প্রবোচনায় হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি শরৎচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'Man In India' পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন এবং রাঁচিতে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে Man In India প্রকাশালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন।

অধ্যাপক বসু তাঁর নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণার শুরু থেকেই ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির অনুশীলনের প্রতি যত্নবান ছিলেন। মানব-সংস্কৃতির নৃ-বিজ্ঞান-সম্মত সংজ্ঞা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপরেখার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রথম ও বিখ্যাত পুস্তক Cultural Anthropology-তে (1929), সংস্কৃতি, সংস্কৃতি-লক্ষণ (Cultural trait), সংস্কৃতি কেন্দ্র (Culture centre), সংস্কৃতি ক্ষেত্র (Culture area), বিস্তরণ (Diffusion), অনুকরণ (Attenuation) প্রভৃতির ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা এবং দেশজ আচার-ব্যবহারের পশ্চাৎপটে ও উদাহরণ সহযোগে তাঁর মনোজ্ঞ আলোচনা বিদগ্ধ মহলে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। ভারতীয় বিধান ও আচার-ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারতের বসন্ত উৎসব' শিরোনামে রচিত সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ 1927 খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি উৎসবের উপজাতীয় প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করে কি ভাবে এটি সর্বভারতীয় জনউৎসবে পরিণত হয়, তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বসন্ত উৎসব প্রকৃতপক্ষে কৃষি উৎসবেরই রূপান্তর। কোন উৎসব বা আচার-অনুষ্ঠানের উৎস-সন্ধান এবং তার প্রকৃতিগত বিচার-বিবেচনাতেই অধ্যাপক বসু সন্তুষ্ট ছিলেন না, কিভাবে এসব অনুষ্ঠান দেশের আপামর জনসাধারণের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে, তার প্রত্যক্ষ আলোচনায় তিনি বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ওড়িষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই ওড়িষার ইতিহাস ও তার শিল্পধারা প্রসঙ্গেই এক মনোজ্ঞ এবং দরদপূর্ণ আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অরণ্যবাসী উপজাতি জুয়াঙদের পল্লীতে তিনি কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। জুয়াঙ জাতির জীবনযাত্রা প্রণালীর কয়েকটি বিবরণ তৎকালে প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ছোটনাগপুরের মুণ্ডাজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মাধ্যমে তিনি উক্ত জাতির জীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয় আলোচনা করেন। কিভাবে ছোটনাগপুর অঞ্চলের উপজাতির জীবনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বিস্তারলাভ করে, তা তাঁর আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল।

ভারতীয় জাতিতত্ত্বের গবেষণায় অধ্যাপক বসুর অবদান নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জাতির প্রকৃতি এবং ভেদাভেদের বিষয়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

জাতিতত্ত্বের নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সর্বপ্রথম ইউরোপীয় নৃ-বিজ্ঞানীদের দ্বারাই সূচিত হয় এবং পরে ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে যথোক্ত আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। তবে অধিকাংশ আলোচনাই তখন জাতিভেদের উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। অধ্যাপক বসু ভারতীয় জাতিতত্ত্বের আলোচনায় জাতিপ্রথাকে একটি বিচিত্রতর অর্থনৈতিক সংগঠন হিসাবে উপস্থাপিত করেন। প্রাচীন যুগে কিভাবে কৌলিক বৃত্তিগুলিকে কেন্দ্র করে এক একটি জাতিসংস্থা গড়ে উঠেছিল, তা তিনি ধর্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসাশ্রিত উদাহরণের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন। বুদ্ধদেব আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি পূর্ণ জেহাদ ঘোষণা করলেও তাঁর সময় বিভিন্ন শিল্প-বৃত্তিগুলি কুলগত অধিকারে প্রভাবিত হয়েছিল বলে অধ্যাপক বসু মনে করেন এবং জাতির উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের ও অস্পৃশ্যতারূপী সংস্কারে তদানীন্তন মানুষের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হতো। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতীয় জনজীবন প্রভাবিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন কারণে ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে হিন্দু জাতিপ্রথায় কয়েকটি ক্ষেত্রে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। অপর দিকে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে কিভাবে দিগন্তব্যাপী ইসলাম ধর্মান্তরিতকরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। ইংরেজ আমলে বহু যুগ ধরে ইউরোপের নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের পুরাতন ধনতন্ত্রের পরাজয়ের ভিত্তিভূমি রচিত হয় এবং তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ প্রাচীন বর্ণব্যবস্থার প্রতি মানুষের আনুগত্য বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু-সমাজের শোষণ এবং অবমাননার ফলে সমষ্টিগত-ভাবে হিন্দুদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বিষয়ে যে ধারণা রয়েছে, অধ্যাপক বসু প্রমাণ সহযোগে তার বিরোধিতা করেন। অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে হিন্দু বর্ণব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে পড়বার কথাতেও তিনি আস্থা রেখেছিলেন না। পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্যক পরাজয়ই তাঁর মতে বর্ণব্যবস্থা ভেঙে পড়বার একমাত্র কারণ। বর্ণব্যবস্থার মধ্যে শোষণ এবং মনুষ্যত্বের অবমাননা থাকা সত্ত্বেও এই প্রথার মধ্যে বিশেষ এক যুক্তি-বৃত্তির কথা অধ্যাপক বসু অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—"ক্রমোত্তর বিশিষ্ট তান্ত্রিকতার অসির দ্বারাই জাতিভেদের ভয়োমূলক জড়তার বন্ধন ছিন্ন হইতেছে। কিন্তু আজ ধনতন্ত্রপ্রদত্ত যুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার অধিক ফল প্রসব করিবার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা যেন না ভাবি, যাহা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার সবই ধূলা, সবই বালি। তাহার মধ্যে যে সোনার দানা আছে, এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য।' অধ্যাপক বসু তাঁর সারা জীবনের গবেষণায় এই সোনার দানাই উদ্ধার করে এনেছেন। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এবং শোষণের যুগান্তকারী অন্ধকার অতিক্রম করে তিনি আলোকের নিশানায় পৌঁচেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে অধ্যাপক বসু ভারত সরকারের নৃ-বিজ্ঞান সমীক্ষার অধিকর্তা, তপশিলী জাতি ও উপজাতি-সমূহের মহাধ্যক্ষ প্রভৃতি দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সকল সময়েই তিনি নৃ-বিজ্ঞানের অবদান এবং বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণে একে কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করেছেন। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞান সমীক্ষার অধিকর্তা হিসাবে তিনি "ভারতের কৃষক জীবন" সংক্রান্ত গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় জনজীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছেন। বিভিন্ন রকমের গবেষণাকার্য এবং পুস্তকাবলীর মাধ্যমে তিনি নৃ-বিজ্ঞানকে ভারতীয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের

মোকাবিলার কাজে সাধাবার প্রতি সচেষ্ট ছিলেন। উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনধারা এবং সমস্যাবলী আলোচনাকালে অধ্যাপক বসু উপজাতীয়দের জীবনের গভীরে প্রবেশলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। উপজাতীয়দের উন্নয়নের নামে আর্থিক সাহায্য দান, চাকুরীতে বিশেষ অধিকার দান, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান এবং অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের বিষয়ে তিনি কোনদিনই একমত ছিলেন না। পুরাপুরিভাবে বিজ্ঞানসম্মত কর্মপদ্ধতি রূপায়ণে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে—"The best course would be to try and build up a caste-free new India, where no occupation is high and none low, and this with the help of those who are within the caste organisation as well as those who stand outside it". তাঁর উপজাতি উন্নয়নের কর্মপদ্ধতিতে সদাসর্বদা এই সুরই ধ্বনিত হতো। অধ্যাপক বসু রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের প্রতি সর্বদাই সজাগ ছিলেন। সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃত কারণগুলি অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি একজন বিদগ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানীর দিব্যদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন এবং সেই দৃষ্টির সাহায্যে তিনি সামাজিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই অল্প কথায় রচিত সারগর্ভ প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত সত্যে পৌঁছুতে সক্ষম হতেন।

প্রকৃত নৃ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক বসুর জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিচরণে সমধিক আগ্রহ ছিল। ভূগোল, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃ-বিজ্ঞানে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন এবং নৃ-বিজ্ঞানের আলোচনায় সেই জ্ঞানরাশির বিকাশ তাঁর অধ্যয়নের ধারাকে বিশেষভাবে সঞ্জীবিত করেছিল। 1949 খৃঃ-অব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃ-বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার সভাপতি হিসাবে তিনি ভারতীয় মন্দিরসমূহের নির্মাণকাল নির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাষণ দেন, তা তাঁর নৃ-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের অগাধ জ্ঞানের কথাই প্রমাণিত করে। তাছাড়া তিনি মন্দির-স্থাপত্য এবং মন্দিরের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। অপর দিকে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ে কয়েকটি নতুন ভাবধারা প্রদানে এবং প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধের ক্ষেত্রে খননকার্যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। ময়ূরভঞ্জ প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে অধ্যাপক বসুর অবদান অবিস্মরণীয়। মানবিক ভূগোলের অধ্যয়ন ও গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ভৌগোলিক প্রভাব কতখানি, সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় তিনি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি লেখেছেন—"Inspite of the fact that the languages of India are many, and there are well-marked differences between one regional culture and another, yet there is an over-all unity of design which makes them all members of one family." কলিকাতার বিভিন্ন সমস্যাবলীর বিশ্লেষণে অধ্যাপক বসু সদাজাগ্রত ছিলেন। কলিকাতার সমাজ-জীবনের সমীক্ষায় তিনি নৃ-বিজ্ঞান ও মানবিক ভূগোলের বিভিন্ন ধারা ও প্রণালীর প্রয়োগ করেছেন। 1968 খৃঃ-অব্দে প্রকাশিত "Calcutta-1964" শীর্ষক প্রামাণিক পুস্তকটির মধ্যে তথ্য ও তত্ত্বের গুরুত্ব এবং বিজ্ঞানভিত্তিক উদাহরণ সহযোগে তিনি কলিকাতার জনজীবনের এক প্রাঞ্জল চিত্র পরিস্ফুট করেছেন।

অধ্যাপক বসু এক দিকে যেমন সারা পৃথিবী-ব্যাপী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিভ্রমণ করে নৃ-

বিজ্ঞানের নানা দুরূহ তথ্যের আলোচনা করেছেন, অপর দিকে তেমনি নৃ-বিজ্ঞানচর্চার ধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্যেও বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন। প্রবাসী, দেশ, শনিবারের চিঠি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় তিনি নিয়মিত বা সাময়িকভাবে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় সহজ ও সাবলীলভাবে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক বসু একজন প্রখ্যাত নৃ বিজ্ঞানী হিসাবে চিহ্নিত হলেও সাহিত্যের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং কিছু দিন পরিষদের সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। বাংলায় রচিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্য মূল্য প্রতিভাত হয়। একজন ভারতীয় পণ্ডিত হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণে যেমন তিনি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ অগ্রাধিকার দান করে এসেছেন, তেমনি একজন বাঙালী হিসাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন সদস্যরূপে তিনি এই সংস্থার বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুমহান উদ্যোগকে একান্ত সহযোগিতা দান করে এসেছেন। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশীয় এবং বিদেশীয় 11টি সংস্থার আজীবন সদস্য এবং 4টি সংস্থার সাধারণ সদস্য ছিলেন এবং প্রত্যেকেরই সঙ্গে তাঁর মহামূল্য অবদানের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রক্ষা করে এসেছিলেন। সেই পার্থিব যোগসূত্র বিধাতার অমোঘ নির্দেশে গত 15ই অক্টোবর ছিন্ন হলো—অধ্যাপক বসু এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

অধ্যাপক বসুর অবলোকন শক্তি এবং বিশ্লেষণ ভঙ্গীমা সারা পৃথিবীব্যাপী নৃ-বিজ্ঞানীমহলে সুপরিচিত ছিল। এই বিশেষ গুণপণার জন্যেই বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানকে বিশেষ এক রূপদান করে গেছেন। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকৃত ভারতীয়ের দৃষ্টিতে তিনি নৃ-বিজ্ঞানের জগতে যে "ভারতীয়ত্ব" প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, তা ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে পরিগণিত হবে।

কৈশিক প্রক্রিয়া ও শ্রবণোত্তর শব্দ

শ্যামসুন্দর দে*

আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপেই রয়েছে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে, মানুষ চায় তার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এমন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা হচ্ছে, আগ্নেয়গিরির গায়ে প্রাইমুলা ফুল—যাদের ফোটবার দুই-এক দিনের মধ্যেই অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। প্রাইমুলা ফুল ফোটবার সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবার ব্যাপারটা ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বহু বিতর্কিত প্রশ্ন। সম্প্রতি কিছু দিন আগে বিজ্ঞানী কোনোভালভ এই রহস্যের মূল উদ্ঘাটন করেছেন, যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সূত্রপাত করেছে। অগ্ন্যুৎপাতের দুই-একদিন আগে থেকেই ভূত্বকে প্রচণ্ড কম্পনের সৃষ্টি হয়, যার কম্পনাঙ্ক শ্রবণোত্তর শব্দের কম্পনাঙ্কের কাছাকাছি বলে পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে। শ্রবণোত্তর শব্দের চাপ প্রাইমুলা গাছের ফুল ফোটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান গাছের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার মাধ্যমে কাণ্ডে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এই কারণে তখনই ফুল ফোটে।

ব্লটিং কাগজে তরল পদার্থের শোষণ, কৈশিক নল দিয়ে তরলতলের উপরে ওঠা—এগুলি আমাদের জানা ঘটনা। এর মূলে আছে তরল পদার্থের পৃষ্ঠ-টান, যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। তরল পদার্থের মধ্যে অণুগুলি যখন নির্দিষ্ট একটা দূরত্বের মধ্যে এসে পড়ে, তখনই তারা পরস্পরের উপর আকর্ষণ বল প্রয়োগ করতে পারে। এই দূরত্বকে বলা হয় আণবিক আকর্ষণ দূরত্ব। এই দূরত্ব নিয়ে যে কোন অণুকে কেন্দ্র করে একটি গোলকের অস্তিত্ব কল্পনা করলে গোলকটিকে বলা হয় ঐ অণুর আণবিক ক্রিয়ামণ্ডল। ক্রিয়ামণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ অণুগুলি পরস্পর পরস্পরকে সমান জোরে আকর্ষণ করে। যে সব অণুর ক্রিয়ামণ্ডল পুরাপুরি তরল পদার্থের ভিতরে অবস্থিত, তাদের উপর লব্ধি (Resultant) আকর্ষণ বল শূন্য হবে। কিন্তু তরল পদার্থের উপরিতলের কাছে যাদের ক্রিয়ামণ্ডল আংশিকভাবে তরল পদার্থের ভিতর অবস্থিত, তারা তরলের উপরে কোন তরল অণু না পাওয়ায় নিম্নমুখী অসম বলের দ্বারা তরলের ভিতর দিকে আকৃষ্ট হবে। তরলের উপরিতলে আসবার জন্যে অণুর যে পরিমাণ গতিশক্তি খরচ হয়, তা উপরিতলের নিকটবর্তী অণুগুলিতে স্থিতিশক্তিরূপে জমা থাকে। উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বেশী হবে, তত বেশী সংখ্যক অণু ঐ তলে জমা হবে এবং তলের মোট স্থিতিশক্তির পরিমাণও বেড়ে যাবে। কিন্তু বলবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী সাম্যাবস্থায় বস্তুর স্থিতিশক্তি সর্বাপেক্ষা কম। কাজেই উপরিতলের ক্ষেত্রফল যতই সঙ্কুচিত হবে, স্থিতিশক্তির পরিমাণও তত কমে যাবে অর্থাৎ তরলের উপরিতলের সঙ্কুচিত হবার প্রবণতা সর্বদাই থাকে। তরল পদার্থের এই ধর্মকেই বলা হয় পৃষ্ঠ-টান। কৈশিক নল জলে ডোবালে নলের অণু ও তরল পদার্থের অণুর মধ্যে একটি ঊর্ধ্বমুখী আকর্ষী বল ক্রিয়া করে। এর ফলে তরল কৈশিক নল বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কৈশিক নলের তরলস্তম্ভের ওজন আকর্ষী বলের সমান না হয়, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া

---

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

চলতে থাকে। যখন বিপরীতমুখী বল দুটি পরস্পর সমান হয়, তখন নলের ভিতর তরলস্তম্ভ দাঁড়িয়ে পড়ে।

যন্ত্র দিয়ে কোন ধাতু কাটবার সময় ঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়। ধাতুখণ্ডকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে লুব্রিকেটিং তেল ব্যবহার করা হয়। ধাতুখণ্ডটি কাটবার সময় ঐ স্থানে ধাতুখণ্ডের গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটলের সৃষ্টি হয়। আগে মনে করা হতো শুধুমাত্র কৈশিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লুব্রিকেটিং তেল এই সব ফাটলে প্রবেশ করে ধাতুখণ্ডকে ঠাণ্ডা রাখে। কিন্তু উচ্চ-গতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফির পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, কৈশিক প্রক্রিয়ায় যে হারে তরল পদার্থের যাওয়া উচিত, তার তুলনায় অনেক বেশী হারে ধাতুখণ্ডের ফাটলে লুব্রিকেটিং তেল সঞ্চালিত হয়। এথেকে কোনোভালভ ধারণা করেন যে, এর পিছনে নিশ্চয়ই অতিরিক্ত কোন চাপের প্রভাব রয়েছে। তিনি তখন একটি পিজো-ইলেকট্রিক কেলাসের সাহায্যে ধাতুখণ্ড কাটবার সময় যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তার কম্পনাঙ্ক গণনা করলেন এবং দেখলেন যে, এই কম্পনাঙ্ক শ্রবণোত্তর শব্দের কম্পনাঙ্কের কাছাকাছি এবং এদের বিস্তার খুবই কম। এথেকে তিনি আন্দাজ করেন যে, ধাতু-খণ্ডের ফাটলে লুব্রিকেটিং তেলের তাড়াতাড়ি প্রবেশের মূলে হয়তো শ্রবণোত্তর শব্দের চাপের প্রভাব রয়েছে এবং এটা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি করেন। একটি পাত্রের নীচে শ্রবণোত্তর শব্দ সৃষ্টিকারী একটি যন্ত্র সংযুক্ত করা হলো। প্রথমে যন্ত্রটি না চালিয়ে ঐ পাত্রস্থিত তরল পদার্থে কৈশিক নল ডুবিয়ে দেখা গেল যে, তরলস্তম্ভের উচ্চতা এমন—যেটা আমরা আমাদের জানা পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু উপরিউক্ত যন্ত্রটি চালিয়ে দিলে এই তরলস্তম্ভের উচ্চতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। কাজেই কোনোভালভ এই পরীক্ষা থেকে নিজের ধারণা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। কৈশিক নলে তরলস্তম্ভের উপর শ্রবণোত্তর শব্দের যে প্রভাব—তা জৈব বা অজৈব যে কোন তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সমস্ত পরীক্ষালব্ধ সত্য কোনোভালভকে প্রাইমুলা ফুল ফোটবার রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছিল। কাজেই প্রাইমুলা গাছের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে যে কৈশিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি মূল থেকে কাণ্ডে পৌঁছয়, তা অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে সৃষ্ট শ্রবণোত্তর শব্দের প্রভাবে ত্বরান্বিত হয়ে ফুল ফোটায়।

শ্রবণোত্তর শব্দের প্রচণ্ড চাপের পরিমাণ এত বেশী যে, কোনোভালভের পরীক্ষার আগে কৈশিক নলের ক্ষেত্রে এত বেশী চাপের অস্তিত্ব ও তার প্রভাব সম্পর্কে কেউ সচেতন ছিল না। এই আবিষ্কার প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু প্রতিষ্ঠিত তথ্যের মূলে নাড়া দিয়েছে এবং এর ফলে নতুন করে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাদের ব্যাখ্যা করবার দিন এসেছে।

উদ্ভিদ-কোষের ভেদ্যতা

মনোজকুমার সাধু ও পূরবী চট্টোপাধ্যায়*

কোন একটি কোষের মধ্যে জল ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রবেশ এবং কোষ থেকে এদের প্রস্থান প্রধানতঃ প্রোটোপ্লাজমের একটি বিশেষ নির্বাচনী ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সব ধরণের পদার্থ কোষের মধ্যে সমপরিমাণে ও সমগতিতে প্রবেশ করতে পারে না। আবার কোন কোন পদার্থ কোষের মধ্যে সহজেই প্রবেশ করতে সক্ষম হলেও কোষ থেকে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে বেশ কঠিন; অর্থাৎ উক্ত পদার্থের কাছে কোষটি কেবলমাত্র অর্ধভেদ্য (Semi-permeable), সম্পূর্ণ ভেদ্য নয়। কোষের এই ভেদ্যতা (Permeability) নিয়ন্ত্রণ করে প্রোটোপ্লাজমের একটি স্তর। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে আবার দুটি আবরণীতন্ত্রের (Membrane system) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়—ভ্যাকুওলের (Vacuole) দিকে ভিতরের আবরণীকে বলা হয় Tonoplast এবং কোষ-প্রাচীরের দিকে বাইরের আবরণীর নাম হলো Plasmalemma। সাধারণতঃ এই আবরণীদ্বয় সম্মিলিতভাবে প্লাজমা আবরণী নামে অভিহিত। এই আবরণীর বেধ অতি সূক্ষ্ম (প্রায় 7·5mμ), তাই কেবলমাত্র ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে একে পর্যবেক্ষণ করা যায়। প্লাজমা আবরণীর প্রকৃতি প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশ থেকে পৃথক। যদিও বিভিন্ন উদ্ভিদের কোষের—এমন কি, একই উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোষের আবরণীর বেধ, আণবিক উপাদান ও কার্যাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তথাপি প্রত্যেক কোষের আবরণীর মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্যও আছে। কোষের ভেদ্যতা ও বিভিন্ন কোষের পৃষ্ঠটান (Surface tension) পরিমাপ করে এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আবরণীটি চর্বি (Lipid) ও প্রোটিনজাতীয় উপাদানে গঠিত। প্রোটিন অণু সাধারণতঃ দীর্ঘাকৃতি ও জটিল হওয়ায় এবং ভাঁজ ও নির্ভাঁজ হতে সক্ষম হওয়ায় আবরণীটি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। কোষের বৃদ্ধি ও চলনে প্লাজমা আবরণী কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে না। প্লাজমা আবরণী সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গেলেও এর সঙ্কোচন, প্রসারণ, বৃদ্ধি ও কার্যাবলীর সম্যক উপলব্ধি এখনও সম্ভব হয় নি।

ভেদ্যতার তারতম্য

একটি কুঞ্চিত কিন্তু জীবন্ত কোষকে জলে স্থাপন করলে দেখা যায় যে, কোষ-প্রাচীরের বৃদ্ধির হার প্রোটোপ্লাজমের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। এর কারণ হলো, কোষ-প্রাচীর প্রোটোপ্লাজমের তুলনায় অনেক বেশী ভেদ্য। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, Nitella কোষের প্রাচীর প্রোটোপ্লাজমের চেয়ে প্রায় 3·5 গুণ অধিক ভেদ্য।

সম্প্রতি Tonoplast ও Plasmalemma আবরণীর মধ্যেও ভেদ্যতার তফাৎ লক্ষ্য করা গেছে। ইউরিয়ার কাছে প্রথমোক্ত আবরণী শেষোক্ত আবরণীর প্রায় 30 গুণ বেশী ভেদ্য।

ভেদ্যতা সাধারণতঃ পদার্থটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জলে সহজেই দ্রবণীয়, এমন পদার্থ কোষের পর্দায় অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয়। তাই এই ধরণের পদার্থের কোষের মধ্যে ও বাইরে চলাচলের গতিও অপেক্ষাকৃত মন্থর। অপর দিকে

* কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কোষের আবরণীর মধ্যে লিপিডের উপস্থিতির জন্যে লিপিডে দ্রবণীয় পদার্থ অন্যান্য পদার্থের তুলনায় সহজেই কোষে প্রবেশ করতে পারে। তাই লিপিডে অদ্রবণীয় জৈব অম্ল, যেমন—oxalic acid, malic acid, citric acid ইত্যাদি ভ্যাকুওলের মধ্যে জমা হয়। কারণ ঐ অ্যাসিডগুলি প্লাজমা আবরণী ভেদ করে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আসতে পারে না। আবার লিপিডে সহজেই দ্রবণীয় অম্ল, যেমন—acetic acid, lactic acid, pyruvic acid ইত্যাদি আবরণী ভেদ করে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, তাই ভ্যাকুওলে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। লিপিডে জৈব অম্লগুলির দ্রাব্যতা বৃদ্ধি বা হ্রাস করে এমন অবস্থাও এগুলির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন কোষরসের অম্লতা বৃদ্ধি পেলে লিপিডে জৈব অম্লগুলির দ্রাব্যতাও বৃদ্ধি পায়।

পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, গ্যাসীয় পদার্থ সহজেই কোষে প্রবেশ করতে পারে। ছোট ছোট অণুও সাধারণতঃ দ্রুত প্রবেশে সক্ষম। অবশ্য এই নিয়ম কেবলমাত্র আণবিক ওজন 50-60 এমন অণুর (যেমন—জল, কোহল ইত্যাদি) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে ইলেকট্রোলাইট (Electrolite) বা তড়িদ্বিশ্লেষ্য পদার্থ এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। অনেক ক্ষেত্রে যদিও এদের অণুর আয়তন বেশ ছোট, তবুও এগুলি অতি মন্থর গতিতে কোষে প্রবেশ করে বা অনেক সময় একেবারেই প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। এর কারণ হলো এই যে, ইলেকট্রোলাইট সহজেই আয়নিত হয় এবং জলযোজনের (Hydration) ফলে আয়নিত ইলেকট্রোলাইটের আয়তন অনায়নিত ইলেকট্রোলাইটের চেয়ে অনেক গুণ বেশী বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া আয়নের বৈদ্যুতিক আধানও (Electrical charge) প্রবেশে বাধা দেয়। দুর্বল অম্ল ও ক্ষারগুলি (Weak acide and base) অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে কোষে প্রবেশ করতে সক্ষম, কারণ এদের অণু প্রধানতঃ অনায়নিত অবস্থায় থাকে এবং অনায়নিত অণু আধানবিহীন ও নির্জলিত (Dehydrated) হওয়ায় আয়তনেও বেশ ছোট হয়। লিপিড আবরণীতে আয়নিত ইলেকট্রোলাইট থেকে অনায়নিত ইলেকট্রোলাইট অনেক বেশী দ্রবণীয়।

সাধারণতঃ কোষের মধ্যে non-electrolyte-এর প্রবেশ অন্য কোন পদার্থের উপস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তবে ইলেকট্রোলাইটের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। একযোজী (Monovalent) cation-এর দ্রবণে দ্বিযোজী (Divalent) cation-এর উপস্থিতি প্রথমোক্ত পদার্থটির প্রবেশের গতি হ্রাস করে। আবার কোন কোন পদার্থের দ্রবণ এককভাবে কোষের কাছে বিষাক্ত (Toxic) হলেও দুটি লবণের দ্রবণ একত্রে মোটেই ক্ষতিকারক নয়। যেমন সোডিয়াম বা পটাসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে একটি কোষকে স্থাপন করলে সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের দ্রুত প্রবেশহেতু সাইটোপ্লাজমের স্ফীতি ও সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকুওলের সংকোচন ঘটে, কারণ ভ্যাকুওলস্থিত জল সাইটোপ্লাজমের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং শেষে কোষটি মারা যায়। কিন্তু অতি সামান্য পরিমাণ (1/10 ভাগ) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপরিউক্ত দ্রবণে যোগ করলে সাইটোপ্লাজমের এই অস্বাভাবিক স্ফীতি ঘটে না এবং কোষটিও দীর্ঘ দিন স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে। প্রমাণিত হয়েছে যে, Ca^{++} আয়ন কোষের মধ্যে K^+ বা Na^+ আয়নের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করে। এক আয়নের উপর অন্য আয়নের এইরূপ প্রভাবকে বিপক্ষতা বা বৈপরীত্য (Antagonism) বলে। আর দুটি লবণের মিশ্রণে প্রস্তুত অক্ষতিকারক (Non-toxic) দ্রবণকে সুষম দ্রবণ (Balanced solution) বলে। আবার সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড একাকী সাইটোপ্লাজমের

মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করতে সক্ষম হলেও ভ্যাকুওলের মধ্যে অত সহজে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ সাইটোপ্লাজমের ভিতরের ও বাইরের (অর্থাৎ Tonoplast ও Plasmalemma) আবরণীর ভেদ্যতা N^+ ও K^+ আয়নের কাছে সমান নয়।

প্রক্রিয়া বৈপরিত্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, প্লাজমার আবরণী আয়নের কাছে একেবারেই দুর্ভেদ্য। কোন লবণের অসম দ্রবণে একটি কোষকে স্থাপন করলে কোষের পর্দা প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও আবরণীর নির্বাচনী ক্ষমতা লোপ পায়, কিন্তু সুষম দ্রবণ আবরণীর এই ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে। আবার আবরণীর কলিল ধর্ম (Colloidal property) দিয়েও অনেকে আয়ন প্রক্রিয়ার বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা করেছেন। ফসফোলিপিড হচ্ছে একমাত্র জৈব কলিল, যার মধ্যে Na^+ ও Ca^{++} আয়নের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। প্লাজমা আবরণীতে ফস্‌ফোলিপিডের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, কোষের ভেদ্যতা ফসফোলিপিডের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ ফসফোলিপিডের অণুতে apolar (লিপিডে দ্রবণীয়) এবং polar (জলে দ্রবণীয়)—উভয় শ্রেণীই উপস্থিত থাকে।

প্লাজমা আবরণীর গঠনশৈলী ও ভেদ্যতা-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন যে, অর্ধভেদ্য প্লাজমা আবরণীটি যেন একটি ছাঁকনী বিশেষ (1নং চিত্র)। এটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ লিপিড অণু দিয়ে প্রস্তুত, যার মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্রও আছে। ঐ ছিদ্রগুলি আবার আর্দ্র প্রোটিনের দ্বারা পূর্ণ। এই তত্ত্ব অনুসারে লিপিডে দ্রবণীয় যে কোন আয়তনের অণু অতি সহজেই কোষের আবরণী ভেদ করতে পারে, কিন্তু লিপিডে অদ্রবণীয় কেবলমাত্র ক্ষুদ্রায়তন অণুগুলিই ছিদ্রপথ দিয়ে আবরণী ভেদ করতে সক্ষম।
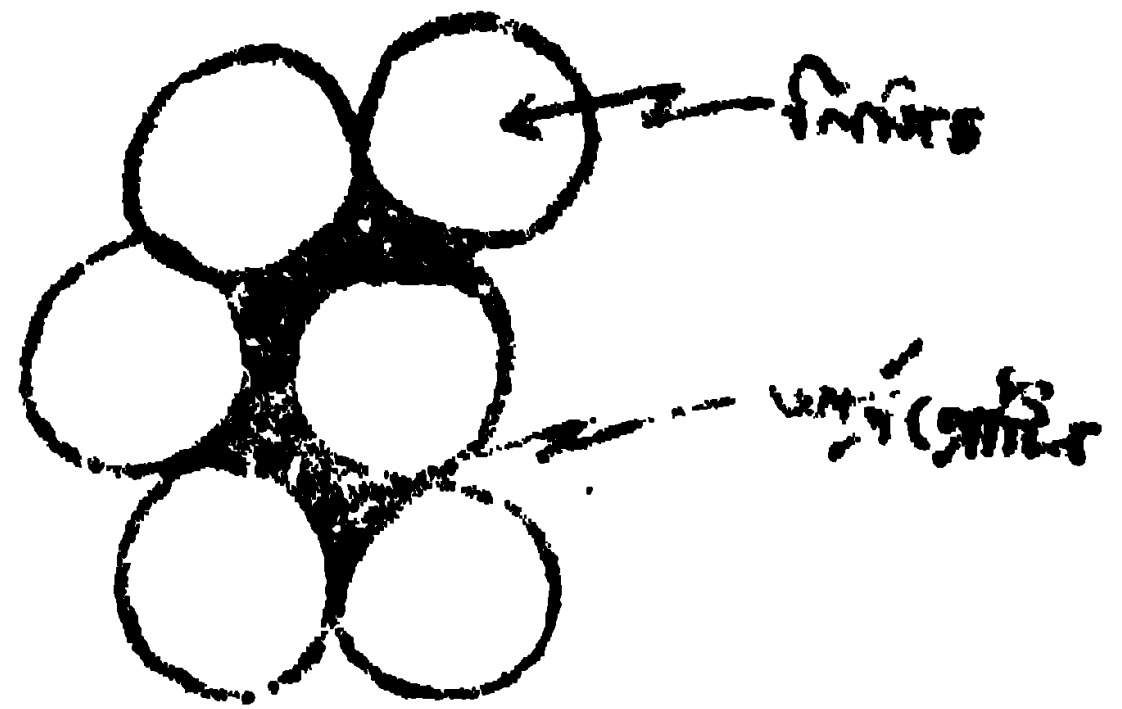
1নং চিত্র
ছাঁকনীর ন্যায় গঠনবিশিষ্ট প্লাজমা আবরণী

অপর দিকে Davson ও Danilli-র মতানুসারে প্লাজমার আবরণী হলো ফসফোলিপিডের দুটি স্তরের
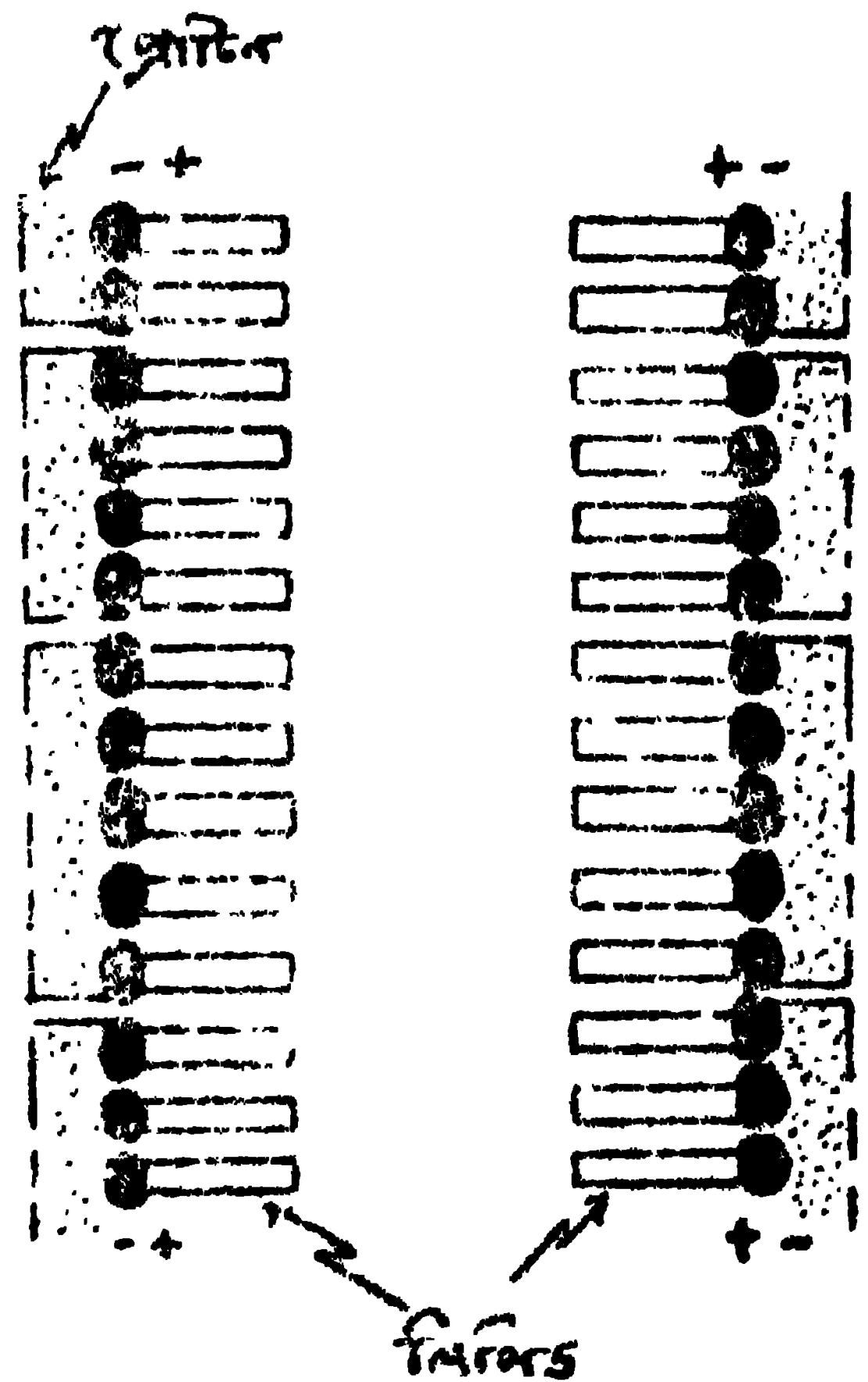
2নং চিত্র
প্লাজমা আবরণীর দ্বিস্তর গঠনশৈলী

সমষ্টি, যা আবার প্রোটিনের একটি পাতলা স্তর দিয়ে আবৃত থাকে। লিপিডের polar প্রান্ত

প্রোটিনের দিকে আর non-polar প্রান্ত পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থিত। 2নং চিত্রে প্লাজমা আবরণীর ভিতর প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তোলা কোষ আবরণীর ছবি অবশ্য লিপিড ছাঁকনী তত্ত্বের (Lipid Sieve Theory) যাথার্থ্য প্রমাণ করে এবং এই তত্ত্বের সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের পদার্থের কাছে প্লাজমা আবরণীর ভেদ্যতার তারতম্য অধিকাংশ সময় ব্যাখ্যা করা যায়—যদিও এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। তবে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবন্ত কোষের প্লাজমার আবরণী মোটেই চিরস্থির নয়, প্রতিনিয়তই এর গঠন ও রাসায়নিক উপাদান পরিবর্তিত হচ্ছে।

কোষের ভেদ্যতা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আরও অনেক কাজে [যেমন—প্রোটিন সংশ্লেষণ, শক্তি স্থানান্তর (Energy transfer), পদার্থের সক্রিয় স্থানান্তর (Active transport of substance) ইত্যাদি] প্লাজমার আবরণীর অংশ গ্রহণ করে। আবরণীর মধ্যে প্রোটিনের উপস্থিতির জন্যেই উপরিউক্ত ক্রিয়া-কলাপগুলি সাধিত হওয়া সম্ভব। আবরণীর উপাদান কেবলমাত্র লিপিড হলে এই ক্রিয়াগুলি সম্ভব হতো না।

কোষের ভেদ্যতার পরিমাপ-পদ্ধতি

সব উদ্ভিদের কোষের ভেদ্যতা সমান নয়—এমন কি, একটি নির্দিষ্ট কোষের ভেদ্যতা কোন একটি বিশেষ পদার্থের কাছে সব সময় সমান নয়। বিভিন্ন ঋতুতে কোষের ভেদ্যতার তারতম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কোষের আবরণীর ভেদ্যতা পরিমাপ করবার জন্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতি দুটি অনুসৃত হয়।

1. রাসায়নিক বিশ্লেষণ—এই প্রক্রিয়ায় কোষটিকে প্রথমে একটি পদার্থের দ্রবণে নির্দিষ্ট সময় ধরে নিমজ্জিত রাখা হয়। পরে ঐ কোষের রস (Cell sap) কৃত্রিম উপায়ে বের করে নিয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দ্রাব্যের পরিমাণ করা হয়। বৃহৎ কোষবিশিষ্ট অ্যালজির (যেমন—Chara, Nitella, Valonia) ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ ঐ সকল উদ্ভিদের এক-একটি কোষ থেকে অনূর্ধ্ব 1 মিলিমিটার কোষরস microsyringe-এর সাহায্যে সহজেই বের করে নেওয়া যেতে পারে।

2. আইসোটোপ পদ্ধতি (Isotope Method)—এই পদ্ধতিতে কোন একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্রবণে একটি জীবন্ত উদ্ভিদ-কোষকে নির্দিষ্ট সময় ধরে নিমজ্জিত রাখা হয়। পরে ঐ কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজম ও ভ্যাকুওলের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ধারণ করে প্লাজমার আবরণীর ভেদ্যতা পরিমাপ করা হয়।

পরিশেষে প্লাজমার আবরণী সম্বন্ধে বলা যায় যে, এটি জীবিত কোষের একটি অচ্ছেদ্য অংশ এবং কোষস্থিত অন্যান্য আবরণীস্তরের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে যুক্ত। বিদীর্ণ বা বিচ্ছিন্ন হলে পুনঃসংস্কারের ক্ষমতা, বিচলন, ভেদ্যতা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইত্যাদি কোষ আবরণীর সজীবতা প্রমাণ করে। প্লাজমার আবরণীর গঠন ও ভেদ্যতা নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গেলেও বিভিন্ন উদ্ভিদের কোষের মধ্যে আবরণীর গঠন ও ভেদ্যতার ধারা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। তাই আরো বিশদ গবেষণা না হওয়া পর্যন্ত কোন মতবাদই সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সূর্য সম্বন্ধে গবেষণা

দীপক বসু*

সূর্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি নানা ভাবে। আমরা সূর্যকে দেখতে পাই—কারণ সূর্য আলোক-তরঙ্গ বিকিরণ করে। আমরা সূর্যের প্রভাব অনুভব করি—কারণ সূর্য তাপ-তরঙ্গ বিকিরণ করে। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, আমরা বর্তমানে সূর্যের কথাবার্তাও শুনতে পারি—কারণ সূর্য বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করে। বেতার-তরঙ্গ বলতে—যে ধরণের তরঙ্গ আমাদের বাড়ীর বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে (রেডিও) ধরে আমরা গানবাজনা শুনে থাকি। সূর্য থেকে বিকিরিত তরঙ্গমালার অবশ্য এখানেই শেষ নয়। আরও আছে—গামা রশ্মি, রঞ্জেন রশ্মি ও অতিবেগুনী রশ্মি। এই সব বিভিন্ন ধরণের তরঙ্গ মূলতঃ একই জাতীয়। এদের একসঙ্গে বলা হয় বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গমালা। এদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ শুধু দৈর্ঘ্যে—অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হচ্ছে তরঙ্গের পাশাপাশি দুটি উচ্চতম বা নিম্নতম অংশের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ। তরঙ্গ ছাড়া সূর্য থেকে আরও এক ধরণের বিকিরণ হয়। সেগুলি হচ্ছে বিদ্যুৎ-কণিকা; যেমন—ইলেকট্রন ও প্রোটন।

যাহোক, এই বিশাল তরঙ্গমালা বা বিদ্যুৎ কণিকাগুলির সকলেই ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। তরঙ্গমালার অনেককেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়। শুধু আলোক ও বেতার-তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলের বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। আলোকের ক্ষেত্রে 2900 A. U. (1 A. U = 10^{-8} সেঃ মিঃ)-এর দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ পর্যন্ত সীমারেখা টানা যায়। অন্যদিকে বেতারের ক্ষেত্রে 1 সেঃ মিঃ থেকে 30 মিঃ-এর তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে। 1 সেঃ মিঃ-এর চেয়ে ছোট তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যায় আর 30 মিঃ-এর বড় তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। আলোক ও বেতার ছাড়া অন্য কোন তরঙ্গের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে প্রবেশাধিকার নেই। কণিকাগুলির ক্ষেত্রে মহাজাগতিক রশ্মিজাতীয় অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন কণিকাই শুধু ভূমি স্পর্শ করতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন কণিকা পৃথিবীর কাছাকাছি এলেই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। তাদের আর ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছনো হয়ে ওঠে না। ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ শুধু সম্ভব জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে আলোক ও বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে এবং মহাজাগতিক রশ্মির মাধ্যমে বিকিরিত কণিকার পরিমাপের দ্বারা। বিজ্ঞানীরা অবশ্য অনেক আগেই বুঝেছিলেন যে, বায়ুমণ্ডলের দ্বারা পরিবর্জিত তরঙ্গমালাকে পর্যবেক্ষণ না করলে সূর্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু এর জন্যে দরকার বায়ুমণ্ডলের উপরে একটি গবেষণাগার স্থাপন করা। তখনকার দিনে সেটা খুব সহজসাধ্য ছিল না।

অবশেষে স্বপ্ন সফল হলো। 1934 সালে একটি বেলুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে 35 কিঃ মিঃ উপরে উঠে গেল। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবদান V-2 রকেট সৌর বিকিরণ পরিমাপ করবার জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্রপাতি নিয়ে 200 কিঃ মিঃ পর্যন্ত উঠে গেল। তবে মহাশূন্যে গবেষণাগার হিসাবে রকেটের

* Radio Astronomy Section, Mackenzie University, Sao Paulo, Brazil

তুলনায় কৃত্রিম উপগ্রহ অধিকতর উপযোগী। কারণ রকেটের আয়ু কয়েক মিনিট মাত্র আর উপগ্রহ কয়েক বছর পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। ফলে উপগ্রহের সাহায্যে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চালানো যায়। বেলুন এবং রকেটের সাহায্যে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাশূন্যগামী যানের সাহায্যে। ভাবতে সত্যই আশ্চর্য লাগে—কত রকমের যন্ত্রপাতি ক্ষুদ্র যানের সীমিত স্থান ও ওজনের মধ্যে বসানো হয়। প্রচণ্ড গতিবেগ ও ঝাঁকুনি, অস্বাভাবিক তাপ ও চাপের মধ্যে থেকেও এই সব যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে।

যদিও প্রথমে বলা হয়েছে—সূর্যের সঙ্গে আমরা নানাভাবে পরিচিত। সাধারণ লোকের কাছে অবশ্য সূর্য আলো ও উত্তাপ বিকিরণকারী একটি গোলকবিশেষ মাত্র। আসলে সূর্য অনেক বড়। সাদা গোলকটি হচ্ছে সবচেয়ে ভিতরের অংশ—নাম আলোকমণ্ডল। তাপমাত্রা 6000°। আলোকমণ্ডলের উপর মোটামুটি 20,000 কিঃ মিঃ পর্যন্ত স্তরের নাম বর্ণমণ্ডল, তাপমাত্রা প্রায় 15,000°। বর্ণমণ্ডলের পর রয়েছে বিশাল ছটামণ্ডল, তাপমাত্রা কোন কোন স্থানে 10^{6}° এবং বিস্তার সম্ভবতঃ পৃথিবী পর্যন্ত। বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল খালি চোখে দেখা যায় না। খালি চোখের দর্শকেরা সৌরমণ্ডলের আরও অনেক চমকপ্রদ দৃশ্য থেকে বঞ্চিত। এদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—সৌরকলঙ্ক ও সৌর বিস্ফোরণ—এক কথায় বলা যায় সৌরপৃষ্ঠের বিক্ষুব্ধ অঞ্চল। সৌরকলঙ্ক হচ্ছে সূর্যের সব রকম বিক্ষুব্ধতার কেন্দ্রস্বরূপ। দেখতে সাদা আলোকমণ্ডলের উপর কালো কালো দাগের মত এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রসমন্বিত। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা প্রতি 11 বছরে একবার চরমে ওঠে। একে বলে সৌরচক্র। সৌর বিস্ফোরণ হচ্ছে বর্ণমণ্ডল অঞ্চলে হঠাৎ বিস্ফোরণ—এর ফলে সৌরকলঙ্কের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা হঠাৎ অত্যধিক আলোকিত হয়ে ওঠে। যাহোক, সৌরপৃষ্ঠে এই রকমের কোন বিক্ষুব্ধ অঞ্চল না থাকলেও সূর্য থেকে কিছুটা বিকিরণ সর্বদাই আসছে। একে বলা যায় শান্ত বিকিরণ। সৌরকলঙ্ক হচ্ছে অতিরিক্ত বিকিরণের উৎস। ফলে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৌর বিকিরণের তীব্রতাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সৌর বিস্ফোরণ হঠাৎ ঘটে। ফলে সৌর বিকিরণও হঠাৎ ও খুব তাড়াতাড়ি অত্যধিক তীব্র হয়ে ওঠে এবং তারপর ধীরে ধীরে পূর্বমাত্রায় ফিরে আসে। এই ভাবে সৌরপৃষ্ঠে কোন প্রকার বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের আবির্ভাবের ফলে শান্ত বিকিরণের উপর তরঙ্গমালা ও বিদ্যুৎ কণিকা উভয়েরই অতিরিক্ত বিকিরণ পরিলক্ষিত হয়।

বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে সূর্যকে পর্যবেক্ষণের প্রধান অবদান হচ্ছে 2900 A. U.-এর ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিকিরণের সন্ধান করা। বর্তমানে রঞ্জেন রশ্মি ও অতিবেগুনী রশ্মিতে সম্পূর্ণভাবে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। রঞ্জেন রশ্মি ও অতিবেগুনী রশ্মিতে গৃহীত সৌরপৃষ্ঠের ছবি থেকে দেখা গেছে—বিক্ষুব্ধ অঞ্চলগুলি থেকে আগত এসব রশ্মি অধিকতর তীব্র। অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের বিকিরণ অন্যান্য অংশের বিকিরণের চেয়ে চার গুণ হতে পারে। রঞ্জেন রশ্মিতে বিক্ষুব্ধ অঞ্চল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আট গুণ উজ্জ্বল দেখাতে পারে। OSO—1, Injun—1, SOLRAD, Aerial—1, Electrons—2 এবং 4—এই সব উপগ্রহের সাহায্যে সূর্যের উপর সর্বদা কড়া নজর রেখে দেখা গেছে যে, যদি কোন বিস্ফোরণ না ঘটে, তবে সৌর রঞ্জেন রশ্মির তীব্রতা প্রায় 24 ঘণ্টার মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। কয়েক দিন থেকে কয়েক মাসের মধ্যে এই তীব্রতা 3 থেকে 100 গুণ

পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন নির্ভর করে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। সৌরচক্রের অবম থেকে চরম অবস্থার মধ্যে সূর্যের রঞ্জেন রশ্মির তীব্রতা—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে—50 থেকে কয়েক শ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। সৌর বিস্ফোরণ থেকে রঞ্জেন রশ্মির অতিরিক্ত বিকিরণ প্রথম আবিষ্কৃত হয় 1956 সালে Aerobee রকেটের সাহায্যে। পরে SOLRAD উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ থেকেও অত্যধিক বৃদ্ধি ধরা পড়ে। বড় রকমের বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে তীব্রতা প্রায় 10 গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। সৌর বিস্ফোরণের ফলে সময়ের সঙ্গে রঞ্জেন রশ্মি 3 সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের তীব্রতার পরিবর্তন অনুরূপভাবে হয়ে থাকে এবং সৌরপৃষ্ঠের একই অংশ থেকে এই দুই প্রকার তরঙ্গ বিকিরিত হতে দেখা গেছে।

অঙ্ক করে জানা গেছে যে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর থেকে বিকিরিত হয়—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত বড়, তত উপরের দিকের স্তরে সেগুলির উৎপত্তি হয়ে থাকে। এভাবে 30 মিঃ-এর তরঙ্গের একটি স্তর আছে। 30 মিঃই হচ্ছে সর্ববৃহৎ তরঙ্গ, যা আমাদের বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে পারে। ফলে এতকাল সৌরমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 30 মিঃ-এর স্তর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তার উপরের অঞ্চল সম্বন্ধে কোন সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্ভব ছিল না। Allouette—1 এবং 2, OGO-3 এই সব উপগ্রহে যে বেতার গ্রাহক-যন্ত্র ছিল, তাতে সৌর বিস্ফোরণের সময় 300 মিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ তরঙ্গ ধরা পড়েছে। ভূপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সময় মিলিয়ে দেখা গেছে—এগুলি দুস্তর তরঙ্গ বিকিরণকারী বিস্ফোরণেরই ঘটনা।

বিদ্যুৎ-কণিকা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে—সূর্য থেকে আগত কম শক্তিসম্পন্ন প্রোটন প্রথম ধরা পড়ে 1957-58 সালে বেলুনের সাহায্যে। পরে বেলুন ও রকেটের সাহায্যে দ্রুত গতি-সম্পন্ন (আলোকের বেগের এক-তৃতীয়াংশ) অপেক্ষাকৃত ভারী কেন্দ্রাণু—কার্বন, অক্সিজেন ও নিয়ন-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের প্রাচুর্যতা থেকে আলোকমণ্ডলে এদের উৎপত্তি বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। Explorer-4 হচ্ছে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, যাকে বিদ্যুৎ-কণিকার সন্ধানে কাজে লাগানো হয়। 1961 থেকে অবশ্য উপগ্রহ ও মহাশূন্যগামী যানগুলিই বিদ্যুৎ-কণিকার সন্ধান ও তাদের শক্তি নির্ধারণের ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। Explorer-12 এবং 14 সৌর কণিকার সন্ধানে সূর্যের উপর সর্বদা দৃষ্টি রেখেছে। Mariners-2 এবং 4-এর সাহায্যে অতি অল্প শক্তিসম্পন্ন প্রোটনও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। Pioneer-6 এবং 7 সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎ-কণিকা ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছে। সৌর বিস্ফোরণের সময় সৌর বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে সৌর বিদ্যুৎ-কণিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে মনে হয়, প্রোটনের সঙ্গে ইলেকট্রনও বিকিরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন সত্য সত্যই ধরা পড়েছে Mariner-4 এবং IMP-3-তে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলের বাধা অতিক্রম করে বেলুন, রকেট ও উপগ্রহের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেছে। এর গুরুত্ব গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয়। সৌর বিকিরণের পর্যবেক্ষণ বর্তমানে শুধু গবেষণাগারের বিজ্ঞানীর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ নয়—প্রকৃতপক্ষে এর ব্যবহারিক গুরুত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূর-পাল্লার বেতার যোগাযোগের জন্যে অপরিহার্য পৃথিবীর আয়নমণ্ডল সৌর রঞ্জেন রশ্মি ও অতি-বেগুনী রশ্মির উপর নির্ভরশীল। ফলে এসব রশ্মি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন।

মহাকাশ ভ্রমণের জন্যে জীবনের উপর সূর্যের বিভিন্ন তরঙ্গ ও কণিকার প্রভাব জেনে নিতে হবে। বিমান-চালককে যেমন আবহাওয়া সম্বন্ধে সকল তথ্য সরবরাহ করা হয়, তেমনি মহাকাশ ভ্রমণকারী জাহাজের নাবিক মহাশূন্য সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ না জেনে জাহাজ চালাতে পারেন না। সারা পৃথিবীর যে সব বিজ্ঞানী ও কারিগরেরা এসব অত্যাশ্চর্য ব্যাপারকে সম্ভব করছেন, তাঁদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

চা-পান এবং ধমনী-কাঠিন্য

তাপসকুমার বসু

ধমনী-কাঠিন্য রোগের সঙ্গে চা-পানের কি সম্পর্ক আছে—সে কথা ভেবে অনেকে আশ্চর্য হবেন, বিশেষ করে চা-পানের অপকারিতার কথাই যখন আমাদের বেশী করে জানা আছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে আমেরিকায় এই বিষয়ে যা কাজ হয়েছে তাতে জানা যায়, ধমনীর ঐ রকম অসুস্থ অবস্থায় চা-পানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে এবং সে ভূমিকা উপকারিতের। ধমনী-কাঠিন্য হৃদ্‌রোগের প্রাথমিক অবস্থা—খাদ্যের চর্বিজাতীয় পদার্থ মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে ধমনীর ভিতরে রক্তের গতিপথকে সংকীর্ণ করে তোলে। তারই ফলে প্রথমে রক্তের কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে হয় হৃদ্‌রোগ।

গবেষণার গোড়ার দিকে দু-জন বিজ্ঞানী—পি. অ্যাকিনিয়াজ্ ও জন ইয়ুডকিন মনে করেছিলেন যে, চা কিংবা কফির ক্যাফিন রক্তের কোলেস্টেরল বা ট্রাইগ্লিসারিডকে পরিমাণে বাড়াতে পারে না, যদিও ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। এর কারণ হিসাবে চা কিংবা কফির চিনিকেই দায়ী করা হয়েছিল। কিন্তু লিট্‌ল ও তাঁর সহকর্মীরা 1966 সালে প্রমাণ করেন, রক্তের লিপিডের পরিমাণ কফি খেলে যতটা বাড়ে, চা খেলে ঠিক ততটা বাড়ে না বরং চা ঐ পদার্থকে কিছুটা কমিয়ে দেয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে চীনাদের কথা বলা হয়েছে—চা যাদের অবশ্য পানীয় এবং যাদের ধমনী-কাঠিন্য রোগ ইউরোপিয়ান বা আমেরিকানদের তুলনায় অনেক কম। এমন কি, শুধু চীনারা নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টু সম্প্রদায় এবং মধ্য আমেরিকার নিগ্রোরা ঐ একই কারণে ধমনী-কাঠিন্য রোগের শিকার হয় না। এই ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উই ইয়ুং এবং তাঁর সহকর্মীরা। একদল র‍্যাবিটকে তাঁরা তিন মাস অতিরিক্ত কোলেস্টেরলজাতীয় খাদ্য দিয়েছেন এবং পানীয় হিসাবে দিয়েছেন শুধুমাত্র জল। এর ফলে ঐ প্রাণীগুলি সহজেই ধমনী-কাঠিন্য রোগের শিকার হয়ে পড়লো। কিন্তু পাশাপাশি আর একদল র‍্যাবিটকে ঐ একই রকম খাদ্য এবং পানীয় হিসাবে শুধুমাত্র চা দিয়ে দেখা গেল, তাদের ঐ রোগ খুবই কম হয়েছে। এই সঙ্গে আরো দেখা গেছে যে, চায়ের মধ্যেকার থিওফাইলিন এবং থিওব্রোমিন জলের সঙ্গে মিশিয়ে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করলেও চা-পায়ী র‍্যাবিটদের মত তারা ধমনী-কাঠিন্য রোগকে এড়াতে পারে না। বোঝা গেল, থিওফাইলিন এবং থিওব্রোমিন ছাড়া চায়ের অন্য কোন পদার্থ ধমনীকে কাঠিন্যের হাত থেকে রক্ষা করে। তা-

ছাড়া অন্য একদল র‍্যাবিটকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল জাতীয় খাদ্য এবং পানীয় হিসাবে প্রথম তিন মাস জল ও তারপর দু-মাস চা দিয়ে দেখা গেছে, তাদের ঐ রোগ কম হয়। তবে উপরিউক্ত গবেষকেরা জানিয়েছেন যে, একটা নির্দিষ্ট অবস্থা পেরিয়ে গেলে চা-পান ধমনী-কাঠিন্যের উপর আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আরও মজার কথা—চা-পায়ীদের তুলনায় কফি-পায়ীরা এই রোগের শিকার হন বেশী। একদল কফিপায়ী (আমেরিকান) এবং একদল চা-পায়ীর (চীনা) উপর প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে পরীক্ষা চালিয়ে উক্ত গবেষকেরা দেখেছেন, হৃদ্‌যন্ত্র এবং মস্তিষ্কের ধমনী-কাঠিন্য কফিপায়ী আমেরিকানদের তুলনায় চা-পায়ী চীনাদের মধ্যেই খুব কম দেখা যায়। পরীক্ষায় আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, চর্বিজাতীয় খাদ্যের সঙ্গে কিংবা অব্যবহিত পরেই চা-পান ফলদায়ক।

এই সম্বন্ধে আরো গবেষণা চলছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে চায়ের সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য জানা যাবে।

কৃষি-সংবাদ

সর্পগন্ধা

সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রকৃতির নিয়ম; তাই প্রথম প্রাণের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছিল জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর। এই জরা-ব্যাধি থেকে মুক্তির আশায় আদিম মানুষ ছুটে বেড়িয়েছে বনে-জঙ্গলে, আবিষ্কার করেছে রোগনাশক অসংখ্য লতাগুল্ম। তাই প্রাচীন সুশ্রুত সংহিতা ও আয়ুর্বেদে পাওয়া যায় রোগনাশক বহু লতা-গুল্মের উল্লেখ। সর্পগন্ধাও এরূপ একটি গুল্ম, যার অসীম ক্ষমতার বহুল উল্লেখ আছে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে।

সর্পগন্ধার আবিষ্কারের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। সর্বপ্রথম এক সুইস্ বিজ্ঞানী এই গুল্মের শিকড়ে রিসারপিন নামক উপক্ষারের (অ্যালক্যালয়েড) সন্ধান পান। পরে 1931 সালে ডাঃ সলীমুদ্দিন সিদ্দিকী ও ডাঃ রাফাত হুসেন সিদ্দিকী এই দু-জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই গুল্মে 5টি উপক্ষারের সন্ধান পান, যার হলুদ বর্ণের দুটি উপক্ষারের নাম দেন সারপেনটিন ও সারপেনটিনিন। কিন্তু প্রাণীর উপর এই উপক্ষারের প্রভাব সম্বন্ধে তখনও তেমন সন্তোষজনক তথ্য পাওয়া যায় নি। এরপর গণনাথ সেন, কার্তিকচন্দ্র বসু প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এই উপক্ষার দুটি প্রাণীর রক্তচাপ প্রশমনে কার্যকরী বলে প্রমাণ করেন। পরে এদের আরও গুণ প্রকাশ পায়। এটি রক্তচাপ, উন্মাদরোগ এবং শিশুদের অনিদ্রা রোগের ওষুধ হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সর্পগন্ধাকে একটি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ঔষধি গুল্ম বলে চিহ্নিত করা হয়। এর পর রামনাথ চোপরার তত্ত্বাবধানে কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনে এই গুল্মটির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এবং গবেষণালব্ধ বহু তথ্য প্রচার করা হয়। অল্প দিনের মধ্যেই সর্পগন্ধার শিকড়-চূর্ণ সারপিনা নামে বাজারে ছাড়া হয়। ডাঃ রুস্তম জাল-ভাকিল বহু রক্তচাপের রোগীর উপর এই ওষুধটির গুণাগুণ পরীক্ষা করেন এবং রক্তচাপের যাবতীয় ওষুধের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করেন। এই মূল্যবান গবেষণার জন্যে সম্প্রতি ডাঃ ভাকিলকে 'ভাটনগর' পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়।

এই ওষধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপক্ষার 'রেসারপিনে'র আবিষ্কারের কৃতিত্ব কিন্তু সিবা ওষুধ কোম্পানীর প্লিক্সটার, মালার ও বেইন-এর। প্রতি এক কিলোগ্র্যাম শারীরিক ওজনের জন্যে ·01 মিঃ গ্র্যাম রেসারপিন একজন রোগীকে কয়েক ঘণ্টা নিশ্চল করে রাখতে পারে এবং রক্তচাপ নিম্নমুখী করতে সক্ষম বলে এঁরা প্রমাণ করেন। সিবা কোম্পানী 'সারপাসিল' নামে এটি বাজারে ছাড়েন। আমেরিকার বাজারে এর নাম রাউডিকসিন। এই উপক্ষার বর্তমানে পৃথিবীর নানা দেশে নানা নামে প্রচলিত।

চিরসবুজ এই গুল্মটি হিমালয়ের পাদদেশে, পশ্চিম বাংলা ও আসাম সীমান্তে, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতাঞ্চলে এবং ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার নানা স্থানে জন্মায়। এপর্যন্ত মোট 131 জাতের সর্পগন্ধার সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে পাঁচটি ভারতে জন্মায়। এই গুল্ম লম্বায় ·9 মিটার পর্যন্ত হয় এবং শিকড় গোড়ার দিকে প্রায় 15 সেঃ মিঃ পর্যন্ত স্থূল হতে পারে। এই শিকড়ে উপক্ষারের মাত্রা 0·8 থেকে 0·3 শতাংশ। শিকড়ের ছালের অংশে এই মাত্রা অনেক বেশী প্রায় 8 গুণ।

মিঃ ভরদ্বাজের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থায় এবং পশ্চিম বাংলায় সিঙ্কোনা ক্ষেত্রের নীচের দিকে 4-5টি বিদেশী জাতের সর্পগন্ধার চাষ এবং এর জন্যে উপযুক্ত মাটি, জলবায়ু প্রভৃতির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষার ফলে যে সব তথ্য জানা গেছে, তা হলো এই যে, সর্পগন্ধা 4·0-6·3 পর্যন্ত পি-এইচ, প্রচুর জৈব সার, হিউমাসযুক্ত এঁটেল বেলেমাটিতে ভাল জন্মায়। এই সব জমিতে প্রাপ্য ফসফরাস ও পটাশের ভাগ যথাক্রমে 21·6 থেকে 54·4 পাউণ্ড এবং 90 থেকে 320 পাঃ পর্যন্ত থাকে। এটি উষ্ণ, উপউষ্ণ অঞ্চলে, যেখানে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ও 50° ফাঃ থেকে 100° ফাঃ তাপমাত্রায় জন্মাতে দেখা যায়।

এই গুল্মটির গুণ এবং চাষ-আবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ না হলেও ব্যবসায়গত উদ্দেশ্যে এর চাষ সম্বন্ধে চাষীরা এখনও উৎসাহী নন এবং সরকারীভাবেও এতদিন পর্যন্ত এসম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিকল্পনা গৃহীত হয় নি। অথচ এটির চাষে লাভের অঙ্ক অন্য যে কোন ফসলের সমকক্ষ হতে পারে। ভারতে এর প্রতি কে. জি. শিকড়ের মূল্য 12-15 টাকা। তাছাড়া বিদেশী বাজারেও এর প্রচুর চাহিদা আছে এবং রপ্তানীর দ্বারা প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আমদানীর সুযোগ রয়েছে। উপযুক্ত চাষের অভাবে ভারত থেকে এর রপ্তানীর পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্যান্য দেশ সে জায়গা অধিকার করে নিচ্ছে। অপরিকল্পিত সংগ্রহের কারণে এর সংখ্যাও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে, যার ফলে এটি সংগ্রহের ব্যাপারে অধুনা অনেক বিধিনিষেধ জারী করা হয়েছে।

সর্পগন্ধার চাষ—নানা প্রকার মাটি এবং আবহাওয়াতেই সর্পগন্ধা জন্মায়। এর চাষের জন্যে গভীরভাবে লাঙল দিয়ে জমি বেশ মিহি করে তৈরি করে নিতে হয়। জমিতে প্রচুর গোবর সার ও পাতা সার মিশিয়ে দিতে হবে। এক হেক্টর জমির জন্যে 4-5 কে. জি. বীজের প্রয়োজন হয়। তাজা বীজে ভাল গাছ হয়। প্রথমে বীজ 24 ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। জলে ভেসে-ওঠা বীজ ফেলে দিতে হয় এবং পরে বীজ 24 ঘণ্টা সময় ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে বীজের উপরের শক্ত খোসা কেটে ফেলে এপ্রিল থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত 30 সেঃ মিঃ দূরে দূরে লাগিয়ে দিতে হয়। বীজ লাগাবার পর বীজতলা অনবরত ভিজা থাকা দরকার। বীজতলা অংশতঃ ছায়াময় হলে অঙ্কুরোদগম ভাল হবে। বীজ অঙ্কুরিত হতে

প্রায় তিন সপ্তাহ লাগে, আবার কখনও আট সপ্তাহ পর্যন্ত দেরী হতেও দেখা গেছে। চারা 20 সেঃ মিঃ-এর মত লম্বা হলে (প্রায় দু মাস পর) ক্ষেতে লাগাবার উপযুক্ত হয়। বীজ ছাড়া শিকড়, শিকড়ডাল অথবা ডালকলমও লাগানো চলে। 20 সেঃ মিঃ লম্বা ডাল জুন-জুলাই মাসে লাগালে 40 শতাংশ ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদগম হয়। আই. বি. এ. (ইণ্ডোল ব্যাসেটিক অ্যাসিড), এন. বি. এ (বেণযেলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড) প্রভৃতি হরমোন প্রয়োগে অঙ্কুরোদ্গম আরো ভাল হয়। তবে বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে শিকড়ের অংশ বেশী হয় বলে দেখা গেছে।

সর্পগন্ধা প্রায় দু-মাস সময় জমিতে থাকে। জমিতে হেক্টর প্রতি 10 টন খামারের সার প্রাথমিক লাঙল দেবার সময় ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। তাছাড়া 45 কে.জি. ফসফেট, 25 কে.জি. পটাশ এবং 12 কে.জি. নাইট্রোজেন জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এর পর বীজতলা থেকে চারা 60×60 সেঃ মিঃ দূরত্বে লাগালে এর মাঝে অন্য ফসলের মিশ্রচাষও করা চলবে। আর মিশ্রচাষ না করলে 35×45 সেঃ মিঃ দূরত্বে চারা লাগালেই চলবে। সেচ প্রয়োজনমত গরমকালে সপ্তাহে এক দিন এবং বছরে পাঁচ সাত বার মধ্যবর্তীকালীন চাষ ও পরিচর্যা করলেই চলবে। হেক্টরে প্রতিবার 10 কে. জি হিসাবে দু-বার, একবার অক্টোবর মাসে এবং আরেকবার মার্চ মাসে নাইট্রোজেন সার চাপান দিতে হবে। শীতের প্রারম্ভে গাছ তুলে এর শিকড় রোদে ততক্ষণ পর্যন্ত শুকাতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত জলীয় অংশ 8-12 শতাংশে না দাঁড়ায়।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের মিঃ শাহ ভুবনেশ্বরে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভুট্টা, জোয়ার, বাজী বা শুঁটিজাতীয় ফসলের সঙ্গে মিশ্রচাষে সর্পগন্ধার শিকড়ের উৎপাদন কম হয়। লতাজাতীয় ফসল যেমন বরে বা মিষ্টি আলুর চাষও এর সঙ্গে করা ঠিক নয়, কারণ এদের লতাপাতা বেড়ে গিয়ে সর্পগন্ধা গাছকে আবৃত করে ফেলতে পারে, তবে ওলকপি, বেগুন প্রভৃতির মিশ্রচাষ সর্পগন্ধার সঙ্গে করা চলবে।

15 মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের গাছে উপক্ষারের পরিমাণের সামান্য তারতম্য দেখা গেছে। 15 মাস বয়সের গাছের উপক্ষার ওষুধ তৈরির কাজে অনায়াসে লাগানো চলে। মিঃ শাহ 1 বছর বয়সের গাছ থেকে 828 কে. জি (টাটকা) পর্যন্ত শিকড় পেয়েছেন। তবে দু-বছরের গাছ থেকে হেক্টর প্রতি 800 থেকে 1,000 কে. জি পর্যন্ত হাওয়ায় শুষ্ক শিকড় পাওয়া যেতে পারে।

এতদিন পর্যন্ত সর্পগন্ধা এবং অন্যান্য ওষধির চাষ সম্বন্ধে দেশ উদাসীন থাকলেও অধুনা ঔষধিযুক্ত লতাগুল্ম চাষের পরিকল্পনায় ইন্দোর, হলদোয়ানী, জম্মু প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট প্রকল্পে সর্পগন্ধার চাষ ও অন্যান্য নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ সুরু করা হয়েছে। তাছাড়া দেরাদুন, লক্ষ্ণৌ, ভুবনেশ্বর, জব্বলপুর, মহীশূর ও আমনগরেও এর জন্যে ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার পক্ষের এই উদ্যোগ অনতিবিলম্বে চাষীদের মধ্যেও ঔষধি লতাগুল্ম চাষের প্রেরণা সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি ভবন, নতুন দিল্লী]

ব্যাঙের ছাতা

বর্ষার পর রোদহীন স্যাঁতসেঁতে জায়গায় যে কোন মৃত জৈব বস্তুর উপর হঠাৎ গজিয়ে ওঠে ফুঁইফোড় ছত্রাকের দল। চলিত কথায় এগুলিকে আমরা ব্যাঙের ছাতা বললেও আসলে কিন্তু ব্যাঙের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্কই নেই। বোধ হয় বর্ষাকালে ব্যাঙের উপস্থিতি ও ছোট

ছোট ডাঁটির উপর গোল ছাতার আকারের মাথা নিয়ে গজিয়ে ওঠা ভুঁইফোড় ছত্রাক—এই দুইয়ে মিলে এদের এমন মজার নামকরণ হয়ে থাকবে। যাহোক ব্যাঙের ছাতা আসলে এক ধরণের ছত্রাকশ্রেণীর উদ্ভিদ। ছত্রাক-বিজ্ঞানে (মাইকোলজি) প্রায় 100,000 প্রজাতির ছত্রাকের কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া আরও অসংখ্য প্রজাতির ছত্রাক আছে বলে মনে করা হয়। মদ চোলাই বা গাঁজানোর কাজে ব্যবহৃত ঈষ্ট, গম ও অন্যান্য ফসল আক্রমণকারী মরিচা (রাষ্ট) ও মিলডিউ, রুটি বা অন্য খাদ্যবস্তু নষ্টকারী মোল্ড এবং রোদহীন জায়গায় নানা মৃত জৈব বস্তুর উপর গজানো মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা—এই সবগুলিই ছত্রাক বা কাছাই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা দু-রকমের হয়। একটি বিষাক্ত, অন্যটি খাদ্যোপযোগী। বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা সাধারণতঃ জালতির মত এবং ভঙ্গুর হয়ে থাকে। সাদা, কোমল ও অপেক্ষাকৃত শক্ত বিশিষ্ট শাঁস ব্যাঙের ছাতা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে। সাধারণ লোকের পক্ষে বিষাক্ত ও ভোজ্য ব্যাঙের ছাতার তফাৎ করা অনেক সময়ই শক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই খাদ্যরূপে নির্বাচন করবার আগে বেশ সতর্ক হওয়া দরকার।

খাবার যোগ্য মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতার খাদ্যমূল্য খুব বেশী। এতে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের প্রোটিন, নানা ধরণের খনিজ লবণ এবং ভিটামিন বি, সি ও ডি আছে। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হজম করতেও ব্যাঙের ছাতা সাহায্য করে। নিয়াসিন, প্যানটোথেনিক অ্যাসিড প্রভৃতি বি-কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিন এতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তা ছাড়া হাড় ও দাঁত মজবুত করা ও দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি খনিজ লবণ এবং রক্তাল্পতা দূর করবার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় ফোলিক অ্যাসিড এতে বেশ ভাল মাত্রায় আছে। শ্বেতসার বা স্টার্চজাতীয় পদার্থ না থাকায় বহুমূত্র রোগীদের পক্ষে এটি আদর্শ খাদ্য। প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ এই ব্যাঙের ছাতায় স্নেহ ও শর্করাজাতীয় উপাদান খুবই কম থাকবার জন্যে যাঁরা স্বাস্থ্য বজায় রেখে ওজন কমাতে চান তাঁদের পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী।

ব্যাঙের ছাতা সুস্বাদুও বটে। এগুলি বিভিন্ন তরিতরকারী, পোলাও, পকোড়া ও আচারে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের দেশগুলিতে ব্যাঙের ছাতার জনপ্রিয়তা ও চাহিদা খুব বেশী। সেখানে ব্যাপকভাবে এর চাষ করা হয়। আমাদের দেশে এটি বহুল প্রচলিত নয়। উৎপাদন কম হবার ফলে দামও খুব বেশী। এতদিন পর্যন্ত এটি ধনীর খাবার টেবিলেই স্থান পেয়েছে। তবে কিছু দিন আগে সোলানে দেশের বিভিন্ন অংশের কৃষিবিদ্‌দের একটি সম্মেলনে এই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যটি সব স্তরের মানুষের কাছেই সুলভ করে তোলবার জন্যে আরও ব্যাপকভাবে ভোজ্য ব্যাঙের ছাতার চাষ করবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া ব্যাপকভাবে ব্যাঙের ছাতা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানে সরকার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি বিরাট মাশরুম হাউস বা ব্যাঙের ছাতা উৎপাদনের কেন্দ্র খোলবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এখানে আরও ব্যাপকহারে ছাতা উৎপাদনের চেষ্টা করা হবে। এছাড়া উৎপাদনের বিশেষ কৌশল ও পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে। সোলানে ব্যাঙের ছাতা উৎপাদনের যে গবেষণাগারটি আছে, সেটিকেও আরও আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সোলানের পরীক্ষাগারে দেখা গেছে

যে, কিলোগ্রাম প্রতি ব্যাঙের ছাতার উৎপাদনের খরচ বর্তমানে বেশ বেশী পড়ে। তবে আরও ব্যাপকভাবে চাষ করা হলে এই উৎপাদনের খরচ কমবে বলে আশা করা যায়।

বাড়ীর মধ্যে কাঠের বাক্সকোণে কম্পোস্ট ভর্তি করে সহজেই ব্যাঙের ছাতা জন্মানো যেতে পারে। এগুলি অত্যন্ত কোমল ধরণের উদ্ভিদ এবং রোদের আলো একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আবার গুমোট বাতাসহীন ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশেও এরা ভালভাবে জন্মায় না। ছাতা রাখা ঘরে যথেষ্ট বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করে সেগুলি পর্দা বা চট দিয়ে ঢেকে দেওয়া ভাল। শুকনো ঋতুতে সেই পর্দাগুলি ভিজিয়ে দিয়ে ঘর আর্দ্র রাখতে হবে। ধুলা-বালি ও মাছি যেন কোন রকমেই ঘরে ঢুকতে না পারে। গমের খড় ও ভুষি, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, ইউরিয়া ও জিপসাম উপযুক্ত মাত্রায় মিশিয়ে ভাল কম্পোস্ট তৈরি করা যেতে পারে। ব্যাঙের ছাতা জন্মাবার সময় ঘরের তাপমাত্রা 70°-75° ডিগ্রী ফাঃ হওয়া দরকার এবং কোন সময়েই যাতে এই তাপমাত্রা 65° ডিগ্রী ফাঃ-এর নীচে না নামে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি ঠিকমত যত্ন নেওয়া যায় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তাহলে সাধারণতঃ ব্যাঙের ছাতায় কোন রোগ ও পোকার উপদ্রব হয় না।

ব্যাঙের ছাতার চাষ হিমাচল প্রদেশে এখন ক্রমশঃ ব্যাপক ও জনপ্রিয় হচ্ছে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের চেষ্টা চলছে। জনসাধারণের কাছে যারা পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এই খাদ্যবস্তুটিকে আরও পরিচিত ও সুলভ করে তুলতে পারলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এর চাষের পরিধি বিস্তৃত হবে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি ভবন, নতুন দিল্লী]

"অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিম্বা এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস—কোন্‌টা অধিক বিস্ময়কর?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ জগতের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এ জগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই।

জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব। একথা সর্ব্ব সময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নীত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। উর্দ্ধাভিমুখেই শক্তির গতি; আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।" (1895)

আচার্য জগদীশচন্দ্র

প্রাণিবিদ্যায় শ্রেণিবিন্যাস নীতি প্রসঙ্গে

শ্রীত্রিদিবরঞ্জন মিত্র*

ভূমিকা

পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নানা রকমের জড় ও জীব। তাই বলা যায়, বৈচিত্র্যই পৃথিবীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জড়কে জীব থেকে অনায়াসে পৃথক করা যায়। অনুরূপভাবে যে কোন কিছুকেই অন্য একটা থেকে আলাদা করা সম্ভব। যেমন—পড়ার বই, লেখার সামগ্রী, খাবার জিনিস প্রভৃতি। এদের প্রত্যেককে আবার বিশেষ কারণে একাধিক ভাগে ভাগ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ পাঠাগারে বই সাজানো থাকে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি ভাগে। বিজ্ঞানকে আবার রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণিবিভাগ করবার এই প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। আদিম কাল থেকেই মানুষ শত্রু-মিত্র, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতি বিচার করে চলেছে। সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে নিজেদের ইচ্ছামত নামও দিয়েছে। এই প্রচেষ্টা থেকে প্রাণীরাও বাদ যায় নি। তবে সাধারণ লোকে যে ভাবে প্রাণিদের শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণ করেন, তাথেকে প্রাণিবিদ্‌দের প্রথা অনেক তফাৎ। প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণ-বিধি নিয়ে আধুনিক প্রাণিবিদ্যায় গড়ে উঠেছে এক উপবিজ্ঞান অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞান (Taxonomy অথবা Systematics)[1]।

শ্রেণিবিভাগের ইতিহাস

প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণ প্রথা বিজ্ঞানীমহলে অনেক দিন যাবৎ প্রচলিত। যদিও অনেকে বিশ্বাস করেন, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের এই বিষয়ে কিছু অবদান নেই। কিন্তু প্রাচীন যুগের কয়েকজন ঋষি এই বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন**। বৈদিক সাহিত্যে শ্রেণিবিভাগে প্রয়োজনীয় কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়। তাছাড়া চরক প্রাণীদের দৈহিক আকৃতিভিত্তিক, স্বভাবভিত্তিক ও জননভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করেন। সুশ্রুতও চরকের মত বিভিন্নভাবে প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগ করেন। এঁরা ছাড়া প্রশস্তপাদ, পাতঞ্জল, নারায়ণ, দালভ্য, উমাস্বাতী, হংসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ নানাভাবে শ্রেণিবিভাগ করেন। উমাস্বাতী প্রাণিকুলকে প্রথমে ইন্দ্রিয় সংখ্যাভিত্তিক চার ভাগ করেন। তিনি চতুর্থ ভাগে মেরুদণ্ডী কুলকে জন্মভিত্তিক অণ্ডজ, জরায়ুজ ও পোতজ—এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। নারায়ণ পতঙ্গের শ্রেণিবিভাগের সময় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিন্তা করতেন।

(ক) গায়ের রং, (খ) ডানা, (গ) ডানার আকৃতি, (ঘ) পা, (ঙ) মুখ ও তৎসংলগ্ন অঙ্গ, (চ) নখর, (ছ) লোম, (জ) দেহের পিছনে অবস্থিত হুল, (ঝ) পতঙ্গ কর্তৃক উৎপাদিত শব্দ, (ঞ) আকার, (ট) দৈহিক গঠন, (ঠ) জননেন্দ্রিয়, (ড) বিষ ও অন্যের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অ্যারিস্টটলকে

---

1. কোন কোন বিজ্ঞানী Taxonomy ও Systematics কথা দুটির ভিন্ন অর্থ করলেও সাধারণভাবে এদের এক অর্থে ব্যবহার করা হয়।

* ভারতের প্রাণিসমীক্ষা, কলিকাতা-16

** J. L. Bhaduri, K. K. Tiwari & B. Biswas (1972) Zoology: (Concise history oi sciences in India), Indian National Science Academy.

প্রাণিবিদ্যার জনক বলা হয়। প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতিতে তাঁরও অবদান আছে। তবে তিনি প্রাণিকুলকে কোনরকম ভাগ করে দেখান নি। তাঁর রচনার মধ্যে প্রাণীদের সম্পর্কে যে সকল কথা পাওয়া যায়, তার দ্বারা প্রাণিজগৎকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়—(ক) এনাইমা (Enaima)—লাল রক্তযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী : (1) চতুষ্পদী জরায়ুজ, (2) অণ্ডজ (পাখী, সরীসৃপ, উভচর ও মৎস্য), (খ) অ্যানাইমা (Anaima) : অমেরুদণ্ডী প্রাণী। ডিম ও অন্য প্রকার জন্ম পদ্ধতিকে ভিত্তি করে অ্যানাইমাকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হয় : (1) সেফালোপোডা : অক্টোপাস, (2) কবচী বা ক্রাসটেসিয়া : চিংড়ি, (3) পতঙ্গ ও মাকড়সা, (4) কম্বোজ বা মোলাস্কা : শঙ্খ, ঝিনুক, (5) একাইনোডার্মাটা : স্টারফিশ, (6) স্পঞ্জ ও এককোষী প্রাণী।

প্লিনী (Pliny) অ্যারিস্টটলের মতকে অগ্রাহ্য করে প্রাণীদের বাসস্থান অনুযায়ী, (1) স্থলচর, (2) জলচর ও (3) খেচর—এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অ্যারিস্টটলের মতকেই সমর্থন করতেন। অ্যারিস্টটলের পর জন রে (John Ray, 1627-1705) কৃত শ্রেণিবিভাগ বিশেষভাবে বিখ্যাত। এঁদের পর সুইডেনের ক্যারোলাস লিনীয়াসের (Carolus Linnaeus, 1707-1778) নাম করা যায়। লিনীয়াস জন রে অনুসৃত পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি (1758) প্রাণিজগৎকে (1) স্তন্যপায়ী, (2) পাখী, (3) উভচর (উভচর ও সরীসৃপ), (4) মাছ, (5) পতঙ্গ এবং (6) অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী—এই ছয় ভাগে বিভক্ত করেন। লিনীয়াসের শ্রেণিবিভাগে মেরুদণ্ডী প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। লামার্ক (J. B. M. Lammarck, 1744-1832) প্রাণিজগৎকে প্রথমে (1) মেরুদণ্ডী ও (2) অমেরুদণ্ডী—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পরে মেরুদণ্ডীকে চার ভাগে ও অমেরুদণ্ডীকে দশ ভাগে বিভক্ত করেন। যদিও অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে, জটিলতার ভিত্তিতে প্রাণিজগৎ বিভিন্ন ধাপে সাজানো আছে, কিন্তু লামার্কই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে ক্রমাভিব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপন করেন। কুভিয়ে (G. Cuvier, 1769-1832) লামার্কের অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করতেন না। তিনি প্রাণিজগৎকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। চার্লস্ ডারউইনও (C. Darwin, 1809-1882) শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে ক্রমাভিব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। এঁরা ব্যতীত বহু বিজ্ঞানী প্রাণিজগৎকে ও প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রাণিকুলকে নানা ভাবে বিভক্ত করেছেন।

গ্রীক দার্শনিকদের যুগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা একটা অথবা কয়েকটা প্রাণীর দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে (অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও তাদের নানা রকম পরিবর্তনকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে) প্রজাতি নির্ণয় করতেন। উক্ত মতানুযায়ী প্রজাতি নির্ণয়ে প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও স্বভাবের জন্যে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তা বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। কিন্তু প্রাণিবিদ্যার অন্যান্য শাখার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতি নির্ণয়ের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয় এবং বর্তমান যুগে প্রাণীর মধ্যে যত প্রকার পরিবর্তন সম্ভব (দৈহিক, চারিত্রিক, শারীরতাত্ত্বিক প্রভৃতি) তাদের সকলকেই গ্রাহ্য করে প্রজাতি ও তার উপপ্রজাতি (Subspecies) নির্ণয় করা হয়। আধুনিক কালে কয়েকজন বিজ্ঞানী বহু বিতর্কিত 'সাংখ্যিক শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতি'র (Numerical taxonomy) কথা বলছেন।[2] ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রাণীর সমস্ত

---

2. এঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে লিনীয়াসের সমসাময়িক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অ্যাডানসনের (M. Adanson, 1727-1806) চিন্তাধারার মিল আছে। সিম্পসনের (G.G. Simpson) মতে, অ্যাডানসনের শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতি লিনীয়াসের পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক যুক্তিসম্মত হলেও সাংখ্যিক শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতির সমর্থকদের মতের অনেক ত্রুটি আছে।

বৈশিষ্ট্যকে সমান গুরুত্ব দান করে, কমপক্ষে চল্লিশটি বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে রাশি-বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখা উচিত পরীক্ষাধীন প্রাণীটির মধ্যে পূর্বে আবিষ্কৃত কোন্ প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্য অধিক সংখ্যায় রয়েছে। যে প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্য বেশী সংখ্যায় থাকবে, প্রাণীটি সেই প্রাণিকুলের অন্তর্ভুক্ত হবে; অর্থাৎ প্রাণীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যার হারের উপর ভিত্তি করে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসগত স্থান নির্ণয় করতে হবে। তবে এই শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতিতে প্রজাতির পূর্ব ইতিহাসকে (অভি-ব্যক্তিগত) উপেক্ষা করা হয়। কয়েকজন বিজ্ঞানী জীবরসায়নের সাহায্যে শ্রেণিবিভাগের কথা বলেছেন। আমাডন (D. Amadon) অল্পকাল আগে (1970) প্রজাতি নির্ণয়ে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন।

শ্রেণিবিভাগের উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে প্রজাপতির সংখ্যা[3] অগণিত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন একটি অংশমাত্র। প্রতি বছরই কয়েক শ' নতুন প্রজাতির আবিষ্কার হচ্ছে।[4] যেমন—লিনীয়াস 1758 খৃষ্টাব্দে 'সিস্টেমা নাচুরী' (Systema Naturae) গ্রন্থে 4235টি প্রজাতির বিবরণ দেন। 1859 খৃষ্টাব্দে আগাসিজ (L. Agassiz) ও ব্রন (Bronn) প্রজাতির সংখ্যা দেন 1,29,370; মায়ার (E. Mayr, 1953) 39টি প্রাণিকুলের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা দেন 1,120,310 এবং সিমন (W. Siemon) ও ক্যাম্পবেল (A. Campbell) 1954 খৃষ্টাব্দে 13টি প্রাণিকুলের জীবিত ও শিলীভূত (Fossilised) প্রজাতির সংখ্যা দেন 10,22,250।

অতএব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রতিটি প্রাণীকে পৃথক পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করা কারো সীমিত জীবনকালে সম্ভব নয়। কিন্তু দৈহিক, শারীর-তাত্ত্বিক, চারিত্রিক প্রভৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে ভিত্তি করে প্রাণীদের শ্রেণি-বিভাগ করলে প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সহজতর হয়ে যায়। কারণ একটা প্রজাতির অন্তর্গত কয়েকটা প্রাণীকে পর্যবেক্ষণ করলে উক্ত প্রজাতির অন্তর্গত সকল প্রাণীকেই মোটামুটিভাবে জানা হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ একজন সাধারণ ব্যক্তি যখন কোন প্রাণীর নাম করতে গিয়ে 'বাঘ' বলেন, তখন বাঘের আকৃতি ও স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করে বলেন। কিন্তু যখন কোন প্রাণিবিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক আলোচনায় 'বাঘ' বলেন তখন তিনি বাঘের সঙ্গে অন্য প্রাণীর, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে চিন্তা করে বলেন। অতএব প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রাণিবিদ্যার সকল শাখার সাহায্যে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে অভিব্যক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাণীর জাতিত্ব নির্ধারণ ও তার সাহায্যে শ্রেণিবিন্যাসই একমাত্র উপায়।

ট্যাক্সন কি

সাধারণতঃ কোন কিছুকে টুকরা টুকরা করে তাদের প্রত্যেকটা অংশকে একটা ভাগ বলা হয়। প্রাণীদের জাতিত্বের ঘনিষ্ঠতাকে ভিত্তি করে প্রাণিজগৎকে যখন কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করা হয়, তখন প্রত্যেক ভাগকে বলে ট্যাক্সন (Taxon)। ভূগোলেও এই রকম ভাগ দেখা যায়। যেমন, একটা রাজ্যকে কয়েকটা বিভাগে, বিভাগকে জেলায়, জেলাকে মহকুমায়, মহকুমাকে থানায়, থানাকে গ্রামে এবং গ্রামকে পাড়ায় বিভক্ত করা হয়। প্রাণিরাজ্যকে এককোষী ও বহুকোষী—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

3. প্রজাতি ও প্রাণীর অর্থ এক নয়। একটা প্রজাতির অন্তর্গত একাধিক প্রাণী থাকে।

4. পাখী ও স্তন্যপায়ী কুলের নতুন প্রজাতি এখন খুব কম আবিষ্কার হয়।

এককোষীদের সাধারণতঃ একটা পর্বের অন্তর্গত করা হয় এবং বহুকোষী প্রাণীদের কয়েকটা পর্বে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক পর্বকে শ্রেণীতে, শ্রেণীকে বর্গে, বর্গকে গোত্রে, গোত্রকে গণে এবং গণকে প্রজাতিতে বিভক্ত করা হয়। কোন কোন সময় পর্বের নীচে ও অন্য ট্যাক্সনের উপরে ও নীচে কয়েকটা ট্যাক্সনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন উপরেরটার নামকরণ করবার জন্যে ট্যাক্সনটির আগে 'অধি' এবং নীচেরটিকে নামকরণ করবার জন্যে 'উপ' শব্দযোগ করতে হয়। যেমন, অধিশ্রেণী (Super class) এবং উপশ্রেণী (Sub-class), অনুরূপভাবে অধিগোত্র ও উপগোত্র নামকরণ করা যায়।[5] ভূগোল ও প্রাণিবিদ্যার তফাৎ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে ভাগ করা হয় প্রশাসনের সুবিধার্থে বিভাগের আয়তন অনুযায়ী; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাগ করা হয় জ্ঞাতিদের ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী। লিনীয়াস (1758) কেবলমাত্র রাজ্য, শ্রেণী, বর্গ, গণ ও প্রজাতি নিম্নগামী এই কয়েকটি ট্যাক্সনকে গ্রহণ করতেন। পরে অন্য নিসর্গী পর্ব ও গোত্র ঐ সকল ট্যাক্সনের সঙ্গে যোগ করেন। লিনীয়াস শুধু শ্রেণিবিভাগ ও প্রজাতির নামকরণ করেই ক্ষান্ত হন নি; তিনি গণ ও প্রজাতির সংজ্ঞাও নির্ধারণ করেন এবং তা 1735 খৃষ্টাব্দে সিস্টেমা নাটুরীর প্রথম সংস্করণে প্রকাশ করেন। গণ সম্পর্কে লিনীয়াসের ধারণার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতের মিল থাকলেও প্রজাতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভুল ছিল। প্রাক্-অভিব্যক্তি যুগের অন্যান্য নিসর্গীদের[6] মত তিনিও বিশ্বাস করতেন সৃষ্টির আদিতে যে কয়টি প্রজাতি বিদ্যমান ছিল, চিরকাল তাই থাকবে এবং প্রত্যেক প্রজাতি সৃষ্টির পর কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তাঁর মতের পরিবর্তন হয় এবং তিনি বলেন, প্রকৃতিতে বিচরণকারী প্রজাতি-দের জননের দ্বারা উদ্ভূত সঙ্কর সন্তান থেকে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি সম্ভব।* অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত নতুন নতুন জায়গায় অভিযান চালাবার ফলে বহু নতুন প্রজাতির আবিষ্কার হয়। ঠিক ঐ সময় লামার্ক, ডারউইন, ওয়ালেস্ (A. R. Wallace, 1823-1913) প্রভৃতির অভিব্যক্তিবাদ প্রচার এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে মরগান (T. H. Morgan, 1866-1945), মুলার (H. J. Muller, 1890-1967) প্রভৃতি কর্তৃক মেণ্ডেলের (J. G. Mendel, 1822-1884) সূত্রগুলির পুনরাবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, নানা কারণে সর্বযুগে নতুন প্রজাতির অভিব্যক্তি সম্ভব।

প্রজাতি (Species) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞানের মূল কথা। বর্তমান যুগের জ্ঞানানুযায়ী প্রজাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বিশেষ দুরূহ হলেও মায়ার প্রজাতির জনন-ভিত্তিক যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, সাধারণভাবে তাই গ্রাহ্য হয়েছে। ঐ সংজ্ঞা নিম্নরূপ—

"পারস্পরিক যৌন জননের দ্বারা জননক্ষম সন্তান উৎপাদন করে (বা করতে পারে) এবং প্রায় অনুরূপ প্রাণীদের সঙ্গে জননে অক্ষম—এরূপ কতকগুলি প্রাণীর সমষ্টিকে বলে প্রজাতি।" যেমন—সব পাতিকাকই এক প্রজাতির। কারণ এরা পরস্পর যৌন জননের দ্বারা জননক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। অবশ্য মালদ্বীপের পাতিকাক যেহেতু বাংলা দেশের অনেক দূরে থাকে, তাই তারা বাংলা দেশের পাতিকাকের সঙ্গে যৌনমিলনে অক্ষম। কিন্তু কোন দিন পাশে আনলে জননক্ষম সন্তান উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে দাঁড়কাক পাতিকাকের পাশাপাশি থাকে বাসা তৈরি

5 34টির বেশী ট্যাক্সন্ সংখ্যা করা সম্ভব হয় নি (G. G. Simpson, 1961)।

6. জন রে ক্যুভিয়েরের মত প্রজাতির সৃষ্টির স্থিতিশীল মতের গোঁড়া বিশ্বাসী ছিলেন না।

* P. A. Moody (1962), Introduction to Evolution

করলেও তারা কখনো পরস্পরের সঙ্গে যৌন মিলন করে না। এই কারণে দাঁড়কাক ও পাতিকাক দুটি ভিন্ন প্রজাতি। অনুরূপভাবে কিছু প্রাণি-কুলের মধ্যে (যেমন কাক) একাধিক প্রজাতি আছে। প্রকৃতিতে সাধারণতঃ দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কদাচিৎ মিলন ঘটে এবং তাদের উৎপন্ন সঙ্কর সন্তান সাধারণতঃ জননক্ষম হয় না।[7] এদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ খচ্চর। কারণ গাধা ও ঘোড়া একই গণের অন্তর্ভুক্ত হলেও দুটি ভিন্ন প্রজাতির। বলাবাহুল্য ভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে বহিরাকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে মাঝে মাঝে একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে এবং একই গণের অন্তর্ভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির দৈহিক আকৃতিতে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। তখন প্রজাতি দুটিকে বলে সিবলিং প্রজাতি (Sibling species)। এই সাদৃশ্য উদ্ভবের কারণ জানা যায় নি। পক্ষান্তরে এক প্রজাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যেও নানা বহিরাকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—মানুষের মধ্যে চীনা বা জাপানীকে নিগ্রো বা বাঙালী থেকে বহিরাকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী পৃথক করা যায়। অনুরূপভাবে বাঘকেও সিংহ থেকে বহিরাকৃতি-গত পার্থক্যের সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু বাঘ ও সিংহী এবং সিংহ ও বাঘিনীর মিলনে জননক্ষম সন্তান উৎপন্ন হয় না, সেহেতু এরা ভিন্ন প্রজাতির। অন্য দিকে মানুষের মধ্যে যে কোন জাতির পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে যে কোন জাতির পুরুষ বা স্ত্রীর মিলনে জননক্ষম সন্তান উৎপন্ন হয়। তাই সমগ্র মানবজাতি একটা প্রজাতি (Homo sapiens)। সুতরাং বলা যায়, প্রজাতি নির্ণয়ে জননগত বিচ্ছিন্নতাই বিশেষ বিচার্য বিষয়।[8] যখন কোন প্রজাতির অন্তর্গত এক 'আঞ্চলিক অধিবাসী সমষ্টি'কে (Local population) ঐ প্রজাতির অন্য আঞ্চলিক অধিবাসী সমষ্টি থেকে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে পৃথক করা যায় তখন ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক অধিবাসী সমষ্টিকে একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন উপপ্রজাতি বলা হয়। উপপ্রজাতিকে অনেক সময় ভৌগোলিক জাতিও বলা হয়। পর-জীবীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রজাতির পোষক (Host) হলে এক ভৌগোলিক সীমারেখায় উপপ্রজাতি দেখা দেয়। মানুষের প্রজাতিকে কোন উপপ্রজাতিতে ভাগ করা হয় না।[9] "নিকট জ্ঞাতিসম্পন্ন প্রজাতিদের সমষ্টিকে বলা হয় গণ।" কোন কোন সময় একই গণের প্রজাতিদের ঘনিষ্ঠতার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তখন ঘনিষ্ঠতার তারতম্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা নিজেদের সুবিধার জন্যে ঐ গণকে একাধিক গণে বিভক্ত করেন। অনুরূপভাবে জ্ঞাতিদের ঘনিষ্ঠতাকে ভিত্তি করে গোত্র, বর্গ, শ্রেণী ও পর্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়। বলা বাহুল্য অভিব্যক্তির ফলে প্রকৃতিতে কেবলমাত্র প্রজাতিরই আবির্ভাব ঘটে—গণ, গোত্র, বর্গ, শ্রেণী বা পর্বের আবির্ভাব ঘটে না। প্রজাতির উপরে সব কটা ট্যাক্সনই কাজের সুবিধার্থে বিজ্ঞানীদের কল্পনাপ্রসূত।

7. প্রকৃতিতে ফড়িংদের (Odonata) মধ্যে ভিন্ন প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রীর প্রাক-সঙ্গম মিলন (Tandem flight) মাঝে মাঝে দেখেছি। বীক্ষণাগারে জলপায়ী জীবের ভিন্ন প্রজাতির পুরুষও স্ত্রীর মিলনে জননক্ষম সন্তান হলেও প্রকৃতিতে দেখা যায় নি।

8. জননগত বিচ্ছিন্নতা কখন কিভাবে আরম্ভ হয়, তা জানা যায় নি। তবে এটি একমাত্র একলিঙ্গ প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্ভব। উভলিঙ্গ প্রাণীদের প্রজাতি নির্ণয়ের বিষয় এখনো বিতর্কমূলক অবস্থায় আছে। জননভিত্তিক সংজ্ঞার সীমিতাবস্থা এড়াবার জন্যে কয়েকজন বিজ্ঞানী অভিব্যক্তিভিত্তিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। আবার কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রজাতির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্যে জীবরসায়নের সাহায্য গ্রহণের কথা বলেছেন।

9) নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের প্রজাতিকে কয়েকটা জাতিতে (Race) ভাগ করেছেন।

শ্রেণিবিভাগের মত ও পথ

বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে সকল কিছুরই শ্রেণিবিভাগ করা হয় সাদৃশ্যযুক্ত লক্ষণগুলি একত্রিত করে। প্রাণিবিদ্যায় শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব ও প্রকারভেদ নির্ভর করে যে লক্ষণ বা লক্ষণগুলিকে শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি ধরা হয়, তার উপর। সাধারণ বাসস্থান ও জীবনযাত্রার ভিত্তিতে যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়, তাকে বলে 'জীবনানুগ শ্রেণিবিভাগ।' উদাহরণস্বরূপ গ্রিসীয় শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতিতে একটি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে প্রাণীদের পারস্পরিক প্রাকৃতিক জ্ঞাতিত্ব বিচ্ছিন্ন হয়। যেমন—খেচর শ্রেণীতে পড়ে বাদুড়, পাখী, ফড়িং প্রভৃতি। স্থলচর শ্রেণীতে পড়ে মানুষ, উটপাখী, কাঁকড়াবিছা প্রভৃতি। জলচর শ্রেণীভুক্ত হয় তিমি, কুমীর, মাছ প্রভৃতি। প্রাণীদের অভিব্যক্তির ইতিহাস, দৈহিক গঠন, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি অনুযায়ী বাদুড়, মানুষ ও তিমি এক শ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু উপরিউক্ত শ্রেণিবিভাগের ফলে তাদের এই স্বাভাবিক জ্ঞাতিত্ব বিচ্ছিন্ন হয়। প্রাণীদের প্রাকৃতিক জ্ঞাতিত্ব বিচ্ছিন্ন হয় বলে এই প্রকার শ্রেণিবিভাগকে বলে কৃত্রিম শ্রেণিবিভাগ (Artificial classification)। পক্ষান্তরে যে শ্রেণিবিভাগের ফলে প্রাণীদের প্রাকৃতিক জ্ঞাতিত্বের আভাস পাওয়া যায়, তাকে বলে প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাগ (Natural classification)। আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।[10] ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করতে হলে অভিব্যক্তির মাধ্যমে দেশ, কাল ও আবহাওয়ার ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন ট্যাক্সনের অন্তর্গত প্রাণীদের যে পরিবর্তন এসেছে, তাদের মধ্যে কোন্ বৈশিষ্ট্যটি প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ও কোন্টি প্রাপ্ত নয়, সেই বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পরিবর্তিত দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করেছেন।

(ক) সমসংস্থা (Homology): এক পূর্বপুরুষ[11] থেকে উদ্ভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিকুলের নানা অঙ্গের গঠনের সদৃশাবস্থা। যে সকল অঙ্গের ঐ অবস্থা দেখা যায়, তাদের বলে সমসংস্থাঙ্গ। যেমন—বানর, বনমানুষ ও মানুষের হাত ও পা। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের গঠনসাদৃশ্য আছে ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে এদের এক পূর্বপুরুষ একই ছিল।

(খ) হোমোপ্লাসী (Homoplasy): ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিকুলের দৈহিক গঠন ও আকৃতির (প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে না পাওয়া) সদৃশাবস্থাকে বলে হোমোপ্লাসী। সমান্তরালতা, সমকেন্দ্রিতা, অনুকৃতি, সমবৃত্তি প্রভৃতি হোমোপ্লাসীর অন্তর্গত।

(1) সমান্তরালতা (Parallelism): এক পূর্বপুরুষের দৈহিক গঠনভিত্তিক অথবা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গঠিত একাধিক প্রাণিকুলের অঙ্গের গঠনের সদৃশাবস্থার স্বাধীনভাবে উদ্ভবকে বলে সমান্তরালতা। বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলে সমান্তরাল। যেমন—দক্ষিণ আমেরিকার সজারু ও আফ্রিকার সজারুর বৈশিষ্ট্যে মিল দেখা যায়, কারণ দু-জনেরই পূর্বপুরুষ (সজারু নয় এমন এক জীব) ছিল এক। এদের সমান্তরাল বৈশিষ্ট্যগুলিও পরিস্ফুটিত হয়েছে স্বাধীনভাবে।

10. লিনীয়াস অনেক সময় অজ্ঞাতসারে কৃত্রিম শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন (G. G. Simpson, 1961)।

11. প্রাণিবিদ্যায় 'এক পূর্বপুরুষ' (Common ancestor) বলতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে প্রাণিকুলের বিবর্তনের ফলে একাধিক প্রজাতির আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে, তাকে বোঝায়। যেমন—প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপকে আদিম পাখী ও স্তন্যপায়ী জীবের পূর্বপুরুষ বলা হয়।

(2) সমকেন্দ্রিতা (Convergence) : ভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত, বিশেষ কোন অবস্থার (যেমন খাদ্যাভ্যাস, আত্মরক্ষা প্রভৃতি) সঙ্গে খাপ খাওয়াবার ভিত্তিতে গঠিত একাধিক প্রাণিকুলের দৈহিক আকৃতির সদৃশাবস্থাকে বলে সমকেন্দ্রিতা। বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলে সমকেন্দ্রিক। যেমন—তাসমানিয়ার নেকড়ে ও সাধারণ নেকড়ের আকৃতির মিল দেখা যায়। ঐ সাদৃশ্য একই রকম খাদ্যাভ্যাসের জন্যে উদ্ভূত হয়েছে, যদিও উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে আবির্ভূত হয়েছে।

(3) অনুকৃতি (Mimicry) : পৃথক পৃথক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিকুলের রূপসাদৃশ্যকে বলে অনুকৃতি। পরের রূপ অনুকরণ-

(4) সমবৃত্তি (Analogy) : পৃথক পৃথক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত একাধিক প্রাণিকুলের বিশেষ অঙ্গের (বিশেষ কোন কাজের জন্যে) সদৃশাবস্থাকে বলে সমবৃত্তি। যেমন—পাখী ও প্রজাপতির ডানা। উভয়েই ওড়বার কাজের সুবিধার জন্যে তৈরি হলেও আভ্যন্তরীণ গঠনে কোন মিল নেই।

সমসংস্থা, সমান্তরালতা ও সমকেন্দ্রিতার তুলনা (1, 2নং চিত্র)

প্রাণীদের দৈহিক গঠনের এই তিন প্রকার সদৃশাবস্থাই শ্রেণিবিভাগের সময় বিচার্য। সমসংস্থার সঙ্গে সমান্তরালতার সাদৃশ্য বেশী থাকলেও
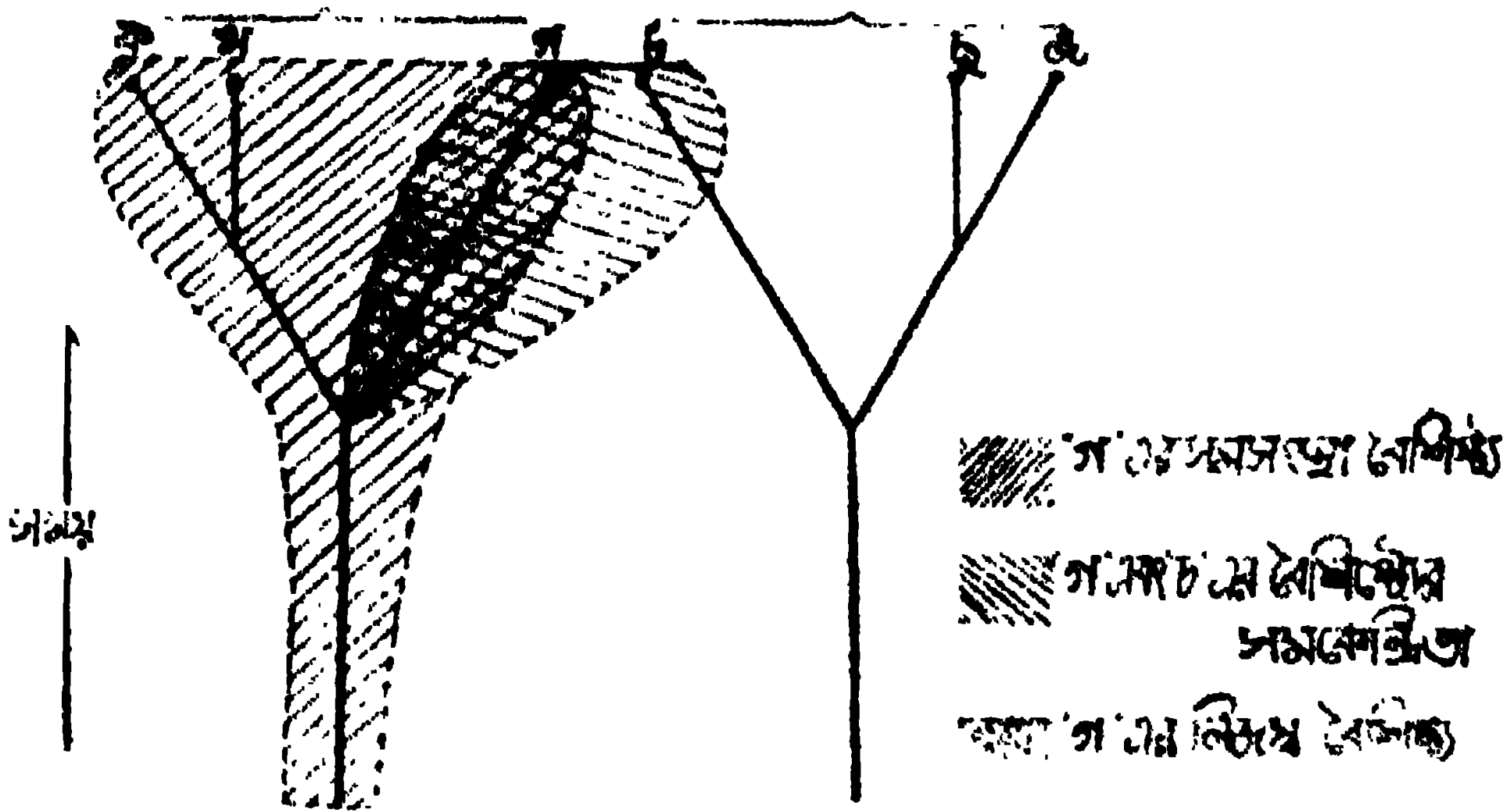
1নং চিত্র—সমকেন্দ্রিতা ও সমান্তরালতার ব্যাখ্যা

ক, খ, গ, চ, ছ ও জ এই ছয়টি প্রজাতি। ক, খ, ও গ এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং চ, ছ, জ আর একটি পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গ-এর সঙ্গে ক ও খ-এর সমসংস্থাঘটিত মিল আছে। গ-এর সঙ্গে চ-এর সমকেন্দ্রিতাঘটিত মিল আছে। এছাড়া গ-এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে (জি. জি. সিম্পসনের 'Principles of Animal Taxonomy' থেকে সংগৃহীত)।

কারীকে বলে অনুকারী (Mimic) ও যার রূপকে নকল করা হয়, তাকে বলে আদর্শ বা মডেল (Model)। এই সাদৃশ্য আত্মরক্ষার জন্যে উদ্ভূত হয়; অর্থাৎ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত মেষকে দেখে যে রকম ভুল হবার আশঙ্কা থাকে, এই ক্ষেত্রেও তাই।

শ্রেণিবিভাগের সময় এদের পৃথক করা তত প্রয়োজন মনে করা হয় না। কিন্তু সমকেন্দ্রিতাকে সমান্তরালতা ও সমসংস্থা থেকে পৃথকীকরণ সহজ ও প্রয়োজনীয়। সমান্তরাল বৈশিষ্ট্যকে সমসংস্থ বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক করা দুরূহ। সমান্তরালতার

প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিকুলের উপর পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিফলিত হয়। সমসংস্থ বৈশিষ্ট্যকে প্রজাতির আদিম বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু সমান্তরাল বৈশিষ্ট্যকে নয়। যেমন ঘোড়া ও গণ্ডারের পায়ের আঙুল গঠনের দিক দিয়ে বিচার করলে দুটিই সমসংস্থার উদাহরণ বটে, কিন্তু সংখ্যা ধরাধার (ঘোড়ার একটি আঙুল ও গণ্ডারের তিনটি আঙুল) ব্যাপারটি সমান্তরালতার উদাহরণ বলে মনে হয়।
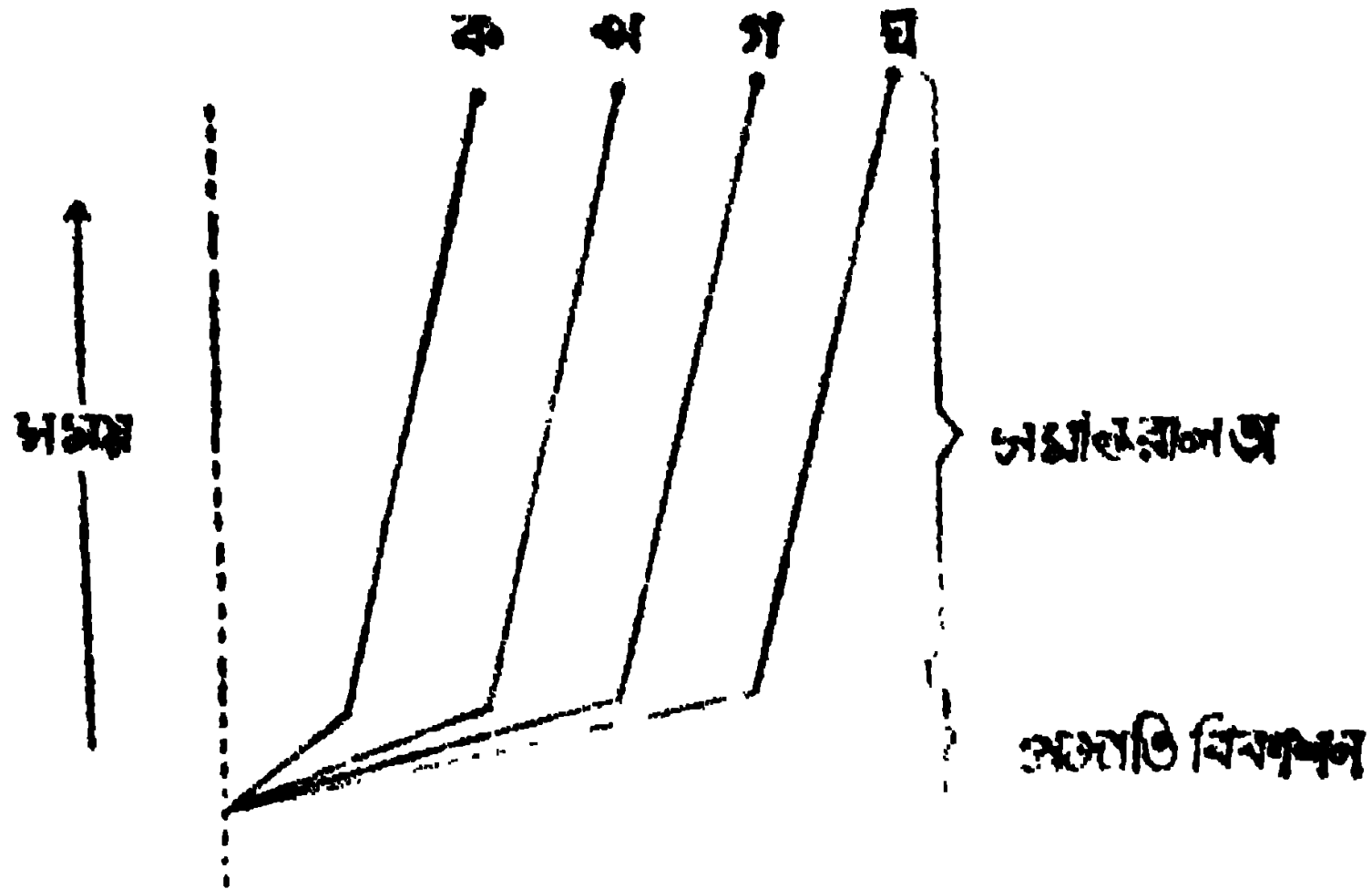
2নং চিত্র—সমকেন্দ্রিতা ও সমান্তরালতার ব্যাখ্যা
ক, খ, গ ও ঘ চারটা প্রজাতি। ভিন্ন প্রজাতিতে বিকাশের আগে ছিল এক পূর্বপুরুষ। পরে সমান্তরালভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

তাসমানিয়ার নেকড়ে (3নং চিত্র) ও সাধারণ নেকড়ের গঠনের তুলনা করলে সমকেন্দ্রিতা ও সমসংস্থার তফাৎ ভাল বোঝা যাবে। তাসমানিয়ার নেকড়ে বা থাইলাসিনাস (Thylacinus) গণের অন্তর্গত যে কোন প্রজাতির আকৃতির সঙ্গে নেকড়ে বা ক্যানিস (Canis) গণের প্রজাতির
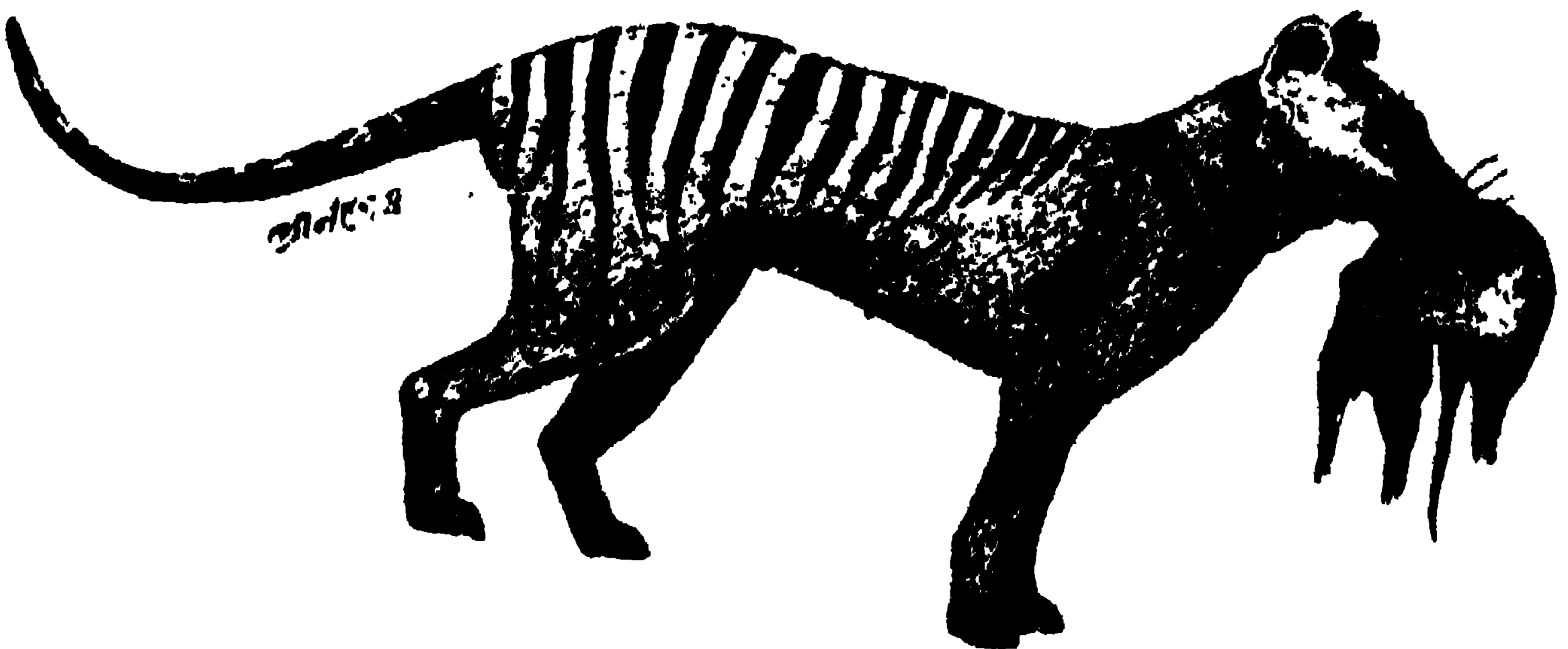
3নং চিত্র—তাসমানিয়ার নেকড়ে

আকৃতির মিল আছে। থাইলাসিনাস প্রজাতিরা স্তন্যপায়ী শ্রেণীর মারসুপিয়ালিয়া (Marsupialia) বর্গের অন্তর্গত ও ক্যানিস প্রজাতিরা

ইউথিরিয়া (Eutheria) বর্গের অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েও খাভাভ্যাস-হেতু এদের আকৃতির মিল আছে। যেহেতু অন্ত সকল বৈশিষ্ট্যে এদের গরমিল দেখা যায়, সেহেতু এই সাদৃশ্যতাকে সমকেন্দ্রিতার উদাহরণ বলা হয়। অন্ত দিকে ক্যানিস প্রজাতির আকৃতির সঙ্গে পাণ্ডাকুলভুক্ত আইলুরাস্ (Ailurus) (4নং চিত্র) গণের প্রজাতির পরিবেশে খাপ-খাওয়াবার বৈশিষ্ট্যে প্রচুর গরমিল দেখা গেলেও গঠনের দিক দিয়ে প্রচুর মিল আছে। তাই এদের সাদৃশ্যকে সমসংস্থার উদাহরণ হিসাবে ধরা হয়।

4নং চিত্র—লাল পাণ্ডা

শ্রেণিবিভাগ ও অভিব্যক্তিবাদ

বৈচিত্র্যই প্রাণিজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটা প্রজাতি অন্ত প্রজাতি থেকে বহুলাংশে পৃথক। প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন পরিবেশে প্রাণীর অভিযোজন (Adaptation) সম্পর্কে গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আরম্ভ হয় দৈহিক গঠন-বিজ্ঞান (Anatomy) ও শ্রেণি-বিন্যাস-বিজ্ঞান (Taxonomy) অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে দৈহিক গঠন-বিজ্ঞান ও শ্রেণিবিন্যাস-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে সূচনা হয় আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ। বর্তমান যুগে শ্রেণিবিন্যাসের মূল কথা প্রজাতির অভিব্যক্তির ইতিহাসকে ভিত্তি করে তাদের শ্রেণিবিভাগ করা। আধুনিক কালে সকলেই বিশ্বাস করেন, জীবন (Life) থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সকল জীবই আবির্ভূত হয়েছে অভিব্যক্তির মাধ্যমে। আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ অনুযায়ী বলা হয়—(1) অধুনা জীবিত প্রজাতিসমূহ অতীতের ভিন্ন রকমের প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, (2) প্রজাতির অভিব্যক্তি হয় নানা পরিবর্তনের সাহায্যে এবং ঐ পরিবর্তন চলে ধীর গতিতে, (3) অতএব বলা যায়, অধুনা জীবিত প্রজাতিদের মধ্যে যত বেশী বৈচিত্র্য দেখা যায়, অতীতে এত বেশী ছিল না, (4) অভিব্যক্তি এখনো প্রকৃতিতে চলেছে। বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির অভিব্যক্তি হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural selection) সাহায্যে। সুতরাং প্রাণীদের শ্রেণি-বিন্যাসগত স্থান নির্ণয়ে অভিব্যক্তিবাদের সাহায্য গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। তাই আধুনিক মতানুযায়ী শ্রেণিবিভাগকে অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ হিসাবে ধরা হয়।

নামকরণের প্রয়োজনীয়তা

নাম যদি চলে যায় তবে জ্ঞানও চলে যায় বলেছিলেন লিনীয়াসের ছাত্র ফেব্রিসিয়াস (J. C. Fabrecius)। সনাক্তকরণই নামকরণের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক প্রাণীর একটা নিজস্ব নাম থাকা উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, এক-একটা প্রাণিকুলের

নিজস্ব নাম আছে। তাছাড়া প্রত্যেক প্রাণী-কুলের নানা আঞ্চলিক নামও আছে। যেমন, বাংলায় যে প্রাণিকুলকে 'ফড়িং' বলে ইংরেজীতে তাকে বলে 'ড্রাগনফ্লাই' ও 'ড্যামসেলফ্লাই' এবং জাপানী ভাষায় বলে 'টোম্বো'। অনুরূপভাবে বাংলায় যাকে বলে 'ঘোড়া', ইংরেজীতে তাকে বলে হর্স এবং জার্মান ভাষায় তাকে বলে ফার্ড (Pferd)। মজার কথা বাংলার ল্যাটা, চ্যাং, শাল ও শোল এই চারটি মাছকে বিজ্ঞানীরা চারটি প্রজাতি হিসেবে ধরলেও সাধারণ ইংরেজী কথায় বলা হয় Snakeheaded fish।* অতএব দৃঢ়ভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানীর পক্ষে আঞ্চলিক ও জনপ্রিয় নামের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই বেশী। এই অসুবিধা এড়াবার জন্যে বিজ্ঞানীরা একটা প্রজাতিকে মাত্র একটা নাম দিয়েছেন। এই নামকরণ করা হয় ল্যাটিন ভাষায়, সাধারণতঃ গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত শব্দকে অথবা অন্য ভাষার শব্দকে ল্যাটিনের মত করে নিয়ে। বিজ্ঞানীদের একাধিক আঞ্চলিক ভাষায় অথবা ল্যাটিন ভাষায় দখল না থাকলেও কোন অসুবিধা হয় না। কারণ শব্দের অর্থ বোধগম্য হওয়া অপেক্ষা সর্বত্র একটি নাম প্রচলিত হওয়াই বেশী প্রয়োজনীয়। সুনির্দিষ্ট সূত্রানুযায়ী নামকরণ হওয়ায় ঐ উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।

নামকরণ রীতির ইতিহাস ও আধুনিক সূত্র

প্রজাতির নাম দুটি পদ নিয়ে গঠিত (গণের-নাম ও প্রজাতির নাম) হয়। গণ-নাম প্রজাতির গোষ্ঠীর ও অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে জ্ঞাতিত্বের ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক এবং প্রজাতি নাম প্রজাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। বর্তমান যুগে প্রচলিত নামকরণ প্রথাকে দ্বিপদ নামকরণ[11] (Binomial nomenclature) বলে।

প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি গণ ও প্রজাতির কথা বলেছিলেন। বাউহিন (K. Bauhin, 1560-1624) গণ ও প্রজাতির পৃথকীকরণের পথ নির্দেশ করেছিলেন। এটাই পরে দ্বিপদ নামকরণে পরিবর্তিত হয়। য়ুং (J. Jung, 1587-1657) প্রবর্তিত উদ্ভিদের তালিকাতে বেশী ভাগ দ্বিপদ নামকরণ দেখা যায়—তাতে প্রথম পদটি বিশেষ্য ও দ্বিতীয়টি বিশেষণ ছিল। এর পর জন রে এবং টুর্নেফোর্ট (J. P. Tournefort, 1656-1708) প্রভৃতি ঐ পথ অনুসরণ করেন। লিনীয়াস এই পদ্ধতির উপকারিতা বুঝে নিয়মিতভাবে তা অনুসরণ করতেন। লিনীয়াসের পরবর্তী বিজ্ঞানীরা (বিশেষতঃ 1800 খৃষ্টাব্দের পর) যখন ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করেন, তখন নানা কারণে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়। যদিও লিনীয়াস্ ও ফেব্রিসিয়াস প্রভৃতি নিজেদের কাজের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট সূত্র অনুসরণ করে চলতেন, কিন্তু তা আন্তর্জাতিক না হওয়ায় প্রত্যেক নিসর্গী নিজস্ব একটি সূত্র অনুসরণ করতেন। এছাড়া নেপো-লিয়নের যুদ্ধের ফলে নানা দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাময়িকী, বই প্রভৃতির আদান-প্রদান বন্ধ হওয়ায় প্রজাতির একাধিক আঞ্চলিক নাম দেখা দেয়। ফলে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় ও সকলে নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক সূত্রের অভাব বোধ করেন। নামকরণের গোলযোগ ও সূত্রের অভাব দূরীকরণের জন্যে 1842 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি

* জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী (1348) প্রাণিবিদ্যার শ্রেণী বিভাগ ও নামকরণের মূল নীতি। বিজ্ঞান পরিচয়, পৃঃ 84-94

12. প্রতি বছর কিছু সংখ্যক প্রজাতি আবিষ্কার হওয়ায় মাঝে মাঝে নতুন গণ ও উচ্চ পর্যায়ের ট্যাক্সনের কল্পনার প্রয়োজন হয়। ফলে অনেক প্রজাতি, গণ ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের ট্যাক্সনের নাম মনে রাখা বিশেষজ্ঞদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই কয়েকজন বিজ্ঞানী নামকরণের নতুন প্রথা উদ্ভাবনের কথা চিন্তা করতে বলেছেন।

অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স, 1877 খৃষ্টাব্দে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স, 1881 খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সোসিয়েতে জোওলজিক ড ফ্রাঁস, 1894 খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর ডয়েটশে জুওলজিশে গেসেলশাফ্ট প্রভৃতি ও অন্যান্য সমিতি থেকে নানা বিষয়ের নামকরণের সূত্র প্রকাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে 1889 খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রাণিবিদ্যা মহাসভার প্রথম অধিবেশনে বিখ্যাত ফরাসী পতঙ্গবিদ্ ব্লাঁশার (R. Blanchard) দ্বিপদ নামকরণ প্রথা চালু করবার জন্যে একটি সূত্রের প্রস্তাব করেন। 1892 খৃষ্টাব্দে মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্লাঁশারের প্রস্তাব সমর্থিত হয়। তথাপি সকল দেশের বিজ্ঞানীরা ঐ সূত্র মেনে চলতেন না। ফলে 1895 খৃষ্টাব্দে তৃতীয় অধিবেশনে আন্তর্জাতিক সূত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এক সংস্থা গঠন করা হয়। ঐ সংস্থা 1898 খৃষ্টাব্দে চতুর্থ অধিবেশনে তাদের তৈরি সূত্রগুলি পেশ করেন। 1901 খৃষ্টাব্দে মহাসভার পঞ্চম অধিবেশনে ঐ সূত্রগুলি প্রাণীদের নামকরণ সম্বন্ধে একমাত্র আন্তর্জাতিক সূত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। পরে ঐ সূত্রের নানা সংস্কার হয়েছে। নীচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেওয়া হলো।

(1) প্রকৃতি রাজ্যের জীবিত ও লুপ্ত প্রাণী সমূহের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ প্রথাকে প্রাণিবিদ্যার নামকরণ রীতি বলা হয়। এই রীতি গোত্র, গণ ও প্রজাতি পর্যায়ের নামকরণ প্রথার নির্দেশ দেয়। কাল্পনিক, অস্বাভাবিক ও সঙ্কর প্রাণীর নিদর্শন অথবা উপপ্রজাতির নীচের কোন ট্যাক্সনের নামকরণ এই রীতি বহির্ভূত।

(2) প্রাণীদের নামকরণের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কিছুর নামকরণের কোন সম্পর্ক নেই; অর্থাৎ অন্য যে কোন কিছুর নাম ও প্রাণীর নাম এক হলে দূষণীয় নয় (তবে না হওয়া বাঞ্ছনীয়)।

লিনীয়াসের সিস্টেমা ন্যাচুরীর দশম সংস্করণের (1758) পূর্বে ব্যবহৃত কোন নাম গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু 1758 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সব নামই গ্রাহ্য হবে।

(4) প্রজাতির উপরের সকল ট্যাক্সনের এক পদ নাম হবে।

(5) প্রজাতির দ্বিপদ এবং উপপ্রজাতির ত্রিপদ নাম হবে।

(6) বৈজ্ঞানিক নাম সব সময় ল্যাটিন ভাষায় লিখতে হবে অথবা অন্য ভাষাকে ল্যাটিনের মত করে লিখতে হবে।

(7) গোত্র, নাম, গণ নামের বহুবচন (কর্তৃকারকে বহুবচন) হবে।

(8) গণ নাম কর্তৃকারকে একবচন হবে।

(9) প্রজাতির নাম সরল বা যৌগিক শব্দ (সাধারণতঃ গণ নামের বিশেষণ) হবে।

(10) গণ নাম ও প্রজাতির নাম এক হওয়া দূষণীয় নয়। যেমন—কাৎলা মাছের নাম কাৎলা কাৎলা (Catla catla)।

(11) কমিশন ও সূত্রের দ্বারা স্বীকৃত সবচেয়ে পুরনো প্রকাশিত নামই ট্যাক্সনের আসল নাম হিসাবে গ্রাহ্য হবে। ঐ রীতিকে বলে অগ্রাধিকার রীতি (Law of Priority)।

(12) কোন নামের ব্যবহার 50 বছর চললে অগ্রাধিকার রীতি মানা হবে না (এর জন্যে কমিশনের অনুমতির প্রয়োজন আছে)।

(13) সংখ্যাবাচক শব্দ অক্ষরে প্রকাশ করতে হবে, সংখ্যায় নয়।

(14) গোত্র নাম ও গণ নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে, কিন্তু প্রজাতির নামের প্রথম অক্ষর ছোট হাতের হবে।

(15) গোত্রের নামকরণের সময় যে গণকে ভিত্তি করে গোত্রের বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই গণের শেষে '—ইডি' (—IDAE) যোগ করতে হবে। উপগোত্রের (Subfamily) নামকরণের সময় যে গণকে ভিত্তি করে উপ

গোত্রের বিবরণ প্রথম প্রকাশ হয় তার শেষে '—ইনি' (—INAE) যোগ করতে হবে (অধি-গোত্রের নামকরণের সময় '—ওইডিয়া' (—OI-DEA) যোগ করতে হয় ; যথা—গণ—Libellula ; উপগোত্র—Libellulinae, গোত্র—Libellulidae, অধিগোত্র—Libelluloidea।

(16) যে বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীরা কোন ট্যাক্সনের (সূত্রের 3য় ও 4র্থ অধ্যায় অনুযায়ী গ্রাহ্য) বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ কোন বই বা সাময়িকীতে প্রকাশ করবেন, তাঁকে বা তাঁদের ঐ ট্যাক্সনের আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকার করা হবে। বই এবং সাময়িকীর গুণাবলী ও সূত্রের (Code) 3য় ও 4র্থ অধ্যায় অনুযায়ী গ্রাহ্য হওয়া দরকার।

(17) যখন দুটি ভিন্ন গোত্র বা গণ বা প্রজাতি অথবা উপপ্রজাতির এক নাম হয়ে যাবে, তখন যে নামটি পরে হয়েছে তাকে সমনাম (Homonym) হিসাবে গণ্য করে নাকচ করতে হবে এবং ঐ ট্যাক্সনটির নতুন নাম দিতে হবে।

(18) দুটি গোত্রের এক নাম হবে না।

(19) দুটি গণের এক নাম হবে না।

(20) এক গণের দুটি প্রজাতির এক নাম হবে না।

ট্যাক্সনের নামের পাশে আবিষ্কারকের নাম লেখা হয়। যেমন, লিনীয়াস বুনো পাতিহাঁসের নাম করেন আনাস্ প্লাটিরিঙ্কস (Anas platyrhyncos), আবিষ্কারকসহ এর নাম হবে আনাস প্লাটিরিঙ্কস লিনীয়াস (Anas platyrhyncos Linnaeus)। একইভাবে গণ, গোত্র প্রভৃতির নামের পাশে আবিষ্কারকের নাম লেখা হয়। সিস্টেমা নাটুরীর (1758) সকল প্রজাতির আবিষ্কারক হিসাবে লিনীয়াসকে ধরা হয়। পাণ্ডুলিপিতে গণ ও প্রজাতি ও উপপ্রজাতির নামকে নিম্নরেখ করা এবং ছাপা অবস্থায় বাঁকা অক্ষরে (Italics) প্রকাশ করা হয়।

নামের পরিবর্তন

বৈজ্ঞানিক নামের সাহায্যে এক প্রজাতির সঙ্গে আরেক প্রজাতির জাতিগত ঘনিষ্ঠতা বোঝা যায়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে কোন কোন সময় নামের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা যায়। যেমন—লিনীয়াস (1758) বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ ও বিড়ালকে একটি গণের [ফেলিস (Felis)] অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর মতানুসারে বাঘ, সিংহ ও চিতাবাঘের নাম হয় ফেলিস টাইগ্রিস্ (Felis tigris), ফেলিস লিও (Felis leo) ও ফেলিস পার্ডুস (Felis pardus)। পরে গবেষণায় প্রমাণ হয়—বাঘ, সিংহ ও চিতাবাঘ বিড়ালের গণের (ফেলিস) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়। তাই বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে নতুন একটি গণ প্যান্থেরার (Panthera) অন্তর্ভুক্ত করেন। বর্তমানে ওদের নাম হয়েছে প্যান্থেরা টাইগ্রিস, প্যান্থেরা লিও এবং প্যান্থেরা পার্ডুস। প্রথম বর্ণনাকারী হিসাবে লিনীয়াসের নাম প্রজাতির নামের পাশে থাকবে, কিন্তু যেহেতু তিনি ঐ তিনটিকে ঠিক গণের অন্তর্ভুক্ত করেন নি (আধুনিক মতানুযায়ী), তাই তাঁর নাম প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হবে, যথা Panthera tigris (Linnaeus)। অনেক সময় গোত্র, বর্গ প্রভৃতির নামও পরিবর্তিত হয়।

উপসংহার

সাধারণভাবে প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সুচিন্তিত শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণের ফলে মানুষের উপকারী ও অনিষ্টকারী প্রাণিকুলের সনাক্তকরণ এবং প্রথম দলের সংখ্যাবৃদ্ধি ও দ্বিতীয় দলের দমনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সব অ্যানোফিলিস (Anopheles) মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায় না বা সব সাপ বিষধর নয়। প্রাণীদের নানারকম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান

লাভ করে সাপ দেওয়ায় অনায়াসে ম্যালেরিয়া বহনকারী অ্যানোফিলিস্ মশা বা অন্য প্রয়োজনীয় প্রাণীর সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও প্রাণিবিদ্যার অন্য শাখা কাজের সুবিধার্থেও শ্রেণিবিভাগের প্রয়োজন আছে। যেমন—যদি কেউ বাঘের বিষয়ে গবেষণা করে প্রাণীটিকে চিনতে না পেরে সিংহ বলে ভুল করেন ও সেই তথ্য প্রকাশ করেন, তবে বিজ্ঞানীমহল বাঘ ও সিংহ উভয়ের বিষয়েই অজ্ঞ থাকবেন। তাই স্যার গ্যাভিন ডে বিয়ার (G. R. De Beer) (1950) বলেন, "**The neglect of taxonomic studies is now realised as a defect which it is in the training of biologists, even if because biologists in other branches of the sciences of zoology and botany must know the identity of the material on which they are working." প্রাণিবিদ্যার অন্য শাখার সঙ্গে শ্রেণিবিন্যাসের তুলনা করলে দেখা যায় শ্রেণিবিন্যাস-বিজ্ঞান সমস্ত প্রাণিবিদ্যার কেন্দ্রস্থল। এই সম্পর্কে স্যার জুলিয়ান হাক্সলি (J. S. Huxley) (1940) বলেন,

"Today,......systematics has become one of the focal points of biology. Here we can check our theories concerning selection and gene-spread against concrete instances, find material for innumerable experiments, build up new induction: the world is our laboratory, evolution itself our guineapig."

মস্তিষ্কে সাইক্লিক এ. এম. পি-র ভূমিকা

লক্ষ্মী কর ও দেবব্রত নাগ*

ভূমিকা

সাইক্লিক অ্যাডিনোসিন 3′ : 5′-মনোফস্‌ফেট বা সংক্ষেপে cAMP (cyclic Adenocine 3′ : 5′-monophosphate) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদার্থ। এর আবিষ্কারক ডাঃ সাদারল্যাণ্ডকে এজন্যে 1971 সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, এমন একটি ছোট্ট অণু প্রাণীর বিভিন্ন কার্যকলাপ, দেহভিত্তিক এবং প্রাণ-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সাদারল্যাণ্ডের ভাষায় প্রাণীর পায়ের নখ থেকে শুরু করে স্মৃতি পর্যন্ত সব কিছুই cAMP নিয়ন্ত্রণ করছে।

জীবকোষে অবস্থিত অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ (Adenyl cyclase) নামক একটি জৈব অনুঘটক অ্যাডিনোসিন ট্রাইফস্‌ফেট বা সংক্ষেপে ATP-কে ভেঙে cAMP তৈরি করে। অবশ্য ফস্‌ফোডাই-এস্টারেজ (Phosphodiesterase) নামে একটি জৈব অনুঘটক cAMP-কে ভেঙে 5′-অ্যাডিনোসিন মনোফস্‌ফেটে (5′-AMP) পরিণত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোষে cAMP-র পরিমাণ মূলতঃ দুটি জৈব অনুঘটকের উপর নির্ভর করছে—cAMP সংশ্লেষক জৈব অনুঘটক অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ এবং cAMP বিশ্লেষক জৈব অনুঘটক ফস্‌ফোডাইএস্টারেজ।

* প্রাণ-রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

$$ATP \xrightarrow{\text{অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ}} cAMP \xrightarrow{\text{ফস্‌ফোডাইএস্টারেজ}} 5'\text{-}AMP.$$

সাদারল্যাণ্ড এবং আরও অনেকে প্রমাণ করেছেন যে, cAMP দ্বিতীয় বার্তাবহ (Second messenger) রূপে বিভিন্ন উত্তেজক রস (Hormone) বা প্রথম বার্তাবহের (First messenger) কাজগুলি করে দেয়; অর্থাৎ উত্তেজক রসগুলি সরাসরি অংশগ্রহণ না করে cAMP-এর মাধ্যমে কাজ করে থাকে। ইদানীং বহু পরীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে দেহের বিভিন্ন গ্রন্থিতে, যেমন—cAMP-এর ভূমিকা আছে, মস্তিষ্কেও তেমনি cAMP-এর ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এর কারণ হলো—

(1) যে জৈব অনুঘটকটি ATP ভেঙে cAMP তৈরি করে, তা মস্তিষ্ককোষে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়, উপরন্তু বেশী পরিমাণেও থাকে।

(2) অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ জৈব অনুঘটকটি স্নায়ুকোষ প্রান্তে বেশী থাকে এবং মস্তিষ্ককোষ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পাওয়া সাইনাপটোজোমে (Synaptosome) বেশী পাওয়া গেছে। জানা গেছে, মস্তিষ্কের উল্লেখযোগ্য উত্তেজক রসগুলিও ঐ অংশে বেশী থাকে।

(3) তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করে জানা গেছে, দুটি স্নায়ুকোষের সংযোগ স্থলে খবরাখবর পরিবহনে cAMP-র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

(4) প্রাণীর বিভিন্ন চালচলনের সঙ্গে cA-MP-এর সম্পর্ক আছে।

(5) বিভিন্ন বিপাক-প্রণালীতে cAMP অংশগ্রহণ করে।

এই প্রবন্ধে মস্তিষ্কে cAMP সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। আমাদের ধারণা, নিম্নলিখিত আলোচ্য বিষয়গুলি মস্তিষ্কে cAMP-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় দেবে।

মস্তিষ্কে cAMP-এর পরিমাণ

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা গেছে জীব-দেহের অন্যান্য গ্রন্থির সঙ্গে তুলনা করলে গুরু-মস্তিষ্কের ধূসর কোষসমষ্টিতে cAMP, অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ এবং ফস্‌ফোডাইএস্টারেজ-এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশী থাকে। স্নায়ুকোষকে বিশ্লেষণ করে আরও জানা গেছে যে, সাইনাপটো-জোম (Synaptosome) নামক অংশে (যা প্রধানতঃ স্নায়ুকোষ প্রান্তভাগের অংশবিশেষ) cAMP, অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ এবং ফস্‌ফোডাই-এস্টারেজ সবগুলিই বেশী পরিমাণে থাকে। অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ এবং ফস্‌ফোডাইএস্টারেজ জৈব অনুঘটক দুটির সক্রিয়তাও ঐ অংশে সবচেয়ে বেশী। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে সাইনাপটো-জোমে cAMP বেশী থাকা সত্ত্বেও বিশ্লেষক জৈব অনুঘটক ফস্‌ফোডাইএস্টারেজের পরিমাণ ও সক্রিয়তা কি করে বেশী থাকছে? জানা গেছে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ যখন ঝিল্লীযুক্ত (Membrane-bound) অবস্থায় থাকে, তখন ফস্‌ফোডাইএস্টারেজ সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় থাকে, ফলে cAMP যেখানে সংশ্লেষিত হয়, সেখানে ঐ অণুটি ভাঙতে পারে না। অবশ্য cAMP ঝিল্লীমুক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে ফস্‌ফোডাই-এস্টারেজের সাহায্যে ভেঙে যায়।

কোষে cAMP-র পরিমাণগত পরিবর্তন যারা ঘটায়

কোষে cAMP-র পরিমাণ বাড়া-কমার কারণ অনেক হতে পারে। অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা কিংবা পরিমাণ বাড়িয়ে cAMP-এর উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। ফস্‌ফোডাইএস্টারেজকে নিষ্ক্রিয় করেও cAMP-র পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। জানা গেছে

ক্যাটিকলঅ্যামিন (Catecholamine) জাতীয় পদার্থগুলি, তড়িৎ-প্রবাহ, সোডিয়াম ফ্লোরাইড (NaF) প্রভৃতি অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা বাড়িয়ে কোষে cAMP-র পরিমাণ বৃদ্ধি করে। আবার দেখা গেছে, থিয়োফাইলিন (Theophylline), মিথাইলজেনথিন (Methylxanthine) এবং কিছু সংখ্যক ভেষজ যেমন ইমিপ্রামিন (Imipramine), নরট্রিপটাইলিন (Nortryptyline), অ্যামিট্রিপটাইলিন (Amitryptyline) প্রভৃতি ফস্‌ফোডাইএস্টারেজ জৈব অনুঘটকটিকে নিষ্ক্রিয় করে কোষে cAMP র পরিমাণ বাড়াতে পারে। এই ভেষজগুলি অনেক সময় মানসিক অবসাদ দূরীকরণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

প্রস্টাগ্ল্যানডিন (Prostaglandin) নামক রাসায়নিক যৌগটি কোন কোন কোষে cAMP-র পরিমাণ বাড়ায় আবার কখন কমাতেও দেখা গেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণে আজকাল প্রস্টাগ্ল্যানডিন বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে, যদিও কিভাবে প্রস্টাগ্ল্যানডিন স্নায়ুকোষে কাজ করে, তা কিছুই জানা যায় নি।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ কিভাবে তৈরি হয়

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে কিভাবে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ জৈব অনুঘটকটি তৈরি হতে থাকে, তা ইঁদুর এবং গিনিপিগের উপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কি ধরণের সংকেত জৈব অনুঘটকের অধিক সক্রিয়তার মূলে কাজ করে, তা জানা যায় নি, কিন্তু এটুকু জানা গেছে যে, মস্তিষ্কে নরএপিনেফ্রিনের (NE) পরিমাণগত বৃদ্ধির সঙ্গে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তার একটা সম্পর্ক আছে।

সাধারণতঃ গুরুমস্তিষ্ক স্তরেই বেশী পরিমাণ সংশ্লেষক এবং বিশ্লেষক জৈব অনুঘটক দুটি থাকে, কিন্তু পাইনিয়েল গ্রন্থিতে (Pineal gland) ফস্‌ফোডাইএস্টারেজের তুলনায় অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা অনেক বেশী থাকে। সেজন্যে পাইনিয়েল গ্রন্থি নিয়ে বেশী কাজ হয়েছে। এখন দেখা যাক, পাইনিয়েল গ্রন্থিতে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ কিভাবে তৈরি হয়। জন্মের পর 30 দিন পর্যন্ত ইঁদুরের পাইনিয়েল গ্রন্থির অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা অপরিবর্তিত থাকে। জন্মের একদিন পর ইঁদুরের পাইনিয়েলে NE থাকা সত্ত্বেও অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ জৈব অনুঘটকটি সক্রিয় থাকে না বললেই চলে, কিন্তু 16 দিন বয়স ইঁদুরের পাইনিয়েলে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা NE-এর উপস্থিতিতে সাধারণ অবস্থা থেকে প্রায় তিন গুণ বেড়ে যায়, তারপর বাদও প্রায় একই রকম থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য, NaF-এর উপস্থিতিতে একদিন বয়স ইঁদুরের পাইনিয়েলের অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ যথেষ্ট সক্রিয় থাকে এবং 50 দিন বয়স ইঁদুরের অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ সাধারণ অবস্থার পাঁচগুণ সক্রিয় থাকে। মনে হবে NaF নিয়ে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্য কি হতে পারে, কারণ NaF দেহের সাধারণ পদার্থ নয়। Tissue slice ব্যবহার করে দেখা গেছে, NE Tissue slice-এ অবস্থিত অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা বাড়ালেও স্নায়ুকোষের অ্যাডিনাইল সাইক্লাইজকে উত্তেজিত করতে পারে না। এই পরীক্ষা থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

(1) জন্মের প্রথম দিকে cAMP যদিও তৈরি হয় না, কিন্তু অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ থাকে, কারণ NaF-এর উপস্থিতিতে জৈব অনুঘটকটির সক্রিয়তার পরিচয় মেলে। NE-এর উপস্থিতিতে কিন্তু ঐ সময় অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

(2) NE-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এমন গ্রাহক (Receptor) অ্যাডিনাইল সাইক্লেজে প্রথম দিকে থাকে না, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকটি তৈরি হতে থাকে, ফলে অ্যাডি-

নাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা বেশ কিছুদিন পর NE-এর উপস্থিতিতে প্রকাশ পায়। NE এর গ্রাহক ইঁদুরের পাইনিয়েল অ্যাডিনাইল সাইক্লেজে প্রথম দিকে থাকে না, কিন্তু পরে তৈরি হয়, কারণ গিনিপিগের পাইনিয়েলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে NE-এর উপস্থিতিতে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা প্রথম থেকেই থাকে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গিনিপিগ নিয়ে কাজ করবার উদ্দেশ্য হলো গিনিপিগের মস্তিষ্ক জন্মের প্রথম থেকেই পরিণত থাকে। এক্ষেত্রে অনুঘটকের গ্রাহকটি প্রথম থেকেই তৈরি থাকে। ইঁদুরের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অনুঘটকের গ্রাহকটি যখন থেকে তৈরি হয়, তখন থেকেই NE-এর সংস্পর্শে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। গ্রাহকটিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেলে এই কাজের আরও ভাল সমাধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

চালচলনের সঙ্গে cAMP-এর সম্পর্ক

মস্তিষ্কে cAMP-র পরিমাণের সঙ্গে প্রাণীর চালচলনের কি সম্পর্ক—সে সম্পর্কে অনেক কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এইসব পরীক্ষায় cAMP ব্যবহার না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাইবিউটাইরিল cAMP ব্যবহার করা হয়, কারণ cAMP পেশীতে প্রবেশ করাবার ফস্‌ফোডাইএস্টারেজ তৈরি অনুঘটকের সাহায্যে ভেঙে যায়, কিন্তু ডাইবিউটাইরিল cAMP ভাঙে না।

Paul এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে, উন্মাদরোগীদের মূত্রে cAMP-এর পরিমাণ বেশী মাত্রায় থাকে, কিন্তু নানান অবসাদে ভুগছে এমন রোগীদের মূত্রে cAMP-এর পরিমাণ কম থাকে। Abdulla এবং Hamada প্রায় 26 জন মহিলার উপর পরীক্ষা চালিয়ে তাদের মূত্রে cAMP-এর পরিমাণের সঙ্গে বিভিন্ন চালচলনের কথা উল্লেখ করেছেন। এও দেখানো হয়েছে যে, কতকগুলি ওষুধ, যেমন—L-dopa, MAO-inhibitors, amphetamine, phenobarbital এবং chlorpromazine প্রভৃতি ইঁদুরের মস্তিষ্কে cAMP-এর পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে। প্রাণীর চালচলনের সঙ্গে cAMP-এর যে সম্পর্ক, তা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণগুলিকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যাবে। এই ব্যাপারে প্রধানতঃ দু-রকম কাজ হয়েছে। একদল সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে মস্তিষ্কে cAMP সরাসরি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, প্রাণীর চালচলনের সঙ্গে cAMP-এর সম্পর্ক রয়েছে। অপর একদল প্রাণীর বিভিন্ন অবস্থায় মূত্রে নির্গত cAMP-এর পরিমাণ মেপে অনুমান করেছেন যে, cAMP-এর পরিমাণ বাড়া-কমার সঙ্গে প্রাণীর স্বভাবের একটা সম্পর্ক আছে।

ক) মস্তিষ্কে cAMP প্রয়োগ—cAMP যে বিভিন্ন উত্তেজক রসের বার্তাবহরূপে দেহকোষে কাজ করে, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও ভালভাবে তা জানা গেল মস্তিষ্কে cAMP প্রয়োগ করে। lateral ventricles, ventromedial hypothalamus, mesencephalic reticular formation প্রভৃতি মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে মাত্র 25μg পরিমাণ ডাইবিউটাইরিল cAMP প্রয়োগ করলে যদিও কোন রকম পরিবর্তন দেখা যায় না, কিন্তু 50 থেকে 100μg পরিমাণ প্রয়োগ করলে ইঁদুরের গতিবিধিতে প্রচুর সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়, যেমন—দেহের খিঁচুনি বাড়ে, দেহপেশীর সংকোচন-প্রসারণের মাত্রাও বাড়ে। গুরুমস্তিষ্কে যদিও ডাইবিউটাইরিল cAMP প্রয়োগ না করে উপায় নেই, কিন্তু লঘুমস্তিষ্কে (Cerebellum) ফস্‌ফোডাইএস্টারেজ কম থাকায় সেখানে cAMP সরাসরি প্রয়োগ করা চলে। ডাইবিউটাইরিল cAMP বিড়ালের মস্তিষ্কে প্রয়োগ করলে ইঁদুরের মত বিড়ালেও একই রকম লক্ষণ

দেখা যায়। যদিও বিড়ালের ক্ষেত্রে ডাই-বিউটাইরিল cAMP একমাত্র reticular formation-এ প্রয়োগ করলেই বিড়ালের শরীরে খিঁচুনী হয়, কিন্তু অন্য কোন স্থানে প্রয়োগ করলে তেমনটি হয় না। এথেকে মনে হয়, ইঁদুরের মস্তিষ্কে lateral ventricle কিংবা hypothalamus-এ এটা প্রয়োগ করলে ডাই-বিউটাইরিল cAMP reticular formation-এ প্রবেশ করে এবং ইঁদুরের দেহে খিঁচুনীর উপদ্রব ঘটায়। ডাইবিউটাইরিল cAMP মস্তিষ্কের বিশেষ স্থানে প্রয়োগ করলে বিড়ালের চোখে-মুখের উত্তেজনা বেড়ে যায়। anterior hypothalamus-এ প্রয়োগ করলে ঐ লক্ষণটি আরও জোড়ালো আকার ধারণ করে। Amygdala'র corticomedial nucleus-এ ডাইবিউটাইরিল cAMP প্রয়োগ করলে এদিক-ওদিক মাথা ঘোরানো, সামনের পা গুটিয়ে নেওয়া এবং পিছনের পা টান করা ইত্যাদি স্বভাবের পরিচয় মেলে। মস্তিষ্কের যে সব স্থানে ডাইবিউটাইরিল cAMP প্রয়োগ করে এই ধরণের চালচলন লক্ষ্য করা গেছে, ঠিক তেমনটি লক্ষ্য করা গেছে ঐ সব স্থানে কেবল তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে। বিড়ালের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো একই ডাইবিউটাইরিল cAMP hypothalamus-এ প্রয়োগ করলে, যদিও উত্তেজক স্বরূপে কাজ করে কিন্তু লঘুমস্তিষ্কের fastigial nucleus-এ প্রয়োগ করলে শান্ত স্বভাব সৃষ্টি করে, এমনকি 5 থেকে 10 মিঃ পর বিড়ালের চালচলন এবং Electroenphalogram-এ (EEG) Non-rapid eye movement (NREM) ধরা পড়ে। সুতরাং চালচলনের মূলে মস্তিষ্কের যে সব গঠন-প্রকৃতিগুলি কাজ করে, তারা cAMP-র সংস্পর্শে বিভিন্নভাবে সাড়া দেয়। কিভাবে মস্তিষ্কে ডাইবিউটাইরিল cAMP কাজ করে, সে সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে, তা হলো, প্রথম reserpine নামক ভেষজ প্রয়োগ করে স্নায়ুকোষের সঞ্চিত NE নষ্ট করে তারপর ডাই-বিউটাইরিল cAMP প্রয়োগ করলেও পূর্ববর্ণিত চালচলনগুলি প্রতিফলিত হয়। আবার chlorpromazine নামক ভেষজ প্রয়োগ করে জৈব অনুঘটক-গ্রাহকটিকে (Enzyme-receptor) প্রথম থেকে ঢেকে রাখবার পর ডাইবিউটাইরিল cAMP প্রয়োগ করলেও ঐ একই রকম স্বভাবের পরিচয় মেলে। সুতরাং বলা যাচ্ছে, ডাইবিউটাইরিল cAMP স্নায়ুকোষের উত্তেজক রস জৈব অনুঘটক-গ্রাহকের যোগাযোগ ভিত্তিতে কাজ করছে। তবে খুঁটিনাটি সবকিছু জানা এখনও সম্ভব হয় নি।

(খ) মস্তিষ্কে cAMP-এর পরিমাণ—মস্তিষ্কে cAMP বাড়া-কমার সঙ্গে চালচলনের কি সম্পর্ক—সে সম্পর্কে কাজ সবে সুরু হয়েছে। জীবন্ত প্রাণীর মস্তিষ্কে cAMP-এর পরিমাণ মাপা সহজ কথা নয়। Dr. Delgado কর্তৃক উদ্ভাবিত chemitrodes এবং dialytrodes মস্তিষ্কে সরাসরি প্রবেশ করিয়ে অনেক কিছু জানবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এখনও cAMP নিয়ে এই ধরণের কাজ সুরু হয় নি। আপাততঃ যা জানা গেছে, তা হলো বিভিন্ন অবস্থায় মূত্রে cAMP-এর পরিমাণ কিভাবে বাড়ে বা কমে। দেখা গেছে 24 ঘণ্টার সংগৃহীত মূত্রে cAMP-এর পরিমাণ সাধারণ অবস্থা থেকে উন্মাদ অবস্থায় বেশী থাকে। Abdulla এবং Hamada লক্ষ্য করেছেন যে, পরিণত বয়সে মেয়েদের 24 ঘণ্টার সংগৃহীত মূত্রে সুস্থ অবস্থায় 2,232 ± 565 n moles cAMP থাকে, কিন্তু যে সব মেয়েরা নানা কারণে মানসিক শান্তি হারিয়েছে এবং প্রবলভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়েছে, তাদের 24 ঘণ্টার সংগৃহীত মূত্রে চিকিৎসার পূর্বে cAMP-এর পরিমাণ হলো 523 ± 282 n moles, কিন্তু ভেষজ

প্রয়োগ করে এদের যখন ভাল করা হয়, তখন 24 ঘণ্টায় সংগৃহীত মূত্রে cAMP-এর পরিমাণ থাকে 1,282±123·5 n moles। আজকাল imipramine, amitryptyline, nortryptyline প্রভৃতি ভেষজ বিভিন্ন রকম অবসাদে ভুগছে এমন মানুষের চিকিৎসায় প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। দুর্দান্ত স্বভাবের মানুষকে শান্ত করতে পারে haloperidol নামক ভেষজটি। আরও অনেক ভেষজ আজকাল চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। জানা গেছে imipramine, amitryptyline, nortryptyline প্রভৃতি ভেষজ ফস্‌ফোডাই-এস্টারেজের সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে cAMP-এর পরিমাণ পরিবর্তন করে।

cAMP-এর প্রাণ-রাসায়নিক ভূমিকা

এই ছোট্ট একটি অণু কিভাবে বিভিন্ন পরিবর্তনের মূলে কাজ করছে তা প্রাণ-রাসায়নিক স্তরে কিছুটা জানা সম্ভব হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ প্রোটিনের সঙ্গে ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সংযোজন হলো বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ। প্রোটিনের সঙ্গে ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সংযোজন ঘটে থাকে প্রোটিন কাইনেজ নামক জৈব অনুঘটকের উপস্থিতিতে। এই জৈব অনুঘটকটির সক্রিয়তা নির্ভর করছে cAMP-এর উপর। প্রোটিন কাইনেজ অনেক রকমের আছে। মস্তিষ্কের প্রোটিন কাইনেজগুলি অন্যান্য প্রাণির প্রোটিন কাইনেজ থেকে আলাদা। cAMP সম্পর্কে প্রাণ-রাসায়নিক স্তরে যে সব কাজকর্ম হয়েছে, তা বেশীরভাগ গ্লাইকোজেনের ভাঙাগড়া এবং হিস্‌টোনের সঙ্গে ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সংযোজন সম্পর্কিত।

(ক) হিস্‌টোনের সঙ্গে ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সংযোজন—মস্তিষ্কে হিস্‌টোন নামক প্রোটিনের সঙ্গে ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সংযোজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিস্‌টোন কাইনেজ নামক জৈবঅনুঘটকের উপস্থিতিতে এই সংযোজন হয়ে থাকে।

$$\text{হিস্‌টোন} + ATP \xrightarrow{\text{হিস্‌টোন কাইনেজ}} \text{হিস্‌টোন-}P + ADP.$$

দেখা গেছে cPMP হিস্‌টোন কাইনেজের সক্রিয়তা বাড়াতে পারে। আবার NEও হিস্‌টোন কাইনেজের সক্রিয়তা বাড়াতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে NE প্রথমে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজের সক্রিয়তা বাড়িয়ে অধিক পরিমাণ cAMP তৈরি করে এবং ঐ cAMP তখন হিস্‌টোন কাইনেজকে সক্রিয় করে তোলে। অনেক সময় হিস্‌টোনগুলি DNA-তে অবস্থিত নিউক্লিয়োটাইডের ভাষা ব্যক্ত করতে দেয় না, কিন্তু হিস্‌টোনের সঙ্গে ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সংযোজন হলে হিস্‌টোনের গঠন-প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয়, ফলে হিস্‌টোনের DNA-মুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে DNA-এর অপ্রকাশিত ভাষা নতুন বার্তাবহ RNA-তে প্রতিলিপিত হয়ে যায়। এরপর বার্তাবহ RNA-এর ভাষা বিভিন্ন পরিবাহক-RNA-এর সাহায্যে অনূদিত হয়ে নতুন প্রোটিন তৈরি হয়। অনেকের মতে, স্মৃতিসম্পর্কিত ঘটনার মূলে হয়তো এই প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াটির ভূমিকা আছে।

(খ) গ্লাইকোজেনের ভাঙাগড়া—cAMP গ্লাইকোজেনের ভাঙাগড়ায় যেভাবে অংশ গ্রহণ করে তা সংক্ষেপে দেখানো গেল।
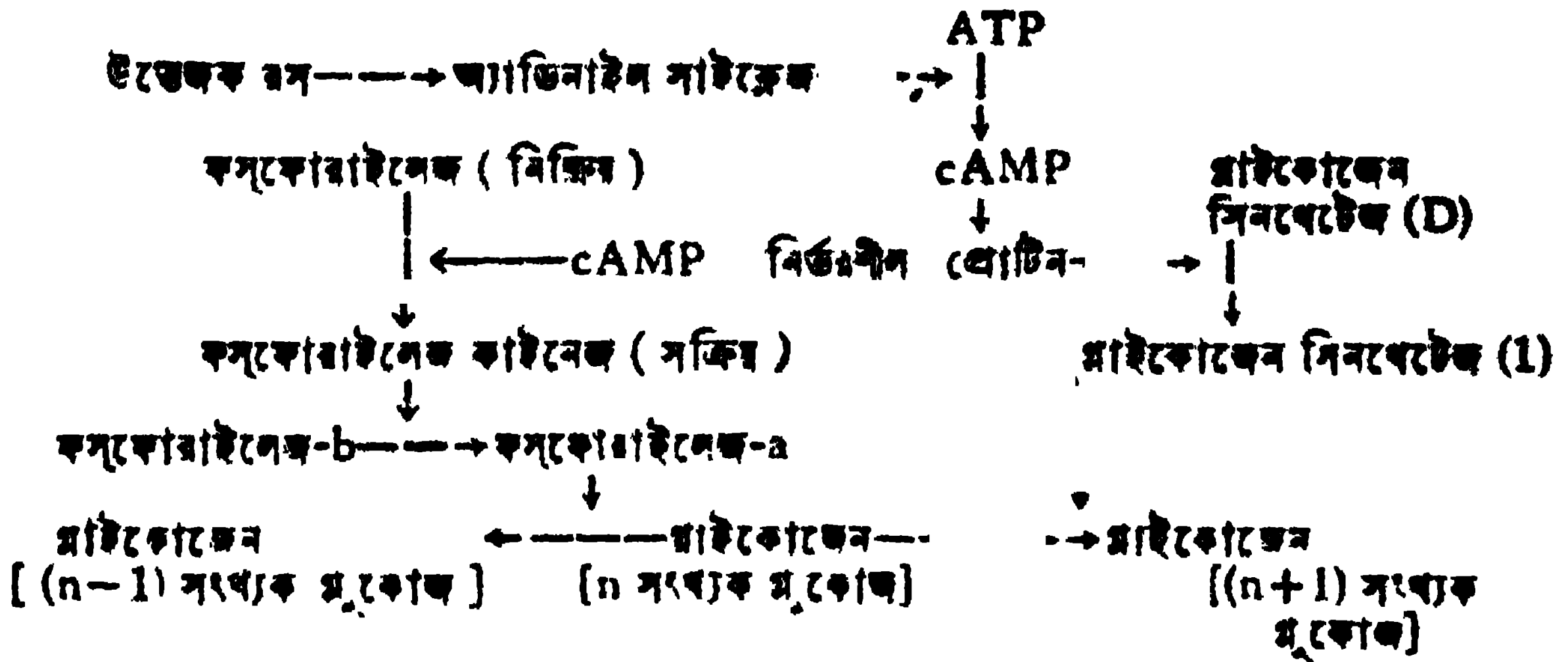
একদিকে ফস্‌ফোরাইলেজ নামক জৈব অনুঘটকের সাহায্যে গ্লাইকোজেন প্রথমে গ্লুকোজ-1-ফস্‌ফেটে ভেঙে যায়। এই ফস্‌ফোরাইলেজ জৈব অনুঘটকটি দু-ভাবে থাকতে পারে,—ফস্‌ফোরাইলেজ-a এবং ফস্‌ফোরাইলেজ-b। ফস্‌ফোরাইলেজ-b, ফস্‌ফোরাইলেজ কাইনেজ নামক জৈব অনুঘটকের সাহায্যে ফস্‌ফাইলেজ-a-তে পরিণত হয়। ফস্‌ফোরাইলেজ কাইনেজ আবার ফস্‌ফেটসযুক্ত অবস্থায় (সক্রিয়) এবং ফস্‌ফেটসমুক্ত (নিষ্ক্রিয়) অবস্থায় থাকতে পারে। একটি cAMP নির্ভরশীল প্রোটিন পাওয়া গেছে, যা নিষ্ক্রিয় ফস্‌ফোরাইলেজ কাইনেজকে সক্রিয় করে দিতে পারে। এভাবে ধাপে ধাপে গ্লাইকোজেনের ভাঙবার কাজটি চলতে থাকে। অপর দিকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণে গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ নামক জৈব অনুঘটকটি অংশগ্রহণ করে। cAMP-নির্ভরশীল প্রোটিন ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লাইকোজেন সিনথেটেজের সংযোজনে অংশগ্রহণ করে এবং নিষ্ক্রিয় গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ (D) তৈরি করে। কিন্তু ফস্‌ফেটেজ নামক জৈব অনুঘটকের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ (D) ফস্‌ফরিক অ্যাসিডমুক্ত হয় এবং সক্রিয় গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ (I)-তে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্লাইকোজেন যখন ভাঙতে থাকে, তখন গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যভাবে বলা যায় cAMP-এর পরিমাণ কোষে যখন কমতে থাকে, তখন গ্লাইকোজেনের ভাঙাও কমতে থাকে, কিন্তু গ্লাইকোজেনের সংশ্লেষণ বাড়তে থাকে।

পাইনিয়েল গ্রন্থিতে cAMP-এর ভূমিকা

অনেকে মনে করেন পাইনিয়েল গ্রন্থি মানুষের ভাবজগতের নিয়ন্ত্রক গ্রন্থি। বহিঃবিশ্বের ঘটনাবাহগুলোর সঙ্গে পাইনিয়েল গ্রন্থির একটা সম্পর্ক আছে—এই ধারণাও অনেকের ছিল। পাইনিয়েল গ্রন্থি সম্পর্কে কাজ খুব বেশী দিন হয় নি শুরু হয়েছে, কিন্তু যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেহের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রক হিসাবে পাইনিয়েলের যথেষ্ট ভূমিকা আছে বলে মনে হয়। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, পাইনিয়েলের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণে cAMP-এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেলাটোনিন নামক উত্তেজক রস একমাত্র পাইনিয়েলেই সংশ্লেষিত হয়। cAMP আবার মেলাটোনিনের সংশ্লেষণে কোন না কোনভাবে যুক্ত। পিটুইটারি এবং গোনাডের কার্যকর্ম, প্রাণীর উপর আলো এবং অন্ধকারের প্রভাব, যৌন সম্পর্ক প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণে মেলাটোনিনের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। মেলাটোনিন সংশ্লেষণ ছাড়াও আরও বহু

প্রয়োজনীয় যৌগ সংশ্লেষণে cAMP বিশেষভাবে জড়িত।

cAMP কিভাবে কাজ করে

cAMP কিভাবে বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে—সে সম্পর্কে দু-রকম মত আছে। একদলের মতে cAMP নিজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করে কোষের ক্যালসিয়ামের পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। অপর একদলের মতে, বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক পরিবর্তনের মূলে বিভিন্ন প্রোটিন কাইনেজ জৈব অনুঘটক জড়িত। আবার ঐ প্রোটিন কাইনেজগুলির সক্রিয়তা cAMP-এর উপর নির্ভরশীল। ইদানীং কতকগুলি প্রোটিন কাইনেজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে প্রোটিন কাইনেজের সঙ্গে cAMP যুক্ত হলে সম্পূর্ণ প্রোটিন কাইনেজ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন অংশটি আসলে সক্রিয়। প্রোটিন কাইনেজে যে গ্রাহক (Receptor) অংশটি যুক্ত থাকে, তার সঙ্গেই cAMP যুক্ত হয়। এই সংযোগের ফলে পুরো প্রোটিন কাইনেজের গঠন-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে, ফলে মূল প্রোটিন কাইনেজ থেকে সক্রিয় কাইনেজ অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

গ্রাহকযুক্ত প্রোটিন কাইনেজ (নিষ্ক্রিয়) + cAMP → cAMP যুক্ত গ্রাহক + প্রোটিন কাইনেজ (সক্রিয়)।

উত্তেজক রসগুলি হয়তো প্রোটিন কাইনেজ এবং cAMP-এর মিলনে অংশগ্রহণ করে। হয়তো এভাবেই আণবিক স্তরে cAMP বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক এবং দেহভিত্তিক পরিবর্তনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এই পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এতদিন আমরা যদিও দেহকোষের বড় বড় অণু—যেমন প্রোটিন, DNA, RNA ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা বলেছি, কিন্তু দেহকোষের ছোট ছোট অণুগুলির ভূমিকা যে যথেষ্ট, তা এড়িয়ে চলা যাবে না। cAMP-এর আবিষ্কার ও জীবের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঙ্গে যে ভাবে cAMP জড়িত, তা জীবকোষের আরও অন্যান্য ছোট অণুগুলি সম্পর্কে আমাদের ধারণায় পরিবর্তন আনতে পারে। চিন্তা, ভাব, হিংসা, গ্লানি প্রভৃতি মানুষের মানসিক অবস্থা, যা মস্তিষ্কের বিভিন্ন গঠন-প্রকৃতিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা জানতে আজকের বিজ্ঞান-জগৎকে অনেক ক্ষুদ্র নিয়ন্ত্রকগুলির দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের বিশ্বাস Dr. Delgado কর্তৃক উদ্ভাবিত Chemitrodes এবং Dialytrodes-এর ব্যবহার এই ব্যাপারে অনেক তথ্য প্রকাশে সক্ষম হবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

অল্প খরচে গৃহ নির্মাণ

স্বল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে অল্প খরচে গৃহনির্মাণের একটি পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র সরকার গ্রহণ করেছেন। ঐ সকল বাড়ী নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় ইট পোড়ানো হয় না এবং ফেলে দেওয়া নানা অকেজো জিনিষ, যেমন—কাচের টুকরা, বালি, অ্যাসবেস্টস, সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে সিমেন্ট মিশিয়ে এই সকল ইট তৈরি করা হয়। এই প্রকার ইট নির্মাণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'টেক প্রোসেস'। আমেরিকার ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ড্যানভণ্টায় 'টেক ইট' দিয়ে তিন কামরার একটি শোবার ঘর নির্মিত হয়েছে। এই সকল গৃহনির্মাণের জন্যে বিশেষ কোন যন্ত্রপাতি বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করবার প্রয়োজন হয় না। সমুদ্রের তলদেশ খনন করতে গিয়ে সেখান থেকে যে সকল উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে, তাও এই প্রক্রিয়ায় গৃহনির্মাণের কাজে লাগানো হচ্ছে। পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ড্যানিফক্সের মার্টেনটিক প্রোডাক্টস কর্পোরেশনের একটি শাখা সংস্থা কর্তৃক এই সকল অভিনব ইট উদ্ভাবিত হয়েছে।

শল্যচিকিৎসার অভিনব ছুরিকা

রক্তপাতহীন শল্যচিকিৎসার উপযোগী এক প্রকার অভিনব অস্ত্র নিউইয়র্কের পদার্থ-বিজ্ঞানী লিউইস বালাবুখ কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। সাধারণ শল্যচিকিৎসায় শিরা-উপশিরার মুখ-সমূহ বাঁধতে হয়। কিন্তু এই অভিনব ছুরিকা দিয়ে অপারেশনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। এই ছুরির ফলকে যে কম্পন সৃষ্টি করা হয় তাতে এর এক ইঞ্চির 5 হাজার ভাগের এক ভাগ স্থানে কম্পনের মাত্রা প্রতি সেকেণ্ডে 30 হাজার বার। অপারেশনের সময়ে অস্ত্র বস্তুর সংস্পর্শে আসামাত্র এতে যে তাপের সৃষ্টি হয়, তাতে কাটা রক্তপ্রবাহের নালীর মুখ বন্ধ হয়ে যায়, রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। কম্পনের মাত্রা বাড়ানো ও কমানোর ব্যবস্থাও এর হাতলে রয়েছে। বর্তমানে এই ধরণের ছুরিকা দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

মাছ ধরবার অভিনব কৌশল

আমেরিকার এরোস্পেস কর্পোরেশনের হুলিয়াম ষ্টন নামে জনৈক বিজ্ঞানী কর্তৃক মাছ ধরবার একটি প্রক্রিয়া ও সরঞ্জাম উদ্ভাবিত হয়েছে। নৌকা করে যাবার সময় ঐ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দিন ও রাত্রি যে কোন সময়ে মাছ ধরা যায়। এই প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের কোন একটি স্থানে গাছের ডালপালা, ছোট ছোট মাছের টুকরা ছিটিয়ে রাখা হয়, তাছাড়া তাতে থাকে চমৎকার আলোর ব্যবস্থা। ছোট মাছ ঐ আলো দেখে খাবারের লোভে সে দিকে ছুটে আসে এবং ঐ ডালপালার মধ্যে এসে আশ্রয় নেয়। ছোট মাছগুলিকে খেতে আসে আবার বড় বড় মাছ। সেখানে যে অভিনব জাল পাতা থাকে, তাতে এসে সবাই ঢুকে যায়। জালের মুখ থাকে ভিতরের দিকে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা আর সম্ভব হয় না। শব্দ সৃষ্টি করে মাছগুলিকে ঐ স্থানে নিয়ে আসা হয়।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে হৃদ্‌রোগীর চিকিৎসা

মিনেসোটার একটি প্রতিষ্ঠান পারমাণবিক শক্তি-চালিত একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন এর সাহায্যে চালু রাখা যায়। বাফালো নিউইয়র্ক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পারমাণবিক শক্তিতে চালিত

'পেসমেকার' নামে এই যন্ত্রটি রোগীর দেহের অভ্যন্তরে স্থাপন করবার পরিকল্পনা করেছেন এবং একাজে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের নিকট আবেদন করেছেন। যে কোন তেজস্ক্রিয় বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অনুমতি-লাভের প্রয়োজন। 'পেসমেকার' দেখতে একটি সিগারেটের বাক্সের মতন; শল্যচিকিৎসকগণ রোগীর তলপেট কেটে রোগীর দেহের ঐ স্থানে বা অন্য কোন স্থানে স্থাপন করে থাকেন। হৃৎ-কম্পন বজায় রাখবার জন্যে এই যন্ত্রটি এর আগেও রোগীর দেহে স্থাপন করা হয়েছে এবং ব্যাটারীর সাহায্যে এটিকে চালু রাখা হয়েছে। ঐ সকল ব্যাটারী দেড় থেকে দু-বছরের বেশী কার্যকরী হয় না। তারপর এটিকে রোগীর দেহ থেকে বের করে আনতে হয়। প্লুটোনিয়াম-238 পারমাণবিক-শক্তির সাহায্যে চালিত এই 'পেস মেকার' যন্ত্র দশ বছর পুরাপুরি কার্যকরী থাকবে। এই যন্ত্রে উদ্ভূত কম্পন একটি সরু তারের সাহায্যে হৃৎযন্ত্রে বাহিত হয়। ঘণ্টায় 72 বার হারে এতে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং হৃৎযন্ত্রটিকে উজ্জীবিত করে থাকে।

শহরের জঞ্জাল অপসারণের অভিনব ব্যবস্থা

কেগসভিলের (ভার্জিনিয়া) শহরের একমাত্র শিল্প সিমেন্টের কারখানাটি সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যায় ও বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। কারখানা কর্তৃপক্ষ তখন অন্যভাবে কারখানাটিকে ব্যবহার করা সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন। উপায় উদ্ভাবিত হলো এবং শহরে যে ময়লা ও আবর্জনা জমে ওঠে সে সকল আবর্জনাকে সিমেন্ট তৈরি করবার যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়। কেবল একটি কারখানা নয়, তার কাছে আর একটি কারখানাও স্থাপন করতে হয়। এর ফলে যে ময়লা ও আবর্জনা আস্তাকুঁড়কে কলুষিত করে, তা থেকে মুক্ত হওয়া তো গেলই, অধিকন্তু বহু বেকারেরও কর্মসংস্থান হলো।

ঐ প্রক্রিয়ায় সিমেন্ট তৈরির একটি যন্ত্রে আবর্জনাগুলিকে গুঁড়া করা হয়। আর একটি যন্ত্রে ঐ সকল আবর্জনায় যে সব ধাতব পদার্থ থাকে, তা পৃথক করা হয়। সিমেন্ট তৈরির পুরনো চুল্লীতে ঐ সব ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য বস্তু মিশিয়ে একটি কৃত্রিম উপাদান তৈরি করা হয়। জল বিশুদ্ধ করবার ব্যাপারে এই সকল কৃত্রিম উপাদান ব্যবহৃত হয়। ঐ আবর্জনার বাকী অংশটুকুর মধ্যে যে সব জৈব ও অজৈব উপাদান থাকে, তাদেরও পৃথক করা হয়। জৈব উপাদানের সাহায্যে তৈরি হয় মিশ্রিত কৃষি সার। আর অজৈব উপাদান কারখানায় চুল্লীতে তাপ উৎপাদনের জন্যে, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জেনারেটরটি চালু রাখবার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান

পৃথিবীর কোথায় সমুদ্রগর্ভে ও সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকার কোন্ স্থানে তৈল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুকায়িত রয়েছে, পৃথিবীর সম্পদসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ তার সন্ধান দিয়ে থাকে। ব্রহ্মদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় গালফ অয়েল কর্পোরেশন নামে একটি জাহাজকে এই কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। ঐ জাহাজে যে সকল জটিল যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম রয়েছে, সে সকল পৃথিবী প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহের সংকেত গ্রহণ করে যথানির্দিষ্ট স্থানে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের জন্যে তৎপর হবে। একাজে প্রয়োজনীয় সকল সাজসরঞ্জাম ঐ জাহাজে রয়েছে।

ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির লোকের বই পড়বার অভিনব ব্যবস্থা

[illegible], নিউইয়র্ক—[illegible] এলাকার

একটি বহনযোগ্য যন্ত্র। এর সাহায্যে 14 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও 9 ইঞ্চি প্রস্থের একটি পর্দার বৃহদাকারে হাতেলেখা বা ছাপানো যে কোন বিষয়বস্তু বৃহদাকারে প্রতিফলিত হয়। অক্ষিপট বা রেটিনায় যে পরিমাণ আলোক এসে পড়লে যে কোন বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণ আলোক সরবরাহের এবং যে কোন বিষয় সুস্পষ্টভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তোলবার ব্যবস্থাও ঐ যন্ত্রে রয়েছে। সুতরাং যারা প্রায় অন্ধ অথবা দৃষ্টিশক্তি যাদের কম, তারা ঐ যন্ত্রের সাহায্যে এখন বই, পত্র পত্রিকা ইত্যাদি পড়তে পারবেন। এই যন্ত্রটির ওজন 14 পাউণ্ড মাত্র।

আজব ঘড়ি

ঘণ্টা বা মিনিটের কাঁটা ঘুরছে না অথচ সময় জানিয়ে দিচ্ছে—নতুন ধরনের এই নিরেট হাত ঘড়িতে একটি বোতাম টিপলেই লাল অঙ্কে ঘণ্টা ও মিনিট দেখা যাবে। আবার বোতামের উপর আঙুল টিপে রাখলেই ঘণ্টা মিনিটের অঙ্ক মুছে যাবে আর সেকেণ্ডের সংখ্যা পাওয়া যাবে।

প্রচলিত আকারের এই আজব ঘড়ি গত মার্চ মাসে (1972) বাজারে বিক্রি হতে শুরু হয়েছে। কি করে যে ঘড়িটি চলে, তা কয়েক মাস পর্যন্ত জানা যায় নি। তারপর আমেরিকার পুলসার ডিভিসনের এইচ. এম ভারিষ্ট ইণ্ডাস্ট্রিজ ইনকর্পোরেটেডের দু-জন অফিসারকে এই আজব ঘড়ির পেটেন্ট দেওয়া হলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। ঘড়িটির যন্ত্রপাতির মূল হলো একটি স্ফটিকের টুকরা। টুকরাটি প্রয়োজনমত নিখুঁৎ আকারে কেটে নেওয়া হয়। স্ফটিকের টুকরাটি খুব দ্রুত কম্পিত হয়। একটি বিভেদকের সাহায্যে এই দ্রুত কম্পন কমিয়ে দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে একবার কম্পনে পরিণত করা হয়।

কম্পিউটারের সাহায্যে অস্ত্রোপচার

বড় বড় অস্ত্রোপচারে অনুভূতিনাশক অ্যানেস্থেসিয়া ওষুধে রোগীদের উপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বা ওষুধ কতটা পরিমাণ তাদের সহ্য হবে, তা কম্পিউটারের সাহায্যে চিকিৎসকেরা জানতে পারেন। আমেরিকায় কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির চিকিৎসাসংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ার ও ইউনিভার্সিটি হাসপাতালসমূহের চিকিৎসকদের একটি দল 3) জন রোগীর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

রোগীর বুক, বাহু ও ঘাড়ের চামড়ায় সংবেদনশীল যন্ত্র স্থাপন করা হয়। সেগুলি হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে বার্তা কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। প্রতিটি হৃৎকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের শক্তির একটি হিসাব কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। মিনেসোটার সেন্ট পলের ব্যাটারী ও ইলেকট্রনিক্স নির্মাতা গুল্ড ইনকর্পোরেটেডের সহযোগিতায় এই নতুন পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

যন্ত্রটি এখন কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে পাওয়া যায়। এখন এটি একবারে একজন রোগীর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। আশা আছে যে, এটিকে এমনভাবে উন্নত করা যাবে—যাতে একসঙ্গে অনেকগুলি অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটিকে ব্যবহার করা যায়।

হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানেস্থেসিয়ার ডিরেক্টর ডাঃ জোয়াকিম এস্ গ্র্যাভেনস্টাইন বলেন, বর্তমানে রোগীর নিরাপত্তার যে সব ব্যবস্থা রয়েছে, কম্পিউটার পদ্ধতি সে ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। বর্তমানে চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীর রক্তের চাপ ও হৃদ্স্পন্দন পরীক্ষা করেন এবং পরীক্ষামূলক মাত্রায় অনুভূতিনাশক ওষুধ ব্যবহার করেন। অধিকতর উন্নত এই পদ্ধতিতে কি সঙ্কট ঘটতে পারে—চিকিৎসক তা আগেই জানতে পারেন ও তা নিবারণ করতে পারেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

বিলুপ্ত মহাদেশ

প্রাগৈতিহাসিক কোন্ অন্ধকার যুগে কয়েকটি ছোটখাটো দ্বীপ, উপদ্বীপ—এমন কি দু-একটি বিরাট মহাদেশও হয়তো অদৃশ্য হয়ে গেছে সমুদ্রের তলায়, বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই সব বিলুপ্ত মহাদেশের অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মহাদেশগুলি যে স্থান পরিবর্তন করে—তা আজ থেকে প্রায় 100 বছর আগে বাইথানক নামে এক বিজ্ঞানী প্রথম লক্ষ্য করেন। তারপর 1914 সালে জার্মান বিজ্ঞানী ওয়েগনার, আমেরিকার টেলার, ফ্রান্সের স্নাইডার এই বিষয়ে গবেষণা করে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন। পরবর্তী কালে এ. এল. ডু টাইট এই মহাদেশীয় সঞ্চরণ (Continental Drift) তত্ত্বটি নানা প্রমাণাদির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হারিয়ে যাওয়া এই সব মহাদেশ সম্বন্ধে গবেষণা খুব সাম্প্রতিক কালে শুরু হলেও পাশ্চাত্যের কয়েকটি মহাকাব্যে এই ধরণের একাধিক মহাদেশের উল্লেখ দেখা যায়। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত টাইমিয়াস গ্রন্থে আটলান্টিস নামে অধুনা লুপ্ত এমনি একটি মহাদেশের কথা লিখেছেন। বর্তমানে যেখানে জিব্রালটার প্রণালী অবস্থিত, সেইখানেই ছিল প্রাচীন আটলান্টিস। কোন এক সময়ে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমগ্র মহাদেশটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ভূপৃষ্ঠ থেকে। জিব্রালটার প্রণালীর কাছাকাছি আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে এখনো একটানা অনেকগুলি অগভীর অংশ দেখা যায়, প্রাচীন আটলান্টিস মহাদেশ যে জায়গায় মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সেই বরাবর এর একটা অংশ আজও জলের তলায় আছে বলে মনে হয়।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, বর্তমান বিষুবরেখার উত্তর দিকে প্রাচীনকালে দুটি বিশাল

ভূ-ভাগ ছিল। তার উত্তর ও দক্ষিণ অংশে দুটির নাম ছিল যথাক্রমে লোরেসিয়া এবং গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। আজকের সমগ্র ইউরোপ, গ্রীনল্যাণ্ড, উঃ আমেরিকা এবং এশিয়ার কিছু অংশ লোরেসিয়ার অন্তর্গত ছিল আর গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড বলতে বোঝাতো বর্তমান আফ্রিকা, দঃ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মেরু অঞ্চল এবং আমাদের ভারতবর্ষ। এই দুই মহাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত বিরাট টেথিস সাগর। বহু দিন আগে এই দুই ভূ-ভাগ এবং সেই সঙ্গে টেথিস সাগরও লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেন, আজকের ভূমধ্যসাগর প্রাচীন সেই টেথিসেরই একটা অংশ। প্রাগৈতিহাসিক কয়েকটি উদ্ভিদের জীবাশ্ম দেখেও বিশেষজ্ঞেরা প্রাচীন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেছেন। গ্লসপ্টেরিস নামে হিমশীতল মেরু প্রদেশীয় এক শ্রেণীর গুল্মের জীবাশ্ম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে; যেমন—দঃ ভারত, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, মেরু অঞ্চল এবং অষ্ট্রেলিয়া। বর্তমানে এই স্থানগুলির কয়েকটির মধ্যে দূরত্ব সহস্রাধিক মাইল হলেও এক সময়ে এরা যে একটা অখণ্ড ভূ-ভাগের অন্তর্গত ছিল, জীবাশ্মের এই বিস্তৃতিই তার অকাট্য প্রমাণ। প্রাচীন যুগের বিরাট আকৃতির হিমবাহগুলি গলতে সুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডও ক্রমে উত্তর দিকে সরে যেতে থাকে। এর প্রচণ্ড আকর্ষণের মুখে দঃ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং আরও দুটি বিরাট ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মূল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অবশিষ্ট অংশটি আরও দক্ষিণে সরতে সরতে বর্তমান দঃ মেরুর কাছে হাজির হয় এবং সেখানকার সীমাহীন পুরু বরফস্তূপের নীচে অদৃশ্য হয়ে যায় চিরদিনের জন্যে। পরবর্তী কালে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে শ্রবণোত্তর ধ্বনি-তরঙ্গের সাহায্যে ব্যাপক পরীক্ষা চালিয়ে বিশেষজ্ঞেরা দঃ মেরুর তলদেশে একটানা দীর্ঘ ফাটল এবং একাধিক বৃহৎ গহ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের মতে, এগুলি বরফের নীচে হারিয়েযাওয়া প্রাচীন মহাদেশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডেরই ধ্বংসাবশেষ। ওয়েগনারও বলেছেন, বর্তমান পৃথিবীতে মেরুপ্রদেশ সমেত যে সাতটি মহাদেশ আছে, তার মধ্যে কেবল এশিয়া ও ইউরোপ ব্যতীত আর কোন মহাদেশের মধ্যে সরাসরি যোগ নেই, কিন্তু 37½ কোটি বছর আগে সমস্ত মহাদেশই ছিল পরস্পর জোড়া। এক অজ্ঞাত প্রাকৃতিক কারণে একদিন এর মধ্যে ফাটল দেখা দেয়, ফলে সমস্ত মহাদেশটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আজ থেকে 15 লক্ষ বছর আগে প্লিস্টোসিন (Pleistocene) যুগে মহাদেশগুলি আজকের স্থানে আসে।

বিশেষজ্ঞেরা দেখেছেন, একটা বড় কাগজকে কয়েকটা অংশে ছিঁড়ে নেবার পর ছেঁড়া টুকরাগুলি পাশাপাশি রাখলে সেগুলি যেমন খাঁজে খাঁজে মিলে যায়, ঠিকমত সাজালে মহাদেশগুলির তটরেখাও তেমনি অদ্ভুতভাবে একটার সঙ্গে আরেকটাকে বেমালুম জুড়ে দেওয়া চলে। দঃ আমেরিকার পূর্ব তটরেখা ও আফ্রিকার পশ্চিম তটরেখা এবং উঃ আমেরিকার পূর্বাংশ ও ইউরোপের পশ্চিমাংশ পাশাপাশি সাজালে একটা কাগজের ছেঁড়া

টুকরোর মতই হুবহু মিলে যায়। ভারতের পশ্চিম তটরেখা ও লোহিত সাগরের নিকটবর্তী আফ্রিকার পূর্ব উপকূল পাশাপাশি রাখলে এমন খাপে খাপে মিলে যায় যে, মনে হতে পারে এক সময় এরা একই সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিশেষজ্ঞেরা তাই মনে করেন, সুদূর অতীতে কোন এক সময় এই মহাদেশগুলি একটি অখণ্ড ভূ-ভাগের অন্তর্গত ছিল, পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেছে।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বিভিন্ন সময়ে একটি নয়—একাধিক মহাদেশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে সমুদ্রের গর্ভে। এর একটি ছিল প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে। এটি দঃ আমেরিকা থেকে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এর সর্বোচ্চ সীমা ছিল ইস্টার দ্বীপপুঞ্জ। আরও এই ইস্টার দ্বীপে বিচিত্র আকৃতির অনেকগুলি স্তম্ভ ও সৌধ দেখা যায়। এগুলি কারা কবে কোন্ উপাদানে তৈরি করেছিল, তা এখনও জানা যায় নি। তবে ভূতাত্ত্বিকদের অনুমান, সমুদ্রের তলায় বিলুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের নাম-না-জানা মহাদেশের অধিবাসীরাই এই সৌধগুলির নির্মাতা। মহাদেশটি কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু কালের তর্জনী উপেক্ষা করে বিচিত্র উপাদানে তৈরি এই সব ধ্বংসাবশেষ লক্ষ লক্ষ বছর পরেও তার স্মৃতি বহন করে চলেছে। দ্বিতীয় আরেক দল বিশেষজ্ঞের মতে, আজকের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, নিউগিনি এবং এদের নিকটবর্তী ছোটখাট দ্বীপগুলি অতীত যুগে একটি অখণ্ড ভূভাগের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এদের মধ্যবর্তী ভূমি মাঝে মাঝে সমুদ্রের তলায় রয়ে গেছে, আজ তাই দেশগুলিকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন মনে হয়। তৃতীয় আরেকটি মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগর অঞ্চলে; এটি ভারত মহাসাগর বরাবর ভারতবর্ষকে যুক্ত করেছিল আফ্রিকার সঙ্গে, অর্থাৎ অতীতে এক সময় ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা মহাদেশ ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন ভূভাগ। তাছাড়া আরও একটি মহাদেশ আজকের মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে মালাগাসি অর্থাৎ মাদাগাস্কারকে যুক্ত করেছিল বলে মনে করা হয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাদেশগুলির ভাঙা-গড়া ও স্থান পরিবর্তনের ক্রিয়া আজও চলেছে। হাতে-কলমে পরীক্ষা করে এর প্রমাণও তাঁরা পেয়েছেন। তাঁদের মতে, হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, নিকটবর্তী দেশগুলিতে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে; যেমন—এর ফলে আরব, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ যদি সুদূর ভবিষ্যতে কোন দিন ভারতবর্ষের কাছাকাছি সরে আসে, তবে অবাক হবার কিছু নেই। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত গ্রীনল্যাণ্ডের দ্রাঘিমার দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে বিশেষজ্ঞেরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, এই বিরাট দেশটি ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রতি বছর 25 থেকে 30 গজ করে সরে যাচ্ছে। এভাবে ক্রমাগত দূরত্ব বাড়তে থাকলে কয়েক লক্ষ বছর পরে সমস্ত দেশটি ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে সরে যাবে, এমন অনুমান করা খুব ভুল হবে না।

অশোক সেন

পারদর্শিতার পরীক্ষা

নৃ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ছ'টি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে—কোন্‌টি সঠিক, তোমাদের বলতে হবে। তোমাদের উত্তর অনুযায়ী নৃ-বিজ্ঞানে তোমাদের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারবে।

1. পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল

   (ক) 25 থেকে 30 লক্ষ বছর আগে

   (খ) 2·5 থেকে 3 কোটি বছর আগে

   (গ) 25 থেকে 30 কোটি বছর আগে

2. বিবর্তনের ধারায় আধুনিক মানুষের পূর্ববর্তী মানুষকে বলা হয়

   (ক) ক্রো-ম্যাগ্‌নন (Cro-magnon) মানুষ

   (খ) নিয়ানডার্থাল (Neanderthal) মানুষ

   (গ) হোমো ইরেক্টাস (Homo Erectus)

3. আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন হলো মোটামুটিভাবে 1500 ঘন সেন্টিমিটার।

   (i) শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্কের আয়তন হচ্ছে প্রায়

   (ক) 400 ঘন সেন্টিমিটার

   (খ) 1200 ঘন সেন্টিমিটার

   (গ) 2000 ঘন সেন্টিমিটার

   (ii) ক্রো-ম্যাগ্‌নন মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায়

   (ক) 1400 ঘন সেন্টিমিটার

   (খ) 1500 ঘন সেন্টিমিটার

   (গ) 1600 ঘন সেন্টিমিটার

4. (i) 1971 খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল মোটামুটিভাবে

   (ক) 50 কোটি

   (খ) 55 কোটি

   (গ) 60 কোটি

   (ii) ঐ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা ছিল মোটামুটিভাবে

   (ক) 4 কোটি

   (খ) 4½ কোটি

(ঘ) 5 কোটি

5. (i) 1971 খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সহরের জনসংখ্যার শতকরা হার ছিল প্রায়

(ক) 20

(খ) 25

(গ) 30

(ii) ঐ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সহরের জনসংখ্যার শতকরা হার ছিল প্রায়

(ক) 20

(খ) 25

(গ) 30

6. ভারতবর্ষে ভাষা ও উপভাষার সর্বসমেত সংখ্যা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে

(ক) 85

(খ) 850

(গ) 8500

(উত্তরের জন্যে 125নং পৃষ্ঠা দেখ)

জ্ঞানানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু

সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

মুক্তি-বেগ

উপরদিকে কোন বস্তুকে ছুঁড়ে দিলে তা আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। এর প্রধান কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ অর্থাৎ অভিকর্ষ। কিন্তু একে এমন একটি বেগে উৎক্ষিপ্ত করলে আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না, তখন বস্তুর পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। বস্তুর এই বেগকেই বলা হয় মুক্তি-বেগ (Escape velocity)।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠে গ্রাভিটেশন্যাল পোটেন্শিয়েলের (Gravitational potential) মান $-\frac{GM}{r}$, যখন G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, M = পৃথিবীর ভর, r = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। ঋণাত্মক চিহ্ন এর বলের ঋণাত্মক ধর্ম প্রকাশ করে। সুতরাং m ভরবিশিষ্ট বস্তুকে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠাতে প্রয়োজনীয় শক্তির (Work বা Energy) পরিমাণ ঐ m ভরবিশিষ্ট বস্তুটির পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকাকালীন স্থিতিশক্তির

(Potential energy) বেশী হওয়া প্রয়োজন। m ভরবিশিষ্ট বস্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকলে স্থিতিশক্তির পরিমাণ $G\frac{Mm}{r}$।

এখন বস্তুটি যদি v বেগে উলম্বভাবে উপরদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, তবে তার গতিশক্তি $\frac{1}{2}mv^2$, এখন এই গতিশক্তির মান স্থিতিশক্তির বেশী হলে বস্তুটি পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে উঠবে। এখন এই ক্ষেত্রে বস্তুটির বেগ যদি v_e হয় অর্থাৎ বস্তুটির মুক্তি বেগ যদি v_e হয়,

$$\frac{1}{2}mv_e^2 = G\frac{Mm}{r};$$

$$v_e^2 = 2GM$$

নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র থেকে পৃথিবী ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত m ভরবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল F হলে,

$$F = G.\frac{Mm}{r^2}।$$

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে $F = mg$.

$$\therefore\ g = \frac{GM}{r^2}.$$

$$\therefore\ v_e^2 = \frac{2GM}{r} = \frac{2GM}{r^2} \times r = 2gr$$

$$\therefore\ \text{মুক্তি-বেগ}\ v_e = \sqrt{2gr}$$

একণে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $r = 6321$ কি. মি. (Km), অভিকর্ষজ ত্বরণ $g = 980 \times 10^{-6}$ কি. মি./সেকেণ্ড² (Km./Sec²)।

∴ পৃথিবী থেকে কোন বস্তুর মুক্তি বেগ $(v_e) = \sqrt{2 \times 980 \times 10^{-6} \times 6321}$ কি.মি./সেকেণ্ড $= 11{\cdot}2$কি.মি/সেকেণ্ড $= 7$ মাইল/সেকেণ্ড (বা 25,000 মাইল/ঘণ্টা)

সুতরাং কোন বস্তুকে 25,000 মাইল/ঘণ্টা বেগে উৎক্ষিপ্ত করলে তা আর কখনও পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। সুতরাং পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত কোন মহাকাশযানের গতিবেগ অন্ততঃ ঘণ্টায় 25,000 মাইল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই বিপুল গতিবেগে আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তা হচ্ছে বাতাসের ঘর্ষণজনিত সমস্যা। বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে মহাকাশযান জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এই জন্যে প্রথম দিকে মহাকাশযানের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম রাখতে হয়। এভাবে তাকে বাতাসের স্তরটা পার করে দিতে হবে। তারপর এই বেগ ক্রমশঃ বাড়ানো হয় ধাপে ধাপে।

সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) ও ব্যাস বিভিন্ন হওয়ায় ঐ সকল

গ্রহে মুক্তি-বেগের মান বিভিন্ন। নিম্নে চন্দ্র ও সূর্যসহ গ্রহগুলিতে মুক্তি-বেগ ও তাদের ব্যাস ও অভিকর্ষজ ত্বরণের মান দেওয়া হলো :—

গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্র	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো	সূর্য	চন্দ্র
গড় ব্যাস (কি.মি.)	5,000	12,400	12,742	6,870	13),760	115,100	51,000	50,000	12,700	1,390,600	3,476
অভিকর্ষজ ত্বরণ (পৃথিবীর তুলনায়)	0·27	0·86	1·00	0·37	2·64	1·17	0·92	1·44	? (?)	28	0·17
মুক্তি-বেগ (কি.মি./সেকেণ্ড)	3·6	10·2	11·2	5·0	60	36	21	23	11 (?)	620	1·9

বহু পূর্বে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন বেশী ছিল। উত্তপ্ত থাকবার সময় বায়ুমণ্ডলের হাল্কা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম প্রভৃতি ধীরে ধীরে ক্রমাগত বায়ুমণ্ডল থেকে মহাশূন্যে চলে যায়। চাঁদ বা সৌর পরিবারের অপর গ্রহগুলির উপগ্রহে বায়ুমণ্ডল না থাকা বা অতি অল্প থাকবার কারণ উপগ্রহের ব্যাস ও অভিকর্ষজ ত্বরণ কম হওয়ায় তাতে মুক্তি-বেগ অনেক কম। ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসসমূহ কম মুক্তি-বেগ অতিক্রম করে উপগ্রহের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়েছে। অপর পক্ষে সূর্যে মুক্তি-বেগ অনেক বেশী হওয়ায় হাইড্রোজেন প্রভৃতি হাল্কা গ্যাস সূর্য থেকে অন্যত্র যেতে অক্ষম।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী যোড়াই

বিচিত্র ব্যাক্টিরিয়া

আমাদের এই পৃথিবীতে যারা বেঁচে আছে, তারাই বাতাস, জল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করছে। অক্সিজেন গ্যাসই জীবকে বাঁচিয়ে রাখে।

কিন্তু কিছু কিছু এমন ব্যাক্টিরিয়াও আছে, যারা অক্সিজেন ছাড়াই বেঁচে থাকে। আজ সেই রকম কয়েক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার কথা আলোচনা করা যাক। তবে তাদের সম্বন্ধে আলোচনার আগে ব্যাক্টিরিয়া বলতে কাদের বোঝায়, সে সম্বন্ধে একটু জানতে হবে।

ব্যাক্টিরিয়া খালি চোখে দেখা যায় না—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। এরা অনেক রকম রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এদের শরীরে এক বা একাধিক কোষ থাকে।

কোন কোন জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া মোটেই নড়া-চড়া করতে পারে না; কিন্তু কেউ কেউ আবার নড়া-চড়া করতে পারে। অতিসূক্ষ্ম শোঁয়ার মত এক প্রকার লম্বা, সরু অংশ এদের নড়া-চড়ায় সাহায্য করে। এগুলিকে ফ্ল্যাজেলা (Flagella) বলা হয়।

অক্সিজেনের প্রয়োজন না হয়, এই রকম তিন জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার নাম করা যেতে পারে; যেমন—1. এসকেরিশিয়া কোলাই (Escherichia coli), 2. থায়োস্পিরিলাম (Thiospirillum); 3. ক্লস্ট্রিডিয়াম (Clostridium)।

এসকেরিশিয়া কোলাই নামক ব্যাক্টিরিয়ার অক্সিজেন দরকারে লাগে বটে, কিন্তু কোন কারণে যদি অক্সিজেন না পায়, তাহলেও এদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। অক্সিজেন ব্যতীত এই সব ক্ষেত্রে এরা বেশ বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে। অক্সিজেন ছাড়াই অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থের সাহায্যে এরা এদের জৈব প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়।

থায়োস্পিরিলাম নামক ব্যাক্টিরিয়ার অক্সিজেন একদম দরকারই হয় না। এরা বদ্ধ জলে থাকে এবং বিশেষ করে এমন বদ্ধ জল, যেখানে অক্সিজেন নেই। অবশ্য অক্সিজেন থাকলেও এদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সুতরাং এদের কাছে অক্সিজেন গ্যাসের কোন প্রয়োজন নেই।

ক্লস্ট্রিডিয়াম ব্যাক্টিরিয়াদের ব্যাপার আরও অদ্ভুত। কেন না, এর আগে যাদের কথা বলা হলো, অক্সিজেনের দ্বারা তারা কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রথমটি অক্সিজেন নিজের কাজে লাগাতে পারে আর দ্বিতীয়টির কাছে অক্সিজেন অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু ক্ষতিকারক নয়। ক্লস্ট্রিডিয়াম নামক ব্যাক্টিরিয়া অক্সিজেন গ্যাসকে এড়িয়ে চলে। এরা পঙ্কপূর্ণ স্থানে থাকে। অক্সিজেন এদের কোন কাজেই লাগে না, অধিকন্তু এই গ্যাস এদের কাছে রীতিমত বিষাক্ত। এরা যদি প্রচুর অক্সিজেনসমন্বিত কোন স্থানে গিয়ে পড়ে, তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে।

এখন স্বভাবতঃই একথা মনে হয় যে, আমাদের পৃথিবীতে যখন অক্সিজেন ব্যতিরেকেই কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া সুষ্ঠুভাবেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, তথা পৃথিবীর বাইরে বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি অক্সিজেনশূন্য গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। পৃথিবীতে প্রচুর অক্সিজেন থাকা সত্বেও তার সাহায্য না নিয়ে যদি এসব ব্যাক্টিরিয়া বেঁচে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে পারে, তবে অক্সিজেনশূন্য অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে উপযুক্ত পরিবেশে জীবনের অস্তিত্বের অভাব হবে কেন?

অশোক ঘোষদস্তিদার

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (খ)

2. (ক)

[ক্রো-ম্যাগ্‌নন মানব, নিয়ানডারথাল মানব এবং হোমো ইরেক্টাস পৃথিবীতে বর্তমান ছিল যথাক্রমে প্রায় 50 হাজার বছর, 1 লক্ষ বছর এবং 5 থেকে 10 লক্ষ বছর আগে।]

3. (i) (ক)

   (ii) (গ)

4. (i) (খ)

   [1971 খৃষ্টাব্দের লোকগণনা অনুযায়ী এই জনসংখ্যা ছিল 54,73,67,926]

   (ii) (খ)

   [1971 খৃষ্টাব্দের লোকগণনা অনুযায়ী এই জনসংখ্যা ছিল 4,44,40,095]

5. (i) (ক)

   [প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 1921, 1951, 1961 ও 1971 খৃষ্টাব্দে এই হার ছিল যথাক্রমে 11·4, 17·3, 17·98 ও 19·87]

   (ii) (খ)

   [প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 1961 ও 1971 খৃষ্টাব্দে এই হার ছিল যথাক্রমে 24·45 ও 24·59]

6. (খ)

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1.: ব্রঙ্কাইটিস রোগ কি?

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, 24-পরগণা।

উত্তর 1: ব্রঙ্কাইটিস শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্রঙ্কাসের প্রদাহ। আমাদের শ্বাসনালী বুকের পাঁজরে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে বাম ও ডান ফুসফুসে প্রবেশ করেছে, যাদের বলা হয় যথাক্রমে বাম ব্রঙ্কাস ও ডান ব্রঙ্কাস। ব্রঙ্কাস দুটি ফুসফুসের মধ্যে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে আছে।

এই ব্রঙ্কাস যখন ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখনই প্রদাহের সৃষ্টি হয়। ব্রঙ্কাইটিস রোগের আক্রমণে জ্বর, হাতেপায়ে যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা, অনবরত শুষ্ক কাশি ইত্যাদির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ থেকে নিউমোনিয়া—এমন কি, দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে এ থেকে বুকের ও ফুস্‌ফুসের কঠিন অসুখ পর্যন্ত হতে পারে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

তমলুকে বিজ্ঞান-চিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী

মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে গত 24 ও 25শে ডিসেম্বর (1972) কিশোর কল্যাণ পরিষদের বার্ষিক শিবির উপলক্ষে স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগার ভবনে বিজ্ঞান-চিত্র ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে মানুষের চন্দ্রাভিযানের আলোকচিত্র, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসমূহ এবং ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি স্থান পায়। 24শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কিশোর কল্যাণ পরিষদের সহ-সভাপতি ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে বলেন—এই ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন করে আমরা গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করে আসছি। স্থানীয় ছেলেমেয়েরা এই প্রদর্শনী দেখে উৎসাহিত বোধ করলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করে বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায় যে শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন, তা সভায় পাঠ করেন শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরামপুর চাতরায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

গত 30 ডিসেম্বর '72 থেকে 1লা জানুয়ারী '73 এই তিন দিন ধরে শ্রীরামপুরের চাতরা নন্দ-পাড়া লেনে কল্পতরু ছোটদের আসরের উদ্যোগে এক সুন্দর এবং শিক্ষণীয় পঞ্চম বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

ইলেকট্রনিক্স, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতি-বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা এই পাঁচটি বিভাগে প্রদর্শনীটি বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল ইলেকট্রনিক্স বিভাগে ইন্টারকমিউ-নিকেশন (আর্তসংযোগ প্রথা) দ্বারা এক জায়গা থেকে দূরবর্তী অন্য জায়গায় কথোপকথন আর খুব সহজে এবং খুব অল্প দামে ট্রানজিস্টর ব্যাটারী এলিমিনেটর তৈরি।

জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগে বিভিন্ন রঙীন আলোক-বিন্দুর মাধ্যমে 'জানুয়ারী-73'-এর আকাশে

আকাশকে চিনিয়ে দেওয়া হয়। এটি ছিল একেবারে নতুন এবং অভিনব প্রচেষ্টা।

2য় ছবনী বীরের মডেল, ইউনিভার্সাল ক্যালেণ্ডার, Paper chromatography এবং কলকাতার বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের লোকরঞ্জক বিজ্ঞানের মডেলগুলি খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক ক্ষুদ্র স্মারক পুস্তিকাটিও সুন্দর হয়েছিল। তিনদিন ধরে প্রদর্শনীতে বহু ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ দর্শকের সমাগম হয় এবং বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি এবং বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়।

পরিবেশ দূষিতকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা-চক্র

গত 14, 15 ও 16 ডিসেম্বর (1972) কলকাতায় ভারতের পরিবেশ দূষিতকরণ প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচনার জন্যে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিজ্ঞানীরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলা দেশের প্রতিনিধিও এতে উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা ছিলেন সি. এম. ডব্লু. এ, সি. এম. ডি. এ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণাগার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ।

এই আলোচনাচক্রের কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান, মহাকাশ ও পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ সাইমন বোরগিন কলকাতায় এসে পরিবেশ দূষিতকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার বিজ্ঞান প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কলকাতার মত জনবহুল শহরে যেখানে বহু লোক রাস্তায় বসবাস করে, সেখানে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হলে পরিবেশ দূষিতকরণ সমস্যার প্রতিকার করা কঠিন। শুধু জনবহুল নয়, কলকাতা হচ্ছে দিনের অত্যধিক যানবাহন শহর। যানবাহন পরিবেশকে দূষিত করে মানুষের শরীরের উপর ক্ষতি করে। জল ও বাতাস দূষিতকরণ সমস্যার সঙ্গে শব্দজনিত পরিবেশ দূষিতকরণ সম্পর্কেও আমাদের সচেতন হতে হবে।

লুনাখোদ-2-এর চাঁদের বুকে অবতরণ

মস্কো থেকে রয়টার এবং ইউ. এন. আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-21 স্বয়ংক্রিয় চালকযান লুনাখোদ-2-কে 16ই জানুয়ারী চাঁদের বুকে নামিয়ে দিয়েছে।

ইতিপূর্বে লুনাখোদ-1 চাঁদের বুকে যে গবেষণা শুরু করেছিল, লুনাখোদ-2 তার পুনরাবৃত্তি করছে। লুনাখোদ-2-এর ওজন 840 কিলোগ্রাম।

মানব-আরোহীহীন এই মহাকাশযানকে গত 8ই জানুয়ারী পৃথিবী থেকে পাঠানো হয়।

যন্ত্রের সহায়তায় জন্মবার্তা

লণ্ডন থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—গুরুতর অস্বাভাবিকতা নিয়ে যাতে কোন শিশু না জন্মায়, সেজন্যে বৃটেনের একটি সেবা প্রতিষ্ঠানকে অতি উন্নত ধরণের একটি যন্ত্রের সহায়তা দেওয়া হবে।

সন্তানটি জড়বুদ্ধি হবে কিনা বা ভবিষ্যৎকালে তার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোন আশঙ্কা রয়েছে কিনা, জেমেটোগ্রাফ-মাস-স্পেকট্রোমিটার নামে অভিহিত এই যন্ত্রে গর্ভাশয় থেকে নিঃসৃত রস বিশ্লেষণ করে আগেই তা বলে দিতে পারা যায়।

কুইন চারলট ম্যাটারনিটি হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলেছেন, ভাবী সন্তানের অস্বাভাবিকতা খুঁজে বের করবার জন্যে আমরা এতদিন যে যন্ত্র ব্যবহার করে এসেছি, তার দ্বারা গর্ভাবস্থার 7ম সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হলে কিছুই ধরা যায় না বা সবকটি ক্ষেত্রেও ধরা পড়ে না।

46000 স্টারলিং ব্যয়ে নির্মিত এই যন্ত্রটির

সাহায্যে এর অনেক আগেই গর্ভস্থ সন্তানের ভাবী জীবনের চিত্রটি উদ্ঘাটিত করতে পারা যাবে।

কৃত্রিম গাত্রচর্ম

নতুন দিল্লি থেকে ইউ এন আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—মানুষের স্বাভাবিক গাত্রচর্মের বিকল্প হিসাবে আমেরিকায় কৃত্রিম গাত্রচর্ম উদ্ভাবিত হয়েছে। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ মানুষের ক্ষতস্থানে চামড়া এবং সাধারণভাবে রোগীর নিজেরই চামড়া তার দেহের অন্য স্থান থেকে তুলে এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এতে সুফল পাওয়া যায় না। কৃত্রিম গাত্রচর্মের মধ্য দিয়ে বাতাস ও জলীয় বাষ্প দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেও রক্ত বের হয়ে যাবে না। অথবা এই চামড়া ভেদ করে কোন রোগ-জীবাণুও প্রবেশ করতে পারবে না।

ভারতে ভূগর্ভস্থ তাপ ব্যবহারের উদ্যোগ

নিউইয়র্ক থেকে পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—ভূগর্ভের অভ্যন্তরস্থ তাপ থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পক্ষে কোন্ কোন্ অঞ্চল সর্বাধিক উপযোগী হবে তা স্থির করবার ব্যাপারে ভারতকে সহায়তা করবার জন্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের একদল বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই ভারতে আসছে।

ভারতের সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রকের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবহন বিভাগ তাদের সেখানে পাঠাচ্ছেন। উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর জোসেফ বারনিয়া সম্প্রতি বলেছেন, চলতি শতাব্দীর শেষে সারা পৃথিবীতে বিদ্যুৎ ও শক্তির যে সঙ্কট দেখা দিতে চলেছে, তার সমাধান হতে পারে মাত্র একটি পথেই এবং তা হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ-শক্তিকে কাজে লাগানো। তিনি আরও বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়া আর মাত্র দুটি দেশে এই অব্যবহৃত শক্তি-সম্পদ রয়েছে এবং দেশ দুটি হলো ভারত ও জাপান। চীনে এই সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে বহির্বিশ্বে কিছুই জানা নেই।

ডক্টর বারনিয়া আরও বলেছেন, শক্তির এই নতুন উৎস কেবলমাত্র বিদ্যুৎই উৎপাদন করবে না, অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে ব্যাপকভাবে এয়ার-কণ্ডিশনিং-এও এটার ব্যবহার চলবে। সমুদ্র জলকে লবণমুক্ত করবার ব্যাপারেও এর প্রয়োজনীয়তা থাকবে। ভারতের সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রক সারা দেশে 252টি উষ্ণ প্রস্রবণ খুঁজে পেয়েছেন। এগুলি বিদ্যুৎ-শক্তির নতুন উৎস হয়ে উঠতে পারে এবং জলশক্তি ও কয়লা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতকে সর্বাংশে সহায়তা করবে। উক্ত প্রস্রবণগুলি রয়েছে প্রধানতঃ বিহার, হিমাচল প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কোঙ্কণ এলাকায়। যেহেতু বিহারে যথেষ্ট কয়লাখনি রয়েছে এবং কয়লা তাপবিদ্যুতের প্রধান উৎস সেহেতু এই ভূগর্ভস্থ তাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষড়বিংশতিতম বর্ষ | মার্চ, 1973 | তৃতীয় সংখ্যা

গণিত শিক্ষার আধুনিকীকরণ

গণিতের উৎপত্তি দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগে—তারপর এসেছে তার তত্ত্ব। প্রাথমিক অবস্থা (যা বেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল) পার হবার পরে গণিতে তত্ত্বীয় জ্ঞানানুসন্ধানের প্রেরণা এসেছে কখনও প্রয়োগ থেকে আবার তত্ত্বীয় জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে আগে এবং প্রয়োগ এসেছে অনেক পরে, এমন কি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে। উদাহরণ, যথা—রীমানীয় (Riemannian) জ্যামিতি ও আইনস্টাইনের (Einstein) সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General theory of relativity)। প্রতিক্ষেত্রেই প্রয়োগ সব সময়েই অধিকতর এবং গভীরতর তত্ত্বীয় গবেষণার প্রেরণা যুগিয়েছে। গণিতের বিকাশে প্রয়োগ এবং তত্ত্বীয় জ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—গণিত প্রয়োগ ও তত্ত্বীয় জ্ঞানের সমন্বয়। তাই গণিত শিক্ষার সুষ্ঠু ভিত্তি স্থাপনে গণিতের এই উভয় অঙ্গের সু-সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। তা না হলে গণিত শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অবশ্য সুষ্ঠু ভিত্তি-স্থাপনের পর আসবে বিশেষজ্ঞ তৈরির শিক্ষার পালা। পরে আবার বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের পুনর্মিলনে অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে। তাই প্রয়োজন বিশেষজ্ঞদের তরজার লড়াই নয় জ্ঞানান্বেষণে সক্রিয় সহযোগিতা—পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে।

গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে গণিতের তত্ত্বীয় অঙ্গের ও প্রায়োগিক অঙ্গের—উভয়েরই অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। যা কিছু দিন আগে বিশুদ্ধ তত্ত্ব বলে মনে হতো আজ তার প্রচুর প্রয়োগ হচ্ছে। প্রথম উদাহরণ হিসাবে ধরি বুলীয় বীজগণিত (Boolean algebra)—বহু কাল ধরে যার প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল শুধুমাত্র বিশুদ্ধ তর্কবিদ্যা

ও সমুদায়ের বা সেটের (Set) তত্ত্ব: প্রযুক্তিবিদ্যায় তার প্রথম প্রয়োগ হলো বৈদ্যুতিক বর্তনীর তত্ত্বে এবং তারপর এই বর্তনী তত্ত্বের যুগান্তকারী প্রয়োগ হলো আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রগণক গঠনে। বুলীয় বীজগণিতের আধুনিক প্রয়োগ ক্ষেত্রের মধ্যে আছে সমাজবিদ্যা, গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি। অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব এখন আর শুধু তত্ত্বীয় ভাববিলাস নয়। যন্ত্রগণকের কার্য নির্দেশ সারণীর বা প্রোগ্রামের ভাষার গবেষণা ও যন্ত্রগণকের সাহায্যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের গবেষণাও এই গাণিতিক ভাষাতত্ত্বের আওতায় পড়ে। দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে ধরি আধুনিক বীজগণিতের সসীম ক্ষেত্র তত্ত্বের (Theory of finite fields) প্রয়োগ কূটায়নের বা কোডিং-এর তত্ত্বে (Coding theory)। যন্ত্রগণকে, বেতার দিয়ে দূরত্ব মাপা কিংবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সংকেতের সাহায্যে সংবাদ পাঠানো ইত্যাদিতে এই কূটায়ন তত্ত্বের প্রভূত প্রয়োগ হয়েছে ও হচ্ছে। এই কূট (Code) ভ্রান্তিশোধক (Error-correcting)—প্রেরক-যন্ত্র থেকে গ্রাহক-যন্ত্রে সংকেত যাওয়ার পথে কোন অপবাদ ঘটলে গ্রাহক-যন্ত্র তা যথা সম্ভব সংশোধন করে নেয়। বছর পনেরো আগে সসীম ক্ষেত্র তত্ত্বের এরূপ প্রয়োগের কথা কেউ হয়তো কল্পনাও করেন নি। আনন্দের কথা এই যে, এই সব প্রয়োগের পথিকৃৎদের মধ্যে একজন বিদেশবাসী বাঙালীও আছেন—তাঁর নাম অধ্যাপক রাজচন্দ্র বোস। তৃতীয় উদাহরণ হিসাবে ধরি লেখ তত্ত্ব (Graph theory)—আজকাল এর প্রয়োগের ক্ষেত্র অতিশয় ব্যাপক—বৈদ্যুতিক বর্তনী তত্ত্ব, যন্ত্রগণকের বিশ্লেষণ, যন্ত্রগণকের প্রোগ্রাম রচনা, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তত্ত্ব বা অটোমাটা তত্ত্ব (Theory of automata), বিচ্ছিন্ন পরিচালনা তত্ত্ব, অপারেশনস রিসার্চ (Operations research), সাধারণভাবে কিবেরনেটিক্স্ বা সাইবারনেটিক্স্ (Cybernetics), সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি এর প্রয়োগ ক্ষেত্রের মধ্যে।

উপরে যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া হলো সব কয়টিই বিচ্ছিন্ন রাশির গণিত (Discrete mathematics) থেকে। অবিচ্ছিন্ন রাশির গণিতেরও প্রভূত বিকাশসাধন হয়েছে একই সময়ে, বিশেষ করে টপোলজির (Topology) ও ফাংশনাল অ্যানালিসিস্-এর (Functional analysis) এবং এদের প্রয়োগ ক্ষেত্র অবিচ্ছিন্ন মাধ্যমের বলবিদ্যা (Mechanics of continua) ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা (Theoretical physics) ছাড়িয়ে প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা অর্থনীতি, সমস্ত পরিচালনা তত্ত্ব ইত্যাদি পর্যন্ত পৌঁছেছে সুফলপ্রদ হয়ে। যন্ত্রগণকের প্রচলন সাংখ্যিক বিশ্লেষণের (Numerical analysis) বিকাশে প্রচুর সার্থক প্রেরণা যুগিয়েছে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আমাদের রাজ্যে গণিতের শিক্ষাদানের উপর এই সব অগ্রগতির প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়েছে? প্রতিক্রিয়া হয়েছে অল্প কিছু, কিন্তু তা স্নাতকোত্তর স্তরেই সীমিত। অনার্স-স্নাতক পাঠক্রমে এইসব অগ্রগতি লেশমাত্র রেখাপাত করতে পারে নি। যখন দেখি যে, উত্তর বাংলার কোন বিশ্ববিদ্যালয় তার গণিতের অনার্স পাঠক্রমে বুলীয় বীজগণিত এবং সমুদায়ের বা সেটের তত্ত্ব, তর্কবিদ্যায় ও বৈদ্যুতিক বর্তনীর তত্ত্বে তার প্রয়োগ পড়ানোর ব্যবস্থা করেছে এবং এই বৎসরই এই বিষয়ের পরীক্ষা নিচ্ছে, তখন মনে হয় এই রাজ্যের গণিতের পাঠক্রম নির্ধারক বোর্ডগুলির কর্ণধারেরা কি করছেন। ছাত্র অশান্তির অজুহাত এক্ষেত্রে অচল। এই অশান্তির মধ্যেই তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের পরিবর্তন হয়েছে এবং ছাত্র আন্দোলনের ফলেই

বিশুদ্ধ গণিতের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম আধুনিক করবার দিকে এগোনো সম্ভব হয়েছে—যদিও এখনও এই উভয়েরই বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়েছে।

অবশ্য শুধু আধুনিক হওয়ার জন্যেই কতকগুলি পল্লবগ্রাহী পরিবর্তনে কোন সুফল হবে না। এর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির উচ্চতর শ্রেণীর পাঠক্রমে বিশেষ করে জ্যামিতির পাঠক্রমে। ছাত্ররা সেট, ফাংশন বুলি অনেক শিখছে আর অর্জন করছে কিছু কিছু আধুনিক গাণিতিক চিহ্নের (Mathematical symbol) সঙ্গে পরিচয়। অবশ্য আমরা একথা মোটেই বলতে চাইছি না যে, তারা গণিতের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে মোটেই পরিচিত হচ্ছে না। তারা এই ভাবধারার সঙ্গে অবশ্যই কিছু ভাসা ভাসা পরিচয় লাভ করছে। অপর দিক থেকে তারা হারাচ্ছে অঙ্ককষার/সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও গণিতের প্রয়োগের ক্ষমতা। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠানগুলির গণিতের অধ্যাপকেরা এটা আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁদের এই অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে প্রকাশও করে থাকেন। আশা করি, কর্তৃপক্ষ তাঁদের পাঠক্রমের প্রয়োজনমত সংশোধন করবেন। আমাদের দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষার আধুনিকীকরণ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। আমাদের রাজ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি কেন্দ্র আছে। আশা করি, এই সব কেন্দ্র থেকে কর্তৃপক্ষকে সুচিন্তিত সুপরামর্শ দেওয়া হবে।

কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন যে, গণিত শিক্ষা কি কেবল প্রয়োগের জন্যে? এই শিক্ষার কি নিজস্ব কোন সার্থকতা নেই? গণিত শিক্ষার যে নিজস্ব সার্থকতা আছে, তা অনস্বীকার্য। তবু বেশীর ভাগ ছাত্রের ক্ষেত্রে গণিত শিক্ষার মূল্য প্রয়োগে। বিশেষ করে যারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করবে, তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের গণিত শেখাতে হবে যতটা সম্ভব এবং এই প্রয়োজনীয় গণিতের মাধ্যমে তাদের আধুনিক গণিতের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে। পরবর্তী পাঠক্রমেও প্রয়োগের প্রয়োজনের দিকে বেশ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয় ভাল করে শেখবার জন্যে গণিতের বিশেষ প্রয়োজন এবং এই সব বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ছাত্রের কাছে গণিত একটি হাতিয়ার। তবুও সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হবে বিমূর্ত গণিতের (Abstract mathematics) ভাবধারার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সার্থক পরিচয়। এটা যে সম্ভব, তা কোন কোন দেশের এই স্তরের আধুনিক পাঠ্যপুস্তক দেখলেই বোঝা যাবে। বিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এসে গণিত-পঠন-পাঠনে বিমূর্তন (abstraction) ও মূর্তন (concretization) চলবে সমান তালে সর্বাধুনিক প্রয়োগগুলির দিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রেখে। সকল স্তরের গণিতের শিক্ষণে দৃষ্টি রাখতে হবে—কি করে ছাত্রকে শেখানো যায় যে, কিভাবে একটি সমস্যাকে গাণিতিক রূপ দেওয়া যায়, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় এবং সেই গাণিতিক সমস্যার সমাধানটিতে কি অর্থ আরোপ করা যায়। বিদ্যালয়ের খুব নীচু শ্রেণী থেকেই এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব খুব সরল সমস্যা দিয়ে। তারপর বয়স ও জ্ঞান বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জটিলতর সমস্যার দিকে এগোতে হবে। আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এইরূপ গণিত শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক। শুধু বিমূর্ত গণিতের বিশেষজ্ঞ তৈরির পালা আসবে অনার্স পাঠক্রমের শেষের দিকে বা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে। আমাদের দেশের প্রয়োজনের দিকে এখন দৃষ্টি রাখতে হবে। অগ্রসর দেশগুলির অন্ধ অনুকরণে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশী।

পরিমলকান্তি ঘোষ

চেরেনকভ বিকিরণ—তত্ত্বে ও প্রয়োগে

শ্রীমৃণালকান্তি সাহা*

আদিপর্ব

গবেষণাকালে ক্ষীণ এক নীলাভ বিকিরণ দেখে চেরেনকভ উদ্দীপ্ত হন। কিন্তু না, এই বিকিরণের রহস্য তখন নাকি আর অজ্ঞাত নয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের মৌলিক গবেষণায় নিরত বহু বিজ্ঞানী নাকি এ বিকিরণকে পর্যবেক্ষণ করে এর অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের সার্বিক সিদ্ধান্ত—এটি তেজস্ক্রিয় মৌল নির্গত এক অতি পরিচিত রশ্মি। বাস্তবিকপক্ষে, সময়ের সেই সন্ধিক্ষণে বিজ্ঞানজগতের অনেকেই কৌতূহলী ছিলেন পদার্থের প্রতিপ্রভা (Fluorescence), অনুপ্রভা (Phosphorescence), তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে। যে কোন বিকিরণকে অবলীলাক্রমে তখন তাঁরা তেজস্ক্রিয়তা-জনিত বলে বিচার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। জনশ্রুতি আছে যে, মাদাম কুরীর মত প্রতিভাময়ী বিজ্ঞানীও এই বিষয়ে মতামত পোষণ করতেন। এরূপে বিজ্ঞানের নূতন এই ধারায় কাজ করতে বিজ্ঞানীদের অনীহা ও অতিশয় স্পন্দনশীল ও উন্নতমানের আলোক নিরূপকের অভাবে চেরেনকভ বিকিরণের আবিষ্কার প্রাথমিকভাবে ব্যাহত হয়।

যা হোক, প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে প্রথম সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ বিজ্ঞানী ভ্যাভিলভের। তিনিই প্রথম বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেন যে, তেজস্ক্রিয় উৎসের নিকট রক্ষিত স্বচ্ছ বস্তু থেকে নির্গত রশ্মি নিরতই একই নীলাভ দ্যুতিসম্পন্ন এবং এর বর্ণালী অবিচ্ছিন্ন (Continuous)। প্রতিপ্রভাজনিত বৈশিষ্ট্য বা পটি গঠনের সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্য নেই বা অনুপ্রভার সঙ্গেও ভ্যাভিলভ এই গবেষণাকার্যে বেশী দূর অগ্রসর হন নি বা এ বিকিরণের উৎস সম্পর্কে কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদানে প্রবৃত্ত হন নি। স্বাভাবিক কারণে তারপর এই গবেষণার ধারায় কিছুটা মন্থরতার ভাব দেখা দেয়। কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ 1938 সালে চেরেনকভ যখন ইউরানিল লবণে আলোর প্রতিপ্রভা নিয়ে গবেষণায় নিরত ছিলেন, তখন এই নূতন বিকিরণের সন্ধান পান এবং প্রামাণ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করবার মানসে ধারাবাহিকভাবে গবেষণাকার্যে ব্যাপৃত হন। তাঁর উন্নত মানের পরীক্ষাকার্য সফল হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফ্রাঙ্ক ও টামের তত্ত্বগত ফল ও চেরেনকভের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখা যায় এবং তাঁরা তিনজন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এরপর এই ঘটনাকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে গিনস্‌বার্গের অবদান নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

বিকিরণের মূল নীতি

গাণিতিক দুরূহ তত্ত্বের বাইরে থেকে প্রথমে বিকিরণের মূল নীতি একটু পর্যালোচনা করাই বোধ হয় শ্রেয় হবে।

মনে করা যাক, কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে একটি ইলেকট্রন অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে চলমান, 1নং চিত্রে প্রদর্শিত বৃত্তগুলি মাধ্যমের স্থানীয় পরমাণু এবং ক খ ইলেকট্রনের গতিপথ। সাধারণ অবস্থায় পরমাণুগুলির আকৃতি মোটামুটি গোলাকার

* ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ,

এবং অবিকৃত। কিন্তু যখন ইলেকট্রনটির প্রভাবে এর সান্নিধ্যে আসা পরমাণুগুলির ধর্মের পরিবর্তন হয় এবং অবস্থান্তর ঘটে। ধরে নেয়া যাক, নির্দিষ্ট কোন সময়ে চলমান ইলেকট্রনটির অবস্থান-বিন্দু গ। এই ক্ষেত্রে গ বিন্দুর চতুর্দিকে
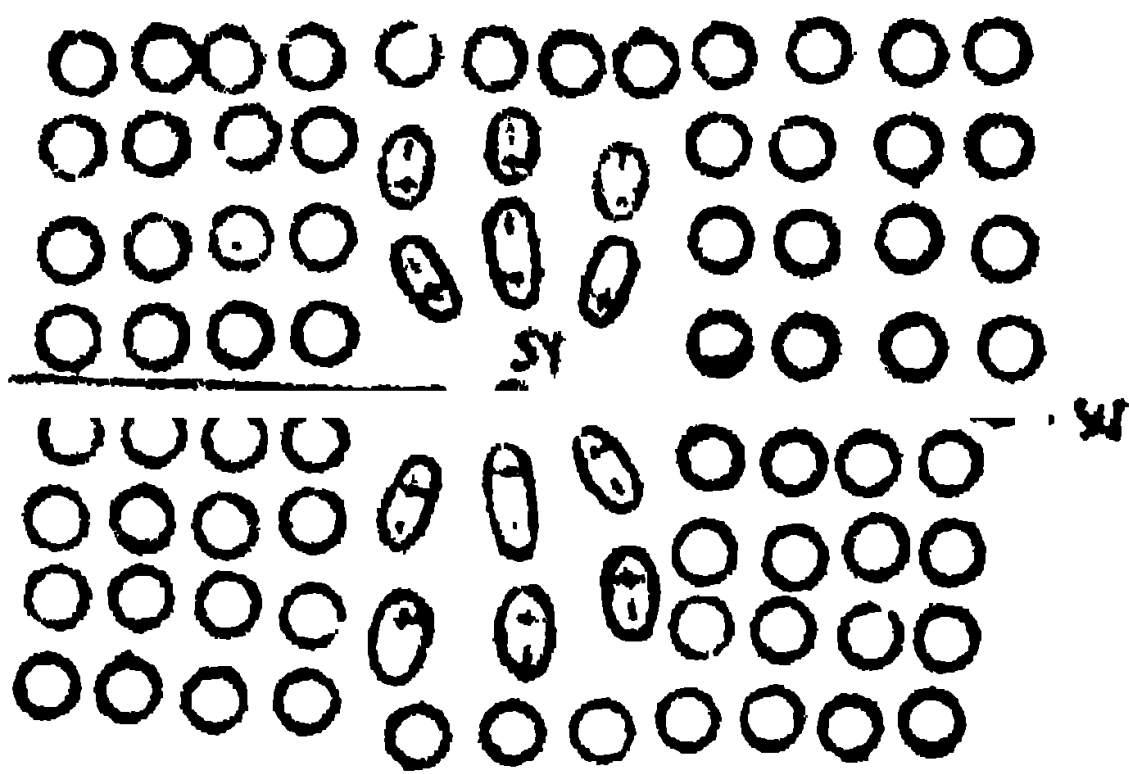
1নং চিত্র

পরমাণুগুলির ধনাত্মক আধানগুলি আকর্ষিত হবে ক খ-রেখার দিকে এবং ঋণাত্মক আধানগুলি রেখার বিপরীতমুখী হয়; অর্থাৎ গ বিন্দুর চতুর্দিকে মাধ্যমটির কিছুটা অংশের সমবর্তন (Polarisation) হয়। সমবর্তিত অংশের পরমাণুগুলি চিত্রে প্রদর্শিত মত দ্বিমেরুরূপে (Dipcle) ব্যবহার করে। সুতরাং এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, চলমান আহিত কণিকাটি যদি ইলেকট্রন হয়, তবে দ্বিমেরুগুলির ঋণাত্মক মেরুগুলি বিকর্ষিত হয়ে বিপরীতমুখী এবং ধনাত্মক মেরুগুলি আকৃষ্ট হয়ে ইলেকট্রন-গতিপথের দিকে হয়। কিন্তু চলমান কণিকাটি যদি পজিট্রন (Positron) বা প্রোটন হয়, তবে মাধ্যমের পরমাণুগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম প্রদর্শন করে। এই-রূপে মাধ্যমের মধ্যে চলমান কণিকার উপস্থিতির জন্যে গতিপথের চতুর্দিকে মাধ্যমের বিভিন্ন অংশ-গুলি খুব ক্ষীণ তাড়িতচুম্বকীয় ঝাপটা (Electro-magnetic pulse) স্পন্দন অনুভব করে। কিন্তু সমবর্তনের সম্পূর্ণ প্রতিসাম্যতার (Symmetry) দরুণ কোন বিকিরণ ঘটে না। এইক্ষেত্রে দিগংশ (Azimuth) এবং ঘূর্ণাক্ষ (Axis) উভয়তঃই প্রতিসাম্যতা বজায় থাকে।

কিন্তু যদি চলমান আহিত কণিকাটি দ্রুতগামী অর্থাৎ মাধ্যমে আলোর গতিবেগের সমতুল হয়, তবে চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ হবে। এক্ষেত্রে দিগংশজনিত প্রতিসাম্যতা বজায় থাকলেও ঘূর্ণাক্ষ বরাবর লব্ধি ক্ষেত্র (Resultant fi-ld) অনুভূত হয়, যা ইলেকট্রনটির গতিপথ থেকে বহু দূরেও পরিলক্ষিত। স্বভাবতঃই গতিপথের বিভিন্ন প্রদেশে তাৎক্ষণিক (Instantaneous) ক্ষেত্রের আবেগের দরুণ প্রতিটি অংশ ক্ষীণ তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ দেয়।

সাধারণতঃ গতিপথের বিভিন্ন অংশ থেকে নির্গত তরঙ্গগুলির বিনাশী ব্যতিচারের (Destructive interference) ফলে কোন দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ বিন্দুতে লব্ধি ক্ষেত্রের তীব্রতা হয় শূন্য। কিন্তু যদি আহিত কণিকাটির গতিবেগ মাধ্যমে আলোর ফেজ (Phase) গতিবেগ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে কণিকার বিভিন্ন অংশ থেকে নির্গত তরঙ্গগুলি সমদশাসম্পন্ন হয় এবং ফলস্বরূপ দূরবর্তী কোন পর্যবেক্ষণ বিন্দুতে লব্ধি ক্ষেত্র বর্তমান থাকে। বিশিষ্ট আলোক-বিজ্ঞানী

2নং চিত্র

হাইগেন্স-এর অঙ্কনরীতি অবলম্বনে প্রাপ্ত 2নং চিত্রে বিষয়টির সম্যক পরিস্ফুটন ঘটে। উপরিউক্ত
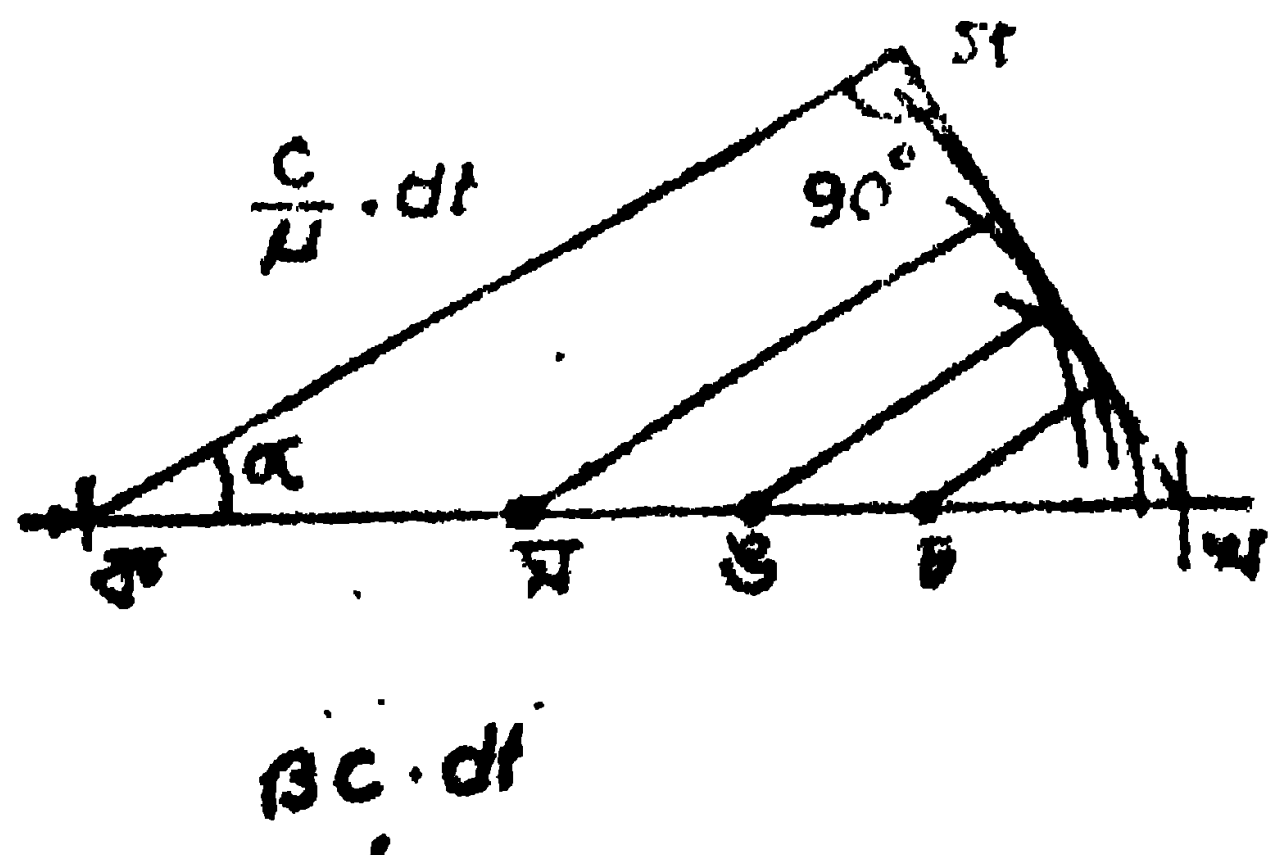
চিত্রানুযায়ী কণিকার গতিপথের সঙ্গে নির্দিষ্ট ∝-কোণে নত অবস্থায় বিকিরণ দৃষ্টিগোচর হবে। চিত্রে আহিত কণিকার গতিপথের উপর যথেচ্ছভাবে নেওয়া খ, ঙ, চ বিন্দুগুলি থেকে নির্গত তরঙ্গগুলি সংসক্ত (Coherent) এবং নতি তরঙ্গমুখ (Wavefront) সৃজন হয়। সংসক্তি (Coherence) সর্ত সম্যক পালিত হবার জন্যে সমসময়ে (dt) আহিত কণিকা ও আলোক যথাক্রমে ক খ ও ক গ পথ পরিক্রমা করে। এখানে মনে করি,

$\beta . c$ = মাধ্যমে আহিত কণিকার গতিবেগ,

c = শূন্যে আলোকের গতিবেগ,

μ = মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক।

∴ 2নং চিত্রানুযায়ী

কখ = $\beta c . dt$.

কগ = $\frac{c}{\mu} . dt$.

$$\therefore \operatorname{Cos} \propto = \frac{\frac{c}{\mu} . dt}{\beta c . dt} = \frac{1}{\beta \mu}.$$

$$\therefore \operatorname{Cos} \propto = \frac{1}{\beta \mu} \quad \cdots (1)$$ সমীকরণটিই চেরেনকভ বিকিরণের স্বরূপ।

পরবর্তীকালে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের নিরিখে বিচার করে গিনস্‌বার্গ, ফ্রাঙ্ক ও টামের তত্ত্বকে সংস্কারসাধন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চলমান কণিকার উপর বিচ্ছুরিত বিকিরণের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করেন। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

$$\operatorname{Cos} \propto = \frac{1}{\beta \mu} + \frac{\gamma}{\lambda} \left(\frac{\mu^2 - 1}{2\mu^2} \right) \quad \cdots (2)$$

এখানে, λ = মাধ্যমে আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য

γ = কণিকার De Broglie তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

এখন 1নং সমীকরণটি পর্যালোচনা করলে আমরা সহজেই কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

(1) সাধারণতঃ বর্ণালীর দৃশ্য বা প্রায় দৃশ্য পর্যায়েই বিকিরণ ঘটে, কারণ তখন $\mu > 1$। আবার যখন $\mu < 1$, অর্থাৎ রঞ্জন রশ্মি প্রভৃতির পর্যায়ে বিকিরণ দৃষ্টিগোচর হবে না, কারণ তখন সমীকরণটি সিদ্ধ হয় না।

(2) কোন μ-প্রতিসরাঙ্কসম্পন্ন মাধ্যমে $\beta = \frac{1}{\mu}$ দ্বারা নির্ধারিত একটি চূড়ান্ত (Threshold) গতিবেগ বর্তমান। এই চূড়ান্ত (এই ক্ষেত্রে অবম) গতিবেগ যদি আরও মন্দীভূত হয়, তবে বিকিরণ অসম্ভব।

(3) যখন $\beta = 1$, অর্থাৎ আল্ট্রা রিলেটিভিষ্টিক (Ultrarelativistic) কণিকার জন্যে বিকিরণ কোণ সর্বোচ্চ

$$\text{এবং } \propto_{\text{সর্বোচ্চ}} = \operatorname{Cos}^{-1} \left(\frac{1}{\mu} \right)।$$

পরীক্ষামূলক প্রমাণ

1934 সালে চেরেনকভ যখন ইউরানিল লবণে গামা রশ্মির প্রভাবে আলোর প্রতিপ্রভা নিয়ে সাধনায় নিরত, তখনই তিনি এই নীলাভ বিকিরণটির সম্পর্কে কৌতূহলী হন। তারপর একাদিক্রমে বহু দ্রবণের মধ্যে অনুরূপ পরীক্ষাকার্য চালাবার পর সংশয়াতীতভাবে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন— এটি আলোর প্রতিপ্রভা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের একটি নূতন ঘটনা। ঠিক সেই মুহূর্তে চেরেনকভ সম্ভবতঃ ম্যালেটের পরীক্ষাকার্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। যা হোক, চেরেনকভ পর্যায়ক্রমে 16টি বৈধ তরল পদার্থের উপর গবেষণাকার্যের পর একটি নূতন বিকিরণের সম্ভাবনায় আশান্বিত হন। তিনি কয়েকটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেন।

(1) উষ্ণতার তারতম্যে নির্গত বিকিরণের তীব্রতার কোন তারতম্য ঘটে না এবং এটি আলোর প্রতিপ্রভার পরিপন্থী।

(2) প্রতিপ্রভার ক্ষেত্রে আলোর চরম

প্রশমনকারী হিসেবে পরিচিত পটাসিয়াম আয়োডাইড, সিলভার নাইট্রেট বা অনুরূপ কোন যৌগের প্রভাবেও তরল পদার্থগুলি থেকে নির্গত আলোকের কোন হ্রাস ঘটে না।

(3) বর্ণালী বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন তরল পদার্থগুলির ক্ষেত্রে নিরূপিত বর্ণালী-বিন্যাসের পার্থক্য খুবই কম এবং বর্ণালী নীল ও বেগুনী প্রদেশেই সীমাবদ্ধ।

চেরেনকভ যখন এরূপ অপ্রতিহত ধারায় এগিয়ে চলেছেন, ঠিক তেমনি সময়ে অপর রুশ বিজ্ঞানী ভ্যাভিলভ এই বিকিরণকে Bremsstrahlung-জনিত বলে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানী চেরেনকভ বিন্দুমাত্র পশ্চাদ্‌পসরণ না করে নবোদ্যমে এই সত্যকে উদ্‌ঘাটন করবার মানসে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাকার্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন দ্রবণে বিভিন্ন আহিত কণিকার ক্ষেত্রে সমফল প্রাপ্ত হন। অতঃপর নিতান্তই সহজ, সরল একটি পরীক্ষার সাহায্যে সহযোগী ফ্রাঙ্ক ও টামের $\text{Cos}\alpha = \frac{1}{\beta\mu}$ সূত্রটিকে দৃঢ় প্রতিপন্ন করেন।

এরপর যুদ্ধোত্তরকালে ফটোমাল্টিপ্লায়ারের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে চেরেনকভ বিকিরণসম্পর্কিত গবেষণায় প্রভূত উদ্দীপনা দেখা দেয়। কলিনস ও রেলিঙ একটি তীব্র ও সুসমান্তরীকৃত (Well collimated) কণিকাগুচ্ছের সাহায্যে পুনরায় দেখান যে, বিকিরণ বর্ণালী সর্বদাই অখণ্ড (Continuous); তদুপরি পরম আলোক তীব্রতার পরিমাপের সাহায্যে ফ্রাঙ্ক ও টামের তত্ত্বলব্ধ ফলের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখান। সেটিংই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে চেরেনকভ বিকিরণের আলোক নিরূপণের জন্যে ফটোমাল্টিপ্লায়ারের ব্যবহার করেন। মহাজাগতিক রশ্মির প্রয়োগেও এই বিকিরণের সত্যতা প্রমাণিত করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে একটি ধারাবাহিকতার ক্রমানুসরণে কৃত্রিম-ভাবে ত্বরিত কণিকা, মহাজাগতিক রশ্মি, তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রভৃতির ক্ষেত্রে চেরেনকভ বিকিরণের সত্যতা সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহু অগ্রজ ও তরুণ বিজ্ঞানীদের সাধনার ফলেই চেরেনকভ বিকিরণ আজ এক প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং বিকিরণের এই ধারাটি এত সুসমৃদ্ধ। কিন্তু গ্যাসীয় মাধ্যমের ক্ষেত্রে চেরেনকভ বিকিরণ সম্পর্কে প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন ব্ল্যাকেট। গ্যাসীয় মাধ্যমের μ প্রায় 1 হওয়ার দরুণ বিকিরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কঠিন ও তরল মাধ্যম অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। এরূপ ক্ষেত্রে আলোক তীব্রতা খুবই কম, চূড়ান্ত শক্তি (Threshold energy) খুব বেশী এবং আলোক বিকিরণের সর্বোচ্চ কোণ খুবই কম। অ্যাসকোলি এবং অ্যাসকোলি বালজারেলি নামক দু-জন বিজ্ঞানী দ্ব্যর্থহীনভাবে বায়বীয় মাধ্যমেই চেরেনকভ বিকিরণের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

চেরেনকভ বিকিরণের প্রয়োগ

চেরেনকভ বিকিরণের প্রয়োগে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায়, বিশেষতঃ পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা ও মহাজাগতিক রশ্মির ক্ষেত্রে এই বিকিরণের প্রয়োগের ফলে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয়েছে। নীচে চেরেনকভ বিকিরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ ব্যবহার আলোচিত হচ্ছে।

1. চেরেনকভ নিরূপকের প্রয়োগ

পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় গাইগার গণক, স্ফুলিঙ্গায়ন গণক (Scintillation counter) প্রভৃতির ন্যায় চেরেনকভ নিরূপকের প্রয়োগমূল্য অপরিসীম। বিকিরণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই একে চমকপ্রদ ব্যবহারে পথ সুগম করে দিয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে চেরেনকভ নিরূপকের উপযোগিতা সবিশেষ স্বীকৃত।

(খ) চেরেনকভ বিকিরণের ফলে উদ্ভূত আলোক কণিকার আধারের বর্ণের সমানুপাতী। তাই আহিত কণিকার ভর যদি জানা থাকে, তবে কণিকার অন্তর্নিহিত শক্তি নির্ণয়ও হয়।

(গ) নিরূপকের সাহায্যে কোন আলট্রা-রিলেটিভিস্টিক কণিকার গতিপথের দিক নির্ণয়ও সম্ভব। মহাজাগতিক রশ্মির ক্ষেত্রে, যেখানে অনেক সময় গতিপথ সুনির্দিষ্ট থাকে, অথচ দিক সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে নিরূপকের ব্যবহার কাজটিকে অনেক সহজসাধ্য করে তোলে।

(ঘ) কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রসম্পন্ন অঞ্চল দিয়ে যুগপৎ চলমান কণিকার সংখ্যা নির্ণয়ও চেরেনকভ গণকের সাহায্যে সম্ভব।

এভাবে চেরেনকভ নিরূপকের প্রয়োগনৈপুণ্যের অবদান উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

2. প্রমাণ (Standard) আলোক-উৎস নির্মাণে

আমরা জানি, দৈনন্দিন জীবনে গৃহস্থালীর প্রয়োজনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কার্যে ব্যবহারোপযোগী প্রমাণ তীব্রতা ও নির্দিষ্ট বর্ণালী গঠনসম্পন্ন আলোক উৎসের চাহিদা বহুল। কিন্তু উচ্চ যান্ত্রিক মান বজায় রেখেও আজ পর্যন্ত টাংস্টেন বা অনুরূপ কোন ফিলামেন্টের ব্যবহারের ফলে যে সকল আলোক-উৎস নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে, তাতে দীপনমাত্রা সর্বদা সুস্থির থাকে না এবং বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগুলির কার্যকারিতাও বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

কিন্তু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের পাতলা স্তরে উৎপন্ন চেরেনকভ বিকিরণের ব্যবহার করে বেলচার ও অ্যাণ্ডারসন এক শ্রেণীর ক্ষীণ দীপনমাত্রাসম্পন্ন প্রমাণ আলোক-উৎস উদ্ভাবন করেছেন। প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে এই আলোক-উৎসগুলি বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা দিয়েছে এবং বাস্তবতার নিরিখে, উপযোগিতার মাপকাঠিতে এদের অনায়াসে বিশেষায়িত করা যায়।

প্রচুর উৎকর্ষ বর্তমান থাকায় এই প্রকার আলোক-উৎসের দীপনমাত্রা ও বর্ণালী-গঠন সূক্ষ্মরূপে পরিমাপ করা যায়। সাধারণভাবে পারিপার্শ্বিক ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দীপনমাত্রাও অনন্তকাল অপরিবর্তিত থাকবে। ক্ষেত্রবিশেষে যদি এরূপ আলোক-উৎসের দীপনমাত্রার পরিবর্তন হয়, তবে তা নিতান্তই নিয়মানুগ থাকে এবং উদ্দেশকরূপে ব্যবহৃত আইসোটোপের অর্ধায়ু (Half-life) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি সামান্য পরিমাণ অপদ্রব্যের উপস্থিতিতে বা তাপমাত্রার পরিবর্তনেও আলোক-তীব্রতার পরিবর্তন হয় না। আবার প্রয়োজন-বোধে কঠিন স্তরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের গাঢ়তার পরিবর্তনের মাধ্যমেও দীপনমাত্রার পরিবর্তন সাধন করা যায়।

এই প্রকারের আলোক-উৎস প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ ও অকল্পনীয়। আলোর স্বল্পপ্রভার অনুসন্ধানে, জীব-বিজ্ঞানের গবেষণাকার্য বা জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার (Astrophysics) অনুধাবনে এই প্রকার আলোক উৎসের ব্যবহার অনেক বেশী বাস্তবানুগ ও সুবিধাজনক।

3. নূতন ত্বরণ-যন্ত্র উদ্ভাবন

পারমাণবিক বিজ্ঞানে নিত্য নূতন ত্বরণ-যন্ত্র (Accelerator) উদ্ভাবনের গবেষণা চলছে। তারই ফল আমাদের পরিচিত সেক্টার-ফোকাস সাইক্লোট্রন, স্পাইরাল-রিজ সাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন, এ-ভি-এফ সাইক্লোট্রন প্রভৃতি। কিন্তু নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তেওস্লার চেরেনকভ বিকিরণের ভিত্তিতে ত্বরণ-যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় একটি আয়ন প্রাক্‌ত্বরণ মাধ্যম যে সকল আহিত কণিকাকে ত্বরিত করতে হবে, তাদের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত-

গতিতে চলে যাবে। এভাবে কণিকাগুলিতে শক্তি সঞ্চারিত করা হবে। এরূপ আয়ন-প্লাজ্‌মার মাধ্যমকে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগে মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক 1 অপেক্ষা অধিকতর করা সম্ভব, যা প্রকল্পটির আবশ্যক প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই পদ্ধতিটিকে চলমান মাধ্যমের ক্ষেত্রে চেরেনকভ বিকিরণের সার্থক প্রয়োগ হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে। তবে মুক্ত কণিকার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিতে পারে না। গুচ্ছিত কণিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কণিকার মধ্যে সংসক্তির জন্যে বিপরীত চেরেনকভ প্রক্রিয়া (Inverse Cerenkov Effect) সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। নীতিগতভাবে এই প্রক্রিয়ায় কণিকাগুলির শক্তি বিবর্ধিত হয়ে কয়েক কোটি ভোল্ট সে. মি পর্যন্ত পৌঁছয়। তাত্ত্বিক বিচারে প্রকল্পটির উৎকর্ষ থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

4. চেরেনকভ ইন্টারফেরোমিটার

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, চেরেনকভ নিরূপকের সাহায্যে কোন সুনির্দিষ্ট পাল্লায় কণিকার গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানী চুভিলো একটি নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে কণিকার গতিবেগ নির্ণয়ে মনোনিবেশ করেন। পদ্ধতিটির মূল নীতি আলোর ব্যতিচার ঘটনের মধ্যে নিহিত। মূলতঃ এটি একটি ইন্টারফেরোমিটার। ইন্টারফেরোমিটারে ব্যতিচার আকৃতি পাবার জন্যে কণিকাগুলিকে গুচ্ছীকৃত করা প্রয়োজন। উৎপন্ন ব্যতিচার আকৃতি কুলম্ব বিচ্ছুরণ (Coulomb scattering) এবং রেডিয়েটারে কণিকার মন্দনের জন্যে বিকৃত হয়ে বিনষ্ট হয়। এই প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যতিচার আকৃতির অনুধাবনের দ্বারা নির্ণীত কণিকার গতিবেগ যথেষ্ট নির্ভুল নয়।

আলোচিত ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত অন্যত্র বহু-ক্ষেত্রেও চেরেনকভ বিকিরণের প্রয়োগে নব নব রূপান্তর ঘটেছে। এর সার্থক প্রয়োগের জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে এবং সে প্রচেষ্টা যে ফলবতী হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

উপসংহার

আলোক-বিজ্ঞানীদের আকাশে আজ নানা বিকিরণের পদচারণা। এক বিকিরণ যেন অপর বিকিরণের দিগ্‌দর্শী। বিজ্ঞানীরা যেন এক শৃঙ্খল-নিয়মে আলোকবর্তিকার ছাপ রেখে রেখে বিকিরণের নব নব দিগন্তে প্রবেশ করছেন। আজ পর্যন্ত বহু বিকিরণই পরমাণুর অন্তর্নিহিত উদ্ঘাটনে পথনির্দেশ দিয়েছে ও দিচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত চেরেনকভ বিকিরণ এই জগতে একটি সুপরিচিত নাম—একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। আজকের এই চেরেনকভ বিকিরণ হয়তো আগামী দিনের নূতন বিকিরণের পথনির্দেশক-সাধক-নিয়ন্তা।

প্রাচীন ভারতের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নগরী

অবনীকুমার দে*

ভূমিকা

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ছিল জ্ঞানলাভের পবিত্র তীর্থস্থান। বৈদিক যুগ, মহাকাব্যের যুগ এবং পরবর্তী কালেও এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একই ঐতিহ্যের ধারা বজায় ছিল। ঐ সময়ে এই দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উচ্চ শিক্ষার জন্যে। এই সব প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছিল আবাসিক। এখানকার অধ্যাপকেরা ছিলেন মহাপণ্ডিত, ধার্মিক, জ্ঞানপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ, ত্যাগী ও আচারনিষ্ঠ। এই জন্যে এখানকার বিদ্যার্থীরাও চরিত্রবান ও গুণবান হয়ে উঠতেন। তাঁদের আদর্শ দেশের জাতি সংগঠনেও সহায়তা করতো। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করে এখানকার শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট জ্ঞানবান হয়ে উঠতেন এবং এখানকার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধ্য ছাত্রেরা নীতি ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হতেন। প্রাচীন ভারতের এই শিক্ষা ছাত্রদের মানবীয় বিকাশে সাহায্য করতো। এই সব আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশও ছিল বিদ্যার্জনের পক্ষে খুবই উপযোগী। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার এমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, যা অন্যান্য দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও খুব সম্ভব ছিল না। বোধ হয় সেই জন্যেই এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্যে আসতেন। এছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ থেকেও ছাত্রেরা ভারতের এই সব বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যালাভের জন্যে আসতেন। জানা যায় যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে শতকরা বিশজন ছাত্র ছিলেন জাপান, চীন, ইন্দোচীন, সিংহল, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি বাইরের দেশ থেকে। নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, বারাণসী, অজন্তা, জগদ্দল, ওদন্তপুরী, বলভি, সারনাথ, পাহাড়পুর প্রভৃতি ছিল এই সব প্রাচীন প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। হিউয়েন সাঙ, ফাহিয়ান, ই-ৎ সিং প্রমুখ বিখ্যাত চৈনিক পর্যটকদের লিখিত ভ্রমণ বিবরণ থেকে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানা যায়।

তক্ষশীলা

প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গান্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশীলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির উপকণ্ঠে বারো বর্গমাইল স্থান নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তৃত ছিল। এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে চীন, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি দেশ থেকেও বিদ্যার্থীরা অধ্যয়ন করতে আসতেন। জানা যায় যে, হুয়েন সাঙ দু-বার তক্ষশীলায় গিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের বহু রাজা ও রাজকুমারেরাও এখানে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক হাজার বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করতেন। এখানকার অধ্যাপক বা আচার্যেরা অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। এখানকার অস্ত্রবিশারদ বিখ্যাত অধ্যাপক জীবক তাঁর অদ্ভুত শিক্ষাকৌশল দিয়ে ছাত্রদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। সে যুগের সুদক্ষ অস্ত্রজ্ঞ ও

* স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ, শিবপুর

এখানকার অধ্যাপক আত্রেয় অস্ত্রের সাহায্যে মাথার খুলি খুলে তা আবার জোড়া লাগাতে পারতেন। গণিত, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ললিতকলা, অর্থশাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত, ব্যাকরণ, গান্ধর্ববিদ্যা, গুপ্তধন উদ্ধারবিদ্যা, হস্তি-সূত্র, মন্ত্রপুত সর্পবিদ্যা প্রভৃতি এখানে শিক্ষা দেওয়া হতো।

মহাভারত মহাকাব্যে তক্ষশীলার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের রাজা জন্মেজয় এখানে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন। মনে হয় এটি তক্ষশীলার মন্ত্রপুত সর্পবিদ্যার নামান্তর। জাতকেও তক্ষশীলার অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে। জাতকের গল্প থেকে জানা যায় যে, এখানকার অধ্যাপকেরা মৃতকোত্থাপন (মৃতক+উত্থাপন) অর্থাৎ মৃত লোকের প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন।

বারাণসী

প্রাচীন ভারতে বারাণসী ছিল ভূ-স্বর্গ। সে যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে এটি ছিল এক অপূর্ব কীর্তি। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতেন এবং প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে উঠতেন। এখানে জাগতিক বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে মানবীয় চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়াই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানকার মহাজ্ঞানী, অনাড়ম্বর আচার্যদের জীবনাদর্শ বিদ্যার্থীদের অভিনব পথে পরিচালিত করতো।

নালন্দা

আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বিহারের রাজগৃহের নিকট নালন্দায় একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে এই নালন্দা প্রাচীন ভারতের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হয়। হিউয়েন সাঙ্ ও ই-ৎ সিং প্রভৃতি চৈনিক পর্যটকেরা তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখে গেছেন যে, সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব প্রথম অথবা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নালন্দা প্রতিষ্ঠিত হয়। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ছয় শত বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধন এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নালন্দা বিহারের নামকরণ কি করে হয়েছিল— সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন 'না-অলম্-দা' থেকে নালন্দা নাম হয়েছিল। আবার হুয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ কাহিনীতে একে 'না-লন্-তো' নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধধর্মের আন্তর্জাতিক বিকিরণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রচর্চা ছাড়াও এখানে হিন্দু ধর্মনীতি শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্যকলা, ব্যাকরণ, অর্থনীতি, গণিত, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতিও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল।

এখানকার অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে জিনপ্রভ, শাক্যকীর্তি, জ্ঞানচন্দ্র, প্রভামিত্র, দিবাকর মিত্র, গুণমতি, স্থিরমতি, চন্দ্রপাল, বসুসিংহ, শীলভদ্র, জয়সেন, পদ্মসম্ভব প্রভৃতি ছিলেন বিখ্যাত। এঁরা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানকার অধ্যাপকবৃন্দ এসেছিলেন। বিখ্যাত আচার্য জিনমিত্র ছিলেন অন্তঃদেশবাসী। বিখ্যাত অধ্যক্ষ ধর্মপাল ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীনগরবাসী। আর একজন অধ্যক্ষ ছিলেন নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ভববিবেক। হিউয়েন সাঙের গুরু মহাপণ্ডিত ও এখানকার বিখ্যাত অধ্যক্ষ বা মহাস্থবির শীলভদ্র ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। ই-ৎ সিং যখন নালন্দার ছাত্র ছিলেন, তখন এখানকার মহাস্থবির ছিলেন রাহুলমিত্র। হুয়েন সাঙ, ই-ৎ সিং ছাড়াও উ-কঙ্ নামে আর একজন চৈনিক পর্যটক অষ্টম শতাব্দীতে এখানে আসেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা খুবই শক্ত

ছিল। হয়েন সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত ছাত্রাবাসে থেকে অপেক্ষা করতে হতো। তারপর অনুমতি পেলে তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার সুযোগ পাওয়া যেত। হয়েন সাঙ্‌কে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এখানে প্রবেশ করবার পর তিনি পাঁচ বছর ধরে অধ্যয়ন করেন। ই-ৎ সিং এখানে দশ বছর ধরে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতেন। প্রতি দিন ভোরবেলায় স্নানের পর প্রবেশদ্বারে দ্বারপালের অনুমতি নিয়ে ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দলে দলে অধ্যয়ন শুরু করতেন। প্রত্যেক দলে এক শত ছাত্র অধ্যয়ন করতেন এবং তাঁদের অধ্যাপনা করতেন একজন করে অধ্যাপক। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক শত অধ্যাপক অধ্যাপনা করতেন। ছাত্রাবাসে থাকবার জন্যে বিদ্যার্থীদের কোন অর্থব্যয় করতে হতো না। ছাত্রদের খাবারও ছিল খুব ভাল। জলখাবারের জন্যে ছানা, মাখন, ফল ইত্যাদি দেওয়া হতো। মধ্যাহ্নের ও রাত্রের আহারও ছিল অতি উৎকৃষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ও অধ্যাপকদের মাহিনা ও সব কিছু খরচ রাজকোষ থেকে ব্যয় করা হতো।

মধ্যযুগের প্রথম দিকে ভারতের বৌদ্ধ পবিত্রস্থানগুলি ছিল খুব প্রশস্ত ও পাঁচিলঘেরা। এখানকার ধর্মীয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার জন্যে এই সব পবিত্র স্থানের মধ্যে অবস্থিত মন্দির ইত্যাদির চারপাশে ক্রমে ক্রমে বড় নগর গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিলেন। এই সময় শাসক-বর্গ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই সব কারণে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যথাসম্ভব সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতো। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবিধান রক্ষা করবার জন্যে এই সব স্থানের চারপাশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকতো। এই প্রাচীরের মধ্যে থাকতো একটি বিশালাকার ও সুরক্ষিত প্রবেশদ্বার এবং কয়েকটি পর্যবেক্ষণ-বুরুজ। এই থেকে অনুমান করা যায় যে, যদিও এই সব স্থান প্রধানতঃ ধর্মীয় প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছিল, বিপৎসঙ্কুল প্রয়োজনের সময় এইগুলিকে সহজেই আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহার করা যেত। অত্যাচারী শাসকবর্গের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অথবা বিপরীত ধর্মের সমর্থকদের প্রতিকূল ব্যবহার প্রতিহত করবার জন্যে এই সব জায়গায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা প্রয়োজনমত আশ্রয় নিতেন। এই সব ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিতে ক্রমে ক্রমে স্তূপ, মন্দির, কলেজ বা মহাবিদ্যালয়, বিহার প্রভৃতি বহু ইমারত গড়ে উঠেছিল। প্রাচীরঘেরা প্রশস্ত স্থানের মধ্যে অবস্থিত এই সব ইমারত প্রধানতঃ ছিল ইট দিয়ে তৈরি।

নালন্দা ছিল একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় নগরী। সমস্ত স্থানটির দৃশ্য ছিল খুব রমণীয়। চারদিকে বাগান, সরোবর, উদ্যান, স্তূপ, মন্দির, বিহার, পাঠাগার ইত্যাদি শোভা পেত। এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশেষ কিছুই আর এখন অবশিষ্ট নেই। চারদিকে খালি ধ্বংসাবশেষ। এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও প্রাচীন বিবরণ ইত্যাদি থেকে এখানকার স্থাপত্য-শৈলীর কথা জানা যায়। খননকার্য থেকে দেখা গেছে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় নগরী কোনও বিশেষ প্ল্যান বা নক্সা অনুযায়ী তৈরি করা হয় নি। সমস্ত স্থানটি ছিল বিভিন্ন রকমের ইমারতের সমষ্টি। এগুলিকে প্রয়োজনমত বিভিন্ন সময়ে তৈরি করা হয়েছিল। আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ-

কাল হতে এখানকার বিভিন্ন ইমারতগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবার পর অথবা পরিত্যক্ত হবার পর আবার একই জায়গায় হয় পুনর্নির্মিত হয়েছিল অথবা নতুন করে কোন ইমারত তৈরি করা হয়েছিল।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ-কৌশল আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিরাট চতুর্ভুজ আয়তক্ষেত্রের উপর অবস্থিত ছিল। এটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল যথাক্রমে 1600 ফুট এবং 800 ফুট। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটির মধ্যে ছিল তিনটি প্রধান ও অপরিহার্য অংশ—একটি প্রধান স্তূপ অথবা কয়েকটি স্তূপের সমষ্টি, মন্দির বা পবিত্র স্থান এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্যে বাসস্থান। ধর্মার্থীদের আকর্ষণ করবার জন্যে কেন্দ্রস্থলে কোনও পবিত্র জিনিস থাকত। স্তূপ ও অন্যান্য ধর্মীয় কীর্তিস্তম্ভ মিলিয়ে এই পবিত্র স্থানটি প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানটির এক অংশে প্রতিষ্ঠিত থাকত। এইগুলি এখানে হয় পাশাপাশি অথবা এক অক্ষরেখার ধারে ধারে বিন্যস্ত থাকত। এই পবিত্র স্থানটি ও প্রাচীরঘেরা সন্ন্যাসীদের বাস-স্থানকে প্রাচীর দিয়ে পৃথক করে রাখা ছিল। সন্ন্যাসীদের বাসস্থানটির ছিল দুটি অংশ। বাইরের ও ভিতরের দিকের এই দুটি অংশের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে থাকত কয়েকটি প্রবেশ-দ্বার। নালন্দায় কিন্তু এই প্রথার বদলে ছিল কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রধান প্রবেশপথ, যেটি গিয়ে শেষ হয়েছিল প্রধান পবিত্র স্থানটিতে। প্রাচীন নালন্দায় বিদ্যালয়ের একমাত্র নিদর্শন হলো খননকার্যের দ্বারা আবিষ্কৃত একটি বিরাট ঢিবি ও প্রাচীরের কয়েকটি কোণাকার বুরুজ। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে দেখা যায় যে, এই ইমারত-গুলি সুসমঞ্জস ও সমানুপাতিক কয়েকটি তল-বিশিষ্ট ছিল। বিভিন্ন তলগুলির মধ্যে মধ্যে ছিল সুস্পষ্ট কার্নিশ। কার্নিশগুলি পাথরে-খোদাই-করা ধরণের। চারপাশে ছিল চৈত্য ধরণের বিন্যাস করা কুলুঙ্গির ভিতরে অবস্থিত মূর্তির অলঙ্করণ।

এই ইমারতগুলি খুবই মজবুত করে তৈরি ছিল। সাধারণতঃ বিশালাকার ভিত্তিমূল বা ইটের তৈরি উঁচু সমতল ছাদের উপর এই ইমারতগুলি তৈরি ছিল। সেখানে চারদিকে অসংখ্য কারুকার্য করা ছিল এবং সোপান থেকে যথেষ্ট উঁচু হয়ে থাকা ও সিঁড়ি চুন-বালির কাজ করা অসংখ্য মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত ছিল।

বিশাল উচ্চতাই ছিল এখানকার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে ফা-হিয়েন এবং সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাঙ এখানকার ইমারতগুলির বিশাল উচ্চতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা এখানকার প্রায় দু-শ' ফুট উঁচু বিশাল বিহার এবং ছয় তল-বিশিষ্ট একটি ইমারতের মধ্যে স্থাপিত আশি ফুটেরও বেশী উঁচু তামার মূর্তির কথা লিখে গেছেন। হুয়েন সাঙ ছবির মত বর্ণনা করে গেছেন যে, নালন্দার গম্বুজগুলি এত উঁচু ছিল যে, মনে হতো সেগুলি যেন মেঘের মধ্যে গিয়ে ঠেকেছে। মন্দিরের চূড়াগুলিও এত উঁচু ছিল যে, মনে হতো সেগুলি যেন ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে মিশে গেছে। এখানকার ইমারতগুলির ছাদ ছিল চকচকে খাপুর তৈরি। ছাদের চকচকে টালীগুলি ছিল নানা রকম উজ্জ্বল রঙের। মণ্ডপের থামগুলি ছিল সূক্ষ্ম কারুকার্য করা। কড়িগুলি ছিল লাল রং করা এবং বরগাগুলি রামধনুর সব রকম রঙে রঙ করা।

নরসিংহ গুপ্ত ও বালাদিত্য এখানে তিন-শ' ফুট উঁচু এবং সোনা ও মণিমুক্তাখচিত মন্দির নির্মাণ করান।

এখানকার কলেজ বা মহাবিদ্যালয়গুলি সুন্দর চতুষ্কোণ আকারে ও সারিবদ্ধভাবে তৈরি করা হয়েছিল। এখানে ছয়টি চারতলবিশিষ্ট অট্টালিকা

ছিল। ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের জন্যে এক-শতটি গৃহ ছিল। এখানকার 'রত্নসাগর', 'রত্নোদধি' ও 'রত্নরঞ্জক' নামক তিনটি পাঠাগার বা পুঁথিশালা ছিল খুবই উঁচু। এগুলি ছিল প্রাচীন ভারতের বিস্ময়কর অবদান। এদের মধ্যে রত্নোদধি অট্টালিকাটি ছিল নয়তলা উঁচু। এখানকার ছাত্রাবাসগুলিও ছিল চারতলা করে উঁচু।

বিক্রমশীলা বিহার

নালন্দা ও তক্ষশীলা ছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের আর একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিক্রমশীলা। মগধরাজ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে (আধুনিক ভাগলপুর জেলার পাথরঘাটায়) এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল।

সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ বা নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালে এটি মগধে স্থাপিত হয়। এই মহাবিহারটির নামকরণ সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, ধর্মপালের 'বিক্রম' আখ্যা থেকে 'বিক্রমশীলা' নামকরণ করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, বিক্রম নামে এক যক্ষের নামানুসারে বিক্রমশীলা নাম দেওয়া হয়।

নালন্দার মত এই বিশ্ববিদ্যালয়েরও খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষার জন্যে আসতেন। এখানে বহু প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করবার ব্যবস্থা ছিল। এদের মধ্যে ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ, তন্ত্রশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পণ্ডিত ও আচার্য উপাধিতে সম্মানিত করা হতো। এখানকার প্রধান অধিনায়কের নাম ছিল আচার্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ এবং এখানের শেষ অধিনায়ক ছিলেন শাক্যশ্রী। এখানকার খ্যাতনামা অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য রত্নাকর শান্তি, জ্ঞানশ্রী মিত্র (তাঁর বাসস্থান ছিল গৌড়ে), প্রজ্ঞাকরমতি, রত্নবজ্র (তাঁর বাসস্থান ছিল কাশ্মীরে), শ্রীধর, ভব্যকীর্তি, কৃষ্ণসময় বজ্র, লীলবজ্র, বোধবজ্র, তথাগত রক্ষিত, বাগীশ্বর কীর্তি, কমল রক্ষিত, দানরক্ষিত, মহাজ্ঞানবজ্র, অভয়াকরগুপ্ত, তথাকরগুপ্ত, সুগতশ্রী, বাঙালী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ প্রভৃতি)।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থী বিদ্যালাভ করতেন এবং 114 জন আচার্য বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এখানে একটি বড় মন্দির ও 107টি ছোট ছোট মন্দির ছিল।

চার-শত বছর ধরে বিশেষ গৌরবে চলবার পর আনুমানিক 1203 খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

জগদ্দল বিহার

জগদ্দল বিহার ছিল বিহারের আর একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। কথিত আছে যে, রাজা রামপাল এই বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার অধ্যাপকদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণেতা মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র।

বলভি

পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওয়াড়-এর কাছে বলভি নামে একটি বিখ্যাত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশ থেকেও বহু ছাত্র এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে আসতেন। অন্যান্য প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রেরাও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন।

অনেকের মতে বর্তমানের 'ওয়ালা'ই ছিল সেকালের বলভি বিশ্ববিদ্যালয়। ই-ৎ সিং তাঁর পর্যটন কাহিনীতে বর্ণনা করে গেছেন যে, সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা ও বলভি ছিল প্রাচীন ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। 'কথাসরিৎ-

"নালন্দা" গ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হুয়েন সাঙ-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এখানে একটি বিহার ছিল।

এগুলি ছাড়াও বর্তমান বাংলা দেশের পাহাড়পুরে একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নালন্দার বিহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু হাজার শিক্ষার্থী বিদ্যালাভ করতেন। দক্ষিণ ভারতের অজন্তার অত্যাশ্চর্য গুহাগুলিতে শিল্পকলার উন্নত নিদর্শন পাওয়া যায়। অজন্তা ললিতকলার এক অপূর্ব সৌন্দর্যময় সৃষ্টি।

ভৌত ধ্রুবকগুলি কি পরিবর্তনশীল ?

শ্রীপ্রদীপ কুমার দত্ত*

সূচনা

কয়েকটি ধ্রুবকের অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের নানা গণনা করা হয়; যেমন—মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G, প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h, ইলেকট্রনীয় আধান e প্রভৃতি। কিন্তু এই সব ধ্রুবকগুলি সত্যই ধ্রুবক কিনা, অথবা তারা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়—এই নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বিজ্ঞানীরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, যদিও এখন পর্যন্ত এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হতে পারেন নি। এই বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করেন ডিরাক, আজ থেকে প্রায় 35 বছর আগে।

ডিরাকের প্রস্তাবনা

1937 ও 1938 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে ডিরাক বলেন যে, মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। প্রাকৃতিক ও পারমাণবিক ধ্রুবকগুলির মধ্যে সম্পর্ক আছে—এরূপ বিশ্বাস থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন।

হাব্‌লের প্রসারণশীল বিশ্ব অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজগৎ (Universe) একটি অতি ক্ষুদ্র স্থান থেকে প্রসারিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। প্রসারণ শুরু হবার সময়কে শূন্য ধরলে, ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান বয়স প্রায় 2 ইয়ন (1 ইয়ন $= 10^9$ বছর)। এই সময়কে যদি পারমাণবিক ধ্রুবকগুলির দ্বারা গঠিত সময়ের কোনও একক, যথা $\frac{e^2}{m_e c^3}$ (যেখানে $m_e =$ ইলেকট্রনের ভর এবং $c =$ শূন্যে আলোকের গতিবেগ)-এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের মান হবে প্রায় 7×10^{39}। এই মান একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটনের (ভর m_p) মধ্যেকার বৈদ্যুতিক ও মহাকর্ষীয় আকর্ষণী বলের অনুপাত $\left(\gamma = \frac{e^2}{G m_e m_p}\right)$ $2 \cdot 3 \times 10^{39}$-এর কাছাকাছি। যদি সময়ের অন্য কোনও পারমাণবিক এককে প্রকাশ করা হয়, তা হলেও ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের মান $2 \cdot 3 \times 10^{39}$-এর কাছাকাছিই হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পারমাণবিক এককে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের মান দুটি প্রাথমিক কণার মধ্যেকার বৈদ্যুতিক ও মহাকর্ষীয় বলের অনুপাতের (γ) মানের অনুরূপ। এই সাদৃশ্য দেখে ডিরাক ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে পারমাণবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার একটি সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করেন। আর যদি কোনও সম্পর্ক সত্যই থাকে,

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার

তবে তা শুধু বর্তমান যুগেই নয়, সব যুগেই থাকবে। তাই আমরা আশা করতে পারি সুদূর ভবিষ্যতে, ধরা যাক—যখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়স পারমাণবিক এককে 10^{40} হবে, তখন γ-এর মানও 10^{40}-এর কাছাকাছি হবে। সুতরাং ধ্রুবক বলে স্বীকৃত γ ধ্রুবক নয়, সময়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক কণাগুলির ভর এবং পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে তাদের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক বল অপরিবর্তনীয় হওয়ায় আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G সময়ের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ $G \propto t^{-1}$.।

ডিরাক প্রস্তাবনার বিরোধিতা

1948 খৃষ্টাব্দে টেলার ডিরাকের প্রস্তাবনার বিরোধিতা করেন। ভূতাত্ত্বিক ঘটনার সাহায্যে তিনি দেখান যে, ভৌত ধ্রুবকগুলি পরিবর্তনশীল নয়। সূর্যদেহে তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া সৌর শক্তির উৎস ধরে নিয়ে তিনি দেখান যে, সূর্যের ঔজ্জ্বল্য (Luminosity) $L \propto G^7 M^5$, যেখানে M = সূর্যের ভর। ডিরাকের প্রস্তাবনা অনুযায়ী G যদি সময়ের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়, তবে উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে পাই, $L \propto M^5 t^{-7}$—(1)। টেলার আরও দেখান যে, যদি G অথবা M পরিবর্তিত হয়, তবে কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা সূত্রানুযায়ী পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ GM-এর সঙ্গে ব্যস্তানুপাতী হবে। (এখানে পৃথিবীর কক্ষপথকে বৃত্তাকার ধরে নেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ r হলে, $r \propto \frac{1}{GM}$. —(2)। আমরা জানি পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সূর্য থেকে আগত শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আগত শক্তির পরিমাণ আবার সূর্যের ঔজ্জ্বল্য এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব অর্থাৎ r-এর উপর নির্ভর করে। এই সব বিষয় হিসাবের মধ্যে এনে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা $(L/r^2)^{\frac{1}{4}}$-এর অথবা $G^{2.25}.M^{1.75}$-এর সমানুপাতী হবে [সমীকরণ (1) ও (2)-এর সাহায্যে]। ব্রহ্মাণ্ডের বয়স 2 ইওন ধরে টেলার দেখান যে, উপরের গণনা অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় $(2-3)\times 10^8$ বছর আগে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছিল জলের স্ফুটনাঙ্কের কাছাকাছি; অর্থাৎ ঐ সময় সমুদ্র-গুলিতে জল ফুটন্ত অবস্থায় থাকতো। এই অবস্থা প্রাণীর বসবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পৃথিবীতে ঐ সময়ে প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, উল্লিখিত সময়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও কম ছিল।

টেলারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর জ্যোতি-বিদেরা ব্রহ্মাণ্ডের বয়স 2 ইওন নয়, 10 ইওন হবে বলে জানান। বর্তমানে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স ধরা হয় 9.25 ইওন। এই বয়স অনুযায়ী হিসাব করলে দেখা যাবে যে, $(2-3)\times 10^8$ বছর আগে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রাণীর বসবাসের উপযুক্ত ছিল। তবুও আরও কয়েক ইওন আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রাণীদের জীবনধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, ডিরাকের প্রস্তাবনা ঠিক নয় অর্থাৎ G সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না।

টেলারের গণনার সাহায্যে পোচোডা (Pochoda) ও সোয়ার্ৎসচাইল্ড (Schwarzschild) ভিন্ন পদ্ধতিতে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে তাঁরা দেখান যে, সূর্যের শক্তিক্ষয় ঐ উচ্চহারে হলে সূর্যের হাইড্রোজেন জ্বালানি ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যেত এবং সূর্য একটি লাল দৈত্য তারকায় (Red giant star) পরিণত হতো। ক্যামেরণ গণনার সাহায্যে এই একই সিদ্ধান্তে এলেন

করেন। সুতরাং G-এর পরিবর্তন সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হয় উপরিউক্ত আলোচনা অনুযায়ী।

গ্যামোর প্রস্তাবনা

আরও বিশদ আলোচনা না করেই ডিরাকের প্রস্তাবনাকে বাতিল করতে গ্যামো রাজী হন না। ডিরাকের প্রস্তাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন যে, যদি $e^2 \propto t$ ধরা হয়, তবে G সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত না হলেও ডিরাকের প্রস্তাবনা অনুযায়ী $\gamma \propto t$ হতে পারে। এখন $e^2 \propto t$ হলে পৃথিবীর কক্ষপথের উপর তার কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু t ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হলেও পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাঙ্কের কাছাকাছি হতো। প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবককে (h) ধ্রুবক ধরলে এবং $e^2 \propto t$ হলে fine structure constant বা সূক্ষ্ম কাঠামো ধ্রুবক $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$ (যেখানে $\hbar = h/2\pi$)-ও সময়ের সমানুপাতে পরিবর্তিত হবে। e^2 কিংবা α-এর সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হলে দূরবর্তী ছায়াপথের (Galaxy) ক্ষেত্রে স্পষ্ট বর্ণালীর লাল অপসারণ (Red shift) হবে অর্থাৎ বর্ণালীর রেখাগুলি বর্ণালীর লাল প্রান্তের দিকে সরে যাবে। গ্যামো বলেন কোয়াসারগুলির (Quasar) যে প্রচুর পরিমাণ লাল অপসারণ দেখা যায়, তার কিছু অংশ সম্ভবতঃ e^2-এর পরিবর্তনের ফল। সূক্ষ্ম কাঠামো ধ্রুবকের পরিবর্তন দূরবর্তী ছায়াপথের হাইড্রোজেন বর্ণালীর সাহায্যে ধরা যেতে পারে—তবে তা বেশ কঠিন।

বাকল (Bahcall) ও সালপেটার (Salpeter) 3C47 এবং 3C147 কোয়াসার দুটির বর্ণালীতে O III এবং Ne III রেখা দুটির সূক্ষ্ম কাঠামো বিভাজনের (Fine structure splitting) সাহায্যে দেখেন যে, গ্যামোর প্রস্তাবনা অনুযায়ী e^2 বা α-এর পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। বেতার ছায়াপথগুলির (Radio galaxy) বর্ণালীতে লাল অপসারণের পরিমাণ z যখন প্রায় 0·2, তখন সূক্ষ্ম কাঠামো ধ্রুবকের মান নির্ণয় করা হয়। বাকল ও স্মিড্‌ট (Schmidt) উল্লেখযোগ্য লাল অপসারণ দেখা যায়, এমন পাঁচটি কোয়াসারের (3C219, 3C234, 3C26, 3C171, 3C79) ক্ষেত্রে O III রেখাদ্বয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। নির্ণীত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মান ব্যবহার করে তাঁরা $\alpha(z)/\alpha(lab)$ অনুপাতটির মান নির্ণয় করেন। এখানে $\alpha(z)$ হলো লাল অপসারণের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কাঠামো ধ্রুবকের মান এবং $\alpha(lab)$ হলো পরীক্ষাগারে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত সূক্ষ্ম কাঠামো ধ্রুবকের মান। উল্লিখিত পাঁচটি কোয়াসার বা বেতার ছায়াপথের ক্ষেত্রেই এই অনুপাত প্রায় 1 হয় [$\alpha(z \simeq 0{\cdot}2)/\alpha(lab) = 1{\cdot}001 \pm 0{\cdot}002$ সম্ভাব্য ত্রুটি]। কিন্তু গ্যামোর প্রস্তাবনা অনুযায়ী α সময়ের সঙ্গে সমানুপাতে পরিবর্তিত হলে উপরিউক্ত অনুপাতটির মান প্রায় 0·8 হওয়া উচিত। সুতরাং বাকল ও স্মিড্‌ট-এর পরীক্ষা গ্যামোর প্রস্তাবের বিপক্ষে রায় দেয়। তাছাড়া আরও কয়েকটি ঘটনাও সময়ের সঙ্গে α এবং e-এর পরিবর্তনের প্রস্তাবনাকে বাতিল করে দেয়। এই সম্বন্ধে কিছু পরে আবার আলোচনা করা হবে।

অন্যান্য প্রস্তাবনা

গ্যামোর প্রস্তাবনায় e^2 এবং সূক্ষ্ম কাঠামো ধ্রুবক α সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, ধরা হয়েছিল। কিন্তু উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে, তারা ধ্রুবক (Constant)। গ্যামোর প্রস্তাবনায় $\hbar$-কে ধ্রুবক বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু যদি e^2 এবং $\hbar$ উভয়ের সময়ের সঙ্গে একই হারে পরিবর্তিত হয়, তবে সূক্ষ্ম কাঠামো ধ্রুবক সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে না, তা হবে ধ্রুবক;

অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় α ধ্রুবক হলেও e^2-এর পক্ষে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং বাকল ও স্মিউ-এর পরীক্ষায় α ধ্রুবক বলে প্রতিপন্ন হলেও -h- যদি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তবে e^2-এর সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে বাধা নেই, অবশ্যই -h- এবং e^2-এর পরিবর্তনের হার সমান হতে হবে।

$\frac{h}{m_e c^2}$ কে সময়ের একটি পারমাণবিক একক এবং প্রাথমিক কণাগুলির ভর স্থির ধরে ডিরাকের প্রস্তাবনার সাহায্যে পাই $\frac{e^2 \text{-h-}}{G} \propto t$। যদি G ধ্রুবক হয় এবং উপরের প্রস্তাবনা অনুযায়ী e^2 এবং -h- সময়ের সঙ্গে একই হারে পরিবর্তিত হয়, তবে $e^2 \propto t^{\frac{1}{2}}$ এবং $\text{-h-} \propto t^{\frac{1}{2}}$ হবে বলে ধরা যেতে পারে। e^2 এবং -h- এর এই পরিবর্তনশীলতার জন্যে পৃথিবীর কক্ষপথের কোনও পরিবর্তন হবে না এবং গণনায় দেখা যাবে যে, 4×10^9 বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রাণীর বাসযোগ্য ছিল। এখন সময়ের সঙ্গে e পরিবর্তিত হয় কিনা আবার দেখা যাক।

e-এর পরিবর্তন

গ্যামো 1967 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেন যে, e সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হলে তা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা (α) এবং বিটা (β) কণা নির্গমনের হারকে প্রভাবিত করবে। এর ফলে তিনটি তেজস্ক্রিয় শ্রেণীর (ThC, RaC এবং AcC) বিযোজন ধ্রুবকও প্রভাবিত হবে। কিন্তু গ্যামো জানতেন না যে, 1958 খৃষ্টাব্দে উইলকিনসন AcC শ্রেণীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সময়ের সঙ্গে e-এর পরিবর্তন যদি হয়ও, তবে তা বছরে 10^{-12} অংশের বেশী হবে না।

পৃথিবীতে Re^{187} এবং Os^{187}-এর অস্তিত্ব থেকে হিসাব করে ডাইসন 1967 খৃষ্টাব্দে দেখান যে, e-এর পরিবর্তন হয়ে থাকলে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার পরিমাণ 1600-এর মধ্যে 1 অংশেরও কম।

একই বছরে পেরেস আলোচনা করে দেখান যে, যদি e সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তবে বর্তমানে পৃথিবীতে সীসার সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকবার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। তা ছাড়া e^2-এর পরিবর্তন হলে পৃথিবীর বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত একই যৌগের বিভিন্ন নমুনার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যেত। বাস্তবে এরূপ পার্থক্য খুবই কম দেখা যায়। সুতরাং পেরেসের সিদ্ধান্ত এই যে, সময়ের সঙ্গে e-এর পরিবর্তন হয় না, আর হলেও তার পরিমাণ খুবই কম।

U^{238}-এর স্বাভাবিক বিভাজনের (Spontaneous fission) বিযোজন ধ্রুবকের (Decay constant) মান দুটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণয় করে গোল্ড গত 2×10^9 বছরে e^2-এর পরিবর্তনের হারের উর্ধসীমা বছরে 2.33×10^{-13} অংশ হবে বলে নির্ণয় করেন।

ভূতাত্ত্বিক বয়স নির্ণয়ের লেড-ইউরেনিয়াম এবং পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতি দুটির সাহায্যে চিত্রে ও পাল e^2-এর পরিবর্তনের হারের উর্ধসীমা বছরে 5×10^{-13} হবে বলে নির্ণয় করেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সময়ের সঙ্গে e-এর পরিবর্তন হয় না। সুতরাং ডিরাকের প্রস্তাব অনুযায়ী যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পারমাণবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কোনও অজানা পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে আমাদের আবার G-এর পরিবর্তনশীলতার প্রস্তাবনায় ফিরে যেতে হয়।

ও' হ্যানলোন (O' Hanlon) ও ট্যাম (Tam) পুনরায় G-এর পরিবর্তনশীলতার কথা

বলেন। 1969 খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, e^2, h এবং G তিনটিই সময়ের সঙ্গে সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু আগেই দেখা গেছে যে, তাঁদের এই তত্ত্ব ডাইসন, পেরেস, গোল্ড, চিত্রে ও পালের প্রাপ্ত পরীক্ষাফলের বিরোধী।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে, প্রকৃতির ঐক্যে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং পারমাণবিক ধ্রুবকগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় ডিরাক G-এর পরিবর্তনের যে প্রস্তাব করেছিলেন, ভূতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পরীক্ষার ফল তার পক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত কোনও রায় দিতে আজও পারে নি। তবে ব্রহ্মাণ্ড ও পরমাণুর মধ্যে কোনও অজানা সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে না। তবে e, G বা অন্য কোন ধ্রুবকের পরিবর্তনের কথা না বলেই প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্বের উক্ত প্রতিরূপকে ভিত্তি করে প্যাপো মহাজাগতিক ও পারমাণবিক ধ্রুবকগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। যাই হোক, মৌল ধ্রুবকগুলি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় কিনা—এই সম্বন্ধে শেষ কথা বলবার আগে আরও তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক প্রমাণের অপেক্ষায় আমাদের থাকতে হবে।

আপেক্ষিকতাবাদের ভূমিকা

সৌরেন দাশ

নৈসর্গিক জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ক্ষেত্রে আইনস্টাইন যে একটা বৈপ্লবিক আলোড়ন এনেছেন—তা সাধারণভাবে স্বীকৃত। তাঁর অভিনব প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বিশেষ গাণিতিক শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সব অভিনব প্রত্যয়ের অনেকগুলি গাণিতিক ভাষা ছাড়া অন্যভাবেও প্রকাশ করা সম্ভব। তবে নৈসর্গিক জগৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা আমাদের শৈশব থেকেই গড়ে উঠেছে এবং যা আমরা সুপ্রাচীন যুগ থেকে—এমন কি, হয়তো আমাদের প্রাক-মনুষ্য যুগের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি, সেই সব ধারণার আমূল পরিবর্তন না হলে এই প্রত্যয়গুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। পৃথিবী যে স্থির নয় এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যে পৃথিবীর চারপাশে আবর্তন করে না—কোপার্নিকাস যখন এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন, তখনও মনুষ্যজাতির পূর্বেকার ধারণাবলীর অনুরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল। এখন অবশ্য কোপার্নিকাসের তত্ত্ব আমাদের কাছে মোটেই দুর্বোধ্য নয়। এই তত্ত্বের সঙ্গে বহু দিনের পরিচিতির ফলে আমাদের মানসিক অভ্যাসগুলি এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে, আমরা স্বভাবতঃই এই তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিন্তা করি। তেমনি আগামী দিনে যারা আইনস্টাইন তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় হয়ে উঠবে, তাদের কাছে এই আইনস্টাইন-তত্ত্ব এত দুর্বোধ্য লাগবে না।

ভূপৃষ্ঠ সংক্রান্ত অনুসন্ধানকার্যে আমরা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশেষ করে স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করি। প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগ থেকে মনুষ্যদেহের অংশবিশেষ দৈর্ঘ্য মাপবার কাজে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং এক ফুট ও

এক হাত ইত্যাদির সংজ্ঞা আমরা এই ভাবেই পেয়েছি। অধিকন্তু দূরত্বের ক্ষেত্রে সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে যতটা সময় লাগে, সেই সময়টাকে দূরত্বের পরিমাপ নিরূপণে বিবেচনা করা হয়। দৃষ্টির সাহায্যে আমরা মোটামুটিভাবে দূরত্বের পরিমাপ স্থির করি। কিন্তু এই পরিমাপকে নিখুঁতভাবে জানতে গেলে আমরা স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যবহার করি। স্পর্শই বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মায়। কেবলমাত্র জ্যামিতি ও পদার্থবিজ্ঞান নয়—আমাদের বাইরে যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্পর্শের উপর নির্ভরশীল।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে দর্শনেন্দ্রিয় ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয়গুলি অকেজো হয়ে যায়। যে জ্যামিতি ও পদার্থবিদ্যা ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রে উপযোগী হয়েছিল এবং যা স্পর্শ ও বিভিন্ন ঘটনার ব্যবধান অতিক্রম করবার সম্ভাব্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—সেই জ্যামিতি ও পদার্থবিদ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিনা দ্বিধায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহার করেন। ফলে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটা মুস্কিল বেধে যায় এবং আইনষ্টাইনই তার সমাধান করেন। দেখা গেছে যে, স্পর্শজাত প্রত্যয়গুলির অধিকাংশ যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। নৈসর্গিক জগতের আসল রূপটাকে বুঝতে হলে স্পর্শজাত প্রত্যয়ের অনেকগুলিকে বাদ দিতে হবে। আপেক্ষিকতাবাদকে সম্যকরূপে বুঝতে হলে আমাদের সাধারণ জীবনে যে ধারণাগুলির উপযোগিতা রয়েছে, তার অনেকগুলির প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। এই প্রত্যয়গুলির বিলোপের উপরই আপেক্ষিকতাবাদের উপলব্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বিভিন্ন প্রকারের খানিকটা আকস্মিক কারণেই ভূপৃষ্ঠের বিশেষ অবস্থা কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। ভ্রান্ত হলেও এই ধারণাগুলিকে চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে। এই বিশেষ অবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভূপৃষ্ঠের উপর সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠস্থিত বস্তুগুলির অধিকাংশ মোটামুটি অপরিবর্তিত ও প্রায় স্থিতিশীল থাকে।

এ না হলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ হতো না। আপনি যদি আসানসোল থেকে কলকাতায় যেতে চান, আপনি জানেন যে, আসানসোল সর্বদা যেখানে আছে—তাকে সেখানেই দেখতে পাবেন, অর্থাৎ অন্যান্য স্থানের সম্পর্কে আসানসোলের আপেক্ষিক অবস্থান পূর্বের মতই থাকবে। পূর্বে যখন কলকাতায় গিয়েছিলেন, তখন রেললাইন যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সেই পথ দিয়েই যাবে, অর্থাৎ আসানসোল ও কলকাতার মধ্যে যে সব স্থান আগে ছিল, সেগুলি এখনও থাকবে। আর এমন হবে না যে, কলকাতার শিয়ালদহ কালিঘাটে চলে যেয়ে থাকবে অর্থাৎ কলকাতার বিভিন্ন অংশের অপেক্ষিক অবস্থান পূর্বের মতই থাকবে। অতএব আপনি ভাববেন ও বলবেন যে, আসানসোল থেকে কলকাতায় এলেন। কিন্তু কলকাতা আপনার কাছে এলো—এটা ভাববেন না। যদিও এই কথাটাও সমানভাবে সত্য। সাধারণ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত এই মানসিকতার সাফল্য ঘটনাচক্রেই হয়েছে। আসানসোলের বাড়ীগুলি যদি এক ঝাঁক মৌমাছির মত সর্বদা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতো, আর রেললাইনগুলি যদি এমনি করে ইতস্ততঃ সরে যেত ও তাদের আকৃতি পরিবর্তিত হতো এবং সব শেষে যদি বস্তুগুলি মোমদানির মত সর্বদা গলিত হতো ও ভেঙ্গে টুক্রা টুক্রা হয়ে যেত, তা হলে আসানসোল থেকে কলকাতায় যাওয়া বললে—কোন অর্থই বোঝাতো না। তখন আপনি প্রথমেই ভাবতেন যে, আসানসোল এখন

কোথায়? কলকাতা সম্বন্ধে সেই একই প্রশ্ন উঠতো। আরও প্রশ্ন উঠতো—কলকাতার অধিকতর হয়তো এতক্ষণে কৃষ্ণনগরে চলে গেছে এবং ডালহাউসি কোথায় গেছে হয়তো তারও হারিয়েছে। ভ্রমণের পথে স্টেশনগুলিও স্থির থাকতো না—কেউ বা দক্ষিণে, কেউ বা উত্তরে, কেউ বা পূর্বে ও কেউ বা পশ্চিমে ট্রেন থেকেও হয়তো দ্রুততর গতিতে সরে যেত। এই অবস্থায় কোন বিশেষ মুহূর্তে আপনি কোথায় আছেন বলতে পারতেন না। কেউ সর্বদা একটা বিশেষ স্থানে আছে, এই প্রত্যয় বস্তুতঃ ভূপৃষ্ঠের বৃহৎ বস্তুগুলির স্থায়িত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কোন নির্দিষ্ট 'স্থান' যেমন আসানসোল বা কলকাতা বলতে যা বুঝায়, সেই ধারণার কোন যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নেই। এটি একটা সুনির্দিষ্ট ধারণাও নয়—ব্যবহারিক প্রয়োজনে উপনীত একটা মোটামুটি ধারণা।

যে স্থিতিশীলতার অনুভূতি আমরা পাই, সেটি আমাদের চেতনাশক্তির স্থূলতার অভাবজনিত। আমরা যদি ইলেকট্রন অপেক্ষা খুব বেশী দীর্ঘকায় না হতাম, তা হলে এই স্থিতিশীলতার অনুভূতি আমরা পেতাম না; অর্থাৎ এই স্থিতিশীলতার অনুভূতি আমাদের চেতনাশক্তির স্থূলতা থেকেই উদ্ভূত। যে আসানসোলকে এখন আমরা একটা কঠিন বস্তুরূপে দেখছি, তখন তাকে আমাদের মধ্যে দু-একজন গণিতবিদ্ ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। এর যে ক্ষুদ্র টুকরাগুলি আমরা তখন দেখতাম, সেগুলি হতো অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণা, যেগুলি কখনও পরস্পরের সংস্পর্শে আসতো না এবং প্রচণ্ড গতিতে পরস্পরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতো। বর্তমান জগতের যে সমস্ত স্থানকে আমরা স্থির দেখছি, তারা বা তাদের বিভিন্ন অংশ ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ালে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ অস্থির ধারণা হতো, আমরা যদি ইলেকট্রনের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় হতাম, তাহলেও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের অনুরূপ ধারণাই হতো।

অপর পক্ষে আমরা যদি সূর্যের ন্যায় খুব বৃহদাকার ও দীর্ঘায়ু হতাম এবং আমাদের অনুভূতি যদি অত্যন্ত ধীর গতিতে হতো, তাহলেও আমরা একটা স্থায়িত্ববিহীন এলোমেলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই দেখতাম। এই অবস্থায় নক্ষত্র ও গ্রহগুলির জীবন ও অবস্থানের সময়কে অত্যন্ত সামান্য বলেই আমাদের মনে হতো এবং তারা সকালবেলার কুয়াশার মত আসতো ও চলে যেত। পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক অবস্থানের বিচারে বস্তুগুলি কোন বিশেষ স্থানে থাকতো না।

জগতের অন্যান্য বস্তুর তুলনায় আমরা খুব ক্ষুদ্রকায় বা বৃহদকায় নই। এই কারণে অর্থাৎ আমাদের বর্তমান আকারের জন্যে এবং আমরা যে গ্রহে বাস করি, তার উপরিভাগ ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণ আমরা তুলনামূলকভাবে একটা স্থিতিশীলতার অনুভূতি পেয়েছি। এ না হলে আপেক্ষিকতাবাদের পূর্ববর্তী কালের পদার্থ-বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানপিপাসা মিটাতে পারতো না বা ওই সব বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি একেবারেই আবিষ্কৃত হতো না এবং বিজ্ঞান-চিন্তার বিবর্তন অন্য পথে ঘটতো।

যদিও সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রমণ্ডলী বছরের পর বছর ধরে অবস্থান করে চলেছে, তবুও আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে অন্যান্য বিষয়ে ভিন্ন জগৎকে নিয়ে পর্যালোচনা করতে হয় জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার ক্ষেত্রে। এখানে আমাদের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয় দৃষ্টি বা দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর—অন্য ইন্দ্রিয়গুলি একেবারে অকেজো হয়ে যায়। আকাশের যে কোন বস্তু অন্য বস্তুর সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল। পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘুরছে, সূর্য ও হারকিউলিস নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্গত কোন বিন্দুর দিকে প্রচণ্ড-বেগে ছুটে চলেছে। তারকাগুলি তীব্রবেগে এক

ঝাঁক মুরগীর মত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে। আসানসোল বা কলকাতার মত বিশেষভাবে চিহ্নিত কোন স্থান আকাশে নেই। আমরা যখন ভূপৃষ্ঠে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করি, তখন বলি ট্রেনগুলি চলে—স্টেশনগুলি চলে বলি না। আপেক্ষিক অবস্থানের বিচারে স্টেশনগুলি ও সন্নিকটবর্তী ভূপৃষ্ঠের অন্য স্থানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার ক্ষেত্রে কাকে গতিশীল ও কাকে স্থির বলবেন—এই সম্বন্ধে কোন নিয়ামক নীতি নেই—এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে সুবিধা-অসুবিধা এবং প্রচলিত বিধির উপর।

এই বিষয়ে আইনস্টাইন ও কোপার্নিকাসের মধ্যে তুলনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। কোপার্নিকাসের পূর্ববর্তী যুগের লোকে ভাবতো যে, পৃথিবী স্থির ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তার চারধারে দিনে একবার ঘোরে। কোপার্নিকাস বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী দিনে একবার ঘোরে এবং সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলী কেবলমাত্র আপাতদৃষ্টিতেই ঘুরছে বলে মনে হয়। গ্যালিলিও ও নিউটন এই মত সমর্থন করেন। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের চাপ্টাভাব ও বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা মেরু অঞ্চলে বস্তুসমূহ অধিকতর ভারী হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে এই মতের সমর্থনে প্রমাণ বলে ভাবা হতো। কিন্তু আধুনিক মতে কোপার্নিকাস ও তাঁর পূর্ববর্তীদের মধ্যে মতভেদ একটা সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার মাত্র। সমস্ত গতিই আপেক্ষিক। পৃথিবী দিনে একবার ঘোরে। আর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পৃথিবীর চারধারে দিনে একবার ঘোরে—এই দুই বক্তব্যের মধ্যে বস্তুতঃ কোন তফাৎ নেই। এই দুই বক্তব্যের অর্থ মূলতঃ একই। সূর্যকে স্থির ধরে নিলে জ্যোতির্বিদ্যা যত সহজে বোধগম্য হয়—পৃথিবীকে স্থির ধরলে তা হয় না। কোপার্নিকাসের মতকে এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেবার অর্থ হলো নিরপেক্ষ গতির প্রত্যয়কে মেনে নেওয়া। নিরপেক্ষ গতির বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভব—একটা অলীক কল্পনা মাত্র। সমস্ত গতিই আপেক্ষিক। কেবল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোন বিশেষ বস্তুকে স্থির ধরে নেওয়া হয়। এই সব প্রথার প্রত্যেকটি সমভাবে গ্রহণযোগ্য, যদিও প্রত্যেকটি সমভাবে সুবিধাজনক নয়।

কেবলমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হবার ফলে জ্যোতির্বিদ্যা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভূপৃষ্ঠ সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যা থেকে একেবারে ভিন্ন। সাধারণ মানুষের চিন্তায় এবং পূর্ববর্তী যুগের পদার্থবিদ্যায় 'বল' সংক্রান্ত প্রত্যয় একটা বিশেষ স্থান দখল করেছিল। অতি পরিচিত অনুভূতির সঙ্গে জড়িত হবার ফলে 'বলের' প্রত্যয় আমাদের কাছে সহজেই বোধগম্য বলে মনে হতো। আমরা যখন ভ্রমণ করি, তখন মাংসপেশীর সঙ্গে জড়িত কিছু অনুভূতির সঞ্চার হয়, আমরা বসে থাকলে তা' হয় না। যান্ত্রিক পরিবহনের পূর্ববর্তী যুগে মানুষ অশ্বচালিত গাড়ীতে ভ্রমণ করতো। তখন তারা ঘোড়াকে কসরৎ করতে এবং স্পষ্টতঃই 'বল' প্রয়োগ করতে দেখতো। ঠেলা দেওয়া বা টান দেওয়া বা ঠেলা খাওয়া বা টান খাওয়া বলতে কি বোঝায়—তা প্রত্যেকে অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন। অত্যন্ত পরিচিত এই ব্যাপারগুলির জন্যে 'বল' গতি-বিজ্ঞানের স্বাভাবিক ভিত্তি বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্ব একটা মুস্কিল বাধিয়ে দেয়। অপর ব্যক্তির গায়ে ধাক্কা দিলে কেমন লাগে—তা আমরা জানি। অতএব দুটি বিলিয়ার্ড বলের মধ্যেকার 'বল' কি—আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু নয় শত ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যেকার 'বল'

একটা কুহেলিকা। একটা দূরত্বের ব্যবধানে এই ক্রিয়াকে নিউটন অসম্ভব বলে মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য একটা অজানা প্রণালীতে গ্রহগুলির উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। যা হউক—এই ধরনের কোন প্রণালীর সন্ধান পাওয়া যায় নি এবং অভিকর্ষ একটা রহস্য রয়ে গেছে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে 'বলের' সামগ্রিক প্রত্যয়টাই ভুল। আইনস্টাইনের অভিকর্ষমতে সূর্য গ্রহগুলির উপর কোন 'বল' প্রয়োগ করে না এবং গ্রহ-গুলি তাদের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে যে অবস্থার সম্মুখীন, সেই অবস্থার অনুগামী হয়ে চলে। স্পর্শ থেকে পাওয়া ভ্রান্ত ধারণাসমূহের জন্যে 'বল' সংক্রান্ত প্রত্যয় উদ্ভূত হয়েছে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হয়েছে, ততই এটা অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে যে, বস্তু সম্বন্ধে যৌল ধারণার উৎস হিসাবে স্পর্শ অপেক্ষা দৃষ্টি কম বিভ্রান্তিকর। দুটি বিলিয়ার্ড বলের সংঘর্ষ আপাতদৃষ্টিতে খুবই সহজ ব্যাপার। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক ও বিভ্রান্তিকর। আসলে বিলিয়ার্ড বল দুটি আদৌ পরস্পরকে স্পর্শ করে না। যা ঘটে তা অভাবনীয়রূপে জটিল এবং সৌরজগতের মধ্যে একটা ধূমকেতু ঢুকে আবার বেরিয়ে গেলে যা ঘটে—তার অনুরূপ। আমরা সাধারণ জ্ঞানে যা ঘটে বলে মনে করি, তার সঙ্গে আসলে যা ঘটে—তার ততটা মিল নেই।

আমরা পূর্বে যা বলেছি, তার অধিকাংশই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা উদ্ভাবনের আগেও পদার্থ-বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতেন। 'বল' একটা গাণিতিক কল্পনা হিসাবেই বিবেচিত হতো এবং গতিকে সাধারণভাবে একটা আপেক্ষিক ব্যাপার বলেই ভাবা হতো। দুটি বস্তু যখন তাদের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন করছে, তখন বলা যায় না একটা বস্তু চলছে এবং অপরটা স্থির আছে। ব্যাপারটা কেবলমাত্র তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন। কিন্তু এই সব প্রত্যয়ের সঙ্গে বাস্তবে অনুসৃত পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সঙ্গতি স্থাপন করতে প্রভূত প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল। নিউটন 'বল' এবং 'স্থান' ও 'কালের' নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর উদ্ভাবিত প্রয়োগবিধির মাধ্যমে এই প্রত্যয়-গুলিকে রূপ দেন। নিউটনের প্রয়োগবিধি-গুলিই পরবর্তী কালের পদার্থ-বিজ্ঞানীরা অনুসরণ করতেন। নিউটন যে যৌল প্রত্যয়গুলির উপর ভিত্তি করে তাঁর সূত্রগুলি উদ্ভাবন করেন, আইন-স্টাইন সেই সমস্ত প্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করে তাঁর নূতন সূত্র আবিষ্কার করেন। এই জন্যে আইনস্টাইনকে স্মরণাতীত কাল থেকে 'স্থান' ও 'কাল' সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা অবিসংবাদিত-রূপে চলে আসছিল, সেই সব ধারণার মৌলিক পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এখানেই তাঁর তত্ত্বের জটিলতা ও অভিনবত্ব।*

[*বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'এ, বি, সি অব রিলেটিভিটি' অবলম্বনে লিখিত]

গোলকের আয়তন নির্ণয় : একটি চীনা পদ্ধতি

সিতাংশুবিমল করঞ্জাই ও নীতীশ পাল*

বর্তমানে আমরা আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী অতি সহজেই গোলকের আয়তন পরিমাপ করতে পারি। কিন্তু তার পূর্বে এরূপ আয়তন পরিমাপ করা খুব সহজ ছিল না। বহু বছর পূর্বে একজন চৈনিক গণিতজ্ঞ সু চাং চী কিভাবে গোলকের আয়তন পরিমাপ করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, সে সম্বন্ধেই নীচে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো :—

একটি গোলককে আমরা অনেকগুলি বৃত্তের স্তূপ বলে ভাবতে পারি। একটু খুলেই বলি। একটি সুগোল আলু নিয়ে তাকে বটিতে প্রথমবারের সমান্তরালভাবে পর পর কাটতে থাকলে আমরা কি পাব? পাব নিশ্চয়ই কতকগুলি গোল আলুর চাকতি। মাঝের টুকরাটি হবে সবচেয়ে বড়, তার পরের দু-পাশের দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট, তাদের পরের দুটি আরো ছোট। উক্ত আলুটি কাটবার আগে ছিল গোলক। কেটে পেলাম কতকগুলি বৃত্ত। এবার এই বৃত্তগুলি যদি ঠিক মত জোড়া যায়, তবে আবার সেই পুরনো গোলকই পাব। আচ্ছা, এবার ঐ বৃত্তগুলিকে আমরা বৃত্তের ব্যাসের সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারি। মাঝের বৃত্তটার ব্যাস যদি r_1 হয়, তবে তার পরিলিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য হবে r_1। যদি পরের প্রতি জোড়া বৃত্তের ব্যাস যথাক্রমে r_2, r_3…হয়, তবে তাদের পরিলিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্যও হবে r_2, r_3…। এটা বোধহয় আর বলা নিষ্প্রয়োজন যে, r_1, r_2-এর চেয়ে বড়; r_2, r_3-এর চেয়ে বড় অর্থাৎ অঙ্কের ভাষায় $r_1>r_2>r_3\cdots$। এখন এই r_1 বাহুর বর্গক্ষেত্রকে মাঝখানে রেখে তার দু-পাশে r_2 বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র তাদের দু-পাশে r_3 বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র…। এইভাবে যদি জুড়ে যাই তাহলে একটা নূতন ঘনবস্তু পাব। এই নূতন ঘনবস্তুটার প্রতিটি টুকরা গোলকের কোন না কোন টুকরার সমান। চীনা গণিতবিদেরা এই ঘনবস্তুটার নাম দিয়েছিলেন মাওহেফাঙ্গাই (Mouhefanggai)। চীনা গণিতবিদেরা আরো একটা ঘনবস্তুর কথা জানতেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন ইয়াঙমা (Yangma)। এই ইয়াঙমা হচ্ছে এমন একটি ঘনবস্তু, যাকে যদি কোন উচ্চতায় (ধরা যাক h) ছেদ করা যায়, তবে ছেদিত অংশের ভূমি হবে h বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র। চৈনিক গণিতশাস্ত্রে বলা আছে যে, একটি ঘনককে তিনটি ইয়াঙমাতে বিভক্ত করা যায়। এখন একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$ (r বৃত্তের ব্যাসার্ধ)

বৃত্তের পরিলিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= 4r^2$। আগেই বলেছি, গোলক আর মাওহেফাঙ্গাই হচ্ছে কতকগুলি বৃত্ত ও তাদের পরিলিখিত বর্গক্ষেত্র দিয়ে তৈরি। সুতরাং

$$\text{গোলক : মাওহেফাঙ্গাই} = \pi : 4 \longrightarrow \quad (1)$$

গণিতজ্ঞ লিউ হুই (Liu Hui) প্রথমে মাওহেফাঙ্গাইয়ের চিত্রটি ঠিকমত বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সু চাং চীর দু-শ' বছর পূর্বে জন্মেছিলেন। কিন্তু সু চাং চী-ই গোলক পরিমাপের বড় কঠিন কাজটি সমাধান করেছিলেন।

সু চাং চী মাওহেফাঙ্গাইটিকে আটটি সমপরিমাণ ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক

---

* গণিত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং

ভাগে থাকবে একটি বর্গাকৃতি ভূমি, দুটি খাড়া বহির্ভাগ এবং দুটি বক্রাকৃতির বহির্ভাগ। যদি মূল গোলকের ব্যাসার্ধ r হয়, তবে বর্গাকৃতি ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য r হবে এবং প্রত্যেক খাড়া বহির্ভাগ r ব্যাসার্ধযুক্ত বৃত্তের এক-চতুর্থাংশ হবে।

এখন আমরা মাওহেকাফাইয়ের অষ্টমাংশটিকে একটি ঘনকের (r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট) মধ্যে স্থাপন করে তাদের ঘন-পার্থক্য বের করি। h উচ্চতায় মাওহেকাফাইয়ের অষ্টমাংশটির ছেদিত অংশের ভূমি x^2 ক্ষেত্রবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র (বর্গক্ষেত্রের বাহুটি x হলে) হলে ঘন-পার্থক্যটির ক্ষেত্রফল হবে r^2-x^2। কিন্তু মাওহেকাফাইয়ের অষ্টমাংশের একটি খাড়া বহির্ভাগকে মনে মনে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব—h, x, r একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহু এবং r তার অতিভুজ অর্থাৎ $r^2-x^2=h^2$। সুতরাং ঘন-পার্থক্যের ক্ষেত্রফল $=h^2$ অর্থাৎ ঘন-পার্থক্যটি একটি ইয়াংমা। এইভাবে সু চাং চী একটি সমীকরণ পেলেন

$r^3-\frac{1}{8}$ মাওহেকাফাই = ইয়াংমা ——→ (2)

এখন একটি ঘনক তিনটি ইয়াংমার সমান ঃ
সুতরাং ইয়াংমা $=\frac{1}{3}r^3$ ——→ (3)

(1), (2) এবং (3) থেকে আমরা পাই

গোলক $=\frac{4}{3}\pi r^3$

পিঞ্জর যৌগ

চিন্ময় ভট্টাচার্য*

দুটি ভিন্ন ধর্মী বস্তু যখন সরল অথচ নির্দিষ্ট অনুপাতে উপস্থিত থাকে আর তারা যদি সহজে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না পারে, তাহলে রাসায়নিক যৌগ গঠিত হয়।

তাই যদি হয়, তাহলে ধরা যাক, খাঁচার মধ্যে একটি পাখী আছে। দুটি ভিন্ন ধর্মের বস্তু, খাঁচা আর পাখী পেয়েছি। এদের অনুপাত সরল—1 : 1। এরা পরস্পরের কাছ থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাহলে এরা যৌগ কি ?

সাধারণতঃ রাসায়নিক যৌগ গঠনকালে ইলেকট্রনের কোন না কোন একটি ভূমিকা থাকে। রাসায়নিক যৌগ গঠনের সময়ে একটি পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে এসে ভিন্ন ধর্মের একটি পরমাণুতে যুক্ত হয় অথবা একজোড়া, কখনও কখনও দুটির বেশী, অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রন ভিন্ন ধর্মের পরমাণুর যুগ্ম দখলে থাকে।

এমন কয়েকটি যৌগ পাওয়া গেছে, যেখানে এক ধর্মের অণুর কেলাসের মধ্যে ভিন্ন ধর্মের অণু আটক পড়ে। অথচ এই দুই ধরণের অণুর মধ্যে ইলেকট্রন দেওয়া-নেওয়া হয় না—অথবা তাদের যুগ্ম দখলে কোন ইলেকট্রনও থাকে না। তবুও উভয়ে মিলে রাসায়নিক যৌগের মত পদার্থ সৃষ্টি করে। প্রথম প্রকার অণুর ধর্মই মোটামুটি এই নতুন বস্তুটির ধর্ম। ইংরেজীতে এদের নাম ক্ল্যাথ্রেট (Clathrate) কম্পাউণ্ড। ক্ল্যাথ্রেট কথাটি ল্যাটিন ক্ল্যাথ্রেটাস (Clathratus) থেকে এসেছে—তার মানে হলো, খাঁচার জাফরি বা উভয়ের দিক দিয়ে আটকানো বা আবদ্ধ।

* রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর মহাবিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এদের বাংলা নাম আমরা দিতে পারি পিঞ্জর যৌগ বা খাঁচা যৌগ।

এই ধরণের যৌগ গঠনে যদিও ইলেকট্রনের কোন ভূমিকা থাকে না, তবুও কোন কোন পিঞ্জর যৌগের দুটি ভিন্ন ধর্মের অণুর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকতে পারে। অবশ্য হাইড্রোজেন বন্ধন যখন সৃষ্ট হয়, তখনও ইলেকট্রন দেওয়া-নেওয়া বা যুগ্মভাবে ইলেকট্রন দখল রাখবার প্রয়োজন হয় না।

কুইনল (Quinol) একটি জৈব যৌগিক পদার্থ। এর সংকেত $C_6H_6O_2$। এটির জলীয় দ্রবণ থেকে এর কেলাসন সম্ভব। কেলাসনের কালে এর দ্রবণের উপরে বায়ুর বদলে আর্গন নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি 40 অ্যাটমোস্ফিয়ারের উচ্চ চাপে রেখে যে কেলাস পাওয়া যায়, সেই কেলাসে কুইনল আর আর্গন দুটিই পাওয়া যায়। কুইনল আর আর্গনের অনুপাতও সুনির্দিষ্ট থাকে। অথচ কেবলমাত্র যৌগিক পদার্থেই বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে—মিশ্রণে এই অনুপাত পরিবর্তনযোগ্য। কুইনল-আর্গন কেলাস 1 সে. মি. পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই কেলাসে আর্গনের ভাগ সর্বদা শতকরা 9 ভাগ। কাজেই এর সংকেত দাঁড়াচ্ছে $(C_6H_6O_2)\ Ar_{0.8}$।

কুইনল অথবা আর্গন সাধারণতঃ অন্য কারও সঙ্গে তো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। এই কেলাসের সংকেতটি দেখলেই বোঝা যায় যে, এটি একটি সাধারণ রাসায়নিক যৌগ নয়। কুইনল আর্গনের মধ্যে ইলেকট্রন দেওয়া-নেওয়া হয় না বা এদের মধ্যে ইলেকট্রন যুগ্ম দখলেও থাকে না। কারণ সংকেতে দেখা যাচ্ছে দুই প্রকারের অণুগুলির সংখ্যা কোন সরল অনুপাত সৃষ্টি করে নি—3:0.8 বা 15:4-কে সরল অনুপাত বলা যায় না—অথচ রাসায়নিক যৌগ পরমাণু বা মূলকগুলির সংখ্যা সর্বদাই সরল অনুপাতে থাকে।

এটিই পিঞ্জর যৌগের একমাত্র উদাহরণ নয়, আরও অনেক আছে। আর্গনের পরিবর্তে ক্রিপ্টন বা জেনন গ্যাস রেখে অনুরূপ অবস্থায় কেলাসন করলে একই ফল পাওয়া যায়—কুইনল কেলাসের মধ্যে শতকরা 15·8 ভাগ ক্রিপ্টন বা 26 ভাগ জেনন আটক হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে—এগুলি কি বেশ টেঁকসই? এই সব কেলাস এক বছরেরও বেশী রেখে দেওয়া যায়—নষ্ট হয় না। কিন্তু তাপ দিলে কিংবা কোন দ্রবণে দ্রবীভূত করলেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসটুকু বেরিয়ে যায়; অথচ কুইনলের রাসায়নিক ধর্ম ও এই সব পিঞ্জর যৌগের রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন।

সাধারণ বিশুদ্ধ কুইনলের কেলাসের আকৃতি ও এই সব পিঞ্জর যৌগের কেলাসের আকৃতি ঠিক একরকম নয়। এই যৌগে কুইনলের একটি বিশেষ আকৃতির কেলাস তৈরি হয়ে যায়—তার নাম বিটা রূপ—এই আকৃতি বিশুদ্ধ কুইনলের আকৃতি থেকে ভিন্ন। এই বিশেষ ধরণের কুইনল কেলাসে কিছু কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে। ঐ ফাঁকা জায়গাটুকুতেই আর্গন বা ক্রিপ্টন বা জেননের পরমাণুগুলি আটক হয়। কুইনলের আণবিক আয়তন নির্দিষ্ট, আবার কেলাসের আকৃতিও নির্দিষ্ট। কাজেই কুইনলের কেলাসের মধ্যের ফাঁকা জায়গাটুকু ছোট-বড় হয় না—সব সময়ে একই আয়তনের হয়। আর্গনের পারমাণবিক আয়তনও অপরিবর্তনীয়। কাজেই এই ফাঁকা জায়গাটুকুতে কয়টি আর্গন পরমাণু থাকতে পারে তাও স্থির হয়ে যায়। এভাবে এই পিঞ্জর যৌগটিতে কুইনল অণু ও আর্গনের পরমাণুর সংখ্যাদ্বয়ের অনুপাত সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

কুইনলের ফাঁদে কি সবাই ধরা পড়ে? অথবা কুইনল ছাড়া আর কোন যৌগ এরকম পিঞ্জর তৈরি করে কি? আর্গন, ক্রিপ্টন বা জেনন—এগুলি কুইনলের ফাঁদে ধরা পড়ে, কিন্তু অপর দুটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস, হিলিয়াম আর নিয়ন, এই ফাঁদে ধরা পড়ে না। এদের নিয়ে

কুইনলের কোন পিঞ্জর যৌগ তৈরি হয় না। হিলিয়াম বা নিয়নের পরমাণু, আর্গন, ক্রিপ্টন বা জেননের পরমাণুর চেয়ে অনেক ছোট। স্পষ্টই বোঝা যায়, কুইনলের কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণুগুলির মধ্যে যে স্বাভাবিক ফাঁক আছে, তার মধ্যে দিয়ে হিলিয়াম বা নিয়নের পরমাণুগুলি বেরিয়ে যেতে পারে—আর্গন, ক্রিপ্টন বা জেননের পরমাণুগুলি বেরিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া কুইনল যে শুধু এই তিনটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সঙ্গে পিঞ্জর যৌগ তৈরি করতে পারে, তা নয়—অক্সিজেন, নাইট্রিক অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, ফর্মিক অ্যাসিড, মিথাইল সায়ানাইড—এরাও আলাদা আলাদা ভাবে কুইনলের কেলাসে আটক হয়ে পিঞ্জর যৌগের সৃষ্টি করে। এই সব যৌগের মধ্যে কুইনল-সালফার ডাই-অক্সাইড যৌগটি 1843 সালে ওলারের হাতে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তখনকার বিজ্ঞান-জ্ঞানের পটভূমিতে এর বিচিত্র গঠন সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা করা সম্ভব ছিল না।

কেবল কুইনলই যে এই ধরণের যৌগ দেয়, তা নয়। অ্যারোম্যাটিক নাইট্রো যৌগের সঙ্গেও ধরা পড়ে অনেকে—হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইথিলীন। 2:4:6 ট্রাইনাইট্রোবেঞ্জিন আটকে রাখে অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনদের। মনো-অ্যামিনো নিকেল (II) সায়ানাইড [Ni (NH$_3$) (CN)$_2$]-এর কেলাস আটকে দেয় বেঞ্জিন, থুয়েন, পাইরোল, অ্যানিলিন আর ফেনলকে। কিন্তু এটি টলুইনকে ধরে রাখতে পারে না। এই পিঞ্জর যৌগটি তৈরি করে বেঞ্জিন টলুইনের মিশ্রণ থেকে দুটিকে পৃথক করা যায়।

পিঞ্জর যৌগ তৈরি হয় এভাবে—প্রথমতঃ কোন একটি পদার্থ, যেমন—কুইনল, নির্দিষ্ট আকৃতির কেলাস তৈরি করে। ঐ কেলাসের বিশিষ্ট গঠনপ্রকৃতির জন্যে এর কয়েকটি অণু একটি পিঞ্জরের আকৃতি নেয়। অণুগুলির মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা থাকে, কিন্তু ঐ ফাঁকা জায়গাটার সব দিকেই ঐ অণুগুলি একটি আবরণের সৃষ্টি করে। কেলাস সৃষ্টিকালে যদি অপর একটি পদার্থ উপস্থিত থাকে, যার অণু ঐ ফাঁকা জায়গাটার চেয়ে ছোট, তাহলে তারা ঐ ফাঁকা জায়গাটায় আটক হয়ে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থের অণু অত্যন্ত ছোট হলে অবশ্য এরা চারদিকের অণু-পরমাণুগুলির ফাঁকের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। সে ক্ষেত্রে পিঞ্জর যৌগের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় দলের অণু অত ছোট না হলে তারা ঐ কেলাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না—সৃষ্টি হয় পিঞ্জর যৌগের। প্রথম আর দ্বিতীয় পদার্থ পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না—যতক্ষণ কেলাস অটুট থাকে। তরল বা দ্রবীভূত অবস্থায় কেলাস ভেঙে যায়—পিঞ্জর যৌগেরও অস্তিত্ব থাকে না তখন।

অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ যখন উপস্থিত থাকে না, তখন প্রথম শ্রেণীর পদার্থের অণুগুলি একটি ভিন্ন আকৃতির কেলাস সৃষ্টি করতে পারে। যেমন আর্গনের উপস্থিতিতে কুইনলের অণুগুলি যে কেলাসের সৃষ্টি করে, তার মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকে, কিন্তু আর্গনের অনুপস্থিতিতে কুইনলের কেলাস ভিন্ন রূপ নেয়—কেলাসের মধ্যে কোন ফাঁকা জায়গা থাকে না। মনে হচ্ছে—হয়তো আর্গনের পরমাণু কেন্দ্রের কাজ করে—আর এই পরমাণুগুলির চারদিকে কুইনল কেলাস ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

এই সব পিঞ্জর যৌগ কোনটিই সাধারণ অর্থে রাসায়নিক যৌগ নয়। অথচ প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম উপাদানের আণবিক আয়তন আর কেলাসের গঠন ফাঁকা জায়গাটুকুর আয়তন নির্দিষ্ট করে

দেয় বলে দুটি ভিন্ন পদার্থের অণুর সংখ্যার অনুপাত স্থির হয়ে থাকে।

আমাদের চেনা-জানা কোন কোন সোদক (Hydrated) কেলাসও আসলে পিঞ্জর যৌগ। সোদক ক্লোরিন, যার সংকেত হলো Cl_2, $7.3H_2O$, এর উদাহরণ। বরফ-শীতল জলের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস পাঠালে সবুজাভ হলুদ সোদক ক্লোরিনের কেলাস পাওয়া যায়। বদ্ধ পাত্রের মধ্যে 26.7° সে. তাপমাত্রা অবধি এটি অবিকৃত থাকে। এটি দেখতে অনেকটা বরফেরই মত। কিন্তু এর আপেক্ষিক গুরুত্ব বরফের আপেক্ষিক গুরুত্বের চেয়ে অনেক কম। এর কেলাসের আকৃতিও সাধারণ বরফের কেলাসের আকৃতির চেয়ে আলাদা। এই কেলাসে 46টি অণু যুক্ত হয়ে ছয়টি মাঝারি আর দুটি ছোট ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে। এই শূন্য স্থানে যে শুধু ক্লোরিনই অতিথি হতে পারে তা নয়—আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, সালফার ডাই-অক্সাইড, মিথাইল ব্রোমাইড এরাও পৃথক পৃথকভাবে স্থান পেতে পারে। কিন্তু অতিথি অণু যদি আর একটু বৃহদায়তনের হয়, যেমন ক্লোরোফর্ম বা ইথাইল ব্রোমাইড—সোদক কেলাসের আর একটা ভিন্ন গঠন দেখা যায়। এই দ্বিতীয় ধরণের পিঞ্জর যৌগগুলিতে 131টি জলের অণু যুক্ত হয়ে আটটি মাঝারি শূন্য স্থান আর ষোলটি ছোট শূন্য স্থানের সৃষ্টি করে এবং সেখানে অতিথি অণুগুলি আটক হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ক্লোরোফর্ম শুঁকলে আমরা যে জ্ঞান হারাই তার কারণ হলো, মস্তিষ্কের মধ্যের জল ক্লোরোফর্মের সঙ্গে এই ধরণের কোন যৌগ সৃষ্টি করে।

শুধু তরল বা বায়বীয় পদার্থ নয়, কোন কোন কঠিন পদার্থও পিঞ্জর যৌগে আটকে যায়। কয়েকটি লবণ, যেমন—টেট্রাঅ্যালকিল অ্যামোনিয়াম বা টেট্রাঅ্যালকিল সালফোনিয়াম লবণ তাদের সোদক কেলাসে জলের অণু দিয়ে তৈরি পিঞ্জরের মধ্যে বন্দী থাকে। এই রকম দুটি যৌগ হলো সোদক টেট্রা (—নর্মাল বিউটাইল) অ্যামোনিয়াম বেঞ্জোয়েট, $[(n-C_4H_9)_4N]C_6H_5CO_2, 39.5H_2O$ আর সোদক টেট্রা (—নর্মাল বিউটাইল) সালফোনিয়াম ফ্লুয়োরাইড, $[(n-C_4H_9)_4S]F, 20H_2O$

এবার একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—পিঞ্জর যৌগের কি কোন ব্যবহার নেই? এদের এখন একটি দুটি করে ব্যবহারিক সম্ভাব্যতার কথা জানা যাচ্ছে, যদিও কয়েক বছর আগেও এই পিঞ্জর যৌগগুলি সম্বন্ধে বলা হতো—এরা তত্ত্বগত দিক থেকে বেশ কৌতূহলের বস্তু হলেও এদের কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন নেই। যেমন আর্গন-নিয়ন মিশ্রণ থেকে দুটিকে আলাদা করবার জন্যে কেবলমাত্র আর্গনের কোন কোন পিঞ্জর যৌগ সৃষ্টি করবার ক্ষমতার সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। আবার এই ধরণের যৌগের কেলাস নিয়ে কোন পদার্থের দুই-একটি অণুকে আলাদা করে নিয়ে তাদের ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। সাধারণ অবস্থায় আমরা কোন পদার্থের দুই-একটি অণুকে পৃথক করে রাখতে পারি না—যত সামান্য একটুখানিই নিই না কেন, তার মধ্যে বহু পরমাণু এবং অণু থাকে।

কুইনল অক্সিজেনের পিঞ্জর যৌগের সাহায্য নিয়ে 1°K থেকে 20°K (প্রায় —272° সে. থেকে —253° সে.) পর্যন্ত তাপমাত্রায় অক্সিজেনের চৌম্বক ধর্ম পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। আবার এই ধরণের যৌগ সৃষ্টি করে অতি বিশুদ্ধ পদার্থ পাওয়া গেছে। যেমন অ্যামিনো নিকেল (II) সায়ানাইড-বেঞ্জিন যৌগটি তৈরি করে 99.992±0.002% বিশুদ্ধ বেঞ্জিন পাওয়া গেছে। অতি বিশুদ্ধ অবস্থায় পদার্থের ধর্ম বিজ্ঞানীদের কাছে একটি কৌতূহলের বিষয়।

বোলজ্‌ম্যান-ধ্রুবক (K)

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

বিজ্ঞান জগতের সমস্ত ধ্রুবককে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এক, পরম (Absolute) ধ্রুবক—যার মান সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ এরূপ ধ্রুবককে শাশ্বত বা সনাতন ধ্রুবক বলা হয়। দুই, শর্তাধীন (Conditional) ধ্রুবক—যার মান কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্র বা অবস্থায় কেবলমাত্র একটি ধ্রুবরাশি প্রদান করে। প্রথম পর্বের ধ্রুবক গোষ্ঠির মধ্যে একটি হলো—বোলজ্‌ম্যান-ধ্রুবক; যার প্রতীক চিহ্ন হলো—K। ধ্রুবকের নামটা দেখেই বোঝা যায় যে, এই ধ্রুবকটির আবিষ্কর্তা হলেন জার্মান বিজ্ঞানী বোলজ্‌ম্যান। বোলজ্‌ম্যান-পরিসংখ্যান নির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই এই ধ্রুবকটির জন্ম হয়। প্রকৃতপক্ষে, বোলজ্‌ম্যান ধ্রুবক হলো অন্য দুটি শাশ্বত ধ্রুবকের অনুপাত—একটি গ্যাসধ্রুবক (R) অন্যটি অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা বা ধ্রুবক (N)। প্রতি গ্র্যাম-অণু গ্যাসে+ অণুর সংখ্যাই হলো অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা। অতএব বলা যায়, অণুপ্রতি গ্যাস ধ্রুবকই হলো—বোলজ্‌ম্যান ধ্রুবক।

K-র ভূমিকা

আধুনিক বিজ্ঞানে যেখানে গোলযোগ ঘটেছে—যার মোকাবিলার হদিশ পাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়েছে—সেখানেই সম্ভাব্যতাবাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। বে-নিয়মের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নিয়মের স্বরূপকে খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি হলো সম্ভাব্যতাবাদ। ব্যষ্টিগত প্রকৃতির অনুসন্ধান যেখানে অসম্ভব, সেখানে সমষ্টিগত বা গোষ্ঠিগত অনুসন্ধান চালাতে সম্ভাব্যতাবাদ একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এই সম্ভাব্যতাবাদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে পরিসংখ্যান-পদার্থবিদ্যা বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্স। বোলজ্‌ম্যান বস্তুকে (বিশেষতঃ কোন গ্যাস বা গ্যাসীয় পদার্থকে) বহুসংখ্যক সতত সঞ্চরণশীল অণুর সমবায় ধরে নিয়ে অংশতঃ ক্ল্যাসিক্যাল গতি-বিজ্ঞান ও অংশতঃ সম্ভাব্যতাবাদ কিংবা পরিসংখ্যানবিদ্যার সহায়তায় ক্ল্যাসিক্যাল-পরিসংখ্যান বা বোলজ্‌ম্যান-পরিসংখ্যান আবিষ্কার করেন। এই পরিসংখ্যান দিয়ে কোন গ্যাসীয় পদার্থের আচরণ বা বৈশিষ্ট্য সম্যকভাবে জানা সম্ভব। বোলজ্‌ম্যানের নীতি অনুযায়ী কোন সংস্থার (System) E-শক্তি বিশিষ্ট অণুগুলির সংখ্যা $(N) = CNoe^{-E/KT}$; No—সংস্থাটির মোট অণুর সংখ্যা, C—একটি রাশি, যা সংস্থাটির শক্তি ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে, T—চরম স্কেলে সংস্থাটির তাপমাত্রা, আর K হলো একটি পরম ধ্রুবক, যাকে আবিষ্কর্তার নামানুসারে বোলজ্‌ম্যান ধ্রুবক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বোলজ্‌ম্যান পরিসংখ্যান বা নীতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানের কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে গেলে স্বভাবতঃই তা K-এর উপর স্পষ্টভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ, সান্দ্রতা, পরিবাহিতা ও শব্দের বেগ ইত্যাদির ব্যাখ্যায় K-র একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

+ গ্র্যাম-অণু গ্যাস বলতে বোঝায় গ্র্যামে প্রকাশিত কোন গ্যাসের আণবিক ওজন।

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।

বোলজ্‌ম্যান পরিসংখ্যান বা ক্লাসিক্যাল পরিসংখ্যান দিয়ে গ্যাসের গতিতত্ত্বে 'শক্তির সমবণ্টন নীতি' পাওয়া যায়। শক্তির সমবণ্টন নীতিটি হলো—তাপীয় সাম্যাবস্থায় প্রত্যেক অণুর স্বাধীনতার মাত্রাপ্রতি গড়শক্তি, বোলজ্‌ম্যান ধ্রুবকের সঙ্গে চরম স্কেলে তাপমাত্রার গুণফলের অর্ধেক (½KT)। স্বাধীনতার মাত্রা বলতে বোঝায়—কোন অণুর গতিকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে গেলে যতগুলি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র রাশির প্রয়োজন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল পরিসংখ্যান দিয়ে পাওয়া এই গড়শক্তির পরিমাপগত মানের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ মানের বেশ ফারাক দেখা যায়। তাছাড়া খুব কম তাপমাত্রায় হিলিয়াম কেন গ্যাস অবস্থায় থাকে—তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না—তার ব্যাখ্যাও বোলজ্‌ম্যান-পরিসংখ্যানের ক্ষমতার বাইরে। বোলজ্‌ম্যান পরিসংখ্যানের এই সমস্ত ঘাটতি পূরণ করে—পরবর্তী কালের কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান। বসু ও ফের্মি কোয়ান্টামবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুটি নতুন সূত্র আবিষ্কার করেন—বসু-পরিসংখ্যান ও ফের্মি-পরিসংখ্যান। এই দুটি পরিসংখ্যান আজ পদার্থবিদ্যার দুটি অতিশয় মূলগত বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। তবে পরিসংখ্যান পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগত আলোচনা থেকে একথা অনস্বীকার্য যে, ক্লাসিক্যাল কিংবা কোয়ান্টাম উভয় পরিসংখ্যানেই K-র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আর একটু বাড়িয়ে বললে বলা যায়—সমগ্র পরিসংখ্যান-পদার্থবিদ্যাটাই K-রূপী দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূলতঃ পরিসংখ্যান পদার্থবিদ্যা থেকেই K-এ গুরুত্ব মহিমা, প্রাধান্য কিংবা সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি সম্ভব।

পরিসংখ্যান বিষয়ক সূত্রগুলিতে যেমন K-এর ভূমিকা নিঃসন্দেহে সমালোচনাতীত, তেমনি এর আর একটি ভূমিকাও প্রণিধানযোগ্য। সে ভূমিকাটি হলো—থার্মোডাইনামিক্স বা তাপ-গতি-বিদ্যার সঙ্গে পরিসংখ্যানবিদ্যার সংযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপনের ভূমিকা। তাপ-গতিবিদ্যায় adiabatic বা রুদ্ধতাপ-প্রক্রিয়ায় যা অপরিবর্তিত থাকে, তাকে এনট্রপি বলা হয়। বোলজ্‌ম্যানের মতে, কোন সংস্থার আণবিক বিপর্যয়ের পরিমাপই হলো—এনট্রপি। এনট্রপি বস্তুর বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থার মধ্যে যে সম্ভাবনা বর্তিত আছে, তার সূচকের সঙ্গ; অর্থাৎ বলা যায়, এনট্রপি সংস্থাটির সম্ভাব্যতার একটি অপেক্ষক (Function)। এনট্রপি বৃদ্ধি মানে সংস্থাটির সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি কিংবা অন্যভাবে বলা যায় সংস্থাটির বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি। আমাদের বিশ্বে এনট্রপি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার মাত্রা বাড়ছে. তার অর্থ বিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকলেও কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজ করবার মত শক্তির হ্রাস ঘটে চলেছে। যাক, এখন এই এনট্রপির সঙ্গে সম্ভাব্যতার সম্বন্ধটি হলো—এনট্রপি (S)−K log সম্ভাব্যতা (w)। অতএব এখানে K-র ভূমিকার গুরুত্বটুকু সহজেই অনুমেয়।*

K-এর মান নির্ণয়

বোলজ্‌ম্যান-ধ্রুবকটি নানা জটিল সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয়। তাই বলে এর মান নির্ণয় পদ্ধতিটি কিন্তু তত জটিল নয় বরং বলা যায় বেশ সরল। যেহেতু এই ধ্রুবকটি অন্য দুটি সার্বজনীন বা শাশ্বত ধ্রুবকের অনুপাত—একটি গ্যাস ধ্রুবক, অন্যটি অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা, সেহেতু এই দুটি ধ্রুবকের মান জানলে পর K-এর মান অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়।

---

* প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, এনট্রপি ব্যক্তির ধর্ম কি গোষ্ঠীর ধর্ম; এটি একটি মূলতঃ স্ট্যাটিস্টিক্যাল বা সম্ভাব্যতাবিষয়ক কিংবা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তাজ্ঞাপক ধারণা প্রভৃতি মূল প্রশ্নের সম্যক সমাধান সম্বন্ধে এখনও ভাববার অবকাশ রয়েছে।

স্কুল কিংবা কলেজের সাধারণ পরীক্ষাগারে চার্লস্‌ ও বয়েলের সূত্র প্রমাণ করবার সময় সহজে R-এর মান নির্ণয় করা যায়। এক গ্রাম-অণু আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হলো $PV=RT$; চাপ (P), আয়তন (V) ও চরম স্কেলে তাপমাত্রা (T) জানলে পর উক্ত সমীকরণ থেকে সহজে R-এর মান পাওয়া যায়। এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, আমরা সাধারণতঃ পরীক্ষাগারে যে গ্যাস ব্যবহার করি, তা বাস্তব গ্যাস (Real gas)—যা বয়েলের সূত্র যথাযথ মেনে চলে না। খুব কম চাপে ও বেশী তাপমাত্রায় বাস্তব গ্যাস বয়েলের সূত্র মেনে চলে অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের প্রকৃতি পায়। তাই খুব কম চাপে ও বেশী তাপমাত্রায় পরীক্ষা চালানো দরকার—তা না হলে R-এর মান নির্ণয় করার ক্রটি থেকে যায়—যার সংশোধন প্রয়োজন। যাহোক, বর্তমানে গৃহীত R-এর মান—8.31×10^{7} আর্গ/°K।

উত্তেজনার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার অবিরাম নিরন্তর অক্রম বা অবিন্যস্ত গতিকে ব্রাউনীয় গতি বলে। কোলয়েডীয় দ্রবণে প্রলম্বিত (Suspended) সূক্ষ্ম [illegible] কণার ক্ষেত্রেও এই ব্রাউনীয় গতিবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানী পেরিন এই গতি পর্যালোচনা করে পরীক্ষামূলক ভাবে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা নির্ণয়ে সক্ষম হন। এই সংখ্যার মানের পরিমাণ হলো—6.02×10^{23}। অতএব, K-এর মান—

$$\frac{\text{গ্যাস-ধ্রুবক}}{\text{অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা}} = \frac{8.31 \times 10^{7}}{6.02 \times 10^{23}}$$
$$= 1.380 \times 10^{-16} \text{ আর্গ/°K}$$

তাছাড়া কোন পরিসংখ্যানের K-সম্বলিত সূত্র থেকে সুপরিকল্পিতভাবে সবকিছু রাশির মান জানবার পর K-র মান নির্ণয় করা সম্ভব। বর্তমানে গৃহীত মোটামুটি নির্ভুল K-এর মান—$(1.38026 \pm 0.000022) \times 10^{-16}$ আর্গ/°K

[কেবল পেরিন-পদ্ধতিতে মোটামুটি
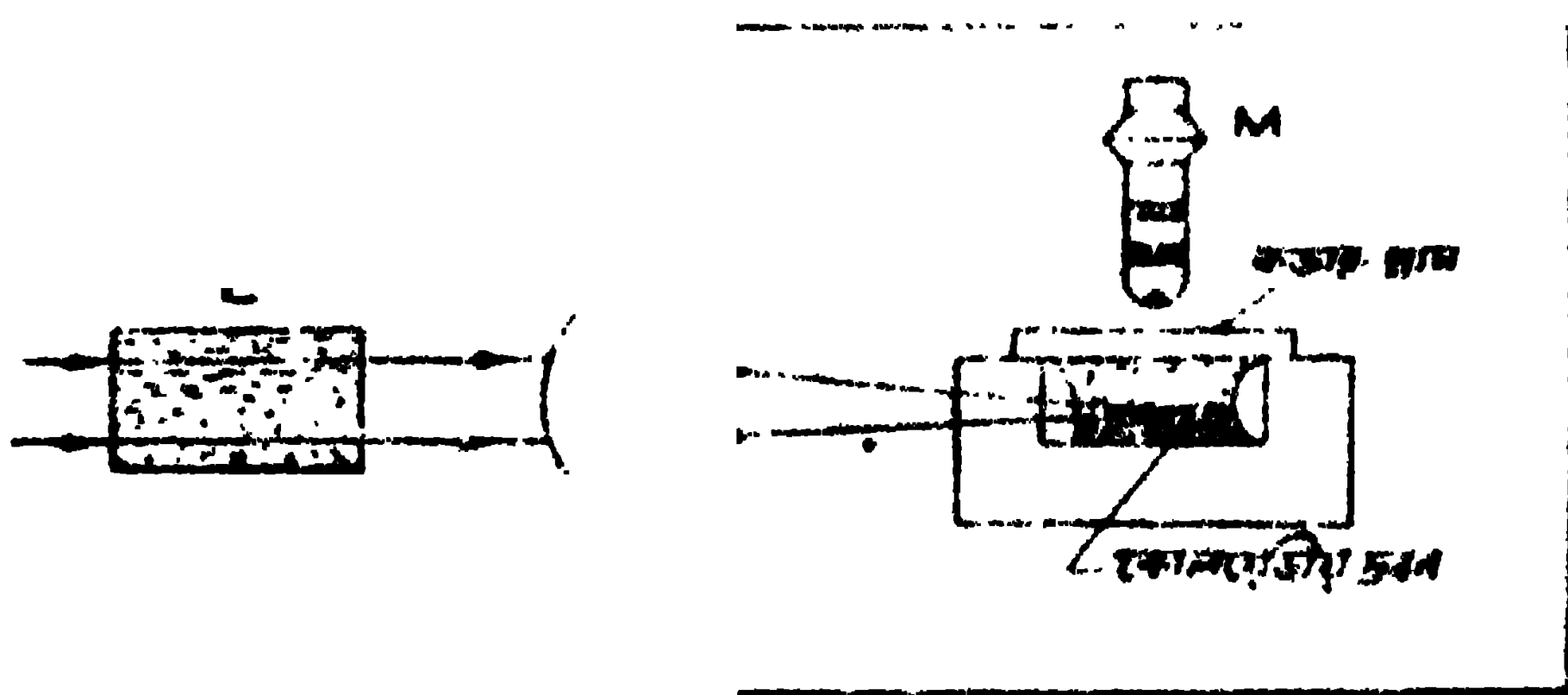
পেরিনের N-নির্ণায়ক যন্ত্র

C—একটি জলকোষ, যা আপতিত আলোকরশ্মির তাপাংশটুকু শোষণ করে নেয়।

L—একটি অভিসারী (Convergent) লেন্স।

M—উচ্চশক্তিসম্পন্ন আণুবীক্ষণিক যন্ত্র, যার সাহায্যে কোলয়েডীয় দ্রবণে প্রলম্বিত সূক্ষ্ম কণাগুলির গতিবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

অন্য দিকে, অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা অর্থাৎ প্রতি গ্রাম অণুতে অণুর সংখ্যা, পরীক্ষামূলক ভাবে নির্ণয় করেন বিজ্ঞানী পেরিন। তাঁর

$\frac{R}{N}$ বা K-র মান নির্ণয় করা যায়। কারণ পেরিন-পদ্ধতিতে N-এর মান নির্ণয় করতে গেলে,

ব্যবহৃত সমীকরণে অন্যান্য রাশির সঙ্গে R-এর মানও বসাতে হয়।]

উপসংহার

প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের* সঙ্গে কোন বিকিরণের কম্পনাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে যেমন একটি কোয়া-ন্টামের শক্তিমাত্রার পরিমাণ পাওয়া যায়, তেমনি বোলজ্‌ম্যান-ধ্রুবকের সঙ্গে চরম স্কেলের তাপমাত্রা দিয়ে গুণ করলেও শক্তির মাত্রা পাওয়া যায়। তবে উভয় শক্তিমাত্রার মধ্যে পার্থক্য হলো—প্রথমটি যান্ত্রিক ও দ্বিতীয়টি তাপীয়। অতএব বোলজ্‌ম্যান ধ্রুবক, কোন তাপমাত্রায় তাপীয় শক্তির মাত্রা নির্ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সাধারণ তাপমাত্রায় (27°C বা 300°K) তাপীয় শক্তির মাত্রা 0·0259 ইলেক্ট্রন ভোল্ট বা $0{\cdot}0259 \times (1{\cdot}6 \times 10^{-11})$ আর্গ।

এই বোলজ্‌ম্যান-ধ্রুবকটির মানের কি কোন পরিবর্তন ঘটে? এর উত্তরে স্বভাবতঃই আর একটা প্রশ্ন এসে যায়। সেটা হলো—সার্বজনীন গ্যাস-ধ্রুবক ও অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যার পরিবর্তন হয় কিনা কিংবা ঘটানো যায় কিনা। এক গ্রাম অণু গ্যাসে অণুর সংখ্যাই হল অ্যাভো-গ্যাড্রো সংখ্যা—অতএব এর মানের কোন পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। তাই অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যাটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। অন্য দিকে গ্যাস-ধ্রুবকটিকে ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে—স্থির নির্দিষ্ট চাপে এক গ্রাম অণু আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস বৃদ্ধি করলে পর গ্যাস-কৃত বাহ্যিক কাজের পরিমাণই হলো গ্যাস ধ্রুবকের পরিমাণ। অতএব এর মানও স্থিরীকৃত বা অপরিবর্তনীয়। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে, বোলজ্‌ম্যান ধ্রুবকটির মানের পরিবর্তন হওয়াটাই অস্বাভাবিক কিংবা অভাবনীয়। তাই K একটি শাশ্বত বা সনাতন ধ্রুবক। আমাদের বিশ্ব-কাঠামোর উপাদানগুলির যৌগগত কোন আকস্মিক পরিবর্তন না ঘটলে K-এর মান অক্ষয় ও অপরিবর্তিত থাকবে।

তবে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বলা যায়—যদি কোন কারণে K-এর মান একদম শূন্যের কাছাকাছি দাঁড়ায়, তাহলে গ্যাস-অণুগুলির সচঞ্চল গতি, কঠিন বা তরল পদার্থের কণাগুলির আবর্তন কিংবা কম্পন প্রায় সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাপীয় শক্তির মাত্রা শূন্যের কোঠায় থাকবে বললে হয়। তাপ-শক্তি প্রয়োগে প্রয়োজনীয় কাজ পাওয়া দুরূহ হবে। পরোক্ষে বলা যায়, পদার্থবিদ্যা, তথা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তাপ-গতি সম্বলিত অধ্যায়ের অবতারণা অবান্তর মনে হবে কিংবা স্পষ্ট অধ্যায়গুলির সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটবে।

অন্যদিকে নানা সূত্র ও তত্ত্বের পরিবর্তন কিংবা অসারতার আভাসও পরিলক্ষিত হবে। যেমন—রামন-বিক্ষেপণে, রামন-বর্ণালীতে কেবল-মাত্র স্টোক্‌স্‌-লাইনগুলির (যে লাইনগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী) স্পষ্ট সাক্ষাৎ মিলবে; কিন্তু অ্যান্টি-স্টোক্‌স্‌ লাইনগুলির (যেগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম) কোন আভাসই পাওয়া যাবে না...ইত্যাদি। অন্যদিকে যদি K-এর মান খুব বেশী হয়—তাহলে উপরিউক্ত ঘটনাবলীর ঠিক বিপরীত ঘটনাবলী গোচরীভূত হবে। তবে এসব চিন্তাধারা সম্পূর্ণ কল্পনা-নির্ভর, বাস্তবতার লেশমাত্র নেই।

* প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগষ্ট '72 সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সঙ্কলন

প্রযুক্তিবিদ্যার সুউন্নত এক পৃথিবী আসন্ন

আমরা আশ্চর্য এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। এমন দিন আসছে, যেদিন আমাদের শখন ধরে খবরের কাগজ ছাপা হবে। নাটক, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, বই, পুঁথি সব কিছুই পাওয়া যাবে চৌম্বক টেপ রেকর্ডে। নবযুগের ঐ অনাগত দিনে টেলিফোনে পরস্পরের চেহারাটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। ঘরে এমন সব অতি সংবেদনশীল যন্ত্র রাখা যাবে যে, বাড়ী পাহারা দেবার জন্যে কুকুর রাখবার আর দরকার হবে না। তাক লাগাবার মত ধাপে ধাপে এমনি আরো কত যে নতুন যান্ত্রিক কৌশল আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা দেবে তার ইয়ত্তা নেই।

আমাদের এই কল্পনার জগৎ দ্রুত বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। প্রযুক্তিবিদ্যাই এইসব পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে? তার উত্তরে বলতে হয় মানুষ যা করতে চাইবে ঠিক তাই হবে।

বর্তমানে টেলিভিশনের যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে কোন উন্নত দেশে একটি বাড়ীতে একই সঙ্গে 60টি টেলিভিশন চ্যানেল থাকতে পারে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে টেলিভিশন আরও অনেক বিচিত্র কাজ করবে। টেলিভিশন শুধু যে আমাদের চিত্তবিনোদন করে আমাদের আনন্দ দেবে আর সংবাদ পরিবেশন করবে তা নয়, টেলিভিশন সেট আমাদের আঘাত থেকে রক্ষা করবে, ব্যাধি নিরাময় করবে, এমনকি, টেলিভিশনের মাধ্যমে দাবা খেলাও চলবে।

চৌম্বক টেপ, ফিল্ম ও গ্রামোফোন রেকর্ডের কাজ হলো যে কোনও রকমের শব্দগ্রাহ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়কে ধরে রাখা ও পরে যথা সময়ে শোনানো বা দেখানো। কিন্তু ভবিষ্যতে যা হতে যাচ্ছে, তা খুবই বিস্ময়কর। তখন বই আর পড়তে হবে না। বই খুললে লেখাগুলি আপনিই পড়া হতে থাকবে; অর্থাৎ মানুষ তখন বই না পড়ে বই শুনবে। ছাপাখানা তৈরি হওয়ার আগে মানুষ যেমন অন্যের মুখে শুনে শুনে শিখত, ভবিষ্যতেও তেমনি বই শুনে শুনে শিখবে। ছায়াছবি প্রভৃতি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্মাতার কাছ থেকে সরাসরি দর্শকের কাছে পৌঁছে যাবে। তখন চিঠি বা ডায়েরী বলে কিছুই থাকবে না। তার পরিবর্তে হবে প্রত্যেকের জন্যে ব্যক্তিগত এক একটি স্মৃতি বা চলচ্চিত্র।

আমেরিকার দুটি শহরে এর মধ্যেই পিকচার ফোন স্থাপিত হয়েছে। পিকচার ফোন সাধারণ টেলিফোনের মতই একটা যন্ত্র। তবে তার সঙ্গে একটা টেলিভিশন সেট জুড়ে দেওয়া থাকে। পিকচার ফোনে কথাবার্তার সময় দুই প্রান্তের দুই জনকেই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এর আরও বিচিত্র সব রূপায়ণ হতে যাচ্ছে। তখন ডায়াল করে চলচ্চিত্র দেখা যাবে আবার তা টেপ রেকর্ড করে রাখা যাবে। তারপর ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজকর্ম ফোনের সাহায্যেই করা যাবে কণ্ঠ আইডেন্টিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমে। চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ডায়াল করে ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যাবে।

আমেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ও মধ্যম

দেশের অনেক খবরের কাগজ টাইপ বসাবার যন্ত্রপাতির পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার করতে সুরু করেছে। ধাতু-নির্মিত টাইপের পরিবর্তে ফটো-প্রিন্টিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু আর কয়দিন বাদে খবরের কাগজ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিদিন বাড়ী বাড়ী বিলি হবে। এর ফলে রিপোর্টারের লেখা শেষ হবার দশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে সে খবর লোকের কাছে পৌঁছে যাবে। এসব তো হবেই, এ ছাড়া আরও অনেক কিছু হবে, যেমন—কম্পিউটার কথা বলবে।

এই সব আজব পরিবর্তনকে বলা হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব। এ নিয়ে সকলেই এখন খুব মাথা ঘামাচ্ছে। এই পরিবর্তনের সম্ভাবনায় জনসাধারণের আকর্ষণও নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কোনও কোনও লোক নতুন স্টিরিও গ্রামোফোন আর কিনছে না। কেননা, আর কিছুদিনের মধ্যেই কোয়াড্রোফোনিক রেকর্ড-প্লেয়ার বেরুচ্ছে। আর তা বেরুলেই তো স্টিরিওফোনিক রেকর্ড-প্লেয়ার অচল হয়ে যাবে।

উন্নত দেশগুলির চেয়ে উন্নতিশীল দেশগুলিতেই এই সব রূপায়ণ তাড়াতাড়ি হবে। কেমনা, সেই সব এলাকায় অভিনব ব্যবস্থা বিশেষ কিছু নেই বলে কোনও কিছুই বাতিল হবার প্রশ্ন ওঠে না।

সমাজতত্ত্ববিদ এবং সংবাদপত্র, বেতার প্রভৃতির সমালোচকেরা যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অভিনব উন্নতির ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছেন না। তাঁদের চিন্তার বিষয় হলো—এই অভিনব যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বার্তা আদান-প্রদান ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কি উপকার করবে। এই যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীলতার উপর আলভিন টফ্‌লার 'ফিউচার শক্' নামে একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে তিনি বলেছেন, বর্তমানে সব কিছুরই এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে, মানুষ কোনক্রমেই তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। ফলে মানুষের নিজের সৃষ্টির মধ্যেই একটা বিরাট ও ভয়াবহ শূন্যতা ও ফাঁক থেকে যাচ্ছে। প্রযুক্তিবিদ্যার যতই উন্নতি হবে—এই শূন্যতাও ততই ব্যাপক রূপ ধারণ করবে। এই বইটি এখন একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

'ফিউচার শক্' শব্দ দুটি এখন মার্কিন শব্দ-ভাণ্ডার বা চলতি কথাবার্তার অঙ্গ হয়ে গেছে। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে অথচ তার জন্যে যদি প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে তা শুনে মনটা যে অপ্রসন্ন হয়, মনের সেই ভাবটা বর্ণনা করতেই এই শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়।

ফিউচার শক্ একটা সতর্ক বাণীও বটে। নতুন পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যে যাতে আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া যায়, তারই জন্যে এই সতর্ক বাণী।

আসলে প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে সুউন্নত ভবিষ্যতের এই নতুন পৃথিবীটা একটা পারিবারিক যোগাযোগ কেন্দ্র হয়ে উঠবে। তখন প্রতি ঘরে থাকবে একটি টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্র, একটি শব্দ গ্রাহক-যন্ত্র, একটি রেকর্ডার এবং একটি প্রিন্ট আউট মেশিন, যা দূর থেকে সংকেত পাওয়া মাত্রই অনেকগুলি অনুলিপি তৈরি করবে। এইসব যন্ত্রপাতি সম্ভবতঃ গৃহস্থকে লীজ দেওয়া হবে।

টেলিফোনে একজন আরেক জনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। ভবিষ্যতের পারিবারিক যোগাযোগের যে ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে, তার ফলে এক সাথে বহু লোকের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ সম্ভব হবে।

আমেরিকার সংবাদপত্র সম্পাদক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি হার্বার্ট ব্রুকার বলেন, "এটা মনে হতে পারে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমগুলির মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলেই সমাজেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। কিন্তু বেতার ও টেলিভিশনের আবির্ভাবের ফলেই বর্তমান যুগের বিক্ষোভ ও

সংকট দেখা দিয়েছে এটা কি হতে পারে? এ অবিশ্বাস্য। অথচ সমাজতত্ত্ববিদ মার্শাল ম্যাকলুহান যা বলেছেন—তাতে এটাই সত্য মনে হয়।"

মিঃ ম্যাকলুহান বলেছেন, 'যোগাযোগের মাধ্যমগুলির প্রকৃতি সমাজকে যতখানি গড়ে তোলে, ঐ মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে প্রচারিত বার্তা ততখানি করে না।

নৃতাত্ত্বিক এডমণ্ড কার্পেন্টার বলেছেন, টি. ভি হচ্ছে এই যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা ফল-বিশেষ। এই যুগের কোনও শিশুকে টি. ভি. দেখতে বারণ করে শাস্তি দেওয়ার কোনও মানেই হয় না।

বিশেষজ্ঞদের ঐ সব বিবৃতি থেকে এই সত্যেই আমরা উপনীত হচ্ছি যে, মানুষ নিজেকে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার উপযোগী করে, প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের উপযোগী হয়ে তৈরি হয় না। অতএব মানুষকে নতুন পৃথিবীর উপযোগী করে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

মাছের মিশ্রচাষ

মাছের মিশ্রচাষ সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের ভি. আর. পি সিন্‌হা লিখেছেন—মাছের মিশ্রচাষ বলতে পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে থাকা বিভিন্ন জাতের মাছের এক সঙ্গে চাষ করাকে বোঝায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো জলের বিভিন্ন স্তর থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে এমন বিভিন্ন জাতের মাছের চাষ করে একই সঙ্গে তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা। যে সব জাতের মাছের পরস্পরের মধ্যে খাদ্যের জন্যে প্রতিযোগিতার প্রবণতা নেই, সেগুলিকে একসঙ্গে মিশ্রচাষের জন্যে নির্বাচন করলে জলাশয়ে মাছের খাদ্য ও স্থানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যায়। বদ্ধ জলাশয়ের মিঠে জলে মাছের একক চাষ আজকাল আর তেমন প্রচলিত নয়। বেশীর ভাগ এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে চীন দেশীয় মিশ্রচাষের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

চীন দেশের মৎস্য-চাষীরা এখনও চারটি জাতের চীনা পোনা মাছের চাষ করেন। এই কারণে চারটি জাতের মাছ হলো—

1. গ্রাস কার্প—এই জাতের মাছ জলজ স্থল উদ্ভিদ ও ঘাস খায়।

2. বিগ হেড কার্প—এরা ছোট ছোট উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে।

3. সিলভার কার্প—জলজ উদ্ভিদ খায়।

4. কমন কার্প—সর্বভুক্ এবং বিশেষ করে জলের তলদেশের খাদ্য খায়।

ভারতে মিশ্রচাষের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছে প্রধান জাতের ভারতীয় পোনামাছ কাতলা, রুই ও মৃগেল। কাতলা জলের উপরিভাগের খাদ্য বিশেষতঃ জলজ উদ্ভিদ খায়। রুইমাছ জলজাতীয় শিকড় ও ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদ খায়। মৃগেল মাছ জলের তলদেশের বালিশা এবং এরা আংশিকভাবে পচা উদ্ভিজ্জাতীয় বস্তু ও বালি, নুড়ি প্রভৃতি খেয়ে বেঁচে থাকে। সম্প্রতি বিদেশী জাতের মাছ কমন কার্প; সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প ভারতে মিশ্রচাষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

1950 সাল থেকে সেন্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পণ্ড কালচার বা পুকুরিণী অনুশীলন বিভাগে মাছের মিশ্রচাষের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। চীনা পোনা মাছ ছাড়া অন্যান্য বিদেশী জাতের সঙ্গেও দেশী মাছের মিশ্রচাষ করে দেখা হয়েছে। 1957-61 সালে কয়েকটি প্রধান জাতের পোনা মাছের সঙ্গে তিলাপিয়ার মিশ্রচাষ করে কোন রকম উর্বরক বা অতিরিক্ত খাদ্য ব্যবহার ছাড়া

প্রতি বছর গড়ে 2,203 কি.গ্রা/হে. উৎপাদন পাওয়া যায়। উপযুক্ত উর্বরক ও খাদ্য সরবরাহ করে বছরে প্রায় 4,870 কি.গ্রা/হে. মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু পরে যখন দেখা যায় যে, তিলাপিয়া প্রধান জাতের মাছগুলির সঙ্গে খাদ্যের জন্যে প্রতিযোগিতা করছে, তখন এই মাছ মিশ্রচাষের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। 1962-63 সালে আবার ভারতীয় ও বিদেশী জাতের মাছের মিশ্রচাষের উপর বিভিন্ন সময়কালের কয়েকটি স্বল্পকালীন পরীক্ষা করে দেখা হয়। এগুলির মধ্যে মাত্র দুটি জাত 365 দিন, একটি 270 দিন এবং বাকীগুলি 52-195 দিন যাবৎ পরীক্ষিত হয়।

এই সমস্ত পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, গ্রাসকার্প-কাতলা মিশ্রচাষের তুলনায় গ্রাসকার্প-সিলভার কার্পের মিশ্রচাষ বেশী লাভজনক। আবার গ্রাসকার্প সিলভার কার্প-কমনকার্পের মিশ্রচাষ গ্রাসকার্প-কাতলা-কমনকার্পের চেয়ে বেশী লাভের। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে কাতলা মাছের চেয়ে সিলভার কার্প তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং এর উৎপাদনের পরিমাণও বেশী। 1963-68 পর্যন্ত মাছের যে 20টি পরীক্ষামূলক মিশ্রচাষ করা হয়, তা প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।—(1) শুধু ভারতীয় জাতের পোনা মাছের চাষ, (2) শুধু বিদেশী পোনামাছের চাষ এবং (3) ভারতীয় ও বিদেশী পোনা মাছের একসঙ্গে চাষ। এর মধ্যে 16টি ক্ষেত্রেই মাছের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে বছরে 2,000 কি.গ্রা-র উপর ছিল, 14টি ক্ষেত্রে এই উৎপাদনের পরিমাণ 2,500 কি.গ্রা বা বেশী, 5টি ক্ষেত্রে 3,000 কিলোগ্রামের বেশী, 3টি ক্ষেত্রে 3,500 কিলোগ্রামের উপর এবং সবচেয়ে বেশী পরিমাণ হলো 4,210 কি.গ্রা। শুধু প্রধান ভারতীয় পোনামাছগুলির চাষ থেকে হেক্টর প্রতি উৎপাদন পাওয়া যায় 1,439-2975 কি.গ্রা (গড়ে 2,088 কি.গ্রা)। শুধু বিদেশী মাছের চাষ থেকে উৎপাদন পাওয়া যায় 2,900 কি.গ্রা এবং ভারতীয় ও বিদেশী পোনামাছ একসঙ্গে চাষ করে 2,234—4,210 কি.গ্রা (গড়ে 3,035 কি.গ্রা) উৎপাদন পাওয়া যায়।

পরীক্ষামূলক মাছ চাষের পুকুরগুলিতে নিয়মিতভাবে গোবর সার ও বিভিন্ন মাত্রায় অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, ক্যাল-সিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি অজৈব উর্বরক ব্যবহার করা হয়। মাছগুলিকে চালের কুঁড়ি ও সরষের তেলের খৈল (1 : 1 অনুপাতে) খেতে দেওয়া হয়। গ্রাসকার্পকে নানা ধরণের জলজ উদ্ভিদ খেতে দেওয়া হয়।

হেক্টর প্রতি 5,000 করে কাতলা, রুই ও মৃগেল মাছ 1 : 1 : 1 অনুপাতে পুকুরে ছাড়া হয়। কিন্তু যখন ভারতীয় ও বিদেশী পোনা মাছের একসঙ্গে চাষ করা হয়, তখন মিশ্রণের অনুপাত ছিল—কাতলা 2 : রুই 6 : মৃগেল 2.5 : সিলভার কার্প 5 : গ্রাস কার্প 2 : কমন কার্প 2.5 এবং গোরামি 0·3 এবং হেক্টর প্রতি ছাড়া চারা মাছের সংখ্যা ছিল 5,075। এই সমস্ত পরীক্ষামূলক চাষ থেকে দেখা গেছে যে, সু-কৌশলে ভারতীয় ও বিদেশী পোনামাছের মিশ্র চাষ করতে পারলে বাজারে ছাড়বার উপযোগী মাছের গড় উৎপাদনের পরিমাণ বছরে হেক্টর প্রতি 300 কি.গ্রা থেকে বাড়িয়ে বছরে 3,000 কি.গ্রা/হে পর্যন্ত করে তোলা যেতে পারে।

সেন্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মাছের মিশ্রচাষের এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রচলনের জন্যে ভারতীয় ও বিদেশী মাছের মিশ্রচাষের উপর একটি সর্বভারতীয় সমন্বয়মূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয়টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এগুলি হচ্ছে—মধ্যপ্রদেশের সাগর-কেহলা কিল

ফার্ম, হরিয়ানার দৈবপুরা ফিশ ফার্ম, মহারাষ্ট্রের খোপোলির ফিশ ফার্ম, তামিলনাড়ুর ভবানীসাগর ফিশ ফার্ম, উত্তরপ্রদেশের ভগবানপুর ফিশ ফার্ম ও পশ্চিম বাংলার কল্যাণীতে কুলিয়া ফিশ ফার্ম। 1971 সালের শেষের দিকে এই কেন্দ্রগুলির কাজ আরম্ভ হলেও যে ফলাফল পাওয়া গেছে, তা খুবই উৎসাহজনক।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পশ্চিম বাংলার কুলিয়া ফিশ ফার্মের (কল্যাণী) কথা। এখানে 4টি পুকুরে মাছ ছাড়া হয়। তার মধ্যে দুটি পুকুরের প্রত্যেকটিতে কাতলা, রুই, ও মৃগেল মাছ 4: 3: 3: এই অনুপাতে ছাড়া হয় এবং অন্য দুটি পুকুরে কাতলা, রুই, মৃগেল, গ্রাসকার্প, সিলভার কার্প ও কমনকার্প ছাড়া হয়। এগুলির অনুপাত ছিল 1 কাতলা : 3 রুই : 1.25 মৃগেল : 2.5 : সিলভারকার্প : 1 গ্রাসকার্প : 1.25 কমনকার্প। পুকুরগুলিতে প্রতি হেক্টরে 5,000 করে চারা মাছ ছাড়া হয়। এই মাছগুলির দৈর্ঘ্য ছিল .100-150 মিলিমিটার। উপযুক্ত পরিমাণে উর্বরক ও অতিরিক্ত খাদ্য ব্যবহার করে ছ-মাসের মধ্যেই মাছের উৎপাদনের হিসাব নিয়ে দেখা যায় যে, এই পরিমাণ 0·23 হেক্টরের পুকুরে 275 কি.গ্রা হয়েছে, 0.15 হেক্টরের পুকুরে 130 কি.গ্রা এবং আরেকটি 0.15 হেক্টরের পুকুরে 153 কি.গ্রা এবং 0.13 হেক্টরের পুকুরটিতে 135 কি.গ্রা হয়েছে। শেষের দুটি পুকুরে ভারতীয় ও বিদেশী জাতের পোনা মাছ ছিল। সব রকম মাছেরই বাড় বেশ ভাল হয়, তবে গ্রাসকার্প এই ছ-মাসের মধ্যে দৈর্ঘ্যে 365 মি. মি ও ওজনে 508 গ্র্যাম বেড়ে ওঠে। মালাকায় (পশ্চিম মালয়েশিয়া) গ্রাসকার্প, সিলভার কার্প ও বিগহেড-কার্প এক সঙ্গে চাষ করা হলে বিগহেডের বাড় খুব দ্রুত হতে দেখা যায়। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বিগহেড কার্প আমদানী করবার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। মিশ্রচাষের তালিকায় এই জাতের মাছটিকে অন্তর্ভুক্ত করা বেশ লাভজনক হবে বলে মনে হয়। সুতরাং মাছের মিশ্রচাষের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফল দেখে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই পদ্ধতি আমাদের দেশের মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন পথ খুলে দেবে এবং গতানুগতিক প্রথায় মাছ চাষ করে যা পাওয়া যায়, তা থেকে অন্ততঃ 5-8 গুণ বেশী মাছ পাওয়া যাবে।

স্মৃতি : আহরণ, সঞ্চয় ও প্রকাশ

শ্রীমতী লক্ষ্মী বসু, শ্রীদেবব্রত নাগ ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

[মনের খাতায় কিভাবে চিন্তাবলি জমা হয়ে থাকে, তা নিশ্চয়ই খুব উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ঔষধ প্রয়োগের মত স্মৃতিশক্তি বা অভিজ্ঞতা মনের মধ্যেও স্থান করে নিতে পারে।]

জন কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করবার খবর যখন আপনি রেডিওতে শুনলেন, তখনকার ঘটনাবলী হয়তো এখনও আপনার বেশ মনে আছে। আপনার হয়তো মনে আছে আপনি কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, এমন কি কোন্ পায়ে ভর দিয়ে আপনি কারও জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এতদিন পরেও খুঁটিনাটি অনেক কিছুই আপনার মনে পড়ে। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়তো এমন সব লোকের এখন পর্যন্ত মনে আছে, যারা প্রায় দশ বছর আগেই স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন; অর্থাৎ বলতে চাই পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অনেক দিন মনে রাখতে পারেন।

নিশ্চয় এই ধরণের মনে রাখবার কলকৌশল জানতে ইচ্ছা হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Robert Livingston-এর মতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে রাখা সবার মধ্যে একই সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। বিশেষ মুহূর্তে বিভিন্ন প্রাণী এবং মানুষের স্মৃতির পর্দায় এমন সব ছাপ পড়ে, যা তার বিস্মৃতির পথে স্মৃতির পরিচয় দেয়। ধরুন যদি একটি জন্তু শিকারীর পাল্লায় পড়ে এবং কোন প্রকারে পালিয়ে বাঁচে, তবে ভবিষ্যতে যে সে শিকারীর হাত থেকে রেহাই পাবার পথ অনেকটা জেনে গেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জন্তুটি প্রথমবার ধরাই বা পড়লো কেন? কি ভুল তার হয়েছিল? হঠাৎ পালিয়ে বাঁচবার ফলে খুঁটিনাটি কলা-কৌশল অধিকাংশই উত্তেজিত মুহূর্তে মনে না থাকবার কথা। খুব কম ক্ষেত্রে দেখা গেছে সারা জীবনের অধিকাংশ ঘটনা কেউ কেউ মনে রেখেছেন। সাধারণ যে যে কারণে বিস্মৃতির বেড়াজাল ডিঙিয়ে স্মৃতির উদ্ভব হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাছাই করা। এটির অভাব হলে আমাদের মন স্বভাবতঃই অতিরিক্ত খবরের বোঝায় ডুবে থাকবে। তাই কাঁচা খবরগুলি মস্তিকে প্রবেশ করবার পর বাছাই হয়। অধিকাংশই মনের আস্তাকুড়ে পচে নষ্ট হয়, আর বাছাইকরা খবরগুলি মনের বিশেষ সংগ্রহ-শালায় পর্যায়ক্রমে জমা হতে থাকে।

ধরুন, রাস্তায় কোন এক মহিলার সঙ্গে আপনার দেখা হলো। আপনাকে তিনি একটি টেলিফোন নম্বর দিলেন। আর সেকেণ্ড সময়ের জন্যে আপনি হয়তো অনেক কিছু জানেন। যেমন, কিভাবে ভদ্রমহিলার ঠোঁট নড়ছিল, তার চোখ কিভাবে নড়াচড়া করছিল ইত্যাদি। কিন্তু তখন আপনি টেলিফোন নম্বরটির দিকে বেশী নজর দেওয়ায় অন্যান্য ঘটনাগুলি আর মনে রাখতে পারবেন না। টেলিফোন নম্বরটি কিন্তু অনেক দিনের জন্যে স্মৃতির কুঠিতে জমা হয়ে থাকবে, যদি সে সময় কেউ আপনাকে বাধা না দেয়। দেখা গেছে কোন ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করতে গেলে প্রায় 1 ঘন্টা সময় লেগে যায় এবং সে সময় মস্তিষ্কে ঔষধ প্রয়োগ

---

* প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

করলে কিংবা তড়িৎ পাঠালে কিংবা আঘাত করলে মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। অনেক টেলিফোন নম্বর শুনতে শুনতে আবার আগেরটি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মনে রাখার অনেক সময় আবার কিছু কিছু ভুলও হতে দেখা যায়। খবরটি যখন ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির পৃষ্ঠায় থাকে, তখন যে ধরণের ভুল হয়—তা হলো বিভিন্ন রকম শব্দের মধ্যে মিল কিংবা নানান আকৃতির মধ্যে মিল। যেমন, কোন স্থানের নাম ভুলবশতঃ Lords' bridge না হয়ে Long bridge নামে প্রকাশ পায়। আবার কিছুদিন পর ঐ নামটি King's bridge নামে প্রকাশ পায়; অর্থাৎ ভুল যা হলো, তা হচ্ছে একই রকম অর্থের মধ্যে একটা গোলমেলে অবস্থা। অনেকটা এই রকম—গ্রন্থাগারে লেখকের নামানুসারে বইগুলি না রেখে বিষয়বস্তু অনুযায়ী বইগুলি রাখা। অনেকের মতে খবরগুলি যখন বাছাই হওয়ার সময় ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির পৃষ্ঠায় জমা হয়, তখন এই ধরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

ইদানীং মস্তিষ্কে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে স্মৃতি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বিশেষভাবে তৈরী তড়িদ্বারের সাহায্যে মস্তিষ্কের temporal lobe নামক স্থানে তড়িৎ পাঠালে মানুষের পুরনো দিনের অনেক কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যা আপাতদৃষ্টিতে মন থেকে মুছে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। Wilder Penfield-এর মতে মস্তিষ্ক নানা ঘটনার খুঁটিনাটি সবকিছুই চিরদিনের মত ধরে রাখতে পারে। অনেকে অবশ্য এই ধারণা স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁদের মতে অনেক ধাঁধা মনে রাখবার মানে এই নয় যে, স্মৃতির পাতা থেকে কোন কিছুই মুছে যায় নি।

পরীক্ষাগারে জ্ঞান ?

Karl Lashley মস্তিষ্কের স্মৃতিসম্বলিত স্থানগুলি অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেন। এর পর অনেক পরীক্ষা থেকে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, স্মৃতিসংক্রান্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে রাসায়নিক সম্পর্ক আছে।

একদলের মতে, বংশজাত ধর্মের মূলে প্রধানত সংকেতের যে সম্পর্ক—স্মৃতির মূলেও এমন কতকগুলি রাসায়নিক অণু কাজ করছে, যারা স্মৃতির বার্তা বহন করে। পরীক্ষাগারে এই ধারণার স্বপক্ষে সব-রকম পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব হয় নি।

কেউ কেউ বলেন, স্মৃতি এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে চালান দেওয়া যায়। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের Janes McConnell একবার একবার একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলেন। Pavlov-এর কুকুরকে যেমন ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের লালা নিঃসরণ করতে শেখানো হয়েছিল, তেমনি McConnell-এর পরীক্ষায় আলোর উপস্থিতিতে flat worm-কে কুঁকড়ে যেতে অভ্যাস করানো হয়েছিল। এই পরীক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতকগুলি flat worm-এর অবশিষ্ট খেয়ে কতকগুলি অশিক্ষিত flat worm বিনা প্রশিক্ষণে শিক্ষিত হয়েছিল। অনেকেই তখন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—তা হলে এবার ছাত্রদের শিক্ষকদের উচ্ছিষ্ট খাইয়ে দিলে ওরাও পণ্ডিত হয়ে যাবে!

1965 সনে কিছু কিছু খবর প্রকাশ হতে শুরু করল যে, এক প্রাণীর স্মৃতি অন্য প্রাণীতে চালান দেওয়া হয়তো সম্ভব। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট ইঁদুরের মস্তিষ্ক থেকে রিবো-নিউক্লিক অ্যাসিড কিংবা সংক্ষেপে RNA নিষ্কাশন করে এবং ঐ RNA সাধারণ অশিক্ষিত ইঁদুরের রক্তে প্রবেশ করিয়ে কেউ কেউ দেখালেন যে, ইঁদুরগুলি শিক্ষিত হয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন এ এক ধরণের ধোঁকাবাজী।

অনুশীলন যন্ত্রের অন্যতম রূপায়ন

ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মস্তিষ্ক যে অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি, তারই কোন না কোন অংশকে

স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে আছে। এই ব্যাপারে Holger Hyden দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, শিক্ষা মস্তিষ্ক-কোষের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। Paul Lange-এর যুক্তভাবে কাজ করে Holger Hyden এমন সব কলা-কৌশল আবিষ্কার করলেন, যা আধুনিক মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে স্থান পাবে। এক কথায় তাঁরা মস্তিষ্কের প্রাণরসায়ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখাতে পেরেছেন। বহু সংখ্যক মস্তিষ্ক-কোষে শিক্ষার প্রভাবে কোন নতুন প্রোটিন তৈরি হয় কিনা—তা পরীক্ষা করে দেখলেন। একটি সরু নলে জেলীজাতীয় পদার্থ ভর্তি করে, শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরের মস্তিষ্ক থেকে পাওয়া খুব সামান্য পরিমাণ প্রোটিন জেলীর এক প্রান্তে রেখে, তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে বিভিন্ন প্রোটিনকে পৃথক করতে সক্ষম হলেন। শিক্ষিত ইঁদুরের দেহে তেজস্ক্রিয় অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োগ করা হলো শিক্ষার শেষ সময়ে। তেজস্ক্রিয় পরিমাপক গাইগার যন্ত্রে (Geiger counter) তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ মেপে দেখালেন যে, শিক্ষার প্রভাবে নতুন প্রোটিন তৈরি হয়। আগেই জানা ছিল যে, মস্তিষ্কে খুব বেশী পরিমাণ RNA আছে। এই RNA আবার নতুন প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। Hyden-এর মতে মস্তিষ্কে RNA-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। প্রাণীদের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে RNA-এর গুণগত এবং পরিমাণগত পরিবর্তন হতে দেখা গেছে। ইঁদুরের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণের সময় RNA-এর পরিমাণ কম থাকে, কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে, আবার বৃদ্ধ অবস্থায় কমতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও RNA-এর পরিমাণ আয়ুষ্কালের বৃদ্ধ বয়সে কমতে থাকে। সাধারণতঃ প্রাণীদের মধ্যে প্রায় একই রকম নিয়ম দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য হলো স্বল্প স্থিতিকালে এই RNA-এর পরিমাণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। কার্যগত শিক্ষাগ্রহণের সময় RNA-পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে। আরও দেখা গেছে মস্তিষ্ক-কোষে RNA বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিনের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এ থেকে মনে হচ্ছে যে, নতুন প্রোটিন সংশ্লেষণে RNA-এর ভূমিকা আছে।

1962-65 সালে Hyden যে সব পরীক্ষা করেছেন, সেগুলি বেশ উল্লেখযোগ্য। একটি পরীক্ষায় ডানহাতি ইঁদুরগুলি বাম হাতে খাবার নিতে আর বামহাতি ইঁদুরগুলি ডান হাতে খাবার নিতে শিখল। এখন ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষার প্রধান কাজগুলি মস্তিষ্কের ডান দিক দিয়ে করা হয়েছে। একই মস্তিষ্কের উভয় দিকের কোষগুলির তুলনামূলক পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, মস্তিষ্কের যে দিক দিয়ে শিক্ষার কাজ হয়, সেদিকের কোষে RNA-এর পরিমাণ অনুশীলনকালে প্রতি দিন নিয়মিত হারে বাড়তে থাকে এবং 9 দিন পর RNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়। ঐ সময় অতিরিক্ত RNA যা তৈরি হয়, তার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে।

মস্তিষ্ক সম্পর্কিত অন্যান্য পরীক্ষা Hyden-এর মতবাদ—'শিক্ষার সঙ্গে RNA-এর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক' সমর্থন করে। ম্যাসাচুসেট বিশ্ববিদ্যালয়ের Victor Shashoua গোল্ডফিশ (চীন ও জাপানের সোনালী রঙের একরকম মাছ) এর কানকোর কতকগুলি ভেলা বেঁধে মাছগুলিকে জলে ছেড়ে দিলেন। ফলে মাছের দেহের প্রায় সবটাই জলের তলায় কিন্তু মাথাটা উপর দিকে হয়ে গেল। ঐ অবস্থায় তিন ঘন্টা কঠোর শিক্ষার পর মাছগুলি ভেলা ছাড়াই ঐ ভাবে সাঁতার কাটতে শিখল। এই ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাছগুলির মস্তিষ্কে RNA-এর পরিমাণগত পরিবর্তন দেখা গেল।

1970 সালে Hyden এবং Lange ইঁদুরের

মস্তিষ্ক-কোষে S 100 নামে এক ধরণের প্রোটিনের সন্ধান পেলেন। এক হাত ছেড়ে অন্য হাতে কাজ করা শেখাবার সময় বিশেষ প্রোটিনটি তৈরি হতে দেখা গেল। S 100 প্রোটিন একমাত্র মস্তিষ্কেই পাওয়া গেছে। শিক্ষণকালে প্রায় একই রকম আর একটি প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যদিও এখনও সনাক্ত হয় নি। Hyden এবং Lange-এর মতে এটি S 100-এর পরিবর্তিত-রূপ। S 100 কিংবা অন্য প্রোটিনগুলি যেভাবেই থাকুক না কেন, 'স্মৃতির সঙ্গে এরা সাংকেতিক ভাবে জড়িত'—Hyden-এর এই মতবাদকে অনেক বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করেন নি। আপত্তির প্রধান কারণ হলো, যখন কোন ব্যক্তি হঠাৎ কিছু মনে করতে চান, তখন এত অল্প সময়ের মধ্যে মস্তিষ্কে কি করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে স্মৃতি উদ্ধারের কাজটি হয়ে থাকে? অন্য একদলের মতে Hyden যা দেখিয়েছেন তা শুধুমাত্র প্রমাণ করে যে, মস্তিষ্ক-কোষে ক্রমাগত RNA আর প্রোটিন তৈরি হয়—এথেকে অন্য কিছু বলা চলে না।

শিক্ষার সঙ্গে প্রোটিনের সম্পর্ক আছে, এই ধারণা অনেক দিনের। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের Bernard Agranoff গোল্ডফিশের মাথায় Puromycin নামক ভেষজটি প্রয়োগ করে দেখতে পেলেন যে, মস্তিষ্কে প্রোটিন সংশ্লেষের হার অনেকটা কমে গেছে। জানা আছে যে, এই ভেষজটি প্রোটিন সংশ্লেষণে বাধা দেয়। আরও দেখা গেল, প্রোটিন সংশ্লেষণ ব্যাহত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোল্ডফিশের শিক্ষায় ঘটনা মনে রাখবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। Agranoff-এর পরীক্ষায় যেভাবে গোল্ডফিশকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তা খুবই সাধারণ। গোল্ডফিশকে অনেকগুলি ছোট ছোট জলাধারে রাখা হয়েছিল। প্রত্যেকটি জলাধারের মধ্যে একটি করে প্রতি-বন্ধক ছিল। দুইদিকে জলাধারের যে কোন প্রান্তে আলো জ্বালিয়ে মাছগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হতো যে, জলাধারের যে প্রান্তে আলো আছে, সেই প্রান্তে মাছগুলির বৈদ্যুতিক আঘাত পাবার সম্ভাবনা আছে। এভাবে ধারাবাহিক পরীক্ষা চালিয়ে যাবার ফলে মাছগুলি খুব সহজেই বৈদ্যুতিক আঘাত উপেক্ষা করে আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করতে শিখলো। কিন্তু অনুশীলনের কাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি গোল্ডফিশকে Puromycin প্রয়োগ করা হয়, তবে মাছগুলি পুরাপুরি সব শিক্ষাই ভুলে যায়। শিক্ষার এক ঘণ্টা পর Puromycin প্রয়োগ করলে অনুশীলন-কালের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখা গেছে; অর্থাৎ ঐ এক ঘণ্টা সময়ে মাছটির মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে, তা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে।

ভেষজ প্রয়োগ করে অনুশীলনের প্রভাব বিচ্ছিন্ন করা কিংবা Hyden-এর পরীক্ষা কোনটাই স্মৃতির মূল রহস্য উদ্ঘাটনে পুরাপুরি সাফল্য লাভ করতে পারে নি। এমনও বলা যেতে পারে যে, ভেষজটি মস্তিষ্কে সাময়িক বিশৃঙ্খলার ফলেই অনুশীলনের প্রভাব লোপ পেয়েছে, যেমন ব্যক্তি মাথায় ঘুষি মারলে ক্ষণিকের জন্যে স্মৃতিবিভ্রম হয়ে থাকে। Agranoff এবং আরও অনেকে আজকাল এই ধারণা পোষণ করেন যে, সমস্ত জ্ঞানই মস্তিষ্কে কোন না কোন ভাবে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এর জন্যে আরও অনেক পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

শেখা কিংবা বেছে নেওয়া

সমস্ত রকম জ্ঞানার্জন একমাত্র মস্তিষ্কের মাধ্যমেই হয়ে থাকে—এমন একটি ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনে প্রকৃতি যে শিক্ষালাভ করে, তা জীবজগৎকে বেঁচে থাকবার পথ বাতলে দেয়। Charles Darwin-এর বিখ্যাত আবিষ্কার বিবর্তনের ঘটনা দিয়ে এর

বরং প্রকৃতিতে বিবর্তন যে নিয়মে চলে তার কলকাঠি সম্পর্কে। দেখা গেছে প্রজনন-সঙ্কেত লিপিতে ত্রুটি কিংবা কোনরকম পরিবর্তন ঘটলে মাতা-পিতা থেকে সন্তানের মধ্যে ঐ ত্রুটি প্রকাশ পায়। আত্মঘাতী ত্রুটি কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না বলে এদের অধিকাংশই বাঁচে না। কিন্তু কিছু কিছু বেঁচে থাকবার জন্যে নির্বাচিত হয় এবং এই বেঁচে থাকবার নির্বাচন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলতে থাকে। বর্তমান যুগে আমরা যে সব প্রাণীদের দেখছি, সেগুলি সবই যা বলা হলো তার ফলস্বরূপ।

প্রকৃতি থেকে যত রকম জ্ঞানার্জন আমরা করি, তার মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য হলো রোগাক্রমণের পর জীবদেহে রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন। যেমন—কোন লোকের যখন হাম হয়, তখন প্রথম দিকে তাকে বেশ কাবু করে ফেলে, কিন্তু তার শরীর ঐ রোগের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। এর পরেও যদি সে হামের বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে; অর্থাৎ তার শরীর একবার হামের বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে হামের বীজাণু চিনতে শিখেছে, এমন কি, দেহে antibody তৈরি করে হামের বীজাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতেও জেনেছে। আরও অন্যান্য সংক্রামিত রোগের ক্ষেত্রেও দেহ প্রায় একইভাবে প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করে।

প্রকৃতি এবং মানুষের তৈরি অসংখ্য antigen নামক পদার্থের সঙ্গে antibody-র সম্পর্ক থাকায় খুব স্বাভাবিকভাবে মনে হবে যে, দেহের প্রতিরক্ষা প্রণালী অর্থাৎ কি ভাবে antibody তৈরি হবে, তা antigen-এর কাছ থেকেই শেখে। 1960 সালের মধ্যভাগে যে সব গবেষণা হয়েছে, তা এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে। এও অসম্ভব মনে হবে যে, দেহের প্রতিরক্ষা প্রণালী কিভাবে জানতে শিখলো যে, লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য antigen-এর মধ্যে মাত্র একটি antigen-এর সঙ্গে একটিমাত্র সক্রিয় antibody-র লড়াই হবে। এখন মনে হচ্ছে যে, antigen প্রচুর পরিমাণে antigen-এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এমন antibody-সমন্বিত কোষ তৈরি করে; অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিবর্তনের মতই বহু সংখ্যক antigen-এর মধ্যে কেবলমাত্র একটি antigen-এর antibody তৈরি হবার কাজটি বাছাই হয়ে থাকে।

Antigen এবং antibody-র সম্পর্ক জার্মান বৈজ্ঞানিক Niels Jerne-র মনে প্রশ্ন জাগালো—হয়তো 'বাছাই' প্রক্রিয়া মানসিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর বহু আগে Socrates মনে করতেন, মানুষের সমস্ত ভাব বা কল্পনা অনেক আগে থেকেই মস্তিষ্কে জমা হয়ে থাকে, তা না হলে ঐ সব ভাব ও কল্পনাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না। এদিক দিয়ে বিচার করলে শিক্ষা এমন একটি ব্যাপার, যা আমাদের জানা কোন কিছুকে মুহূর্তের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ছকে-বাঁধা খবর মুহূর্তের মধ্যে চালু করা

অসংখ্য সংবাদ মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষে যে ভাবে সঞ্চিত হয়ে থাকে, তা যদিও মস্তিষ্কের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেয়, কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্যজনক হলো, মুহূর্তের মধ্যে পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারা। অনেক লোক যখন একসঙ্গে বসে পরামর্শ করে কিংবা গল্প করে, তখন যথাযথ শব্দগুলি কিভাবে এমন অনায়াসে চালু হয়, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

Holography নামক ছবি তোলবার নতুন পদ্ধতি মস্তিষ্ক-গবেষকদের আশান্বিত করেছে যে, ভবিষ্যতে হয়তো এর দ্বারা স্মৃতির পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে। আজকাল অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা গেছে যে, যত সব নতুন

কারিগরি কলাকৌশল চর্চা করে মস্তিষ্কের রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়োগ করা। তাই অনেকে টেলি-ফোন, পীড়ক যন্ত্র, কম্পিউটার যন্ত্র প্রভৃতির সমাবেশ ঘটিয়ে একটি কৃত্রিম মস্তিষ্কের কল্পনা করছেন, যদিও holography-র আবিষ্কার মস্তিষ্ক-বিশারদদের স্মৃতির ধরণ-ধারণ সম্পর্কে অনেকটা আভাস দিয়েছে। Holography-তে লেন্স ব্যবহার না করেই সাধারণ আলো এবং লেসার (Laser) রশ্মি প্রয়োগ করে কোন বস্তুর ছবি তোলা হয়। ঐ ছবিগুলিতে কতকগুলি লাইন কিংবা বিন্দু ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সুতরাং সাধারণ চোখে—যে বস্তুর ছবি তোলা হলো সে সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যাবে না। ঐ ছবিটিকে বলা হয় holoram। Hologram-এর ভিতর দিয়ে আবার সাধারণ আলো এবং লেসার রশ্মি পাঠালে মূল বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ পর্দায় ফুটে ওঠে। অনেকের ধারণা মস্তিষ্ক-কোষে অনেকটা এভাবে খবর জমা হয়ে থাকে এবং কোন টুকরা খবর বাইরে থেকে নাড়া দিলে বহু সংখ্যক খবর ক্রমপর্যায়ে বেরিয়ে আসে।

1960 সালের শেষের দিকে holography-র সূত্রগুলিকে প্রায় সরাসরি কাজে লাগিয়ে স্মৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলে। এই প্রচেষ্টার পুরোভাগে ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Christopher Languet—Higgins। 1969 সালে এই বিষয়ে নতুন আরও অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। Christopher Languet—Higgins এবং তাঁর সহকর্মীদের মতে, মস্তিষ্ক একসঙ্গে যদিও অসংখ্য সংবাদের সংমিশ্রণ ধরে রাখতে পারে, কিন্তু কোন প্রবেশকারী সাংকেতিক নির্দেশ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সংবাদগুলিই বিশেষ সংমিশ্রিত অবস্থায় মুক্ত করে। মস্তিষ্কের যে অংশটি সংবাদযুক্ত হলো, ঐ অংশটি আরও অনেক রকম কাজ করতে পারে। মস্তিষ্কে যেভাবে সংবাদ প্রবেশ করে এবং নির্গত হয়, তা 1নং চিত্রের সাহায্যে আরও সহজভাবে দেখানো হলো।
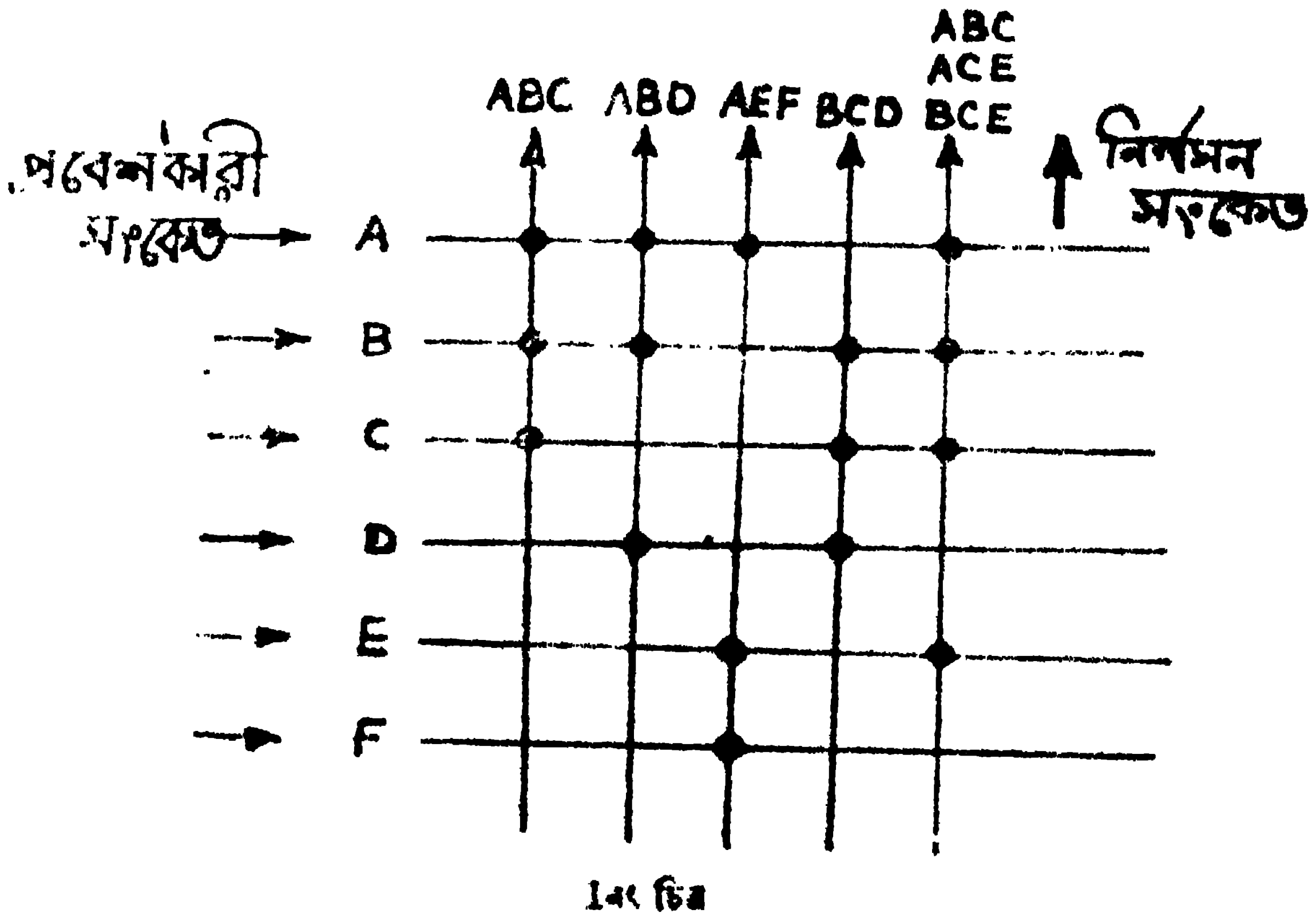
1নং চিত্র

চিত্রে সংযোজক বিন্দুগুলি দিয়ে স্মৃতিকে বোঝানো হয়েছে। প্রবেশকারী সংকেতের বিশেষ মিলন থেকে উদ্ভূত নির্গমন সংকেতকে খাড়া রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে। প্রবেশকারী সংকেতের একটি সংযোগ একের বেশী নির্গমন সংকেতের প্রকাশ ঘটাতে পারে। আবার অন্য ভাবে একই নির্গমন সংকেত বিভিন্ন প্রবেশকারী সংকেতের মিলনে তৈরি হতে পারে। এভাবে লক্ষ লক্ষ সংযোগ মস্তিষ্কে সংবাদ সংরক্ষণের অসম্ভব ক্ষমতাকে কতকটা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

মস্তিষ্কের স্মৃতি-রহস্য এখনও অজানাই রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি ক্ষেত্রে স্মৃতির কারণ ব্যাখ্যা করা গেলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা অমীমাংসিত থেকে গেছে। স্নায়ু-রসায়নবিদ্‌দের পরীক্ষা থেকে যা জানা গেছে, তা স্মৃতি আহরণ ব্যাখ্যা করতে পারলেও মুহূর্তের মধ্যে স্মৃতির প্রকাশ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এদিক থেকে আধুনিক holography-বিদ্যার প্রয়োগ অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে বলা চলে। আমাদের ধারণা, আধুনিক স্নায়ু-রসায়নের তড়িৎঘটিত নতুন কলা-কৌশল, পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োগ স্মৃতি-রহস্য উদ্ঘাটনে অনেক সাহায্য করবে।

আয়নন-তত্ত্ব এবং জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞান

বৈদ্যনাথ বসু*

আধুনিক জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞান যে কয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পেরিয়ে বর্তমানে সার্থকতার উন্নত স্তরে এসে পৌঁচেছে, নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণ (Spectral analysis) এবং বর্ণালী অনুযায়ী নক্ষত্রের শ্রেণিবিভাগ (Spectral classification of stars) তার মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রেণিবিন্যাসের সমস্যা একাধারে যেমন ছিল অত্যন্ত কঠিন, তেমনি এর আকর্ষণ ছিল প্রবল। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রায় 50 বছর যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রথম সারির বহু বিজ্ঞানী বর্ণালীর প্রকৃতি অনুযায়ী নক্ষত্রের শ্রেণিবিন্যাসকে একটি সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু বহু জল্পনা-কল্পনা এবং বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও যখন তাঁরা কিছুতেই সঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি (Scientific basis) খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন পরাধীন ভারতের এক অখ্যাত তরুণ বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহা গভীর আত্মবিশ্বাস এবং পরম নিষ্ঠাভরে সেই বৈজ্ঞানিক সূত্রটি বিশ্বের সুধী-মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। প্রথমটায় বৈজ্ঞানিক মহলে একটা বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব দেখা দিল, তারপর চমক ভাঙলে চারদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। বিশ্বের বিদ্বন্মণ্ডলী এই ভারতীয় প্রতিভাকে সাদরে বরণ করে নিলেন।

এখন দেখা যাক, নক্ষত্রের বর্ণালী বিষয়ে তদানীন্তন গবেষণা এবং তা থেকে লব্ধ জ্ঞান তখন কি অবস্থায় ছিল। নক্ষত্রের বর্ণালী পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সমগ্র বর্ণালী জুড়ে আড়াআড়িভাবে অসংখ্য কালো কালো রেখা (Line) বা রেখাগুচ্ছ (Band) সাজানো রয়েছে।

* গণিত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

নক্ষত্রদেহ থেকে যে আলোক বিকিরিত হচ্ছে, নক্ষত্রের বহিরাবরণের (Atmosphere) উপাদান অণু এবং পরমাণু কর্তৃক সেই আলোর কিছু অংশ নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বিশোষণের (Absorption) ফলে এই কালো রেখাগুলির সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি অণু বা পরমাণু তার নিজস্ব গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে রেখাসমষ্টি বা রেখা উৎপন্ন করে। কাজেই কোন বিশেষ রেখা বা রেখাসমষ্টি কোন্ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে উৎপন্ন হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, উক্ত রেখা বা রেখাসমষ্টি কোন্ পরমাণু বা অণু কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। অতএব বর্ণালীতে কোন মৌল উপাদানের রেখা বা রেখাসমষ্টির উপস্থিতি নক্ষত্রদেহে ঐ উপাদানটির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এখন যদি কোন নক্ষত্রের বর্ণালীতে কোন একটি উপাদানের খুব শক্তিশালী রেখার উপস্থিতি দেখা যায়, তাহলে সহজেই মনে হতে পারে যে, ঐ নক্ষত্রদেহে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় উক্ত উপাদানটি খুব অধিকমাত্রায় রয়েছে। অনুরূপভাবে, কোন উপাদানের খুব দুর্বলরেখার উপস্থিতি নক্ষত্রদেহে ঐ উপাদানটির অতি অল্পমাত্রায় অস্তিত্ব নির্দেশ করতে পারে। কোন নক্ষত্রের বর্ণালীতে কোন বিশেষ উপাদান-প্রসূত রেখার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি উক্ত নক্ষত্রে ঐ উপাদানটির সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতার বোধ জন্মিয়ে দিতে পারে। তৎকালীন নামী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা নক্ষত্রের বর্ণালীর এই সহজ ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তাঁরা মনে করতেন, বিভিন্ন নক্ষত্র বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। কোন নক্ষত্রে যে উপাদানটি যত অধিকমাত্রায় থাকবে, সেই নক্ষত্রের বর্ণালীতে সেই উপাদানজনিত রেখা বা রেখাসমষ্টি তত বেশী শক্তিশালী হবে। নক্ষত্রভেদে উপাদানভেদ—এই ছিল তাঁদের বিধান। এরই ঠিক পাশাপাশি অপর একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁদের মতে, নক্ষত্রের বর্ণালীর বিভিন্নতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিবর্তনের (Evolution) হেতু লাভ করে; অর্থাৎ কোন নক্ষত্র তার বিবর্তনের কোন্ স্তরে রয়েছে, তারই উপর ঐ নক্ষত্রের বর্ণালীর প্রকৃতি নির্ভরশীল। এঁদের ধারণা, একই নক্ষত্র তার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বর্ণালী উৎপন্ন করবে। অসংখ্য নক্ষত্রের বর্ণালী নক্ষত্রসমূহের বহু বিভিন্ন বিবর্তনস্তরই সূচিত করে। সাদা রঙের নক্ষত্রগুলি সব চেয়ে নবীন। তারপর বিবর্তনের স্তর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যত এগোতে থাকে, ততই নক্ষত্রগুলি সবুজ, হলদে লাল ইত্যাদি রঙে পরিবর্তিত হয় এবং তাদের বর্ণালীও সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লাতে থাকে। এভাবে পাশাপাশি দুটি বিভিন্ন মতবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ই. ডাব্লিউ. মণ্ডারের (E. W. Mannder) কথাই বলা যাক। তাঁর মতে, নক্ষত্রের বর্ণালীর শ্রেণী আর কোন বিবর্তনের স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়, এই শ্রেণী একান্তভাবেই নির্ভর করছে নক্ষত্রদেহের রাসায়নিক উপাদানের উপর। অপরপক্ষে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস্ ক্লার্ক (Miss Clerk) লিখছেন—"নক্ষত্রের শ্রেণিবিভাগ তাদের ক্রমবিবর্তনের তত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"

এসব তো গেল তত্ত্বের কথা! তত্ত্বগত গোলমাল না মিটলেও কিন্তু অনুমান অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু বিচিত্র নক্ষত্রের বর্ণালীগুলিকে অল্প কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এরূপ শ্রেণিবিভাগের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফাদার সেক্কি (Father A. Secchi)। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন—বর্ণালীর প্রকৃতি যদিও নক্ষত্রের মতই অসংখ্য, কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এদের অল্প কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা

থায়, তিনি প্রায় 4,000 নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তাদের মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ, সাদা রঙের নক্ষত্র, যাদের বর্ণালীতে পারমাণবিক হাইড্রোজেনের বিশোষণজনিত রেখাসমূহ (Absorption lines) অতি শক্তিশালী। দ্বিতীয়তঃ, হলুদে রঙের নক্ষত্র, যাদের বর্ণালীতে পারমাণবিক ধাতুর (Metal atoms) বিশোষণজনিত অসংখ্য রেখা বর্তমান। এই পারমাণবিক ধাতু তড়িৎ নিরপেক্ষ (Neutral) বা আয়নিত (Ionized) দু-ই হতে পারে। সূর্য এই শ্রেণীভুক্ত একটি নক্ষত্র। আবার সেক্কির অপর দুটি শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রেরা লাল রঙের। শক্তিশালী আণবিক রেখাসমষ্টি (Strong molecular bands) এদের বর্ণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথম শ্রেণীর বর্ণালীতে অক্সাইড অণুজনিত (TiO, ZrO) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণালীতে কার্বন অণুজনিত (C_2) রেখাসমষ্টি (Bands) প্রবল। নক্ষত্রের বর্ণালীর শ্রেণিবিভাগে সেক্কির কাজ এক নতুন পর্বের সূচনা করেছিল।

আবার সেক্কির কাজের প্রায় 20 বছর পরে 1886 সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পিকারিংয়ের (E. C. Pickering) নেতৃত্বে নক্ষত্রের বর্ণালীর শ্রেণিবিভাগের এক বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই কাজে পিকারিংয়ের সহকারীস্বরূপ ছিলেন শ্রীমতী ক্যানন (A. J. Cannon)। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরী ড্রেপারের (Henry Draper) স্মৃতি স্মরণে তাঁরা এই কাজে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের ফলস্বরূপ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হলো হেনরী ড্রেপার তালিকা (Henry Draper Catalogue)। এই তালিকায় প্রায় 400,000 নক্ষত্রের বর্ণালীর শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই বিপুল সংখ্যক নক্ষত্রের বর্ণালী একে একে পরীক্ষা করে তাদের শ্রেণী নির্দেশের কাজে হার্ভার্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার নজীর অতি বিরল। এর পর 50 বছর কেটে গেছে। এই 50 বছর ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির যুগ। কিন্তু হার্ভার্ডের এই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কর্মপ্রচেষ্টার কোন তুলনা কেউ রাখতে পারে নি। আজও পর্যন্ত প্রত্যেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে এই হেনরী ড্রেপার তালিকার উপরই নির্ভর করতে হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিপুল সংখ্যক নক্ষত্রের অসংখ্য রকমের বর্ণালীকে হার্ভার্ডের এই বিজ্ঞানীরা মাত্র অল্প কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই শ্রেণিবিভাগ যে নক্ষত্রের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল—তার আভাসও তাঁরা পেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের পূর্বোক্ত জ্ঞান জন্মেছিল দীর্ঘকাল কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই। এর পিছনে কোন ভৌত নিয়মের (Physical principle) যোগসূত্র তখনও তাঁদের অজানা ছিল। তাঁদের পরীক্ষিত নক্ষত্রনিচয়কে তাঁরা O, B, A, F, G, K এবং M—এই কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। K ও M জাতীয় নক্ষত্রের মধ্যে আবার অল্প কিছু সংখ্যক নক্ষত্রকে R, N এবং S—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। B থেকে M—এই শ্রেণীগুলির প্রত্যেকটিকে আবার সংখ্যার সাহায্যে দশটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যেমন BO, B1……B9 ইত্যাদি। O শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রের সংখ্যা খুবই কম বলে একদিকে অল্পসংখ্যক উপশ্রেণীতে (O5–O9) ভাগ করা গেছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের নির্দিষ্ট এই শ্রেণীগুলির নক্ষত্রসমূহে যথাক্রমে ক্রমহ্রাসমান তাপমাত্রা বিদ্যমান। অর্থাৎ, O শ্রেণীর নক্ষত্রের তাপমাত্রা সর্বাধিক (এবং

আমরা জানি, এই তাপমাত্রা 40,000°K বা তারও বেশী), তারপরেই অধিক তাপমাত্রা B শ্রেণীর নক্ষত্রে, ইত্যাদি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা M শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রে (2500°K – 3500°K); এদের রং লাল। R, N এবং S শ্রেণীভুক্ত-নক্ষত্রগুলিও কম তাপমাত্রার লাল রঙের নক্ষত্র। অপরপক্ষে O এবং B শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রদের রং যথাক্রমে নীলাভ এবং নীলাভ-সাদা। রঙের বিচারে সূর্য প্রায় হলুদে, এর বর্ণালীর শ্রেণী G2; অর্থাৎ, রং এবং তাপমাত্রার বিচারে আমাদের মহান সূর্য একটি অতি সাধারণ নক্ষত্র। এর দেহের তাপমাত্রা প্রায় 6,000°K.

নক্ষত্রের বর্ণালী যে তার দেহের তাপমাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, হার্ভার্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই তথ্য বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের দীর্ঘ দিনের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের বর্ণালী পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের দ্বারা। কিন্তু এরও অনেক বছর আগে এই একই তথ্য অনুধাবন করেছিলেন স্যার নরম্যান লকইয়ার (Sir Norman Lockyer), তাঁর লেবরেটরীর একটি বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা। বৈদ্যুতিক আর্ক (Arc) এবং স্পার্কের (Spark) দ্বারা উত্তেজিত বিভিন্ন মৌল উপাদানের বর্ণালী সৃষ্টি করে তিনি দেখলেন যে, স্পার্কের দ্বারা সৃষ্ট বর্ণালীতে অধিকতর উত্তেজিত উপাদানের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এই কথা সকলেরই জানা যে, আর্ক অপেক্ষা স্পার্ক অধিকতর তাপমাত্রা সৃষ্টি করে। অতএব স্যার লকইয়ারের সিদ্ধান্ত, নক্ষত্রের বর্ণালীর প্রকৃতি অবশ্যই তাদের দেহের তাপমাত্রার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যদিও নির্ভুল ছিল, কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে তিনি কোন ভৌত নিয়ম বা কোন সূত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন নি। তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। কারণ তখনও পর্যন্ত (উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে) তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum theory of electromagnetic radiation) এবং পরমাণুর গঠনতত্ত্ব (Theory of atomic structure) সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণাই গড়ে ওঠে নি।

লকইয়ারের কাজের প্রায় 30 বছর পরে 1920 সালে ডক্টর মেঘনাদ সাহা তাঁর আয়নন-তত্ত্ব (Ionization theory) আবিষ্কার করেন। ডক্টর সাহার আবিষ্কারের আগেই অবশ্য আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধাপ বিজ্ঞানীরা পেরিয়ে এসেছিলেন। প্রথমতঃ, জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck) তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন 1901 সালে। এই তত্ত্বানুযায়ী, তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি সর্বদাই এক অবিভাজ্য গুচ্ছ (Indivisible bundle) হিসাবে বিশোষিত (Absorbed) বা বিকিরিত (Emitted) হয়। এই অবিভাজ্য গুচ্ছকে প্লাঙ্ক নাম দিয়েছেন কোয়ান্টাম (Quantum)। এর দশ বছর পরে 1911 সালে লর্ড রাদারফোর্ড (Lord Rutherford) তাঁর পারমাণবিক গঠনের নিউক্লিয়াস তত্ত্ব (Nuclear theory of atoms) উপস্থাপিত করেন। এই তত্ত্বানুযায়ী পরমাণুর কেন্দ্রে এক অতি ক্ষুদ্রাংশের ভিতর তার সম্পূর্ণ ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তি নিহিত থাকে। কেন্দ্রীয় এই ক্ষুদ্রাংশ হচ্ছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের বাইরে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থিত ইলেকট্রনগুলি ঘোরাফেরা করে। রাদারফোর্ডের আবিষ্কারের মাত্র দু-বছরের মধ্যে 1913 সালে নীল বোর (Niels Bohr) তাঁর হাইড্রোজেন পরমাণুসম্বন্ধীয় তত্ত্ব (Theory of the hydrogen atom) উপস্থাপিত করে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলকে চমৎকৃত করলেন। নীল বোরের এই নতুন তত্ত্ব হচ্ছে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং রাদারফোর্ডের নিউক্লিয়াস তত্ত্বের সার্থক মিশ্রণ ও প্রয়োগের ফল। বোরের হাইড্রোজেন পরমাণুসম্বন্ধীয় তত্ত্ব

আবিষ্কারের পরেই ডক্টর মেঘনাদ সাহা এই তত্ত্বের মূল প্রকৃতি অনুধাবনের উদ্দেশ্যে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করেন এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এর সার্থকতম প্রয়োগ আবিষ্কার করেন তাঁর আয়নন-তত্ত্বের মাধ্যমে। তাঁর এই নতুন তত্ত্বকে তিনি শক্ত গাণিতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। লণ্ডনের ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে 1920 সালে ডক্টর সাহার এই নতুন তত্ত্বের উপর লেখা প্রথম দুটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়। বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন ভারতের এই নবীন প্রতিভাকে।

উপরিউক্ত গবেষণাপত্রগুলিতে ডক্টর সাহা সূর্যের বর্ণালীর প্রকৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। সূর্যের বর্ণালী পরীক্ষা করে তিনি প্রথমে দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করলেন যে, পৃথিবীতে যে সকল মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে, সৌরদেহেও সেই সবগুলিই বিদ্যমান। তিনিই সর্বপ্রথম নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করলেন যে, সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের বর্ণালীতে বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন রূপে প্রকাশের মূল কারণ হচ্ছে, সূর্য এবং ঐসব নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে (Atmosphere) বিভিন্ন মাত্রায় তাপ ও চাপের অস্তিত্ব। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ ও চাপে বিভিন্ন পরমাণু তাদের গঠনানুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণে প্রভাবিত হয়। কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান। সেই নির্দিষ্ট উত্তেজনায় যে সব অণু বা পরমাণু তাদের গঠনানুযায়ী সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত হবে, উক্ত নক্ষত্রের বর্ণালীতে সেই সব অণু বা পরমাণুর প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যাবে। ডক্টর সাহার মতে, সূর্যের আবহমণ্ডলে 7500°K তাপমাত্রাজনিত উত্তেজনা বিদ্যমান (আজকাল অবশ্য এই তাপমাত্রা প্রায় 6000°K ধরা হয়); অতএব দৃষ্ট ফ্রনহোফার (Fraunhofer) বর্ণালী ঐ উত্তেজনারই স্পষ্ট প্রকাশ। সূর্যের ক্রোমোস্ফিয়ারের (Chromosphere) বর্ণালী ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ডক্টর সাহা একথাও সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে বিদ্যমান বায়বীয় চাপের উপর পরমাণুসমূহের উত্তেজনা (Excitation) ও আয়নন (Ionization) বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রায় কম চাপে বেশী আয়নন এবং বেশী চাপে কম আয়নন হবে। পরমাণুর উত্তেজনা ও আয়ননের উপর চাপের এই বিশেষ প্রভাব আগে বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। এই প্রভাব কিভাবে এবং কি পরিমাণে কাজ করে, ডক্টর সাহা তা গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে দেখিয়ে দিলেন। তাঁর আয়নন-সূত্রে তাপমাত্রার মত ইলেকট্রনজনিত চাপও একটি চলরাশি (Parameter) হিসাবে বিদ্যমান।

ডক্টর সাহার পরবর্তী গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয় 1921 সালের রয়াল সোসাইটির জার্নালে (Proceedings of the Royal Society)। বর্ণালী অনুযায়ী নক্ষত্রের শ্রেণিবিভাগকে তাঁর আয়নন-তত্ত্বানুযায়ী কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এই পত্রে তিনি সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, কোন নক্ষত্রের বর্ণালীতে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন বা অন্য কোন পরমাণুসমূহের তীব্র রেখা দেখে আমরা এ সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, ঐ নক্ষত্রে ঐ বিশেষ উপাদানটির সুস্পষ্ট আধিক্য রয়েছে। বরং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত এই হবে যে, ঐ নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে যে উত্তেজনার উৎস রয়েছে, তা ঐ বিশেষ উপাদানের পরমাণুগুলিকে উত্তেজিত করবার পক্ষে বিশেষরূপে সহায়ক, যার ফলে নক্ষত্রের বর্ণালীতে ঐ উপাদানজনিত রেখার প্রভাব খুব বেশীরকমে দেখা দেয়। অতএব আমরা দেখতে পাই যে, নক্ষত্রের বর্ণালী অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগের পিছনে যে যৌক্তিক নিয়ম প্রচ্ছন্ন ছিল, যা আবিষ্কার করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা

দীর্ঘ 50 বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, এবং হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা তাঁদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার দ্বারা যার আভাসমাত্র পেয়েছিলেন, ডক্টর সাহা সেই জটিল বিষয়টি আবিষ্কার করেন এবং গাণিতিক ভিত্তির উপরে তা সূত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা আয়নন-সূত্রের রহস্য, ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় ভূমিকাকে আরও ভালভাবে প্রকাশ করতে পারি। বর্ণালী পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কম উত্তপ্ত লাল এবং গাঢ় হলুদে বর্ণের নক্ষত্রের বর্ণালীতে হাইড্রোকার্বন (CH), সায়ানোজেন (CN), টাইটেনিয়াম-অক্সাইড (TiO), জিরকোনিয়াম-অক্সাইড (ZrO), কার্বন (C_2) ইত্যাদি অণুজনিত রেখা-(Molecular bands) বিদ্যমান, কিন্তু অধিকতর উত্তপ্ত নক্ষত্রের বর্ণালীতে আর কোনরকম অণুজনিত রেখাসমষ্টির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। নতুন সূত্রানুযায়ী এই ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এই যে, কম উত্তপ্ত নক্ষত্রে উত্তেজনার উৎস দুর্বল হওয়ায় অণুগুলি তাদের নিজস্ব গঠন নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, অতএব বর্ণালীতে তাদের স্বাভাবিক রেখাসমষ্টি প্রতিভাত হয়। অধিকতর উত্তপ্ত নক্ষত্রে উত্তেজনার উৎস প্রবলতর হওয়ায় অণুগুলি তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, ভেঙেচুরে পরমাণুতে পর্যবসিত হয়। কাজেই ঐ সকল নক্ষত্রের বর্ণালীতে অণুজনিত রেখাসমষ্টির অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

আবার, ধাতব পরমাণুগুলির (Metal atoms) কথাই ধরা যাক। এদের আয়নন-বিভব (Ionization potential) সাধারণতঃ খুব কম। অপেক্ষাকৃত অল্প তাপেই এরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ কারণে কম উত্তপ্ত লালনক্ষত্রের বর্ণালীতে ধাতব পরমাণুর উত্তেজনাজনিত অসংখ্য শক্তিশালী রেখা ছড়িয়ে থাকে। এখন যদি আমরা ক্রমেই অধিকতর তাপমাত্রার নক্ষত্রের দিকে এগোই, তবে দেখব এসব নক্ষত্রের বর্ণালীতে ধাতব পরমাণুর রেখাসমূহ ক্রমেই দুর্বল এবং ধাতব আয়নের রেখাসমূহ ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকবে। কারণ, অধিকতর তাপমাত্রায় ধাতব পরমাণুরা বেশীর ভাগই আয়নিত হয়ে যায়, অতএব তড়িৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুজনিত রেখা দুর্বল হয়ে যায় এবং আয়নপ্রসূত রেখাগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্যালসিয়াম্ পরমাণুর সাহায্যে এই বিষয়ের চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বর্ণালী পরীক্ষায় দেখা যায় যে, সবচেয়ে কম উত্তপ্ত M শ্রেণীভুক্ত লাল রঙের নক্ষত্রের বর্ণালীতে তড়িৎ-নিরপেক্ষ ক্যাল্সিয়াম পরমাণুজনিত 4227 Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রেখাটি অতি শক্তিশালী। কিঞ্চিদধিক উত্তপ্ত K শ্রেণীর নক্ষত্রের বর্ণালীতে এই রেখাটি দুর্বলতর দেখায়। অপরপক্ষে, ক্যালসিয়াম আয়নিত হতে থাকায় আয়নিত ক্যালসিয়ামের 3968 Å এবং 3933 Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (এদের H এবং K রেখা বলে) যুগ্মরেখা (Doublet) দেখা যেতে থাকে। আরও অধিক উত্তপ্ত G শ্রেণীর নক্ষত্রের বর্ণালীতে এই যুগ্মরেখা প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কারণ এখানে ক্যালসিয়াম প্রায় সবই আয়নিত হয়ে গেছে। অধিকতর উত্তপ্ত F এবং A শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রের বর্ণালীতে H এবং K রেখাদ্বয় আবার দুর্বল হতে থাকে। কারণ ঐ নক্ষত্রদের তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম পরমাণুরা দু-বার আয়নিত হয়ে যায়। অতএব একবার আয়নিত ক্যালসিয়ামের H এবং K রেখাদ্বয় তাদের পূর্বের শক্তি বজায় রাখতে পারে না। [দু-বার আয়নিত ক্যালসিয়ামের রেখা বর্ণালীর দৃশ্যসীমার (Optical range) মধ্যে পড়ে না বলে সেগুলি দেখা যায় না] অন্য যে কোন ধাতব পরমাণুর বেলায় এই একই নিয়ম খাটে। 1নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হাইড্রোজেন পরমাণুর বামার সিরিজের

রেখাগুলির (Balmer series of hydrogen lines) তারতম্য আরও চমৎকার দৃষ্টান্ত দেয়। উক্ত পরমাণু উত্তেজনার দ্বিতীয় স্তর থেকে ওঠে এবং সেখান থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তেজিত হয়ে বামার রেখা উৎপন্ন করে। এমতে G, F এবং A শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রের বর্ণালীতে বামার
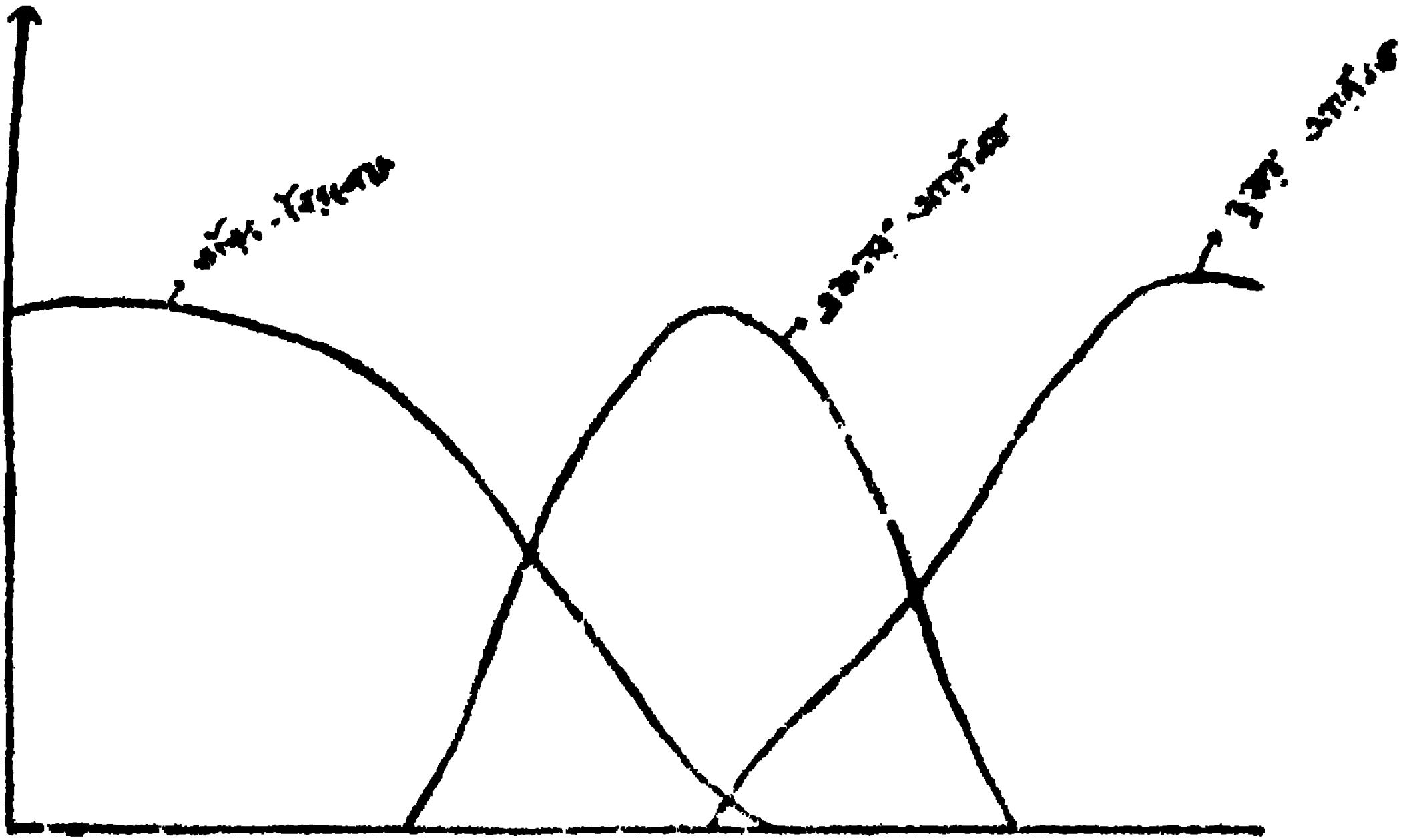
1নং চিত্র : নক্ষত্রের তাপমাত্রার উপর বিভিন্ন স্তরের আয়নপ্রসূত রেখার শক্তির নির্ভরশীলতা দেখানো হয়েছে।

আরও উচ্চতর কোন স্তরে উত্তেজিত হয়ে উঠলে এই বামার রেখার সৃষ্টি হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বিতীয় স্তরে উত্তেজিত হয়ে ওঠবার জন্যেই উত্তেজনার উৎস যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া দরকার; অর্থাৎ যথেষ্ট বেশী তাপমাত্রার দরকার। কম উত্তপ্ত লাল ও হলুদে রঙের নক্ষত্রে (M ও K শ্রেণীভুক্ত) এরূপ শক্তিশালী উৎসের অস্তিত্ব না থাকায় এই সকল নক্ষত্রের বর্ণালীতে হাইড্রোজেন পরমাণুর বামার রেখা অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য যেটুকুও দেখা যায়, তাও অন্য সব উপাদানের তুলনায় হাইড্রোজেনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী থাকায় (ওজন হিসাবে প্রায় 75%)। অধিকতর উত্তপ্ত নক্ষত্রে উত্তেজনার উৎস প্রবলতর হওয়ায় অধিক সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বিতীয় স্তরে উত্তেজিত হয়ে রেখাসমূহ ক্রমবর্ধমান শক্তিতে দেখা দেয়। A নক্ষত্রের আবহমণ্ডলের পরিবেশ শক্তিশালী বামার রেখা উৎপাদনের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। অতএব স্বাভাবিক নিয়মেই A নক্ষত্রের বর্ণালীতে বামার রেখাসমূহ প্রবল শক্তিতে দেখা দেয়। আরও অধিক উত্তাপে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি আয়নিত হতে থাকে। অতএব তখন বামার রেখাগুলির শক্তি হ্রাস পাওয়া উচিত। বাস্তবে আমরা ঠিক তাই দেখতে পাই। অধিকতর উত্তপ্ত B এবং O শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রের বর্ণালীতে বামার রেখাসমূহ ক্রমহ্রাসমান শক্তিতে আবির্ভূত হয়। নক্ষত্রের শ্রেণীর উপর বামার রেখার শক্তির নির্ভরতা 2নং চিত্রের সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে।

সর্বশেষ উদাহরণরূপে আমরা হিলিয়াম

পরমাণুজনিত রেখার কথাই আলোচনা করব। হিলিয়াম পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি এমন যে, তাকে উচ্চতর স্তরে উত্তেজিত বা আয়নিত করবার জন্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী উৎসের প্রয়োজন। একমাত্র B এবং O শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রেই এরূপ শক্তিশালী উৎস বিদ্যমান। বাস্তবেও আমরা দেখি যে, তড়িৎ-নিরপেক্ষ হিলিয়াম পরমাণু-প্রসূত রেখা কেবলমাত্র B এবং O শ্রেণীর নক্ষত্রের বর্ণালীতেই বিদ্যমান। হিলিয়ামের আয়নের জন্যে আবার আরও শক্তির প্রয়োজন। অতএব আয়নিত হিলিয়ামের রেখা কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা উষ্ণ O নক্ষত্রের বর্ণালীতেই বিদ্যমান।

উপরিউক্ত আলোচনায় নক্ষত্রের বর্ণালীর উপর তাপমাত্রার প্রভাবের একটা সুষ্ঠু যৌক্তিক নিয়ম রয়েছে বোঝা গেল। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, ইলেকট্রনজনিত চাপও আয়নন-হারের একটা চলরাশি; অর্থাৎ এই চাপের প্রভাবও বর্ণালীর উপর বর্তাবে। কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় চাপ বেশী হলে আয়নন কম হবে, আবার চাপ কম হলে আয়নন বেশী হবে। শুধু তাই না, চাপের আর একটি কাজ হলো বর্ণালীর রেখাগুলিকে প্রশস্ত করা। নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে গ্যাসের ঘনত্ব খুব কম হলে বর্ণালীর রেখাগুলি হবে সরু এবং তীব্র (Narrow and sharp)। অপরপক্ষে, গ্যাসের ঘনত্ব বেশী হলে বর্ণালীর রেখাগুলি হবে খুব প্রশস্ত (Broad)। অতএব কোন নক্ষত্রের বর্ণালীর রেখা বিশ্লেষণ করে তার আবহমণ্ডলে গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই বিষয়টির গুরুত্ব অতি অধিক। কারণ, নক্ষত্রের ক্রমবিবর্তনের তত্ত্বানুযায়ী বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে নক্ষত্রের ঘনত্ব বদলাতে থাকে। অতএব বর্ণালীর রেখার সাহায্যে ঘনত্ব নিরূপণ করা গেলে নক্ষত্রটি বিবর্তনের কোন্ স্তরে আছে—তাও নির্ণয় করা সম্ভব। দুটি চরম উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।
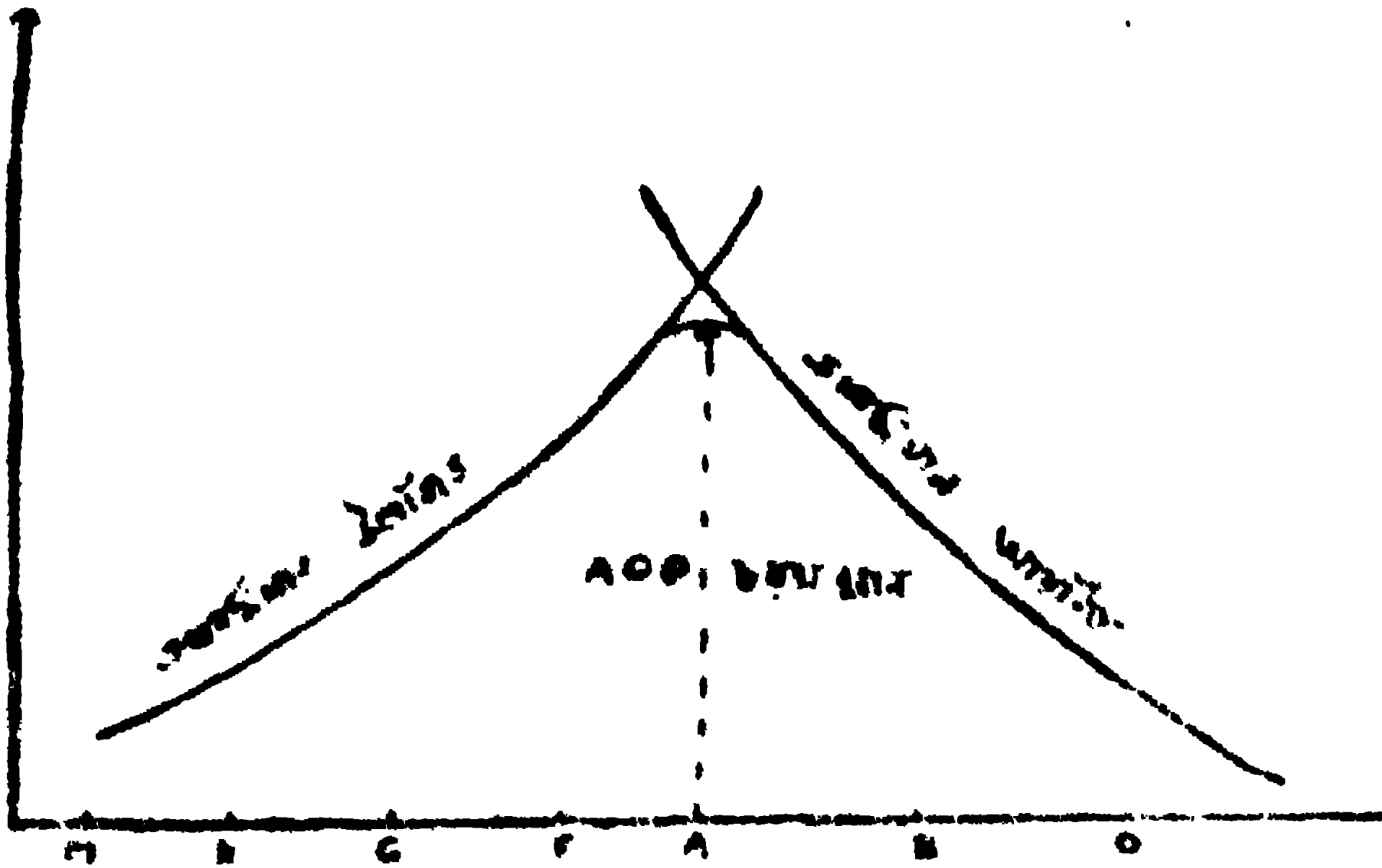
2নং চিত্র: নক্ষত্রের বর্ণালীর শ্রেণীর উপর হাইড্রোজেন পরমাণুপ্রসূত বামার রেখাসমূহের শক্তির নির্ভরশীলতা দেখানো হয়েছে।

প্রথমতঃ, লাল দানব (Red giants) এবং লাল মহাদানবদের (Red supergiants) কথাই ধরা যাক। বিবর্তনের বিশেষ বিশেষ স্তরে কোন নক্ষত্র লাল দানব বা লাল মহাদানবে

রূপান্তরিত হয়। তখন নক্ষত্রটির তাপমাত্রা কমে, কিন্তু আয়তন এবং চরম ঔজ্জ্বল্য দু-ই শত শত গুণ বেড়ে যায়। সেই বিশেষ স্তরে পৌঁছলে কোন নক্ষত্র লাল দানব হবে কি লাল মহাদানব হবে, তা নির্ভর করবে নক্ষত্রটির ভরের উপর। অধিক ভরবিশিষ্ট নক্ষত্রগুলি হয় মহাদানব। সূর্যের মত ভরবিশিষ্ট কোন নক্ষত্র বিবর্তনের ঐ স্তরে লাল দানবে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু সূর্য অপেক্ষা 5 গুণ বা তারও বেশী ভরবিশিষ্ট নক্ষত্র রূপান্তরিত হবে লাল মহাদানবে। এদের চরম ঔজ্জ্বল্য (Intrinsic luminosity) দানবদের তুলনায় প্রায় 100 গুণ বেশী হয়ে থাকে। সূর্যের তুলনায় মহাদানবদের চরম ঔজ্জ্বল্য সাধারণভাবে প্রায় 10,000 থেকে 10,0000 গুণ বেশী। এই দানব বা মহাদানব অবস্থায় নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যই শুধু বাড়ে না, নক্ষত্রটির আয়তনও বিপুলভাবে বেড়ে যায়। নক্ষত্রটির ব্যাস তার স্বাভাবিক অবস্থার ব্যাস অপেক্ষা 100 গুণ আরও বেশী বেড়ে যায়। ফলতঃ, বস্তুর গড়-ঘনত্ব কমে হয় প্রায় 10^6 ভাগের এক ভাগ। আবহমণ্ডল অত্যন্ত পাত্‌লা হয়ে যায়। এই পাত্‌লা আবহমণ্ডলে যে বিশোষণজনিত রেখা উৎপন্ন হয়, তা হয় সরু এবং তীব্র। কাজেই কোন নক্ষত্রের বর্ণালীতে ঐরকম রেখা দেখলে বুঝতে হবে যে, নক্ষত্রটি একটি দানব বা মহাদানব; এবং রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে নক্ষত্রটির চরম ঔজ্জ্বল্যও নির্ণয় করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের সূর্য আরও প্রায় 3 থেকে 4 বিলিয়ন (1 বিলিয়ন $= 10^9$) বছর পরে একটি লালদানবে রূপান্তরিত হবে। তখন সূর্যের সীমানা থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বর্তমান দূরত্বের প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে। অপরপক্ষে, সৌরদেহের তাপমাত্রাও কমে গিয়ে হবে প্রায় 4,000°K (বর্তমান তাপমাত্রা 6,000°K)। কাজেই এই টানাপোড়েনের ফলে পার্থিব জীবনের উপর তৎকালীন সূর্যের প্রভাব খুব মারাত্মক নাও হতে পারে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান চালাবার সুযোগ রয়েছে।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে শ্বেতবামন (White dwarf) শ্রেণীর নক্ষত্র। বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে নক্ষত্র যখন সবরকম শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন তার আর কোন জীবনীশক্তি থাকে না। এই মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রদেরই নাম দেওয়া হয়েছে শ্বেতবামন। সার্থক নাম! কারণ, তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশী বলে এদের রং সাদা (বর্ণালীর শ্রেণী A ও F) এবং বিবর্তনের শেষ অংশগুলিতে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকায় আয়তনে এরা হয় অতি ক্ষুদ্র। এদের ভর প্রায় সূর্যের ভরের সমান। কিন্তু আয়তনে এরা মাত্র পৃথিবীর সমান। ফলতঃ, এদের দেহে বস্তুর গড়-ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় এক মেট্রিক টন। এই অতি ঘনত্বের ফলস্বরূপ এদের বর্ণালীর রেখাগুলিও আশ্চর্য রকমের প্রশস্ত। অতি শক্তিশালী চওড়া চওড়া হাইড্রোজেন পরমাণুর শোষণ রেখাসমন্বিত বর্ণালী দেখে এই শ্বেতবামনদের চেনা যায়। লাল দানব ও মহাদানবদের চরম ঔজ্জ্বল্য যেমন সূর্যের তুলনায় কয়েক-শ' থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশী, শ্বেতবামনদের চরম ঔজ্জ্বল্য তেমনই সূর্য অপেক্ষা কয়েক-শ' থেকে কয়েক হাজার গুণ কম। পূর্বোক্ত নক্ষত্রদের বর্ণালীর রেখাগুলি সরু এবং তীব্র; অপরপক্ষে, শেষোক্তদের বর্ণালীর রেখাগুলি অত্যন্ত চওড়া এবং শক্তিশালী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ডক্টর সাহার আয়নন-তত্ত্বের বিরাট অবদানের খানিকটা আভাস আমরা পেতে পারি। বর্ণালীর শ্রেণিবিভাগ এবং তাঁর নিয়মানুযায়ী বর্ণালীর ব্যাখ্যা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টি বিভিন্ন দিকে ডাল-পালা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে আয়নন-তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগের ফলস্বরূপ। কোন নক্ষত্রের একটিমাত্র

ভাল বর্ণালী পেলেই এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন, নক্ষত্রটি বিবর্তনের কোন্ স্তরে রয়েছে, নক্ষত্রের কেন্দ্রে কোন্ জাতীয় নিউক্লিয়াসের রূপান্তর ঘটছে, তার আয়তন এবং বস্তুঘনত্ব কত, দেহের তাপমাত্রা এবং চরম ঔজ্জ্বল্যই বা কত, ইত্যাদি। এই শেষোক্ত বিষয়টি আবার নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের সহায়ক বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। কোন নক্ষত্রের বর্ণালী পরীক্ষা করে তার চরম ঔজ্জ্বল্য নির্ণয় করা যায়—আমরা আগেই দেখেছি। আবার টেলিস্কোপের সাহায্যে নক্ষত্রটির ফটোগ্রাফ নিয়ে তার আপাতঃ ঔজ্জ্বল্য (Apparent luminosity) অতি সহজেই ঠিক করা যায়। এই দুটি রাশি—চরম এবং আপাতঃ ঔজ্জ্বল্য নক্ষত্রের দূরত্বের সঙ্গে অতি সহজ সম্বন্ধে আবদ্ধ। অতএব কোন নক্ষত্রের একটিমাত্র ভাল বর্ণালী পেলেই পৃথিবী থেকে ঐ নক্ষত্রটির দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব—জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার ডক্টর সাহার আয়নন-তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগেরই প্রত্যক্ষ ফল। আয়নন-তত্ত্বের আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পুরোধা ডক্টর রাসেল (H. N. Russell) বলেছিলেন—"আয়নন-তত্ত্বের মূল ভাবনা নিশ্চয় গোটা জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই প্রভাবিত করবে। নক্ষত্রের বর্ণালীর শ্রেণিবিভাগের পিছনে মূল ভৌত নিয়মটি আবিষ্কার করে ডক্টর সাহা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন—যার সম্ভাবনা অসীম। এই তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগের জন্যে চাই দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যার দ্বারা পরমাণু এবং নক্ষত্রের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে......"ইত্যাদি। ডক্টর রাসেলের সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। আয়নন-তত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে আজ এমন এক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা বর্তমান বিজ্ঞান-জগতে অতীব গৌরবজনক।

-পত্র

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

মহাশয়,

আজ 25 বৎসর যাবৎ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার যে দান, তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। আমাদের দেশে যেখানে বিজ্ঞানের প্রসার প্রয়োজনের তুলনায় খুব একটা বেশী নয়, সেখানে আঞ্চলিক ভাষায় এরূপ একটি বিজ্ঞান পত্রিকার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা খুবই শক্ত। এক্ষেত্রে পত্রিকাটির পরিচালকমণ্ডলীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা বাংলা ভাষায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য অগ্রগণ্য বিজ্ঞান পত্রিকা, যা বিজ্ঞানে উৎসুক পাঠকদের পিপাসা মেটাতে সাহায্য করছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান—এই দাবি অনেক দিনের। আজকে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রসার বাড়বার পরেও অনেকেই বিশ্বাস করেন না যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রসার সম্ভব। অবশ্য এর পিছনে কারণও রয়েছে। যা হোক, আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এঁদের মতের পরিবর্তন ঘটবে।

কিন্তু বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অভাব যেটা আজকে অনেকেই অনুভব করছেন, যা আপনাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নি, তা হলো

বাংলাতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। এই বিষয়ে আজ পর্যন্ত উদ্যোগ অত্যন্ত নগণ্য। সেই 1950 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছিলেন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। তার পরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু-একটি পরিভাষার বই প্রকাশিত হয়েছে এবং কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকা যেমন 'গবেষণা' এবং 'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা' এই বিষয়ে কিছুটা উদ্যোগী হয়েছে। আমি যতদূর জানি, এই বিষয়ে সরকারী উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য নয়। এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের যে বাধা ছিল, তা আজ অপসারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজ কোনও দিনই সম্ভব নয়। তাই আজ প্রয়োজন পশ্চিম বাংলা সরকার, বাংলাদেশ সরকার, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং আরও কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকার যৌথ উদ্যোগ। এই বিষয়ে আপনাদের প্রস্তাব ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান', জুলাই, 1972) খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই বিষয়ে অযথা দেরী না করে শীঘ্রই কাজ শুরু করা উচিত। এক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা বিরাট। তাই আপনারা যদি শুধু প্রস্তাব দিয়েই ক্ষান্ত না থেকে এই বিষয়ে কাজ শুরু করেন, তা হলে তা সত্যই অত্যন্ত উপকারী হবে। তাই আশা করি এই বিষয়ে আপনাদের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করবেন।

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় এবং মূল্যবান। কিন্তু একটা বিষয়ে আপনাদের সতর্ক থাকা উচিত, যাতে প্রবন্ধগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতে গিয়ে তা বৈজ্ঞানিক তথ্যহীন না হয়ে পড়ে। তাছাড়া সমস্ত প্রবন্ধই যে সর্বত্র জনসাধারণের নিকট বোধগম্য হতে হবে, তা তো ঠিক নয়। সেই জন্যেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ভাল উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকলে ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা, বিদেশের অগ্রণী বিজ্ঞান পত্রিকার মূল্যবান প্রবন্ধ অনুবাদের ব্যবস্থা করে আপনারা যদি প্রকাশ করতে পারেন, তা হলে খুবই ভাল হয়। কারণ, বিদেশের পত্র-পত্রিকা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না বললেই হয়। এর ফলে অনেক বিজ্ঞান-পিপাসু পাঠকই উপকৃত হবেন।

তাছাড়া, আপনারা যদি মাঝে মাঝে, মাসে অন্ততঃ একবার 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান'-এর উপর আলোচনার ব্যবস্থা করেন, তা হলে অত্যন্ত ভাল হয়।

আরেকটা কথা, আপনারা যদি বাংলাদেশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের বিজ্ঞান পত্রিকা আনবার ব্যবস্থা করেন, তা হলে আমাদের পক্ষে বাংলাদেশের বিজ্ঞান-চর্চা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজ হয়।

ধন্যবাদান্তে

শ্রীদিলীপকুমার বক্সী

19, রামেশ্বর মালিয়া লেন, হাওড়া

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ — 1973

ষড়্‌বিংশতিতম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

ইংল্যাণ্ডের পশ্চিমে গুনহিলে স্থাপিত পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-তরঙ্গ সংগ্রাহক যন্ত্র। এর সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে একই সময়ে সংবাদ সংগৃহীত হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বয়স

এই পৃথিবী শব্দটা আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত, আমাদের একান্ত প্রিয়। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এই পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি, জেনেছি এবং উপলব্ধি করেছি। কিন্তু তবুও এখনও অনেক কিছুই জানার বাকী রয়ে গেছে—বিজ্ঞানীদের সন্ধান-পিপাসু, জ্ঞান-পিপাসু মন আজও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—এই পৃথিবীকে আরও ভাল করে চেনবার জন্যে, জানবার জন্যে, বোঝাবার জন্যে। পৃথিবীর বয়স এমনই এক অজানা বিষয়।

আমাদের পৃথিবীর বয়স কত?—এই প্রশ্নের এখনও পর্যন্ত কোনও সঠিক উত্তর না পেলেও মোটামুটি বয়স বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পন্থায় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন বয়স নির্ধারণ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে সে নিয়ে কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করব।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডারউইন এই সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা সুরু করেন এবং পৃথিবীর বয়স নির্ণায়ক বহু তথ্যের সন্ধান পান। বিভিন্ন তথ্য, যেমন—'পৃথিবী থেকে চন্দ্রের বিচ্ছিন্ন হবার ধারণা'কে কাজে লাগিয়ে তিনি পৃথিবীর বয়স 5 কোটি 70 লক্ষ বছর নির্ণয় করেন। এ ছাড়া, পৃথিবীর শীতলীকরণের ইতিহাসকে কেন্দ্র করেও পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কেল্‌ভিন সচেষ্ট হন এবং মোটামুটি তিনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমাদের পৃথিবীর বয়স 2 থেকে 4 কোটি বছর হবে। 2 থেকে 4 কোটি বছরের মধ্যে তফাৎটা নেহাৎ কম নয়। এইভাবে পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে থাকতে বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট নন। তাই আরও বিভিন্ন তথ্যের অনুসন্ধান ও গবেষণা চলছে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে পাললিক স্তর (Sedimentary strata) বর্তমানে কত পুরু হয়েছে, তার উপর নির্ভর করেও পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে নানান প্রাকৃতিক কারণে পাললিক স্তর বিভিন্ন রকম পুরু হওয়ায় এবং ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর উৎপত্তির সময় থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পৃথিবীপৃষ্ঠে পলি সঞ্চয়ের গতি বিভিন্ন হওয়ায় এই পলিস্তরের পুরুত্বের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছেন। ঠিক একই কারণে, 'জৈব পদার্থের বিবর্তনের ইতিহাসকে'ও পৃথিবীর বয়স নিরূপণের কাজে লাগানো এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জলি এবং ক্লার্ক সমুদ্রের জলে সোডিয়াম ধাতুর সন্ধান পান। স্বভাবতঃই তাঁরা এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা চালিয়ে যান এবং সমুদ্রের জলে সোডিয়াম সঞ্চয়ের গতির উপর নির্ভর করে পৃথিবীর বয়স আন্দাজ করতে সক্ষম হন।

তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, পৃথিবী প্রায় 10 কোটি বছর আগে জন্মেছে। পৃথিবীর জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমুদ্রের জলে সোডিয়াম সঞ্চারের গতি এক না থাকায় পৃথিবীর নির্ভুল বয়স এই তথ্যের সাহায্যে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কাজেই পৃথিবীর বয়স অন্ততঃপক্ষে 10 কোটি বছর—এই সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানে সমুদ্রের জলে সোডিয়াম সঞ্চারের গতি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে।

এর পরে বিজ্ঞানী হেল্‌মহোলৎজ্‌ অনেক দিনের গবেষণার পর পৃথিবীর বয়স নিরূপণের একটা সূত্রের সন্ধান পান—সূর্যের 'তাপ গণনা'কে কাজে লাগিয়ে তিনি পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করেন। তিনি মনে করেন অন্ততঃ 2 কোটি 20 লক্ষ বছর আগেই পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে।

কালক্রমে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার (Radioactivity) আবিষ্কার ও প্রয়োগ পৃথিবীর বয়স নিরূপণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যেমন, থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম-এর (যা শেষ পর্যন্ত সীসায় পরিণত হয়) স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্লেষণের গতির উপর নির্ভর করে পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধীয় বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্যের অবতারণা সম্ভব হয়েছে। পদার্থের এই তেজস্ক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়স যে 200 কোটি বছরের কম হতে পারে না—সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আধুনিক যুগে পৃথিবীর বয়স নিরূপণের এই পথ খুবই সহজ, সরল এবং সংক্ষেপও। কারণ এই তত্ত্বে ন্যূনতম অনুমানের (Assumptions) সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম-এর স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্লেষণ সমগতিতে সম্পন্ন হয়। তাই এই তত্ত্বে পৃথিবীর বয়সের নির্ভুলতার হার আগের তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশী।

পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ 2,00 কোটি বছর—এর নির্ভুলতা যাচাই করা প্রয়োজন। এই নির্ভুলতা যাচাই করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা এমন কতকগুলি খনিজ পদার্থের সাহায্য নিয়েছেন, যা খুব কমই পরিবর্তনশীল এবং যাতে নির্ধারণযোগ্য ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ও সীসা বর্তমান। ফলে পৃথিবীর বয়স গণনার গাণিতিক ত্রুটির পরিমাণ কম হবে।

পৃথিবীর প্রায় সর্বস্থান থেকেই পরীক্ষার উপযুক্ত বিভিন্ন প্রস্তরখণ্ড বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করে অতি যত্নসহকারে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পৃথিবীর বয়স অন্ততঃপক্ষে 2,00 কোটি বছরের কম হবে না। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে আরও কিছু কিছু ভূ-রাসায়নিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বহুল উন্নতির ফলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, পৃথিবীর জন্মলগ্ন আজ থেকে প্রায় 450 কোটি বছর আগে। পৃথিবীর বয়স আরও নির্ভুলভাবে জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা আজও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসু

পারদর্শিতার পরীক্ষা

গাণিতিক সমস্যার সমাধানে তোমাদের কার কেমন পারদর্শিতা, তা বোঝবার জন্যে নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো।

1. 16 সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও 9 সেন্টিমিটার প্রশস্ত একটি আয়তক্ষেত্রকে এমন দু-ভাগে ভাগ কর, যাতে সেই দুটি ভাগ দিয়ে একটি 12 সেন্টিমিটার বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র তৈরি করা যায়।

2. ধরা যাক, তুমি একটি করে 1 পয়সা, 2 পয়সা, 3 পয়সা, 5 পয়সা, 10 পয়সা, 20 পয়সা, 25 পয়সা এবং 50 পয়সা মূল্যের মুদ্রা নিয়ে দোকানে গিয়েছ।

(ক) দোকানদার একটা খাতার দাম চাইল 88 পয়সা। তে মার মুদ্রাগুলি দিয়ে খাতার দাম কতভাবে দিতে পারবে?

(খ) খাতার দাম 46 পয়সা চাইলে তুমি কত ভাবে দাম দিতে পারবে?

3. নীচে দুটি অসীম শ্রেণী দেওয়া হলো। প্রত্যেক শ্রেণীর সমষ্টি কত হবে?

(ক) $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\cdots\cdots$

(খ) $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\cdots\cdots$

(উত্তরের জন্যে 187নং পৃষ্ঠা দেখ)

প্রজানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

আইসোটোপ

আইসোটোপ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পেতে হলে পদার্থের পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। মৌলের পরমাণু সাধারণতঃ ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণার দ্বারা গঠিত। মূলতঃ পরমাণুর কেন্দ্রীনে (Nucleus) নিউট্রন ও প্রোটন থাকে। কোন মৌলের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সর্বদা একই থাকে। প্রোটন সংখ্যায় বিভিন্নতা দেখা দিলে পরমাণু তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে। মৌলের এক পরমাণুর মধ্যে যতগুলি প্রোটন থাকে, তাকে সেই পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number) বলে। কিন্তু কোন মৌলের পরমাণুতে নিউট্রন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে,

পরমাণুর ওজন বিভিন্ন হয়, কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে। এই সকল পরমাণুকে উক্ত মৌলের আইসোটোপ বলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের নিউট্রন সংখ্যার বিভিন্নতার জন্যেই আইসোটোপের উৎপত্তি হয়। পারমাণবিক ওজন (Atomic weight) বিভিন্ন হলেও, এগুলি একই মৌল এবং পর্যায়সারণীতে (পিরিয়ডিক টেব্‌ল্) একই ঘরে অবস্থান করে।

সুতরাং আইসোটোপের সাধারণ সংজ্ঞা হিসাবে বলতে পারি যে, আইসোটোপ হচ্ছে সেই সব শ্রেণীর মৌল, যাদের ভর-সংখ্যা (Mass number) একই, যারা পর্যায়সারণীতে একই ঘরে অবস্থান করে, কিন্তু পারমাণবিক ওজনে বিভিন্ন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেনের আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন 1, 2 কিংবা 3 হতে পারে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই হাইড্রোজেনের (H) ভর-সংখ্যা 1 হবেই। এদের চিহ্নিত করা হয়, এই ভাবে—$_1H^1$, $_1H^2$, $_1H^3$

[নিম্নের এক নির্দেশ করে H-এর স্থির ভর-সংখ্যাকে, উপরের এক, দুই বা তিন নির্দেশ করে H-এর আইসোটোপের বিভিন্ন পারমাণবিক ওজনকে]

সেরূপ Mg (ম্যাগনেসিয়ামের) আইসোটোপ—$_{12}Mg^{24}$, $_{12}Mg^{25}$, $_{12}Mg^{26}$

সেরূপ O_2 (অক্সিজেনের)—$_8O^{15}$. $_8O^{16}$, $_8O^{17}$, $_8O^{18}$, $_8O^{19}$

সেরূপ Al (অ্যালুমিনিয়ামের)—$_{13}Al^{26}$, $_{13}Al^{27}$, $_{13}Al^{28}$, $_{13}Al^{29}$

সেরূপ C (কার্বনের)—$_6C^{10}$, $_6C^{11}$, $_6C^{12}$, $_6C^{13}$, $_6C^{14}$

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি মৌলের নির্দিষ্ট পারমাণবিক ওজনের আইসোটোপের সঙ্গে অন্য বিভিন্ন মৌলের আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন সমান হয়, কিন্তু রাসায়নিক ধর্মে ভিন্ন হয়। তখন তাদের আইসোবার (Isobar) বলে। অর্থাৎ 'A' মৌলের আইসোটোপ α যদি 'B' মৌলের আইসোটোপ β-র সঙ্গে পারমাণবিক ওজনে সমান হয়—তখন α-কে β-র কিংবা β-কে α-র আইসোবার বলা হয়।

তেজস্ক্রিয়তার (Radioactivity) দিক থেকে দেখলে

আইসোটোপ তিন প্রকার, যথা :—

(I) নন-রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ—$_8O^{17}$, $_8O^{18}$, $_{17}Cl^{35}$, $_{17}Cl^{37}$

(II) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ—Pb^{204}, Pb^{206}, Pb^{207}, Pb^{208}, U^{235}

(III) কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ—সাইক্লোট্রন, বিভাট্রন, কস্‌মোট্রন, রিয়াক্টর প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মৌলের পরমাণুতে নিউট্রন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা হয়।

আজকের দিনে আইসোটোপের ব্যবহার খুবই ব্যাপক। বিভিন্ন রাসায়নিক বিশ্লেষণে, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, কার্বন ইত্যাদির আত্তীকরণ (Assimilation) নির্ণয়ে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির পুরাতন গাছের

বয়স নির্ণয়ে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Radio-Phosphorus (P^{32}) রক্তের লিউকেমিয়ার, Radio Iodine (I^{131}) থাইরয়েড গোলযোগের জন্যে, Radon (Rn)-এর বিকিরণ—ক্যান্সার রোগের নিরাময়ে এবং এছাড়া প্রাত্যহিক জীবনে আইসোটোপ আরও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রেমাংশু ঘোষ

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1.
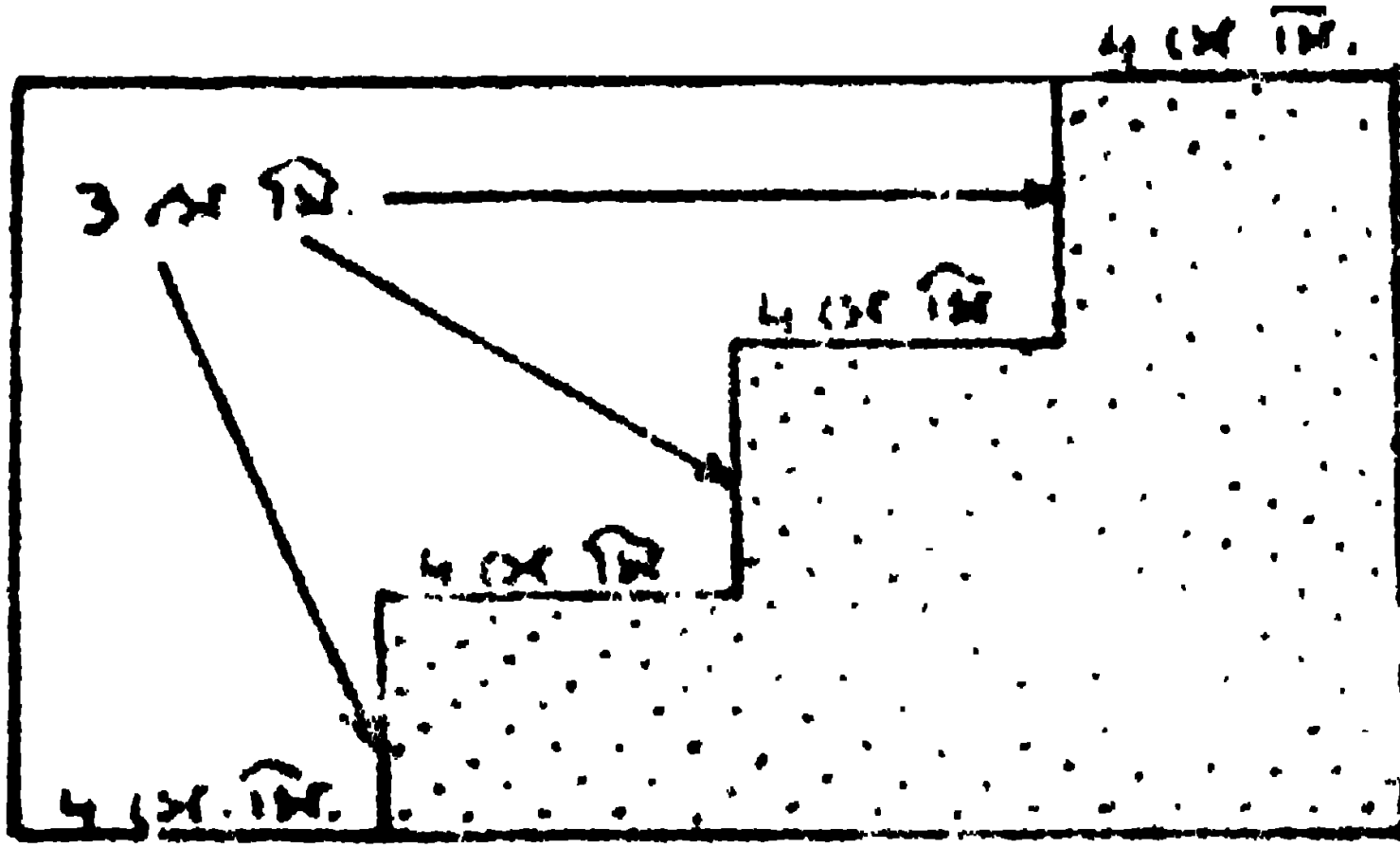
(ক) নং চিত্র
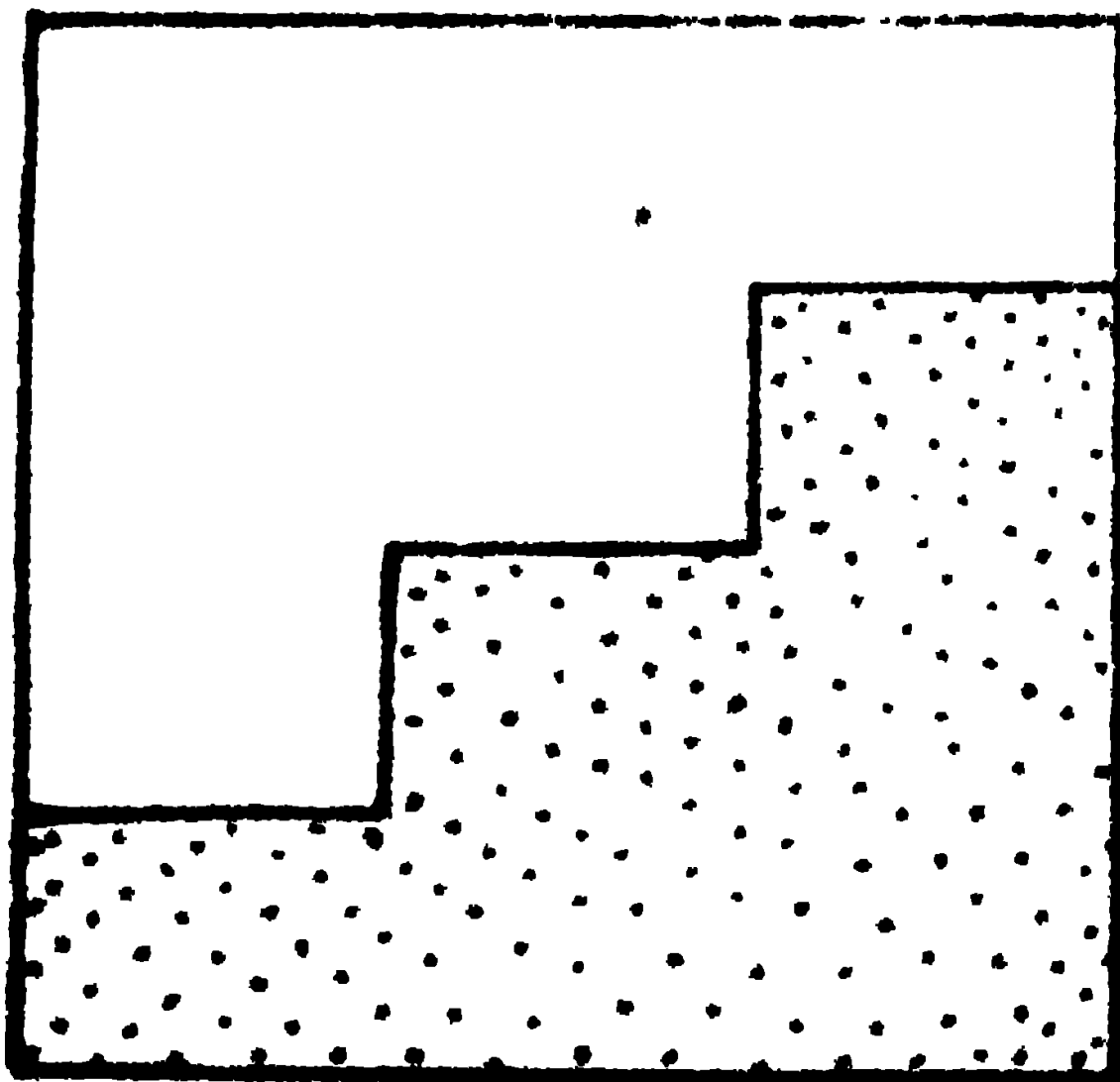
(খ) নং চিত্র

[আয়তক্ষেত্রটিকে কিভাবে ভাগ করতে হবে (ক)-চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। ডান দিকে

চিহ্নিত অংশকে নীচে 3 সে.মি. ও বাঁ দিকে 4 সে.মি. সরিয়ে বসালে 12 সেন্টিমিটার বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র পাওয়া যাবে ((খ)-চিত্র দ্রষ্টব্য)]।

2. (ক) 4

(খ) 2

[আমরা এখানে প্রশ্নটির সাধারণ সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করবো। মনে কর, প্রথম মুদ্রা n_1 পয়সা, দ্বিতীয় মুদ্রা n_2 পয়সা⋯এভাবে m-তম মুদ্রা n_m পয়সা; এগুলি একবার ব্যবহার করে তোমাকে N পয়সা দিতে হবে। মনে করি, যতভাবে তুমি দিয়েছ সেই বিভিন্ন সংখ্যা হচ্ছে—

$$F(n_1, n_2, \cdots n_m; N)$$

এখন, যতভাবে N পয়সা দিয়েছ তার মধ্যে কয়েকবার m-তম মুদ্রা n_m পয়সা ব্যবহার করেছ এবং কয়েকবার কর নি। যদি ব্যবহার করে থাক, তবে $N-n_m$ পয়সা তুমি $n_1, n_2 \cdots n_{m-1}$ পয়সার মুদ্রাগুলি দিয়ে দিয়েছ; এই সংখ্যা হলো $F(n_1, n_2 \cdots n_{m-1}; N-n_m)$। যখন m-তম মুদ্রা n_m পয়সা ব্যবহার কর নি তখন $n_1, n_2 \cdots n_{m-1}$ পয়সার মুদ্রাগুলি দিয়ে N পয়সা দিতে হয়েছে; এই সংখ্যা হচ্ছে $F(n_1, n_2 \cdots n_{m-1}; N)$।

$$\therefore\ F(n_1, n_2, \ldots n_m; N)$$
$$=F(n_1, n_2 \cdots n_{m-1}; N-n_m)+F(n_1, n_2 \ldots n_{m-1}; N)$$

এভাবে, ডান দিকের প্রতি পদকে দুটি পদে ভেঙে ফেলা যাবে এবং পদগুলি শেষ পর্যন্ত জানা সংখ্যায় পর্যবসিত হবে।

এর মধ্যে দুটি শর্ত থাকবে : যদি $n_1+n_2+\cdots+n_m<N$, তাহলে আমরা N পয়সা কিছুতেই দিতে পারবো না; সুতরাং $F(n_1, n_2 \cdots n_m; N)=0$। যদি $n_m>N$, তাহলে n_m পয়সা ব্যবহার করতে পারবো না, অর্থাৎ $F(n_1, n_2 \cdots n_m; N)=F(n_1, n_2 \cdots n_{m-1}; N)$

প্রশ্নোক্ত দুটি উদাহরণের দ্বারা ব্যাপারটা বোঝানো যাবে। মনে কর—88 পয়সা যত ভাবে দেওয়া যাবে সেই সংখ্যা S হলো

$$S=F(1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50; 88)$$
$$=F(1, 2, 3, 5, 10, 20, 25; 38)+F(1, 2, 3, 5, 10, 20, 25; 88) \quad -(1)$$

এর মধ্যে $1+2+3+5+10+20+25<88$

$\therefore$ দ্বিতীয় পদ $=0$;

সুতরাং $S=F(1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 38)$
$$=F(1, 2, 3, 5, 10, 20; 13)+F(1, 2, 3, 5, 10, 20; 38) \quad -(2)$$

ডান দিকের প্রথম পদ $F(1, 2, 3, 5, 10, 20; 13)$
$$=F(1, 2, 3, 5, 10; 13)$$
$$=F(1, 2, 3, 5; 3)+F(1, 2, 3, 5; 13) \quad -(3)$$

যেহেতু $1+2+3+5<13$, সুতরাং $F(1, 2, 3, 5; 13)=0$

আবার $F(1, 2, 3, 5; 3)=F(1, 2, 3; 3)=F(1, 2; 0)+F(1, 2; 3)=1+1=2$

সুতরাং (2)নং সমীকরণের ডান দিকের প্রথম পদ $=2$

এখন, অন্ত পদটি F (1, 2, 3, 5, 10, 20 ; 38)

= F (1, 2, 3, 5, 10 ; 33) + F (1, 2, 3, 5, 10 ; 18) —(4)

এখন, 1+2+3+5+10<38 ∴ F (1, 2, 3, 5, 10 ; 38) = 0

আবার F (1, 2, 3, 5, 10 ; 18) = F (1, 2, 3, 5 ; 18) + F (1, 2, 3, 5 ; 8)

= 0 + F(1, 2, 3, 5 , 8) —(5)

সুতরাং (2)নং সমীকরণের ডান দিকের দ্বিতীয় পদটি হলো

F (1, 2, 3, 5 ; 8) = F (1, 2, 3 ; 3) + F (1, 2, 3 ; 8)

= 2 + 0 = 2

∴ মোট 2+2=4 ভাবে 88 পয়সা দেওয়া যাবে—

i) 50+25+10+2+1=88

ii) 50+25+10+3=88

iii) 50+20+10+5+3=88

iv) 50+20+10+5+2+1=88

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুরূপ ভাবে দেখানো যাবে নির্দেশ সংখ্যা 2 ;—

25+20+1=46

25+10+5+3+2+1=46]

3. (ক) 2

(খ) সমষ্টি নির্ণয় করা যাবে না—সমষ্টিটি যে কোন সসীম সংখ্যা অপেক্ষা বৃহত্তর।

[(ক) এটি একটি অসীম গুণোত্তর শ্রেণী, প্রতিটি পদ পূর্ববর্তী পদের $\frac{1}{2}$ গুণ,—এর সমষ্টি 2 ; নিম্নোক্ত উপায়ে সমষ্টি নির্ণয় করা যেতে পারে।

ধরে নেওয়া হোক

$$S = 1+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{8}+\tfrac{1}{16}+\cdots$$

যেহেতু এটি অসীম গুণোত্তর শ্রেণী, উভয় পক্ষে $\frac{1}{2}$ দ্বারা গুণ করলে

$$\tfrac{1}{2}S = \tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{8}+\tfrac{1}{16}\cdots$$

বিয়োগ করলে $S-\frac{S}{2}=1$

$\therefore\ S=2$

(খ) এই শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয় করা যাবে না। দেখানো যায় যে, যত বেশী পদ নেওয়া যায় শ্রেণীর সমষ্টি ততই বেড়ে যাবে। ফলে শ্রেণীর সমষ্টি যে কোন সসীম সংখ্যা অপেক্ষা বড় হবে।

নিম্নোক্ত শ্রেণীটি নেওয়া যাক

$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\cdots$ (অসীম পর্যন্ত)

নিঃসন্দেহে এই শ্রেণীর সমষ্টি সসীম হবে না। এবার আমাদের শ্রেণীটির সমষ্টি এর চেয়ে বড় হবে তা দেখানো যাবে :

$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\cdots$

$=1+\frac{1}{2}+(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})+(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8})+(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}+\frac{1}{16})+\cdots$

এখন $(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})>\frac{1}{2}$

$(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8})>\frac{1}{2}$,

অনুরূপভাবে বন্ধনীস্থিত পদগুলির সমষ্টি $\frac{1}{2}$ অপেক্ষা বড়, সুতরাং সামগ্রিকভাবে পদগুলির সমষ্টি

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots$$

অপেক্ষা বড় অর্থাৎ সমষ্টি যে কোন সসীম সংখ্যা অপেক্ষা বড়।

গাণিতিক ভাষায় (ক)-তে প্রদত্ত শ্রেণীকে অভিসারী শ্রেণী এবং (খ)-তে প্রদত্ত শ্রেণীকে অপসারী শ্রেণী বলা হয়]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : টেলিভিশনে রঙীন ছবি কিভাবে পাওয়া যায় ?

অঞ্জলি ঘোষ, ঢাকা; রেখা নিয়োগী, মুর্শিদাবাদ।

প্রশ্ন 2. : উড়োজাহাজ ছাড়বার সময় প্রথমে কিভাবে গতি পায় ?

দক্ষিণারঞ্জন বসাক, মেদিনীপুর।

উত্তর 1. : রঙীন ফটো তোলবার ব্যাপারে আমরা যে ফিল্ম ব্যবহার করি, তাতে তিনটি স্তর আছে, যাদের একটি নীল আলো, দ্বিতীয়টি সবুজ ও তৃতীয়টি লাল আলোতে সাড়া দেয়। এগুলি মিশেই ছবির মধ্যে বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি হয়।

রঙীন টেলিভিশনে ছবিকে নীল, সবুজ ও লাল রঙে আলাদা করবার ব্যবস্থা থাকে। কিছু সংখ্যক লেন্স, ফিল্টার এবং দর্পণের সাহায্যে ছবিকে আলাদা করে প্রেরক-যন্ত্রে প্রচারের জন্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক-যন্ত্রে এই তিন রঙের ছবিকে একত্র করা হয়ে থাকে। গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দায় তিনটি বিভিন্ন ধরণের প্রতিপ্রভ বস্তু মাখানো থাকে। প্রতিপ্রভ বস্তুর একটি নীল রঙে, দ্বিতীয়টি সবুজ রঙে এবং তৃতীয়টি লাল রঙে উদ্ভাসিত হয়। ফলে তিনটি বিভিন্ন রঙের প্রতিচ্ছবি এক হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দায় একখানি ছবির সৃষ্টি করে—যা রঙীন হয়।

উত্তর 2. : উড়োজাহাজ গতি পায় উড়োজাহাজের সামনের প্রোপেলারের সাহায্যে। প্রোপেলারটি চলে একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে। প্রোপেলারের ব্লেডের আকৃতি একটা বিশেষ ধরণের হয়ে থাকে। ইঞ্জিন চলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রোপেলারও ঘুরতে থাকে। ব্লেডের আকৃতি এমন করা হয়, যাতে ঘোরবার সময় প্রোপেলারটি সামনের বাতাসকে পিছন দিকে ঠেলে দিতে পারে। ফলে ব্লেডের ঠিক পিছনের বাতাসে সামনের তুলনায় উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয় এবং এই চাপই ব্লেডগুলিকে ঠেলা দিয়ে উড়োজাহাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

প্রশান্ত মহাসাগর থেকে প্রচুর ধাতু পাওয়া যেতে পারে

নয়াদিল্লী থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোটি কোটি মণ তামা, নিকেল ও ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এই কথা ঘোষণা করেছেন।

সমুদ্র থেকে এসব ধাতু তোলা হবে। এর পরিমাণ ভূমি থেকে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য ধাতুর তুলনায় বহু গুণ বেশী বলেও জানানো হয়। রাষ্ট্রসংঘের প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত সমিতির রিপোর্টে এই তথ্যের কথা প্রকাশ করা হয়।

থুম্বা থেকে আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ

ত্রিবান্দ্রম থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—থুম্বা বিষুবীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ভারতে তৈরি দ্বিপর্যায়ের একটি সেন্টর রকেট সম্প্রতি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

রকেটটিতে মহাকাশের কয়েকটি জ্যোতিষ্ক থেকে নির্গত মৃদু এক্স-রশ্মি পরিমাপের যন্ত্র ছাড়াও এক্স-রশ্মির নতুন উৎস সন্ধানের যন্ত্র ছিল।

রকেট ও তার যন্ত্রপাতি ভাল ভাবেই কাজ করেছে। রকেটটি প্রায় 165 কিলোমিটার উচ্চতায় উঠেছিল।

হলোগ্রাফের অদৃশ্য সূঁচ

টেলট্রন ডাটা করপোরেশন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) একরকম আলোর হলোগ্রাফ সূঁচ তৈরি করেছেন। এই ব্যবস্থায় কম্পিউটারের তথ্য দ্রুতহারে সংগ্রহ ও বিতরণ করা যাবে। লেসার থেকে একটি সূক্ষ্ম আলো তথ্যের রেকর্ডের খাঁজে ফেলা হয়। এই ছোট আলোকটিই অদৃশ্য সূঁচ। খাঁজ থেকে আলো ছড়িয়ে পড়েই শব্দে রূপান্তরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর গবেষণা দপ্তরের সঙ্গে চুক্তিতে এই করপোরেশন কাজ করছে। তাঁদের বক্তব্য হলো, তথ্যের রেকর্ডগুলির উপর কোন সংঘাত ঘটছে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষয় হচ্ছে না। এই ব্যবস্থাটিতে খুব উচ্চমানের অবিকল শব্দোৎপাদন এবং সুপার লং প্লেয়িং রেকর্ড নির্মাণ করা সম্ভব।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলীর ৪নং ফরম
অনুযায়ী বিবৃতি :—

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা :—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

2. প্রকাশনের কাল—মাসিক

3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

4. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

5.

সম্পাদকের নাম	জাতি ও ঠিকানা
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রধান সম্পাদক)	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীজয়ন্ত বসু	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6

6. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য

তাং 7-3-73

প্রকাশক—"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাসিক পত্রিকা

বিষয়-সূচী

PRECIVAC
Rotary High
Vacuum Pump
For Industry, Research
Educational Institutes
& Govt. Contractors
PRECIVAC ENGINEERING COMPANY

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষড়বিংশতিতম বর্ষ | এপ্রিল, 1973 | চতুর্থ সংখ্যা

সংবাদপত্রে বিজ্ঞান

একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, কোন দেশের উন্নতির জন্যে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগ একান্তই অপরিহার্য। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রেখে এই কাজ কখনই সম্ভব নয়, এর জন্যে প্রয়োজন দেশের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া সৃষ্টি করবার, দেশের জনমানসে একটা বৈজ্ঞানিক মেজাজ গড়ে তোলবার। এই অতি-আবশ্যকীয় কাজটিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা, বলা বাহুল্য, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষতঃ আমাদের মত দেশে, যেখানে লোকরঞ্জক বিজ্ঞানের বই বা পত্র-পত্রিকার সংখ্যা (এবং প্রচার) মোটেই যথেষ্ট নয়।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীকুল সমাজের মধ্যে অনেকটা যেন একঘরে হয়ে বাস করেন। সেই ঘরে কিছুটা সম্মান আছে, হয়তো তুলনামূলকভাবে খানিকটা আর্থিক সঙ্গতি আছে, কিন্তু দেশের মাটির সঙ্গে ঐ ঘরের যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ—দূরে থাকে প্রায় নির্বাসিত অবস্থায় একটি 'দর্শনীয় বস্তু' হিসাবে সেটি বিরাজ করে। এক দিকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী এবং অন্য দিকে দেশের সাধারণ মানুষ ও তাদের সমস্যা—এদের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, সামগ্রিকভাবে সেই ব্যবধানের অপসারণ সম্ভব একমাত্র সরকারের সঠিক নীতি গ্রহণ এবং তার বলিষ্ঠ রূপায়ণের মাধ্যমে। তবে ঐ ব্যবধানের উপর প্রাথমিক সেতুবন্ধনের কাজটি অবশ্যই সংবাদপত্রগুলি সার্থকভাবে করতে পারে।

সংবাদপত্রের সাধারণভাবে দুটি বিভাগ: একটির উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ধরণের সংবাদ বিতরণ করা; অন্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পাদকীয় ও অন্যান্য প্রবন্ধের মাধ্যমে নানা বিষয়ে জনগণকে ওয়াকিবহাল করা এবং কোন কোন

বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা। আনন্দের বিষয়, গত কয়েক বছর আমাদের দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলি বিজ্ঞান সম্পর্কে আগেকার তুলনায় কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছে—সংবাদপত্রের দুটি বিভাগেই এই সচেতনতার স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করলেও বিজ্ঞানের প্রতি সংবাদপত্রের আচরণ এখনো অনেকটা বিমাতৃসুলভ—বিজ্ঞানের উপস্থাপনায় সেহাৎই যেন দায়সারা গোছের একটা মনোভাব।

প্রথমতঃ ধরুন বিজ্ঞান-সংবাদের কথা। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হয়তো একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা করা হলো। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা যদি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সংবাদপত্রের দপ্তরে অনুষ্ঠানের বিবরণ পৌঁছে দেন বা ঠিক জায়গায় যদি 'ধরা-করা' করতে পারেন, তবেই সেই বিবরণ সংবাদপত্রে বেরুবার সম্ভাবনা, তা না হলে অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও সংবাদপত্র নীরব। এই ধরণের কর্মপদ্ধতি কি বাঞ্ছনীয়? বিজ্ঞান-সংবাদ সংগ্রহ করবার এবং যথাযথ গুরুত্ব অনুযায়ী সেগুলিকে পরিবেশন করবার জন্যে সংবাদপত্রের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকা কি উচিত নয়?

সংবাদপত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেগুলির বিষয়বস্তু যথেষ্ট ব্যাপক নয় এবং সেগুলিতে প্রায়শঃই গভীরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর মূল কারণ বোধ হয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহের জন্যে সংবাদপত্রের কোন সক্রিয় ব্যবস্থা নেই; একেবারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানানুরাগীর রচনা ও মতামতই তাদের সম্বল। অথচ সংবাদপত্রের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে সক্ষম, এমন বিজ্ঞানীর সংখ্যা তো আমাদের দেশে কম নয়। সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংগ্রহ করা কি সম্ভব নয়?

বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা বা আলোচনায় সংবাদপত্রের অগভীরতা সম্পর্কে একটি নমুনা দেওয়া যাক। আকাশবাণীতে বিজ্ঞানসম্পর্কিত যে সব আলোচনা পরিবেশিত হয়, সংবাদপত্রে তার পর্যালোচনা হলে কি ধরণের হয় সেই পর্যালোচনা? আলোচিত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, তথ্যাদির যাথার্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে কোন মন্তব্য যদি আপনি আশা করেন, তবে আপনাকে হতাশ হতে হবে। আলোচনাটি শুনতে লেখকের ভাল লেগেছে কি না, এটুকুই কেবল আপনি মূলতঃ জানতে পারবেন। স্বভাবতঃই আলোচনাকারীর সঙ্গে লেখকের যদি বিশেষ পরিচয় থাকে, তবে তাঁর ভাল লাগবার সম্ভাবনা বেশী; আর তাঁর সম্বন্ধে কোন কারণে যদি লেখকের বিরূপ মনোভাব থাকে, তবে কি আর আলোচনা তাঁর ভাল লাগবে?—কথায় বলে, 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা'।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বিজ্ঞান-সংবাদ প্রকাশেই হোক বা বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনার পরিবেশনেই হোক, আমাদের দেশের সংবাদপত্রের কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাবার সম্ভাবনাকে অনেক ক্ষেত্রেই অঙ্কের ভাষায় এইভাবে লেখা যায়: P=f(c), যেখানে c হলো সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে contact অর্থাৎ সংযোগ, সহজ চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় 'খাতির'। আমরা মনে করি, এই অবস্থা পাল্টে দিয়ে যত বেশী ক্ষেত্রে P=f(q) হয়ে উঠবে, ততই মঙ্গল; এখানে q হচ্ছে বিষয়বস্তুর quality অর্থাৎ গুণ বা মান। অন্ততঃ উৎকর্ষই কি বিজ্ঞান-সংবাদ বা বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাদি পরিবেশনের মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়?

জয়ন্ত বসু

কয়লা সৃষ্টির রহস্য

অশোক চক্রবর্তী ও অরবিন্দ দাস*

ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত যৌগসমূহের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ প্রায় 0·04%; বিরল যৌগগুলির মাত্রা থেকে সামান্য বেশী। তবে বায়ুমণ্ডল ও ভূ-ত্বকের 5000 মিটার নীচের স্তর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করলে কার্বনের শতকরা হার 0·1-এর বেশী হবে না। বিস্ময়ের কথা এই যে, কার্বনের 5000 ভাগের মধ্যে মাত্র 1 ভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে সক্ষম। এটিই গতিশীল কার্বন (Dynamic carbon) নামে পরিচিত। আর এই গতিশীল কার্বনই বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগে। বস্তুতঃ কার্বনকে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যৌগসমূহের মধ্যে একটি বলে গণ্য করা হয়। কারণ মানুষের নিত্যব্যবহৃত সামগ্রীর অধিকাংশই হচ্ছে কার্বনের যৌগ—সেগুলির মধ্যে খাদ্য, পোষাক এবং জ্বালানীকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকৃতি বিভিন্ন গতিশীল কার্বনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে অত্যন্ত ঘনীভূত অবস্থায়—অধিকাংশ জীবাশ্ম-জ্বালানীতে (Fossil fuel) এটি বর্তমান এবং এই জীবাশ্ম-জ্বালানীর সৃষ্টি হয় হাজার হাজার বছর ধরে সৌরশক্তির প্রভাবে। পীট, লিগ্‌নাইট, কয়লা, খনিজ তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসকে এই জাতীয় জ্বালানীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। গঠনগুণে প্রথম তিনটি সমগোত্রীয় এবং এদের উৎপত্তি উদ্ভিদ থেকেই। উদ্ভিদ থেকে কি করে পীট, লিগ্‌নাইট ও কয়লার সৃষ্টি হয়, তা এখন আলোচনা করা হবে।

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর যে সকল গাছ জন্মায়, তাদের থেকেই কয়লার সৃষ্টি হয়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে কয়লা হয় না। সাধারণতঃ যে সব গাছের কাঠামো (Woody skeleton) এবং ত্বকের উপরের স্তর ও বহন শক্ত, তারাই সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারে এবং যথেষ্ট পরিমাণে কয়লাতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম। আর গাছে অবস্থিত যে কার্বন কয়লাতে রূপান্তরিত হয়, তা গাছ বেঁচে থাকাকালীন অঙ্গারাত্মীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সঞ্চিত হয়। এই প্রক্রিয়াতে গাছ তার সবুজ ক্লোরোফিলের সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াটি ঘটতে কিছু তাপ-শক্তির প্রয়োজন, তা আসে সূর্যালোক থেকে। উল্লিখিত বিক্রিয়াটি একটি সরল রাসায়নিক সমীকরণের দ্বারা দেখানো হলো—

$$6CO_2 + 6H_2O$$

(কার্বন ডাই-অক্সাইড) (জল)

$$+660{,}000 \text{ ক্যালরি} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

(তাপশক্তি) গ্লুকোজ
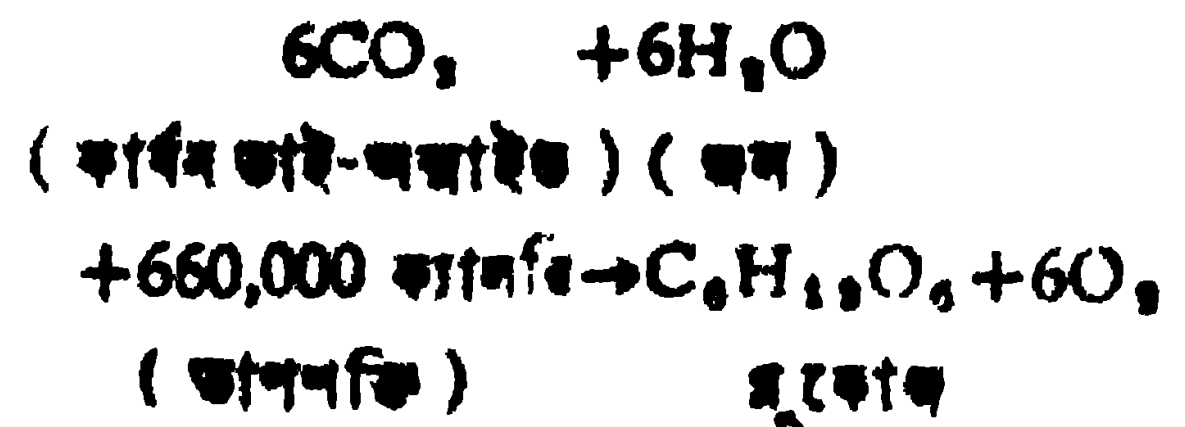
আর এইরূপ বিক্রিয়ার সাহায্যেই গাছে চিনি, স্টার্চ এবং জটিল কার্বোহাইড্রেটসমূহ সংরক্ষিত হতে থাকে। কিছু পরিমাণ শর্করা-জাতীয় পদার্থ গাছটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল তৈরি করে এবং তাদের পুষ্টি হয়। তাছাড়া কিছু পরিমাণ চিনি সেলুলোজে রূপান্তরিত হয়। আর এর সঙ্গে অর্ধ-সেলুলোজ, লিগ্‌নো-সেলুলোজ এবং লিগ্‌নিনের (সেলুলোজের রূপান্তরিত গঠন) সংমিশ্রণে তৈরি হয় গাছের মজ্জা। এবার

* রসায়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণমিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, 24-পরগণা।

থাকে কি কি রাসায়নিক যৌগ উপাদান বর্তমান, তা একটু আলোচনা করা যাক। সেলুলোজের আণবিক সংকেত হলো $(C_6H_{10}O_5)n$ (যেখানে n-এর মান নির্দিষ্ট নয়, কয়েক হাজার হতে পারে); তাই সংযুক্তি সঠিকভাবে বলা না গেলেও দেখা গেছে— C—44·4%, H—6·2%, O—43·4% (মোটামুটি)। এইভাবে লিগ্‌নিনে আছে C—60-65%, H—6%, O—30-33% (মোটামুটি) এবং এর সঙ্গে কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন ও সালফার থাকতেও পারে। আর রূপান্তরিত সেলুলোজ (Modified cellulose) এবং লিগ্‌নো সেলুলোজের (Ligno cellulose)-মধ্যে রয়েছে C—50%, H—6%, O—43% (মোটামুটি)। কাঠের মধ্যে নাইট্রোজেনঘটিত প্রোটিন ও রেজিন (Resin) থাকে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায় সেলুলোজ, লিগ্‌নো সেলুলোজ, রূপান্তরিত সেলুলোজ, নাইট্রোজেনঘটিত প্রোটিন ও রেজিন ধীরে ধীরে 'মৃত্তিকা-জীবাণু'র দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কার্বনে (কয়লা ও তার পূর্ববর্তী অবস্থায়) রূপান্তরিত হয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তা হলো—প্রথমে কাঠ থেকে পীট, পীট থেকে লিগ্‌নাইট, লিগ্‌নাইট থেকে কয়লা ও সবশেষে তার অ্যান্থ্রাসাইট রূপটি। শুষ্ক মাটিতে যখন কোন গাছজাতীয় পদার্থ পতিত অবস্থায় থাকে, তা প্রথমে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল তৈরি করে। কিন্তু অগভীর জলাশয়ের নীচে এর বিয়োজন পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের এবং প্রথমে জীবাণুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ক্রিয়া চলতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ যৌগের বিয়োজন সম্পূর্ণ না হয় অথবা ক্ষয়ের ফলে উৎপন্ন দ্রব্য এত ঘনীভূত হয়—যার ফলে জীবাণু আর বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এটা স্পষ্ট যে, বিক্রিয়া অগভীর জলাশয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ চলতে থাকে এবং এখানে উৎপন্ন অম্লাত্মক পদার্থ (Acidic matter) নির্গমন পথ দিয়ে নিষ্কাশিত হয়। তবে এই অম্লাত্মক পদার্থ খনিজ স্তরের সংস্পর্শে এসে প্রশমিত হতেও পারে। এই ক্ষয়ের গতি ম্যাকেঞ্জি টেলরের (Mackenzie Taylor) মতে দু-ভাবে জীবাণু দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে—

(ক) বায়ুর অনুপস্থিতিতে অথবা সামান্য বায়ুর উপস্থিতিতে পীট গঠন (কার্যতঃ বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে বায়ুর সংস্পর্শ ছাড়া হয় না);

(খ) সর্বক্ষণ বায়ুর সংস্পর্শ ছাড়াই ক্ষারীয় প্রভাবে সন্ধান-প্রক্রিয়ায় (Fermentation) দ্বারা বিটুমিনাস কয়লা গঠন, এই ক্ষেত্রে ক্ষারীয় প্রভাবের প্রয়োজন হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের জন্যে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সৃষ্টি হয় ক্ষয়ের ফলে এবং ক্ষারীয় প্রভাব বজায় রাখা হয় ক্ষারীয় মাটির সাহায্যে, যা টেলরের মতে কয়লার উপরিভাগকে আবৃত করে রাখে। বস্তুতঃ এই চাপের গাঢ়ত্বের ভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কয়লার সৃষ্টি হয়। যেমন, লিগ্‌নাইট গঠিত হয় কম গাঢ়ত্বের চাপের উপস্থিতিতে, বিটুমিনাস গঠিত হয় অতিমাত্রায় গাঢ়ত্বের চাপের প্রভাবে।

টেলরের এই সূত্রানুসারে এই ধারণা করা যেতে পারে যে, কয়লার সৃষ্টি তাপ ও চাপের প্রভাব ছাড়া হয়। কিন্তু ফিশার (Fischer) ও শ্রেডার (Schrader)-এর মত টেলরের মত থেকে ভিন্ন ছিল। এই মতে—গাছের সেলুলোজ জীবাণুর দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে গ্যাসীয় ও অম্ল পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং লিগ্‌নিন হিউমিক (Humic) পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কয়লার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের কয়লাকে সনাক্ত করা যেতে পারে তাদের ক্ষারীয় [illegible]

প্রাধান্য অনুসারে। বাদামী কয়লা এবং লিগ্‌নাইটের প্রাধান্য ক্ষারীয় দ্রবণে বেশী, কিন্তু বিটুমিনাস ও অ্যান্থ্রাসাইট আদৌ ক্ষারীয় দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না।

যে মতবাদই থাকুক না কেন, এটা একটা পরীক্ষামূলক সত্য যে, কয়লার মত পদার্থ সেলুলোজ এবং লিগ্‌নিন থেকেই পাওয়া যায়। বার্জিয়াস (Bergius) সেলুলোজকে জলের উপস্থিতিতে 340° সে. উষ্ণতায় ও 140 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একটা কালো পদার্থে পরিণত করেন, যার কোন কোন বিষয়ে কয়লার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। কালো পদার্থটিকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, কার্বনের শতকরা ভাগ 84%, হাইড্রোজেন=5%, অক্সিজেন—11%। গ্রোপ (Gropp) এবং বোদে (Bode) তাঁদের পরীক্ষা থেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চাপ ও তাপের প্রভাবে সেলুলোজ নিকৃষ্ট কয়লায় (Dull coal) পরিণত হয়; আর লিগ্‌নিন পরিণত হয় উৎকৃষ্ট কয়লায় (Bright coal)। বার্ল (Berl) এই সকল পদার্থকে (লিগ্‌নিন, সেলুলোজ) ক্ষারের উপস্থিতিতে 300-400° সে. উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, লিগ্‌নাইট লিগ্‌নিন থেকে এবং বিটুমিনাস কয়লা সেলুলোজ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই পরিবর্তন অবশ্য অত সহজ নয়। যাহোক, তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করেন এবং সেলুলোজ ও লিগ্‌নিন থেকে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখান। পার্থক্যটি নীচে দেখানো গেল:

	সেলুলোজ কয়লা	লিগ্‌নিন কয়লা
বেঞ্জিনে দ্রবীভূত বিটুমেন ···	15%	0·5%
উৎপাদিত কয়লা ·	33%	65%
পাতনের পর ফেনল ·	3·6%	0·5%

তবে এটা সত্য যে, যে গাছে সেলুলোজ অধিক পরিমাণে থাকে, তা থেকে সেলুলোজ কয়লা এবং যে গাছে লিগ্‌নিন অধিক মাত্রায় থাকে, তা থেকে লিগ্‌নিন কয়লা পাওয়া যায়। এই ভাবে প্রাপ্ত কৃত্রিম কয়লা ঠিক প্রাকৃতিক বিটুমিনাস কয়লার মত নয়। এদের ঘনত্ব কম এবং পাতন করবার পর ভিন্ন ধরণের পদার্থ পাওয়া যায়। তবে এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপনীত হওয়া যায় যে, সেলুলোজ ও লিগ্‌নিন কয়লা তৈরির সহায়ক।

বর্তমান কালে বিশেষজ্ঞদের মতে কয়লা তৈরির প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে এই যে, জীবাণু বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। গাছের বেশ খানিকটা অংশ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়ে একটি অত্যন্ত সহজ পদার্থের সৃষ্টি করে। আর বাকী অংশ ক্ষয় না হয়ে ঐ ভাবেই থেকে যায়। এই উদ্ভিজ্জমল (Vegetable sludge) ধীরে ধীরে পীটে পরিবর্তিত হয়। এই অবস্থায় তাপ ও চাপের প্রভাব কার্যকরী হয়। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে মাটির নীচে কয়লা গঠনের স্তরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 200° সে.-এর কম। চাপ পৃথিবীর গতির জন্যে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল; কিন্তু শুধু একমাত্র গভীরতার জন্যে চাপের পরিমাণ প্রায় 1200 পাউণ্ড, প্রতি বর্গ ইঞ্চি, প্রতি 1000 ফুট গভীরতায়। শুধুমাত্র চাপ ও তাপের প্রভাবেই পীট কয়লাতে পরিণত হয় না। এর জন্যে আরো একটা কারণ (Factor) বর্তমান, তা হলো অত্যন্ত দীর্ঘ সময়।

হিল্টের সূত্র (Hilt's Law) অনুযায়ী উপরিউক্ত তত্ত্বকে স্বীকার করা যেতে পারে। কারণ হিল্টের সূত্র অনুসারে কয়লা খনির অভ্যন্তরের উল্লম্ব (Vertical) গভীরতা যত বৃদ্ধি পাবে, কার্বনের শতকরা হার তত বৃদ্ধি পাবে এবং উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ কমবে। তবে এর ব্যতিক্রমও কোথাও কোথাও দেখা যেতে পারে। চাপের প্রভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন কোন স্থানে প্রচণ্ড পার্শ্বীয়-চাপের (Lateral stress)

সৃষ্টি হতে পারে; অর্থাৎ কয়লাতে রূপান্তরের বেলায় কার্বনের মাত্রা উপর দিকে না যেয়ে পাশের দিকে বৃদ্ধি পায়।

যাহোক, গাছ যতই কয়লাতে পরিবর্তিত হতে থাকে, কার্বনের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পায় ও সেই সঙ্গে উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ কমতে থাকে। উদ্বায়ী পদার্থের অত্যন্ত মুখ্য উপাদান হলো—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন; অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। নিম্নে তালিকায় কয়লায় পরিবর্তিত হবার (Colification) বিভিন্ন ধাপগুলি দেখানো হলো—

কয়লায় পরিবর্তনের ধাপসমূহ (C = 100)

	হাইড্রোজেন	অক্সিজেন	প্রাপ্য হাইড্রোজেন $=\left(\text{হাইড্রোজেন} - \frac{\text{অক্সিজেন}}{8}\right)$
বিশুদ্ধ সেলুলোজ	13·9	111·0	0·0
কাঠ (গড় মাত্রা)	12·0	88·0	1·0
পীট	10·0	57·0	3·0
লিগ্‌নাইট (রাশিয়া)	7·8	54·0	1·1
লিগ্‌নাইট (ইউরোপ)	6·9	30·0	3·5
বিটুমিনাস কয়লা	6·0	21·0	3·4
অ্যান্থ্রাসাইট	4·75	5·2	4·1
গ্রাফাইট	0·0	0·0	0·0

এবার ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কয়লার পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করা যাক :—

(ক) আসল উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও জলের সাহায্যে অপসারিত হয়ে পৃথকীকরণের পার্থক্যের ফলে;

(খ) জীবাণু দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্তির পরিমাণে পার্থক্যের ফলে;

(গ) ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থের তাপ ও চাপের প্রভাবে উদ্বায়ীকরণের পার্থক্যের ফলে কয়লার বিভিন্নতা সম্ভব।

বস্তুতঃ এই কারণগুলি যুক্তভাবে বা এককভাবে পর পর কার্যকরী হয়ে থাকে কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে।

গাছের কোষের কোন্ পদার্থ ধীরে ধীরে কয়লাতে পরিণত হয়—সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে। এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে কয়লার গঠনের উপর নির্ভরশীল। উপরে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখন সংক্ষিপ্তাকারে কয়লা সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া হলো—

(ক) সেলুলোজ, লিগ্‌নিন এবং অল্প পরিমাণে প্রোটিন, রেজিন, চর্বি ও মোম (যা গাছে বর্তমান) মাটির নীচে থেকেই পচন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে; ফলে মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থ নির্গত হয়। তারপরে জলে কিছু কিছু পদার্থ দ্রবীভূত হয় ও জেল (Gel)-এর মত পদার্থ সৃষ্টি করে। আর কিছু পদার্থ অদ্রবণীয় অবস্থায় পড়ে থাকে। এভাবেই পীট তৈরি হতে থাকে।

(খ) উপরিউক্ত যৌগসমূহ হয় সেখানেই থাকে নতুবা দ্রবীভূত হয়ে অন্য স্থানে জমা হয়।

(গ) ভূপৃষ্ঠের নীচে চাপের ফলে জল দূরীভূত হয় এবং পৃথিবীর গতির ফলে স্তর-বিন্যস্ত (Laminated) গঠনের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ পীট লিগ্‌নাইটে রূপান্তরিত হয়।

(ঘ) ভূ-অভ্যন্তরে চাপ ও ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে আরও জল দূরীভূত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইথেন ও মিথেন

প্রভৃতি গ্যাসীয় যৌগেরও অবমুক্তি ঘটে। তাছাড়া অ্যামোনিয়া ও ক্ষারীয় হিউমিক পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটে। আর বিটুমিনজাতীয় বস্তু থেকে কয়লার উপাদানের সৃষ্টি হতে থাকে। এই অবস্থাকে গতি-রাসায়নিক (Dynamo-chemical) অথবা রূপান্তরিত (Metamorphic) অবস্থা বলে।

(৪) আরও চাপ এবং ধীরে ধীরে কম তাপের প্রভাবে শেষে অ্যান্থ্রাসাইটজাতীয় কয়লার সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞান ও সমাজ

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আজ মানবজীবনকে করেছে সমৃদ্ধ—তাকে দিয়েছে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, গতি, রোগ-প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ক্ষমতা—আরও কত কি। একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে, ভারতে বিজ্ঞানের উপযুক্ত প্রসার আজও হয় নি। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত কিছু জনসাধারণই বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানেন। আর দেশের অগণিত জনসাধারণ এই বিষয়ে অজ্ঞ। আজও তারা রোগ নিরাময়ের জন্যে কবজ, তাবিজ আর জল পড়ার উপর নির্ভর করে। রোগের মূল কারণ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। আর এই রোগ নিরাময়ের জন্যে দৈবের উপর নির্ভর করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। অবশ্য এর জন্যে আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থা অনেক পরিমাণে দায়ী। অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, অধিকাংশ গ্রামে চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগ নেই। আর সুযোগ যেখানেও বা আছে, সেখানে গরীব জনসাধারণের দামী দামী ঔষধ কেনবার সামর্থ্য নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে ঔষধের বাস্তব উপকারিতা তাদের অন্ধ বিশ্বাস দূর করতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতো।

অত্যন্ত দুঃখের হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অন্ধ বিশ্বাস শুধু অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই বদ্ধমূল নেই, আছে তথাকথিত কিছু উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যেও—এমন কি, যাঁরা বিজ্ঞান-সাধক, তাঁদের মধ্যেও। এসব বিজ্ঞান-সাধক যতক্ষণ গবেষণাগারে থাকেন, ততক্ষণ তাঁরা যুক্তিবাদী, যা যুক্তিসম্মত নয় তা তাঁরা মানেন না বা স্বীকার করেন না। কিন্তু গবেষণাগারের বাইরে তাঁরা অনেক সময় অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী। ভারতের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু 1950 সালে Fuel Research Institute-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেছিলেন "...All countries, I said, are normally conservative. But I imagine our country is more than normally conservative....I find curious hiatus in people's thinking. I find it even in the thinking of scientists who praise science, and practice it in the laboratory but discard the ways of science, its method of approach and the spirit of science in everything else they do in life. They become completely unscientific.

প্রাচীনকালে মানুষ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ

* আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার

দেখে তাদের কারণ হিসাবে এক অজ্ঞাত শক্তিকে দায়ী করে। জন্ম নেয় নানা দেব-দেবীর ধারণা। দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার উপায় হিসাবে তারা দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করে। এভাবে মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে একদিন অলৌকিক ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়। তারপর থেকে এই ধারণা যুগে যুগে শোষক শ্রেণীর অন্যতম হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে—বর্তমান যুগও তার ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বর, পূর্ব-জন্মের কর্মফল প্রভৃতি ধারণা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে শোষক শ্রেণী তাদের শোষণের দ্বারাই যে সামাজিক বৈষম্য এবং মানুষের অভাব-অনটন সৃষ্টি করেছে, সে কথা মানুষকে বুঝতে দেয় না। তাই শোষণের অবসান ঘটাবার জন্যে, মানবমুক্তির জন্যে অলৌকিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মবহির্ভূত কোন কিছুর ধারণা মানুষের মন থেকে দূর করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। আর তা পারে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী। তাই বিজ্ঞানীদের সমাজের প্রতি একটা বিশেষ কর্তব্য আছে—তা হলো মানুষকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনে সক্ষম করে তোলা। তাদের বোঝানো হয় যে, মানব জীবনে এমন কোনও ঘটনা নেই, যা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে মানবমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সব কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। অবশ্য এই কথা ঠিক যে, এমন কিছু ঘটনা আছে, বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা আজও দিতে পারে নি। কিন্তু তাথেকে আমরা কখনই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে, বিজ্ঞানের পক্ষে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বা বিজ্ঞান তা কোনও দিনই ব্যাখ্যা করতে পারবে না। এই ব্যাখ্যা না দিতে পারবার কারণ বিজ্ঞানের অক্ষমতা নয়। বর্তমানে যথেষ্ট তথ্য এবং তাত্ত্বিক ও কারিগরী জ্ঞানের অভাবই এর জন্যে দায়ী। কিন্তু এমন এক দিন নিশ্চয়ই আসবে, যে দিন এই সব ঘটনার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ইতিহাসই এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবে। আমরা দেখেছি, কোন এক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা যে সব জিনিসের ব্যাখ্যা তখন দিতে পারেন নি, উন্নততর তত্ত্ব ও কারিগরী জ্ঞান নিয়ে পরবর্তী যুগের বৈজ্ঞানিকেরা তা দিতে পেরেছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর অনেক নজীর পাওয়া যাবে। মানুষকে এই কথা বোঝানো দরকার যে, অলৌকিক কোনও শক্তি প্রাণের সৃষ্টি করে নি, প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সাহায্যেই। এই তথ্য আজ প্রমাণিত। মানুষের মনও পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। মানুষের মন বস্তুজগতেরই প্রতিফলন। বস্তুজগৎই মানুষের মনকে প্রভাবিত করে মননশীলতার জন্ম দেয়—মানুষের চিন্তা উন্নত হয়। উন্নত চিন্তা আবার বস্তুজগৎকে প্রভাবিত করে। এভাবে মন ও পদার্থ একে অপরের পরিপূরক।

কোনও কিছুই চরম নয়—absolutism-এর ধারণা আজ অচল। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলেন প্রকৃতির সব কিছুই আপেক্ষিক। তাই ঈশ্বরই চরম—তিনিই সব কিছু, জীবজগৎ ও বস্তুজগতের স্রষ্টা—ধর্মের এই মূল তত্ত্বও আজ আর চলতে পারে না। সৃষ্টি বা বিনাশ বলে কিছু নেই, যা আছে তা রূপান্তর।

বৈজ্ঞানিকদের তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করা একান্তই প্রয়োজন। তা না হলে সমাজের উন্নতি হতে পারে না—বিশেষ করে ভারতের মত অনুন্নত দেশে। আর সমাজ যদি উন্নত না হয়, তবে বিজ্ঞানেরও উন্নতি হতে পারে না, কারণ সামাজিক অবক্ষয়ের প্রভাব বিজ্ঞানীদের উপরও পড়তে বাধ্য। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবধারা গড়ে

ওঠবার পথে প্রতিবন্ধকতা অনেক। ধর্ম, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, প্রাদেশিকতা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে আমাদের দেশে অনেক ছোট-বড় সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দল আছে—জনসাধারণের উপর যাদের প্রভাব যথেষ্ট এবং এই সমস্ত দল জনতার বিজ্ঞানচেতনাকে উন্নত হতে সাহায্য তো করেই না বরং তার বিপরীতটাই করে। ভারতের বর্তমান অবস্থায় আর একটি মারাত্মক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—তা হলো আধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবার প্রচেষ্টা। তাই নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে হলে বিজ্ঞানীদের এই সব সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। আর তাই তাঁরা রাজনীতি-বিমুখ থাকতে পারেন না। এই কথার মানে এই নয় যে, তাঁরা সকলে বিজ্ঞান-সাধনা ছেড়ে দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়বেন। তাঁরা শুধু রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝে সেইমত তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোরও আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। আর দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। সুতরাং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মধ্যযুগে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ঐ সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফল। শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। বিজ্ঞানই আবার স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা এবং তার থেকে এক উন্নততর সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের পথ। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে এবং তার ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে ওঠে। অবশেষে সমাজ এক সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়। সেই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার পথ বিজ্ঞানই দেখায়। অতএব বিজ্ঞান শুধু বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বিস্তৃতি সমাজের সর্বক্ষেত্রে।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রয়োজনমত কারিগর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি তৈরি করা; ছাত্রদের বিজ্ঞানসচেতন করে তোলা নয়, তাদের যুক্তিবাদী মন গড়ে তোলা নয়, সংস্কারমুক্ত করা নয়। তাই ক্লাসে গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়বার পরেও সে মুক্তিস্নান করে গ্রহণ শেষ হবার পর। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের বৈজ্ঞানিক কারণ জানবার পরেও শীতলা মা দিয়ে দেবীর পূজা দেয়। এই কথা মনে রাখা দরকার যে, তথ্য বিশ্লেষণ করে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। তাই ছাত্রদের বিজ্ঞান-শিক্ষা এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে তারা তথ্যকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখে। আমাদের দেশে এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন। ছাত্রদের তাদের নিজেদের আশেপাশের জিনিস ও সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবার, নিজেদের পাঠ্যবিষয়ে নতুন করে ভাববার উৎসাহ দেওয়া উচিত, কারণ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে চিন্তা করা যতক্ষণ না মানসিক অভ্যাসে পরিণত হয়, ততক্ষণ বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞান-শিক্ষকদের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

যে সব বিজ্ঞানী সমাজের প্রগতি চান, তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশী। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে যেমন তাঁদের আত্মনিয়োগ করতে হবে, তেমনই সমাজের বৈজ্ঞানিক চিন্তার মান উন্নত করতে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ যে কোন দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি শুধু সেই দেশের বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান-গবেষণার মান ও তার অগ্রগতির উপর

নির্ভর করে না—দেশের জনসাধারণের বিজ্ঞান সচেতনতার মানের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া দেশের জনসাধারণকে অন্ধ সংস্কারের হাত থেকে মুক্ত করে তাদের যুক্তিবাদী করে তুলতে না পারলে দেশের সমাজব্যবস্থার বাঞ্ছিত পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর এই বাঞ্ছিত পরিবর্তন ছাড়া বিজ্ঞানের অমূল্য দান সামগ্রিকভাবে জনস্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারবে না; ফলে বিজ্ঞান-সাধনা হবে ব্যর্থ।

পারমাণবিক তাপচুল্লী

দেবেন্দ্রবিজয় গুপ্ত

পরমাণুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ আমাদের দেশে ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে। তারাপুরে এর শুভ সূচনা। রাণা প্রতাপসাগর আর কলপক্কমের নামও আজকাল অপরিচিত নয়।

জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় জলের শক্তিতে টার্বাইন ঘোরে; তাপ-বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বাষ্পের

1নং চিত্র

শক্তির রূপান্তর ও বিদ্যুৎ উৎপাদন।

শক্তিতে। বাষ্প পাওয়া যায় জল ফুটিয়ে। জল ফোটাবার জন্যে প্রয়োজন কয়লা বা তেল। পরমাণুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ সবই একরকম; তফাৎ শুধু এইটুকু যে, এটি কয়লা বা তেল ব্যবহার না করে কয়েক রকমের মৌলের (Element) কেন্দ্রীয় বিভাজনকে (Nuclear fission) কাজে লাগানো হয়। (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

পরমাণুশক্তি থেকে তাপ সৃষ্টি কি করে হয়? হয় পরমাণুর কেন্দ্রীন বিভাজনের দ্বারা। কেন্দ্রীনকে নিউট্রন কণিকার দ্বারা আঘাত করলে সেটা বিভক্ত হয় এবং অংশগুলি প্রচণ্ড শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই সব কণিকার গতিশক্তি তাপশক্তিতে এবং পরে তা বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিটি কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে বাড়তি 2/3টি নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। সেগুলি অন্য কেন্দ্রীন বিদীর্ণ করে এবং ঐ হিসাবেই বাড়তি নিউট্রন সৃষ্টি করে। এই-

ভাবে প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। যত বেশী কেন্দ্রীন বিদীর্ণ হবে, তত বেশী তাপ সৃষ্টি হবে।

শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরমাণুর কেন্দ্রীনকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবার যে ব্যবস্থা, তাকে আমরা রিয়্যাক্টর বা সাধারণভাবে পারমাণবিক তাপচুল্লী বলতে পারি। তবে এই চুল্লী সাধারণ চুল্লী নয়। এর অসাধারণত্ব বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করাই হলো এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তাপচুল্লীর বিভিন্ন অংশ হলো: (ক) জ্বালানী—যা কেন্দ্রীন বিভাজন পদ্ধতিতে তাপ উৎপন্ন করে (খ) মন্দক—যা নিউট্রন কণিকার সদ্ব্যবহার করে চুল্লীর কর্মক্ষমতা বাড়ায়; (গ) নিয়ন্ত্রণ দণ্ড—যা তাপোৎপাদনের শক্তি প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত করে; (ঘ) শীতলক—যা তাপকে পরিবাহিত করে মূল চুল্লীকে মাত্রাতিরিক্ত গরম হতে দেয় না। ঐ পরিবাহিত তাপে জল ফুটে বাষ্প হয়। (ঙ) প্রতিফলক—যা নিউট্রন কণিকাগুলিকে যথাসম্ভব প্রতিফলিত করে জ্বালানী ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনে এবং অন্য কেন্দ্রীনে আঘাত করবার সুযোগ দেয়; (চ) তেজস্ক্রিয়তা নিরোধক ব্যবস্থা। (2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

2নং চিত্র
পারমাণবিক তাপচুল্লীর বিভিন্ন অংশ।

জ্বালানী

পারমাণবিক জ্বালানী হলো সেই যৌগ, যার কেন্দ্রীন নিউট্রন কণিকার দ্বারা বিভাজিত হয়। যৌগের যে সব সমস্থানিক (Isotope) জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো ইউরেনিয়াম-235, ইউরেনিয়াম-233, প্লুটোনিয়াম-239। তাছাড়া যে সব যৌগকে সম্ভাব্য জ্বালানী (Fertile) হিসেবে গণ্য করা যায়—অর্থাৎ যেগুলি আদিতে জ্বালানী না হলেও নিউট্রন প্রতিক্রিয়ার ফলে রূপান্তর ঘটিয়ে জ্বালানীতে (Fissile material) পরিণত হয়, তা হলো ইউরেনিয়াম-238 (যা পরে দাঁড়ায় প্লুটোনিয়াম-239-এ) এবং থোরিয়াম-232 (পরে ইউরেনিয়াম-233)।

জ্বালানীর মধ্যে একমাত্র ইউরেনিয়াম-235 স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। স্বাভাবিক

ইউরেনিয়ামের প্রায় সবটাই ইউরেনিয়াম-238, ইউরেনিয়াম-235-এর পরিমাণ মাত্র 0·7%। জ্বালানীতে ইউরেনিয়াম-235-এর পরিমাণ যত বাড়ানো যায়, জ্বালানী হিসাবে ততই সেটা কার্যকর এবং পরিমাণও তখন কম লাগে।

কি ভাবে, কি আকারে এই জ্বালানী ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করে নানা অবস্থার উপর। অধিকাংশ চুল্লীতেই কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করা হয়—ইউরেনিয়াম, ইউরেনিয়াম অক্সাইড বা ইউরেনিয়াম কার্বাইড হিসাবে পাত্ বা দণ্ডে পরিণত করে। জল, বাতাস ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া থেকে জ্বালানীকে রক্ষা করবার জন্যে ধাতব আবরণের ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে যে সব অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেগুলিও বাইরে ছড়াতে পারে না এই আবরণের জন্যে।

কোন কোন তাপচুল্লীতে তরল জ্বালানীর ব্যবস্থা আছে—জলে দ্রবীভূত ইউরেনিয়াম লবণ, অন্য লবণের সঙ্গে তরল অবস্থায় ইউরেনিয়াম লবণ বা অন্য কোন তরল সঙ্কর (Liquid alloy) হিসাবে।

মোটা মোটা জ্বালানী দণ্ডের পরিবর্তে সরু সরু দণ্ড বা পাত্ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়—অবশ্য ইউরেনিয়াম-235-এর পরিমাণ যত বেশী রাখা যায় ততই ভাল। সরু হলে নিউট্রন প্রতিক্রিয়ার জন্যে পরিসর বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু বেশী সরু হলে আবার ওগুলির ধাতব আবরণের জন্যে খরচও বাড়ে। নিউট্রনও বেশ কিছু নষ্ট হয়। কারণ সব আবরণই কিছু কিছু নিউট্রন শোষণ করে।

জ্বালানীর আচ্ছাদক বা আবরণ হিসাবে ব্যবহার করবার আগে দেখতে হবে বস্তুটি ক্ষয়-নিবারক ও উচ্চতাপ সহনক্ষম কি না। তাছাড়া নিউট্রন যত কম শোষণ করে, ততই ভাল। সেই সঙ্গে আছে আর্থিক মূল্য। এসব দিকে লক্ষ্য রেখে যেসব পদার্থ আবরণ তৈরির কাজে লাগে, তা হলো অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্নেশিয়াম, জারকোনিয়াম (বা তার সঙ্কর) এবং বিশেষ ইস্পাত। জারকোনিয়ামের সঙ্কর zircaloy আচ্ছাদক হিসাবে খুবই উপযোগী—তবে ব্যয়বহুল। সবগুণসম্পন্ন না হলেও এবং নিউট্রন কিছু শোষণ করলেও কাজেও বিশেষ ইস্পাতে খরচ অনেক কম। অনেক চুল্লীতে ম্যাগ্নক্স (Magnox) নামে ম্যাগ্নেশিয়াম সঙ্কর ব্যবহার করা হয়।

তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও অন্যান্য নানা কারণে জ্বালানীর পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে। আবার বিভাজনঘটিত পদার্থগুলি বেশী পরিমাণে নিউট্রন শোষণ করে আসল জ্বালানীর কর্মক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়। এসব থেকে অব্যাহতি পেতে হলে কঠিন জ্বালানীর চেয়ে তরল জ্বালানী ভাল। চুল্লীর কাজ একদম বন্ধ না করে জ্বালানীর কিছুটা অংশ পরিশুদ্ধ করে সেটা আবার চুল্লীতে প্রবেশ করিয়ে বাকী অংশটাও শোধন করা যায়। তাছাড়া এতে দণ্ড বা পাতের প্রয়োজন নেই, নেই ধাতব আবরণেরও।

সংঘট্টক ও প্রতিফলক

একটা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পরিসরে অনেকগুলি গোলক রেখে একটাকে ধাক্কা দেওয়া হলো। সেটা অন্য গোলকে লাগলে গতিবেগ কিছুটা কমে, পথও পরিবর্তিত হয়। ফলে আশেপাশের অন্য গোলকের সঙ্গে ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা থাকে। গোলকটিকে যদি খুব জোরে ধাক্কা দেওয়া হয়, তবে হয় সেটা একদম সোজা বেরিয়ে যাবে, নয়তো এক-আধটা গোলকে ধাক্কা খাবে। পরমাণুর কেন্দ্রীন বিভাজনের ক্ষেত্রেও তাই। প্রথম যে নিউট্রন কেন্দ্রীনে আঘাত করে বিভাজন ঘটায়, তার ফলে 2 থেকে 3টি নিউট্রন সৃষ্টি হয়। ঐগুলি অনুরূপ ভরের (Mass) অন্য কেন্দ্রীনে আঘাত করলে গতিপথ ও বেগ,

পরিবর্তিত ও প্রশমিত হয়। যত বেশী তা হয়, তত বেশী অন্য কেন্দ্রীনে আঘাত করবার সুযোগ ঘটে। পারমাণবিক তাপচুল্লীতে মন্দক (Moderator) ও প্রতিফলকের (Reflector) কাজ অনেকটা এক রকম—যতটা পারা যায় নিউট্রনের সদ্ব্যবহার। প্রতিফলকে ধাক্কা খেয়ে নিউট্রনগুলি জ্বালানী কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসে, ফলে কেন্দ্রীনে ধাক্কা খাবার সুযোগ বাড়ে।

মন্দক হিসাবে ব্যবহার করতে হলে যে গুণ থাকা দরকার—তা হলো কম পারমাণবিক ওজন বা ভরসংখ্যা (Mass no.) এবং কম নিউট্রন শোষণ-ক্ষমতা। জল, ভারী জল (Heavy water), বেরিলিয়াম (Beryllium) বা তার অক্সাইড, অঙ্গার বা গ্র্যাফাইট—এগুলিকে সাধারণতঃ মন্দক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে ভারী জলই সবচেয়ে উপযোগী; তবে এর খরচ বেশী। উপযোগিতার হিসাবে সেটি অবশ্য গৌণ। বেরিলিয়াম ও তার অক্সাইডও ভাল নিয়ামক; এদের তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা খুব বেশী। কিন্তু এরা ভঙ্গুর স্বভাবের, ধাতু হিসাবেও মহার্ঘ। ভঙ্গুর হবার দরুণ পাত্ বা দণ্ডে পরিণত করাও আয়াসসাধ্য। তাছাড়া খুব উত্তপ্ত অবস্থায় জল ও বাতাসের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটে।

বেরিলিয়ামের তুলনায় গুণগত উৎকর্ষ কিছু কম হলেও অনেক চুল্লীতে গ্র্যাফাইট ব্যবহার করা হয়। এর খরচ কম, উত্তাপের ফলে উৎকর্ষ বাড়ে। যে সব চুল্লীর তাপমাত্রা খুব বেশী, সেখানে গ্র্যাফাইট খুব কার্যকর।

নিয়ন্ত্রণ দণ্ড

পৃথন-প্রতিক্রিয়া একবার শুরু হলে সেটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে; শক্তি তথা তাপও বেশী করে পাওয়া যায়। সেই তাপকে ঠিকমত পরিবাহিত না করতে পারলে সমূহবিপদ। উত্তাপের ফলে জ্বালানী দণ্ডগুলি পর্যন্ত গলে যেতে পারে। কোন কারণে যদি পাম্প খারাপ হয়, তবে শীতলক (Coolant) ঠিকমত সঞ্চালিত না হওয়ায় তাপ অন্যত্র পরিবাহিত হতে পারে না। সে অবস্থায় চুল্লীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে সবচেয়ে বড় কাজ।

চুল্লীর কার্যকর্ম প্রধানতঃ দুটি জিনিষের উপর নির্ভরশীল—নিউট্রনের স্রোত ও জ্বালানীর কেন্দ্রীন সংখ্যা। প্রথমটাকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জ্বালানী কেন্দ্রে যদি এমন কোন পদার্থ প্রবেশ করানো যায়, যা বেশী মাত্রায় নিউট্রন শোষণে সক্ষম, তবে চুল্লীর কাজ আপনা থেকেই কমে বা বন্ধ হয়ে যাবে। বেশী কালি পড়ে গেলে ব্লটিং পেপার দিয়ে যেমন তা শোষণ করা হয়, বেশী নিউট্রন ক্রিয়াশীল হলেও নিয়ন্ত্রণ দণ্ড (Control rod) দিয়ে তেমনি নিউট্রন শোষণের ব্যবস্থা করা হয়। বোরন, ক্যাডমিয়াম, হাফনিয়াম প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ দণ্ডের আকারে জ্বালানী কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয় প্রয়োজন বোধে।

শীতলক

শীতলকের (Coolant) কাজ হলো চুল্লীর তাপকে পরিবাহিত করে তার দ্বারা জলকে বাষ্পে পরিণত করা। এই বাষ্পের শক্তিতেই টার্বাইন ঘোরে।

আদর্শ শীতলকের নাম করা সহজ নয়। পরিস্থিতি ও প্রকৃতি বিবেচনা করে এক এক ধরণের শীতলকের এক এক ধরণের উপযোগিতা।

শীতলক চার ধরণের: (ক) সাধারণ বা ভারী জল; (খ) দ্রবীভূত ধাতু, (গ) জৈব তরল পদার্থ (হাইড্রোকার্বন) এবং (ঘ) বায়বীয় পদার্থ।

তাপনিঃসরণ ও পরিবহন ধর্মের বিচারে সব ধরণের জলই ভাল শীতলক। তাছাড়া এদের মন্দক (Moderator) হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তবে তাপমাত্রা বেশী হলে বেশী চাপেরও

প্রয়োজন—নইলে জল ফুটতে শুরু করবে। আবার তাপের সঙ্গে বেশী চাপ হলে জলের দ্রাবকতা বেড়ে যায়; অনেক কিছুই তখন জলে দ্রবণীয়। তাই জ্বালানী দণ্ডের আবরণ এমন হওয়া উচিত যে, ঐ অবস্থাতেও জলে তা অবিকৃত থাকে। বিশেষ ইস্পাত বা জারকোনিয়ামের সঙ্কর এই অবস্থায় ব্যবহার করা চলতে পারে।

যে সব চুল্লীতে তাপের পরিমাণ বেশী, সেখানে সোডিয়াম ব্যবহার খুবই উপযুক্ত (গলিত অবস্থায়)। এক্ষেত্রে তাপ বেশী হলেও বেশী চাপের প্রয়োজন হয় না; তাপ পরিবহন ক্ষমতাও এর যথেষ্ট। অসুবিধা শুধু এই যে, জল বা বাতাসের সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া ঘটে আর এই ধাতুকে গলিত অবস্থায় রাখতে হলে বরাবরই বেশী তাপের প্রয়োজন। তাছাড়া কিছু কিছু নিউট্রন শোষণ করে তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক সোডিয়াম-24 সৃষ্টি হয়।

এমন এক ধরণের শীতলকের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার ধর্ম সোডিয়াম ও জলের মাঝামাঝি। এটা এক ধরণের জৈব যৌগিক (Organic compound), নাম পলিফিনাইল। তবে এর তাপ-পরিবহন ক্ষমতা সোডিয়ামের চেয়ে কম।

যে সব বায়বীয় পদার্থ শীতলক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্স ও বৃটেনের অনেক বড় বড় তাপচুল্লীতে এর ব্যবহার হয়।

তেজস্ক্রিয়তা-নিরোধক ব্যবস্থা

পারমাণবিক তাপচুল্লী থেকে নানা ধরণের বিকিরণ শুরু হয়। এগুলি জীবদেহের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। এই তেজস্ক্রিয়তা যাতে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা আছে। এই নিরোধক ব্যবস্থা দু-রকমের। একটা হলো জ্বালানী দণ্ডগুলি একদম ঘিরে কয়েক ইঞ্চি পুরু লোহা বা ইস্পাতের চাদরের আবরণ। দ্বিতীয়টা হলো সারা চুল্লীটা ঘিরে বাইরের চারপাশে কয়েক ফুট চওড়া কংক্রীটের আস্তরণ। এখন আবরণটা গামা রশ্মি শোষণ করে। পূর্ণ নিরাপত্তার জন্যে দ্বিতীয় আবরণ। এটা নিউট্রন, গামা রশ্মি সবই শোষণ করে।

জ্বালানীর সদ্ব্যবহার

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের আসল সমস্যা হলো জ্বালানী এবং তার সদ্ব্যবহার। ইউরেনিয়াম-235 হলো সব ধরণের পারমাণবিক জ্বালানী উৎপাদনের আসল চাবিকাঠি। এটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামের 141 ভাগের মধ্যে জ্বালানী (অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-235) মাত্র 1 ভাগ। অর্থাৎ একভাগ জ্বালানীর সঙ্গে 140 ভাগ অজ্বালানী; এ এক মারাত্মক অপচয়। তাই সব পারমাণবিক তাপচুল্লীর লক্ষ্য হলো জ্বালানী ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য জ্বালানীর উৎপাদন।

ইউরেনিয়াম-235 কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে যে সব বাড়্তি নিউট্রন পাওয়া যায়, তার অনেকটাই শোষণ করে ইউরেনিয়াম-238। নিউট্রন প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে এটি পরিণত হয় প্লুটোনিয়াম-239-এ।

অনুরূপভাবে থোরিয়াম 232 পরিণত হয় ইউ-রেনিয়াম-233 এ। বলা বাহুল্য, শেষের দুটি হলো জ্বালানী।

প্রকৃতিতে পাওয়া ইউরেনিয়াম-235 নতুন করে পুনরুদ্ধার করা যায় না। একদিন না একদিন এই জ্বালানীর শেষ হবে। তাই পরমাণুশক্তি সম্বন্ধীয় কর্মসূচীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সময় থাকতেই আমাদের অন্য জ্বালানীর দিকে মন দিতে হবে। তাই এমন তাপচুল্লী নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে শুরুতে কিছু জ্বালানী দিয়ে কাজ শুরু করলেও পরে শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধরণের পারমাণবিক জ্বালানী তৈরি হয় বেশী। এদের দ্রুত উৎপাদক তাপচুল্লী (Fast Breeder Reactor)। আমাদের দেশের পারমাণবিক শক্তিসংক্রান্ত রূপায়ণ কর্মসূচীতে এটি অন্তর্ভুক্ত।

লৌহ

মণীন্দ্রনাথ দাস

এই জগতে মৌলিক পদার্থের মধ্যে ব্যাপকতায় লোহের স্থান চতুর্থ এবং ধাতুর মধ্যে দ্বিতীয়। পৃথিবীর বহির্ভাগের মাটি ও পাথরের উপাদান শতকরা চার ভাগ লৌহ। মাঠঘাটি ও গৈরিক মৃত্তিকার বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ লোহের উপস্থিতি, লোহের জন্যেই রক্তের রং লাল, গাছের পাতা সবুজ। মানবদেহে ·004% অংশ লৌহ আছে। প্রস্তরযুগ ও তাম্রযুগের পর লৌহযুগের আবির্ভাব, বিগত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে মানুষ লোহের ব্যবহারে অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাভ করেছে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় লোহের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব ধাতুর মধ্যে লোহই শ্রেষ্ঠ। অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা এবং যানবাহন নির্মাণে লোহের ভূমিকা বিশিষ্টতাব্যঞ্জক। অন্যান্য সব ধাতুর চেয়ে লোহের উৎপাদন দশগুণ বেশী।

হয়তো লক্ষ বছর আগে গুহাবাসী আদিম মানব চকমকি পাথরের উপর গন্ধকঘটিত লৌহ খনিজ মার্কাসাইট ঠুকে প্রথমে আগুন জালিয়েছিল। প্রাচীন কালের আদিম মানুষ খুব সম্ভবতঃ প্রথমে মহাশূন্য থেকে আগত উল্কার নিকেলযুক্ত লৌহ কাজে লাগায়। স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি খৃষ্টপূর্ব 3400 বছর আগেকার নীলোপলের সঙ্গে গাঁথা এই রকম লৌহনির্মিত পুঁতির মালা ঈজিপ্টের কোন সমাধিস্থান থেকে সংগ্রহ করেন। খৃষ্টের জন্মের 2900 বছর পূর্বেকার লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি মিশরের চিওপস্ পিরামিডে পাওয়া গেছে। খৃষ্টপূর্ব 1350 বছর আগেকার তুতানখামেনের কবরে লৌহনির্মিত ছোরা দেখা গেছে। উত্তর সিরিয়ার এক জায়গা খুঁড়ে প্রায় 4700 বছর পূর্বেকার লৌহনির্মিত গৃহ সামগ্রী বের করা হয়েছে। ইরাকের অন্তর্গত খোরসাবাদ খনন করে সম্রাট সারগণের (খৃষ্টপূর্ব 722-705) রাজপ্রাসাদে সঞ্চিত প্রায় 150 টন লৌহ-শৃঙ্খল, যন্ত্রপাতি, হাতুড়ি ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে এশিয়া মাইনরের অধিবাসী হিট্টাইটরা (খৃষ্টপূর্ব 1400) লৌহ নিষ্কাশনবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ হয়ে উঠেছিল।

চার হাজার বছর পূর্বে রচিত হিন্দুদের আদি গ্রন্থ বেদে লৌহ ও অয়স শব্দটি অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এই অয়স মানে লৌহ। অন্যান্য সংস্কৃত পুঁথিপুস্তকে অয়সার (Pig iron) কালায়স, তীক্ষ্ণ লৌহ (Steel) ও কান্ত লৌহ (Wrought iron) ইত্যাদি নানারকম লৌহ ধাতুর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ জাতকে ইস্পাতের উল্লেখ দেখা যায়। এদেশে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর সমাধিস্থান খনন করে ইস্পাতের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তক্ষশীলার অন্তর্গত ভিরমুণ্ড খনন করে যে লৌহসামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল, স্যার জন মার্শালের মতে সেগুলি অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর আগেকার। সাম্প্রতিক কালে উত্তর প্রদেশের ইটাওয়া জেলার অন্তর্গত আতারঞ্জি-খেরায় ঐরূপ আর একটি স্তূপ খুঁড়ে অধ্যাপক গৌড় চিত্রিত ধূসর পাত্র ও জৈব পদার্থের সঙ্গে কিছু লৌহনির্মিত জিনিস আবিষ্কার করেন। রেডিও-কার্বন-তারিখনিরূপণ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এই লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি খৃষ্টের জন্মের 1000 থেকে 1100 বছর পূর্বেকার বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারত

বিজয়ের পর আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাবের রাজাদের কাছ থেকে 30 পাউণ্ড উৎকৃষ্ট ভারতীয় ইস্পাত, উপহারস্বরূপ গ্রহণ করেন। অতীত কালে ভারতের ইস্পাত উচ্চ দামে দামাস্কাসে রপ্তানী হতো আর সেই দেশে তা থেকে তীক্ষধার তরবারী নির্মাণ করা হতো। এবং কুমারগুপ্ত তাঁর পিতার স্মৃতি রক্ষার জন্যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দিল্লীতে যে 24 ফুট উঁচু ও 6 টন ভারী বিরাট লৌহস্তম্ভ স্থাপন করেন, তা আজও লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। আশ্চর্যের বিষয় দেড় হাজার বছর পরেও অনেক ঝড়বৃষ্টি সত্ত্বেও এই স্তম্ভ গাত্রে কোনরকম মরচে পড়ে নি বা দাগ ধরে নি। আবু পর্বত ও ধারায় প্রাচীন যুগের অনুরূপ বড় বড় লৌহস্তম্ভ এখনও বিদ্যমান। কোণারকের মন্দিরের ছাদে সাত-শ' বছর আগেকার তৈরি লৌহনির্মিত কড়ি এখনও অক্ষত আছে।

খৃষ্টের জন্মের হাজার বছর পূর্বে লিখিত গ্রীক কবি হোমারের কাব্যে লৌহ ও ইস্পাতের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর সময় সচরাচর যোদ্ধারা পিতলের তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে লড়াই করতো। পুরাকালে লৌহের প্রতীক চিহ্ন ছিল রণদেবতা মঙ্গলের ঢাল ও বর্শা। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কেল্টিক অধিবাসীরা সম্ভবতঃ বৃটেনে লৌহশিল্পের প্রবর্তন করে। ইংল্যাণ্ডে উইনচেষ্টার গির্জায় হাজার বছরের কারুকার্যখচিত পুরনো একটি লৌহনির্মিত পর্দা (Grille) আছে। চীনদেশের প্রায় হাজার বছর পূর্বেকার লোহার ঘণ্টা এবং চার-শ' বছর আগেকার লৌহনির্মিত বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্যারিসের সুপ্রসিদ্ধ চার্চ নটারডামে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত ফুলপাতাযুক্ত লৌহদরজা এখনও অবিকৃত রয়েছে। চীনদেশে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লৌহনির্মিত চিমটা, করাত ও ঘূর্ণীযন্ত্র (Lathe) ছিল। কাঁচি বাইজানটাইনদের (400 থেকে 1400 খৃষ্টাব্দ) আবিষ্কার, দু মধ্যযুগের জিনিষ। খনিজ পদার্থ থেকে লৌহ নিষ্কাশনের জন্যে হাওয়া-চুল্লীর ব্যবহার জার্মেনীতে আরম্ভ হয় 1350 সাল থেকে এবং বৃটেনে শুরু হয় 1500 খৃষ্টাব্দ থেকে। জল-বায়ুর প্রভাবে শীঘ্রই লৌহনির্মিত জিনিষে মরচে ধরে যায়। সে জন্যে পুরাকালের অধিকাংশ লৌহনির্মিত দ্রব্যসামগ্রী বিনষ্ট হয়ে গেছে।

প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের মতে, পৃথিবীতে প্রথমে লৌহমুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল। রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজারের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বৃটেনে নির্দিষ্ট ওজনের লৌহদণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হতো।

আমেরিকায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বাসের আগমনের পর লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের উপস্থিতির পর লৌহযুগের সূচনা হয়।

সাধারণতঃ বিশুদ্ধ লৌহ কদাচিৎ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্সিজেন, জল বা গন্ধকের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় লৌহ খনিজ অবস্থান করে। কেবল আকাশ থেকে পড়া উল্কাবস্তু প্রায়ই বিশুদ্ধ লৌহ, তবে তাতে অল্পমাত্রায় নিকেল থাকে। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় গ্রুটফন্টেনে আছে। এর ওজন প্রায় 50 টন, এটি 10 ফুট লম্বা, 9 ফুট চওড়া, 3 ফুট মোটা। এতে পাঁচ ভাগ লৌহ ও এক ভাগ নিকেল রয়েছে। উত্তর মেরু আবিষ্কারক কমাণ্ডার পিয়ারী 1897 সালে গ্রীনল্যাণ্ডের নিকটবর্তী কোন দ্বীপ থেকে 36½ টন ভারী লৌহ-নিকেলের একটি বিরাট উল্কাবস্তু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন—এটি 11 ফুট দীর্ঘ, 7 ফুট চওড়া ও 5 ফুট মোটা—এখন নিউ ইয়র্কে রক্ষিত আছে। মুসলমানদের তীর্থস্থান কাবা মসজিদে যে ছয় ইঞ্চি পরিমিত

কালো প্রস্তর আছে, সেটিও একটি উল্কাখণ্ড বলে অনেকে অনুমান করেন। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন যে, এরূপ আকাশ থেকে পড়া একটি উল্কাপিণ্ড গলিয়ে তিনি একটি তলোয়ার তৈরি করিয়েছিলেন।

লোহের প্রধান খনিজ হিমাটাইট, ম্যাগ্নেটাইট, লিমোনাইট ও সাইডেরাইট। হিমাটাইটের রং কৃষ্ণাভ লাল, আপেক্ষিক গুরুত্ব 5, কাঠিন্য 5 থেকে 6, রাসায়নিক উপাদান লোহ অক্সাইড Fe_2O_3 এবং এতে শতকরা 70 ভাগ লোহ থাকে। গোল গোল গুটির আকার হলে একে বৃক্ক-খনিজ (কিড্‌নি ওর) বলা হয়। কখনও কখনও মাছের ডিমের মত গুটিকাকার হিমাটাইটও দেখা যায়। ফুলের পাপড়ির মত হিমাটাইটের নাম লোহ গোলাপ। ম্যাগ্নেটাইটের সংস্কৃত নাম অয়স্কান্ত এবং এই লোহশিলা চৌম্বক গুণসম্পন্ন। সে জন্যে এর আর এক নাম লোড স্টোন। কোন কোন ম্যাগ্নেটাইটের চৌম্বক শক্তি এত প্রবল যে, এর কাছে লোহচূর্ণ রাখলে ওতে আটকে যায়। এরূপ এক টুকরা ম্যাগ্নেটাইট সুতা বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে। চতুর্দশ শতক থেকে সমুদ্রে দিক নির্ণয়ের জন্যে কম্পাসের প্রবর্তন হয়। প্রথম প্রথম এই উদ্দেশ্যে কাঠির সঙ্গে ম্যাগ্নেটাইট জুড়ে জলপূর্ণ পাত্রে ভাসানো হতো। ডক্টর রমেশ মজুমদার বলেন, প্রাচীন ভারতে সাগরগামী জাহাজে দিক ঠিক করবার জন্যে এই রকম 'মৎস্যযন্ত্রের' ব্যবহার ছিল। আকরিক ম্যাগ্নেটাইট নীলাভ কালো পদার্থ। এর রাসায়নিক উপাদান লোহ ও অক্সিজেন Fe_3O_4, সে জন্যে চুম্বকের দ্বারা সজোরে আকৃষ্ট হয়। এই খনিজে 72% লোহ আছে। ম্যাগ্নেটাইটজাতীয় লোহ মহীশূরে ও সুইডেনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অয়স্কান্ত আকরের জন্যে ইউটাহ অঞ্চলে এক অংশের নাম ম্যাগ্নেট মাউন্টেন বা চুম্বক পাহাড়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত আর্কানসাস প্রদেশের এক জায়গার নাম চুম্বক উপত্যকা (ম্যাগ্নেট কোভ)। ভারতবর্ষে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূর এবং মাদ্রাজে হিমাটাইট ও ম্যাগ্নেটাইটের খনি আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে লেক সুপিরিয়র অঞ্চলে হিমাটাইটের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। রাশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশে হিমাটাইটের বড় খনি আছে। ফ্রান্সের অন্তর্গত লোরেন অঞ্চলের হিমাটাইট আকরও উল্লেখযোগ্য। লিমোনাইট বা গেরিমাটির রং হলদে, রাসায়নিক উপাদান ফেরিক হাইড্রক্সাইড, আপেক্ষিক গুরুত্ব 3·5, কাঠিন্য 1 থেকে 5, এতে 60% লোহ আছে। সাইডেরাইট—রং বাদামী বা ধূসর, কাঠিন্য 4, আপেক্ষিক গুরুত্ব 3·8, এতে 48% লোহ। রাসায়নিক উপাদান $FeCO_3$ লোহ কার্বনেট সাইডেরাইট ক্রিস্টালের ঈষৎ মুক্তাভাব লক্ষণীয়। কখনও কখনও জলাভূমিতে লোহ কার্বনেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং এক জাতীয় লোহ-জীবাণু জলবিন্দু থেকে এই লোহকণিকা পৃথকীকরণে ব্যস্ত হয়, এর ফলে জলের তলায় অবক্ষিপ্ত লোহের স্তর জমতে থাকে। পাইরাইট বা মর্মাক্ষিকের রং ও ঔজ্জ্বল্য পিতলের মত। এই লোহ ও গন্ধকঘটিত খনিজ প্রধানতঃ সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়। এক এক সময় এদেরকে মূর্খের সোনা উল্লেখ করা হয়। এর কাঠিন্য 6, আপেক্ষিক গুরুত্ব 5। মর্মাক্ষিকে প্রায় 46% লোহ আছে। কখনও কখনও মর্মাক্ষিকপূর্ণ জীবাশ্ম (Fossil) দৃষ্টিগোচর হয়। এই জাতীয় জীবাশ্ম জার্মেনী, ইংল্যাণ্ড ও নিউইয়র্কে পাওয়া গেছে। বুথ গোলকের মত মর্মাক্ষিক নিউইয়র্ক অঞ্চলে দেখা যায়।

পৃথিবীতে আকরিক লোহ উৎপাদনে

ইউরোপের স্থান প্রথম, তারপর যথাক্রমে উত্তর আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ও আফ্রিকার নাম করা যেতে পারে। আমেরিকার মিনিসোটা অঞ্চলের হিবিং লৌহখনি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম, এই লৌহআকর পৌনে চার মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ এবং পাঁচ-শ' ফুট গভীর। বিগত 60 বছরে প্রায় এক-শ' কোটি টন লৌহখনিজ উত্তোলন করা হয়েছে।

1965 সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লৌহ-খনিজ উৎপাদনের হার এই রকম ছিল—রাশিয়া 9·2 কোটি টন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 4·6 কোটি টন, ফ্রান্স 2·1 কোটি টন, সুইডেন 1·8 কোটি টন, ভেনিজুয়েলা 1·1 কোটি টন, বৃটেন ·4 কোটি টন, মালয় ·4 কোটি টন, ক্যানাডা 1·9 কোটি টন, ভারত 1 কোটি টন, ব্রেজিল ·9 কোটি টন, চিলি ·8 কোটি টন, পশ্চিম জার্মেনী ·2 কোটি টন। এই সময় সমগ্র পৃথিবীতে মোট 31·6 কোটি টন খনিজ লৌহ সংগৃহীত হয়েছিল। এই সময়কার লৌহখনিজ উত্তোলনের শতকরা হিসাব প্রায় এই রকম—

রাশিয়া 25%, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 19%, চীন 10%, ফ্রান্স 4%, ক্যানাডা 5%, সুইডেন 5%, ভেনিজুয়েলা 5%, ভারত 3%, ব্রেজিল 2% এবং অন্যান্য 18%।

ভারতীয় লৌহের বার্ষিক হিসাব—বর্তমান ভারতবর্ষে প্রায় 2 কোটি টন আন্দাজ আকরিক লৌহ আহৃত হয়। প্রায় 90 লক্ষ টন লৌহখনিজ বিদেশে রপ্তানী হয়, যার মূল্য প্রায় 35 কোটি টাকা। প্রতি বছর বিদেশ থেকে 150 কোটি টাকার ইস্পাত ও লৌহনির্মিত দ্রব্যসামগ্রী এদেশে আমদানী করা হয়।

লৌহ তিন প্রকারের হয়ে থাকে—ঢালাই লৌহ (Cast iron), পেটাই লৌহ (Wrought iron) ও ইস্পাত (Steel)। ঢালাই লৌহে 2% থেকে 4% অঙ্গার থাকে, পেটাই লৌহে ·1% থেকে ·2% পর্যন্ত অঙ্গার আছে আর ইস্পাতে অঙ্গারের অনুপাত 3% থেকে 1·5% অবধি হয়। ঢালাই লৌহের সাহায্যে খাট, থাম, উনুন, রেলিং, বড় জলের পাইপ ও আধার তৈরি হয়। ঢালাই লৌহের গলনাঙ্ক 1200° সেন্টিগ্রেড। এই জাতীয় লৌহ কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ ও তাপসহ। এতে পান দেওয়া যায় না এবং একে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা সম্ভব হয় না। পেটা লৌহের সাহায্যে তার, পেরেক, চেন, ঘোড়ার নাল, জাহাজের নোঙর ইত্যাদি তৈরি হয়। এই লৌহের গলনাঙ্ক 1500° সেন্টিগ্রেড। এই শ্রেণীর লৌহ অত্যন্ত উত্তপ্ত করে পিটলে একখণ্ডের সঙ্গে অন্য খণ্ড জুড়ে যায়। এই লৌহ নরম ও নমনীয়। এর চার পাশে তার জড়িয়ে বিদ্যুৎ পরিচালনা করলে অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়, কিন্তু একে স্থায়ী চুম্বক করা যায় না। ইস্পাতের গলনাঙ্ক 1300° সেন্টিগ্রেড। এই জাতীয় লৌহ কঠিন অথচ স্থিতিস্থাপক। এই উভয় গুণের জন্যে বর্তমানে এর ব্যবহার ব্যাপক। ইস্পাত দিয়ে রেললাইন, ইঞ্জিন, জাহাজ, পুল, যন্ত্র, যান, কল, কড়ি ও ধারালো অস্ত্রাদি তৈরি হয়। ইস্পাতকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করে হঠাৎ ঠাণ্ডা তেল বা জলে ডোবালে খুব কঠোর ও ভঙ্গুর হয়ে যায়, তারপর ঐ ইস্পাত ধীরে ধীরে গরম করে আবার আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করলে কাঠিন্যের একটা সাম্যবস্থা আসে—এই প্রক্রিয়াকে পান দেওয়া (Tempering) বলে। ইস্পাতকে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা সহজ।

বাত্যাচুল্লীতে প্রতি দিন গড়ে 1000 টন ঢালাই লৌহ খনিজ লৌহপ্রস্তর উত্তপ্ত, বিজারিত ও বিগলিত করে তৈরি হয়। প্রায় 100 ফুট উঁচু খনিজের মত ইটের চুল্লী নির্মাণ করে তার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে উপর থেকে দু-ভাগ লৌহখনিজ (হিমাটাইট বা ম্যাগ্নেটাইট), এক ভাগ কয়লা ও আধ ভাগ চুন-

পাথর ঢালা হতে থাকে আর নীচ থেকে 800° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ প্রচণ্ড-বেগে চালনা করা হয়। এর ফলে চুল্লীর অভ্যন্তরে তাপমাত্রা সহসা 1600° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে এবং তার ফলে কয়লা প্রথমে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং তারপর উপরে উঠে কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। এই গ্যাস খনিজ প্রস্তরের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লোহকে বিজারিত করে। লোহখনিজের সঙ্গে সংলগ্ন কাদা-মাটি চুনা-পাথরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গলিত ধাতুমল রূপে নীচেকার এক ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর উত্তপ্ত গলিত লোহ অপেক্ষাকৃত ভারী বলে আরও নীচের দিকের আর একটি পৃথক পথ দিয়ে নির্গত হয়ে আসে। এরপর একেই ছাঁচে ঢেলে ঢালাই লোহ বলে অভিহিত করা হয়। 1964 সালে সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় 30 কোটি টন কাঁচা লোহ তৈরি হয়েছিল।

ঢালাই লোহে অনেকখানি অঙ্গার থেকে যায় বলে একে পেটাই লোহ করবার সময় এর সঙ্গে অধিক অক্সিজেনযুক্ত লোহখনিজ কিম্বা মরচেধরা অকেজো লোহখণ্ড উত্তপ্ত করে গলানো হয়। এর ফলে অতিরিক্ত অঙ্গার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে বের হয়ে যায় এবং সর্বশেষে প্রায় বিশুদ্ধ লোহ মণ্ডাকারে অঙ্গারশূন্য হয়ে অবশিষ্ট থাকে। এরই নাম পেটাই লোহ।

ইস্পাতে অঙ্গারের পরিমাণ ঢালাই লোহের চেয়ে কম এবং পেটাই লোহ অপেক্ষা অধিক মাত্রায় থাকে। সে জন্যে পেটাই লোহের সঙ্গে আরও অঙ্গার যোগ করে কিম্বা ঢালাই লোহ থেকে অতিরিক্ত অঙ্গার দূর করে ইস্পাত তৈরি হয়। পেটাই লোহ নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গারের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে কিম্বা ঢালাই লোহে অক্সিজেনবহুল খনিজ হিমাটাইট বা মরচে-পড়া পরিত্যক্ত লোহের সঙ্গে গলিয়ে মিলে ইস্পাত তৈরি হয়। 1855 খৃষ্টাব্দে হেনরী বেসেমার ইস্পাত তৈরির নতুন ও সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই প্রক্রিয়ায় ইস্পাত প্রস্তুত করতে হলে উত্তপ্ত গলিত ঢালাই লোহের মধ্য দিয়ে সজোরে বাতাস চালনা করা হয়। এর ফলে লোহের যাবতীয় অঙ্গার ও অবিশুদ্ধি জ্বলে গিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে বের হয়ে যায়, তারপর নির্দিষ্ট মাত্রায় অঙ্গার ও অন্যান্য ধাতু যোগ করা হয়।

লোহের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় অঙ্গার ও অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে বিবিধ গুণসম্পন্ন নানারকম শক্ত ইস্পাত তৈরি হয়। 73 ভাগ ইস্পাতের সঙ্গে 18 ভাগ ক্রোমিয়াম ও 8 ভাগ নিকেল গালিয়ে মরচে-শূন্য ইস্পাত বা ষ্টেনলেস ষ্টীল তৈরি হয়। এই প্রকার মরচেশূন্য ইস্পাতে নির্মিত বাসনপত্রাদি রন্ধন-কার্যে বিশেষ উপযোগী। ম্যাঙ্গানিজ 14 ভাগ ও ইস্পাত 86 ভাগ মিশিয়ে যে শক্ত ধাতু তৈরি হয়, তার সাহায্যে পাথর চূর্ণ করবার যন্ত্রাদি তৈরি হয়ে থাকে। যে জায়গায় সাধারণ ইস্পাতের রেলপথ মাত্র নয় মাস ঠিক থাকে, সে স্থলে ম্যাঙ্গানিজমিশ্রিত লোহ লাইন 22 বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে। ইনভার নামক ইস্পাতে শতকরা 61 ভাগ লোহ আর 36 ভাগ নিকেল থাকে। এই মিশ্র ধাতু তাপে অপরিবর্তনীয় ও চুম্বক শক্তিবিহীন। সে জন্যে এটি ঘড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্য দিকে 61 ভাগ লোহ, 13 ভাগ অ্যালুমিনিয়াম ও 25 ভাগ নিকেল ও 1 ভাগ কার্বন একত্র করে যে ইস্পাত তৈরি হয়, তার সাহায্যে খুব জোরালো চুম্বক গঠন করা যায়। সাধারণ ইস্পাতের সঙ্গে চুম্বক ঘষলে কিম্বা কোন ইস্পাতের চতুর্দিকে রবার মোড়া তামার তার কুণ্ডলী করে জড়িয়ে তার মধ্য দিয়ে [illegible] বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে ঐ লোহ স্থায়ী চুম্বকে

পরিণত হয়। দুই চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে আর সমধর্মী দুই চৌম্বক মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। অনবরত আঘাত পেলে কিম্বা 769° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হলে ইস্পাতের চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়। কাটবার কাজে ব্যবহার্য অস্ত্রাদি 95 ভাগ ইস্পাত ও 5 ভাগ টাংষ্টেন মিশিয়ে তৈরি হয়। মোটরের জন্যে যে ইস্পাত ব্যবহৃত হয়, তাতে 4·5% সিলিকন থাকে। ইস্পাতের সঙ্গে শতকরা 1 ভাগ ভ্যানেডিয়াম মিশিয়ে চাকার অক্ষদণ্ড তৈরি হয়।

1960 সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইস্পাত প্রস্তুতের পরিমাণ এই রকম ছিল :—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 8·8 কোটি টন, রাশিয়া 6·4 কোটি টন; জাপান 2·17 কোটি টন; পশ্চিম জার্মেনী 3 কোটি টন, গ্রেট বৃটেন 2·4 কোটি টন, সুইডেন ·3 কোটি টন; ফ্রান্স 1·7 কোটি টন; ক্যানাডা ·5 কোটি টন, অষ্ট্রেলিয়া ·3 কোটি টন; ভারত ·33 কোটি টন; দক্ষিণ আফ্রিকা ·2 কোটি টন; ইটালী ·8 কোটি টন।

1965 সালে সারা বিশ্বে 40 কোটি টন ইস্পাত প্রস্তুত হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা হার অনেকটা এই মাত্রায় ছিল :—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 27%; রাশিয়া 19%; পশ্চিম জার্মেনী 10%, জাপান 7%; বৃটেন 6%, ফ্রান্স 5%; চীন 5%; ইটালী 2%; পোলাণ্ড 2%; চেকোশ্লোভাকিয়া 2%; বেলজিয়াম 2%, ভারত 1%; অন্যান্য 12%।

বর্তমানে ভারতে ছয়টি ইস্পাতের কারখানায় বছরে প্রায় 60 লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়ে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের গারি ইস্পাতের কারখানা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম, এখানে প্রতি বছর গড়ে 72 লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়।

বিশুদ্ধ লোহের বর্ণ উজ্জ্বল ধূসর, আপেক্ষিক গুরুত্ব 7·85, গলনাঙ্ক 1530° সেণ্টিগ্রেড। লোহ 2735° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটতে আরম্ভ করে। লোহের তাপ সম্প্রসারণের ক্ষমতা প্রতি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে ·000011, আপেক্ষিক তাপ প্রতি গ্র্যাম প্রতি ডিগ্রীতে ·105–·114, তাপ পরিবহন ক্ষমতা প্রতি সেণ্টিমিটারে ·16 ক্যালোরি। প্যারিসে ইস্পাতের তৈরি হাজার ফুট দীর্ঘ যে ইফেল টাওয়ার আছে, তার উচ্চতা শীত গ্রীষ্মের প্রভাবে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি কমে বা বাড়ে। লোহার বিদ্যুৎ পরিচালন ক্ষমতা ·164 সেণ্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড, বৈদ্যুতিক বাধার পরিমাণ 20° সেণ্টিগ্রেডে ·041 ওম-সেণ্টিমিটার, এক বর্গ ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের দণ্ড প্রায় 80 টন ভারী ওজনের টান সহ্য করতে পারে। কিছুকাল পূর্বে একজন বৈজ্ঞানিক এক মিলিমিটারের লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র পাতলা কাচের মত স্বচ্ছ লোহার পাত্ তৈরি করেছিলেন। ইস্পাত রবারের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক। শব্দের গতি লোহের মধ্যে সেকেণ্ডে 17300 ফুট। ইস্পাতের কাঠিন্য $5\frac{1}{2}$ থেকে $6\frac{1}{2}$ পর্যন্ত হতে পারে। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় লোহ (53, 55, 59) তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে।

পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় $3\frac{1}{2}$ গ্র্যাম লোহ আছে। দুই ইঞ্চি লম্বা লোহ-পেরেকে যে পরিমাণ লোহ থাকে, সাধারণ মানুষের দেহে প্রায় ততখানি লোহ আছে। প্রতিদিন আমাদের প্রায় 10 থেকে 20 মিলিগ্র্যাম লোহের প্রয়োজন। শরীর সুস্থ রাখতে গেলে সারা বছর আমাদের প্রায় 5 গ্র্যাম আন্দাজ লোহ খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। রক্তের লোহিত কণিকা লোহসংযোগে গঠিত, রক্তে লোহের অভাব ঘটলে রক্তাল্পতা ব্যাধি হয়। চারাগাছ মাটি থেকে শিকড় দিয়ে খনিজ লবণের সঙ্গে লোহ গ্রহণ করতে সক্ষম হলে তবেই সবুজ বর্ণের

পরফিরিন বা ক্লোরোফিল গঠন করতে পারে। লোহের অভাব হলে গাছের পাতা হলদে ও বিবর্ণ হয়ে যায়। যবের আটা, পুঁদিনা, পেঁয়াজ, গুড়, পালং শাক ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃৎ ও হৃদে লোহ যৌগিক অবস্থায় বর্তমান।

লোহ অধিকাংশ অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস বিমুক্ত করে। সোনা, প্লাটিনাম অথবা রূপা কিংবা পারা, বিসমাথ বা তামাঘটিত তরল জলীয় দ্রবণে লোহ নিমজ্জিত করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ধাতুর সূক্ষ্ম কণা প্রক্ষিপ্ত হয়। আর্দ্র আবহাওয়ার সংস্পর্শে বেশী দিন থাকলে লোহ-নির্মিত জিনিষে মরচে ধরে যায়। মরচে জিনিষটা জলযুক্ত লোহ অক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়। তামাদি কোন উত্তম ধাতুর সংস্পর্শে এলে লোহে আরও তাড়াতাড়ি মরচে পড়ে। এর কারণ দ্বি-ধাতু সংযোগজনিত মৃদু বিদ্যুৎ-প্রবাহ। একবার সমুদ্রজল থেকে কোন জাহাজডুবির প্রায় দেড় বছর পরে কয়েকটি লোহনির্মিত কামানের গোলা উদ্ধার করা হয়। মরচে ধরে এই লোহার গোলকগুলি এতই নরম হয়ে গিয়েছিল যে, ছুরি দিয়ে সহজেই কাটা সম্ভব হচ্ছিল। মরচের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত লোহনির্মিত জিনিষের উপর তেল, রং, আলকাত্‌রা বা প্লাষ্টিকের প্রলেপ লাগানো হয় অথবা রং, দস্তা, ক্রোমিয়াম বা নিকেলের আবরণ দেওয়া হয়। লোহ লঘু অ্যাসিডে দ্রবণীয়। সাল-ফিউরিক অ্যাসিডে লোহ দিলে হরিৎবর্ণের হিরাকস ও হালকা হাইড্রোজেন গ্যাসের উদ্ভব হয়। হিরাকস রক্তবর্ধক ঔষধ হিসাবে খয়েরের সঙ্গে মিশিয়ে কালো কালি এবং নীল রং (প্রুশিয়ান ব্লু) তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়। লোহঘটিত যৌগিক পদার্থ ফেরাস অ্যাসিটেট ও ফেরিক ক্লোরাইড বস্ত্রাদির রং পাকা করবার জন্যে প্রযুক্ত হয়। কোন কোন চর্মরোগে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ বিশেষ কার্যকরী। উজ্জ্বল বেগুনী বর্ণের ফেরিক পটাসিয়াম সালফেটের নাম লোহ ফটকিরি।

তীব্র নাইট্রিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে লোহ দ্রবণীয় না হয়ে কতকটা নিষ্ক্রিয় (Passive) ভাবপ্রাপ্ত হয়। এরূপ নাইট্রিক অ্যাসিডস্পৃষ্ট লোহ আর কোন ধাতুঘটিত জলীয় দ্রবণ থেকে সেই ধাতু উৎক্ষিপ্ত করতে পারে না এবং লঘু অ্যাসিডেও তখন দ্রবীভূত হয় না। রাসায়নিকদের অভিমত—এই রকম নিষ্ক্রিয় লোহের গায়ে অক্সাইডের একটা পাত্‌লা পর্দা পড়ে যায় বলে ঐরূপ অবস্থান্তর ঘটে। আবার যদি ঐ প্রকার লোহকে বেশ করে ঘষে-মেজে বিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়, তাহলে পূর্বরূপ ফিরে পায়। লোহ-ঘটিত লবণ ফেরাস সালফেট বা কার্বনেট খোলা বাতাসে উত্তপ্ত করলে লাল রঙের ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এর আর এক নাম রুজ বা কুঙ্কুম। লাল রং হিসাবে এবং স্বর্ণালঙ্কার পালিশ করবার কাজে এই পদার্থের ব্যবহার আছে। চৌম্বক গুণসম্পন্ন লোহ অক্সাইড প্রস্তুত করতে হলে খোলা বাতাসে যে কোন লোহ বা লোহ অক্সাইড অনেকক্ষণ গরম করতে হয় অথবা রক্তাভ উত্তপ্ত লোহের উপর দিয়ে অনবরত জলীয় বাষ্প চালনা করা হয়।

অগ্নিশিখার উপর ইস্পাতের গুঁড়া ধরলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়ে যায়। উষ্ণ বাতাসে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড দ্রবণে যে কোন লোহঘটিত লবণ অল্পমাত্রায় দিলেও সুন্দর নীল বর্ণের আবির্ভাব হয়। ফেরিক লোহঘটিত জলীয় দ্রবণে বর্ণহীন পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট যোগ করলে অমনি রক্তের আভা দেখা যায়। এই পরীক্ষা এতই সূক্ষ্ম যে, লোহের পরিমাণ পনেরো লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র হলেও স্পষ্ট বোঝা যায়। লোহ অক্সালেটের মিহি গুঁড়া নিম্ন তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে বিজারিত করলে আশ্চর্য তাপোৎপাদক এক লোহচূর্ণ প্রস্তুত হয়। এই রকম আরো লোহচূর্ণ কোন বায়ুশূন্য শিশি থেকে মুক্ত বাতাসে ছড়িয়ে দিলে অগণিত আগুনের ফুলকির মত জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে পড়তে থাকে।

নিয়ন্ত্রিত তাপকেন্দ্রকীয় সংযোজন বিক্রিয়া

অরিন্দম ঘোষ

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উপর বিজ্ঞানীরা বিশেষ নজর দিয়েছেন। পারমাণবিক শক্তি দু-ভাবে পাওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের ন্যায় ভারী পরমাণুর কেন্দ্রক বিভাজন (Fission) বিক্রিয়ার দ্বারা এবং হাইড্রোজেনের ন্যায় হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রক সংযোজন (Fusion) বিক্রিয়ার দ্বারা। প্রথম বিক্রিয়ার সাহায্যে ঘটানো হয় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ এবং দ্বিতীয় বিক্রিয়ার সাহায্যে ঘটানো হয় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বানুযায়ী যদি কোন ভারী পরমাণুর কেন্দ্রক বিভাজিত হয়ে অন্য পরমাণুর কেন্দ্রকে পরিণত হয় অথবা যদি দুটি হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রক সংযোজিত হয়, তাহলে কিছু পরিমাণ ভরের বিলুপ্তি ঘটে এবং তা পরিণত হয় শক্তিতে। কিন্তু সমপরিমাণ পারমাণবিক জ্বালানী থেকে বিভাজনের দ্বারা যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, সংযোজনের দ্বারা তাথেকে অনেক বেশী পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। কাজেই হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংস-ক্ষমতা পরমাণু বোমার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এখন পরমাণু বোমার বিস্ফোরণকে পারমাণবিক চুল্লীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ঘটানো সম্ভব এবং বিভিন্ন দেশে এইভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণকে এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটানো সম্ভব হয় নি, অথচ তা করতে পারলে আমরা অনেক বেশী শক্তির অধিকারী হতে পারবো। বিভিন্ন দেশে এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সফলতা অর্জন করা যাবে। বর্তমান প্রবন্ধে নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রক-সংযোজন বিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হবে। তবে আলোচ্য বিষয়ে বিগত কয়েক বছরে এত উন্নতি সাধিত হয়েছে যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়।

সংযোজন বিক্রিয়া ঘটানো হয় হাল্কা পরমাণু, যথা—হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং এদের আইসোটোপের মধ্যে, যথা—

$${}_1D^2 + {}_1D^2 \rightarrow {}_2He^3 + {}_0n^1 + 3.25 \text{ Mev} \quad (\text{উন্মুক্ত শক্তি})$$

$${}_1D^2 + {}_1D^2 \rightarrow {}_1T^3 + {}_1H^1 + 4.03 \quad ,, \quad (\quad ,, \quad)$$

$${}_1D^2 + {}_1T^3 \rightarrow {}_2He^4 + {}_0n^1 + 17.6 \quad ,, \quad (\quad ,, \quad)$$

$${}_1D^2 + {}_2He^3 \rightarrow {}_2He^4 + {}_1H^1 + 18.3 \quad ,, \quad (\quad ,, \quad)$$

$${}_1T^3 + {}_1T^3 \rightarrow {}_2He^4 + 2{}_0n^1 + 11.3 \quad ,, \quad (\quad ,, \quad)$$
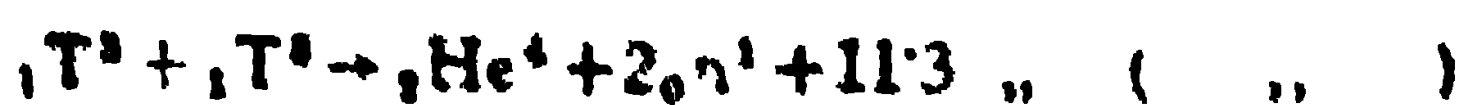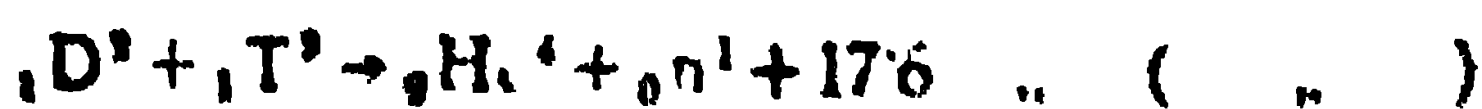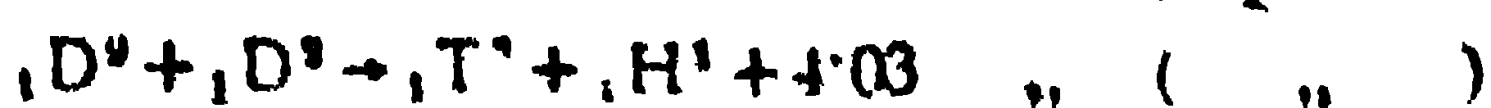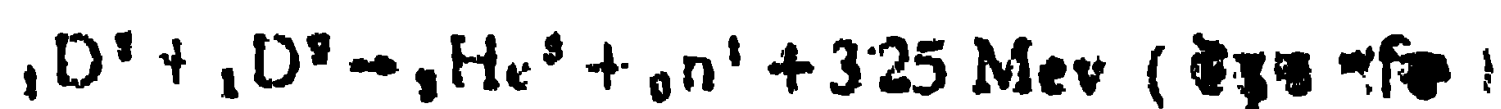
যেখানে ${}_1D^2$=ডয়টেরিয়াম, ${}_1T^3$=ট্রাইটিয়াম, ${}_0n^1$=নিউট্রন। এখন পরমাণু কেন্দ্রকগুলি ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হওয়ায় এদের নিজেদের মধ্যে সর্বদাই একটা বিকর্ষণ বল কাজ করে। একে বলে কুলম্বীয় বিকর্ষণ বল। কাজেই দুটি কেন্দ্রককে সংযোজিত করতে হলে তাদের এমন পরিমাণ

শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যা কুলম্বীয় বাধাকে অতিক্রম করে কেন্দ্রক দুটিকে সহজেই সংযোজিত করতে পারে। এই শক্তি সৃষ্টি করতে চাই বিপুল তাপমাত্রা (প্রায় 10^{8} °K) এবং এই বিপুল তাপমাত্রায় যে সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে, তাকে বলে তাপকেন্দ্রকীয় সংযোজন বিক্রিয়া (Thermo-nuclear fusion reaction)। হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে এই তাপমাত্রা সৃষ্টি করা হয় কেন্দ্রক বিভাজন বিক্রিয়া বা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের দ্বারা। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত সংযোজন বিক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় উচ্চ তাপমাত্রা এই পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা যাবে না, তার জন্যে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আবার এই উচ্চ তাপমাত্রায় বিক্রিয়ারত পরমাণুগুলি আয়নিত হয়ে যায়, যাকে বলে পদার্থের প্লাজ্মা অবস্থা (আয়ন ও ইলেকট্রনের সমাবেশ)। এই অত্যুত্তপ্ত প্লাজ্মাকে পারমাণবিক চুল্লীতে এমনভাবে আবদ্ধ রাখতে হবে, যাতে প্লাজ্মা কণাগুলি চুল্লীর দেয়াল স্পর্শ করতে না পারে, কারণ তাহলে প্লাজ্মা খুব সহজেই শীতল হয়ে আসবে এবং সংযোজন বিক্রিয়া থেমে যাবে। এই উদ্দেশ্যে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটানো হয়, কারণ প্লাজ্মার আহিত কণাগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হবে। তাছাড়া আরেকটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, তা হলো Lawson-এর শর্ত—যাতে সংযোজন বিক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ প্রযুক্ত শক্তির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়। Lawson-এর শর্ত হলো n (বিক্রিয়ারত পরমাণুগুলির ঘনত্ব) এবং t (প্লাজ্মার স্থিতি-কাল)-এর গুণফল 10^{14} (D−D বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে) বা 10^{16} (D−T বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে) -এর বেশী হতে হবে। কাজেই নিয়ন্ত্রিত সংযোজন বিক্রিয়া ঘটাবার জন্যে মূল সমস্যা হলো অত্যুত্তপ্ত প্লাজ্মার উৎপাদন এবং তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে উপযুক্ত জায়গায় এমনভাবে আবদ্ধ রাখতে হবে, যাতে বিক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ প্রযুক্ত শক্তি অপেক্ষা বেশী হয়।

প্রথমে আসা যাক নিষ্পেষণ প্রক্রিয়ার (Pinch effect) কথায়। কোন নলের মধ্যে অবস্থিত প্লাজ্মার মধ্য দিয়ে যদি উচ্চ তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো যায়, তবে তা একটি চৌম্বক ক্ষেত্র গঠন করে, যা প্লাজ্মাকে নলের অক্ষের দিকে টেনে রাখে এবং নলের দেয়ালের সঙ্গে প্লাজ্মাকে স্পর্শ করতে দেয় না। অনুরূপ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় যখন দুটি সমান্তরাল তারের মধ্যে দিয়ে একই দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, যে তড়িদ্বারের সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো হয়, তা সর্বদাই উত্তপ্ত প্লাজ্মার সংস্পর্শে থাকে, ফলে শক্তির অপচয় এবং প্লাজ্মার তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমে আসে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে একটি প্রান্তবিহীন নল নেওয়া হয়, যার এক প্রান্ত অপর প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত। একে বলে টোরাস (Torus)। এই টোরাসকে একটি ট্রান্সফর্মারের সেকেণ্ডারী হিসাবে ধরা হয় (1নং চিত্র) এবং এর প্রাইমারিতে একটি বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রয়োগ করে টোরাসে অবস্থিত প্লাজ্মাতে একটি উচ্চ সেকেণ্ডারী তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট করা হয়। এই প্রবাহ প্লাজ্মার রোধের বিরুদ্ধে কাজ করায় তাতে ওহ্মীয় তাপের সঞ্চার (Ohmic heating) হয়। আবার এই প্রবাহ একই সঙ্গে নিষ্পেষণ প্রক্রিয়াও কাজ করে। কিন্তু যে কোন নিষ্পেষণ প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত সংযোজন বিক্রিয়া ঘটাবার অসুবিধা এই যে, এর স্থিতি খুব কম। মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেণ্ডের মধ্যে প্লাজ্মা স্তম্ভ ভেঙে নলের দেয়ালের সংস্পর্শে এসে পড়ে। তবে বিভিন্ন ধরণের স্থায়িত্ব দূরীকরণের চেষ্টা চলছে এবং তত্ত্বগত ও পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, প্লাজ্মার স্থিতি বাড়াতে হলে (1) টোরাসের দেয়াল কোন বাহক পাত,

দিয়ে নির্মাণ করতে হবে এবং (2) টোরাসের দেয়ালের বাইরে জড়ানো সলিনয়েডের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে প্লাজ্‌মার মধ্যে একটি অক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে।
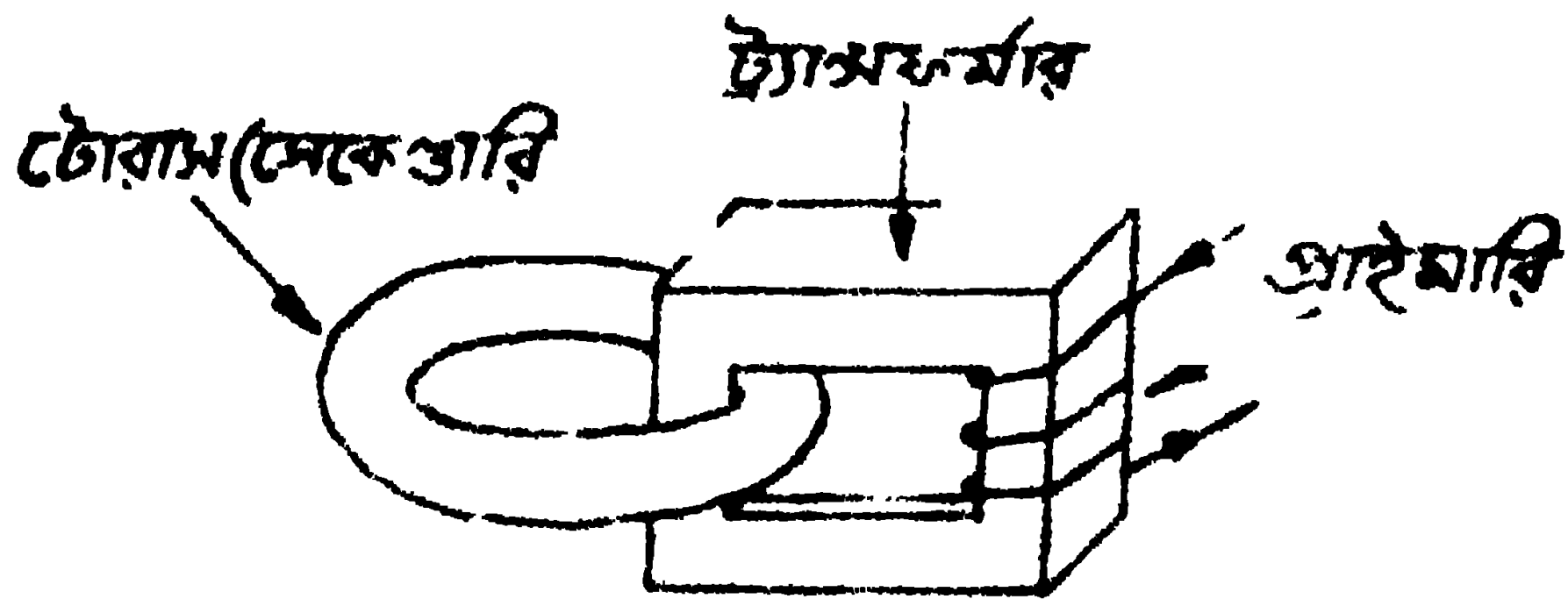
1নং চিত্র

এর পর আসা যাক Stellarator-এর কথায়। পূর্বে বর্ণিত টোরাসের মত এক্ষেত্রেও প্রান্ত-বিহীন নলের দেয়ালের বাইরে সলিনয়েডের কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। তবে এই ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা এই যে, বাইরের দেয়ালের দিকের
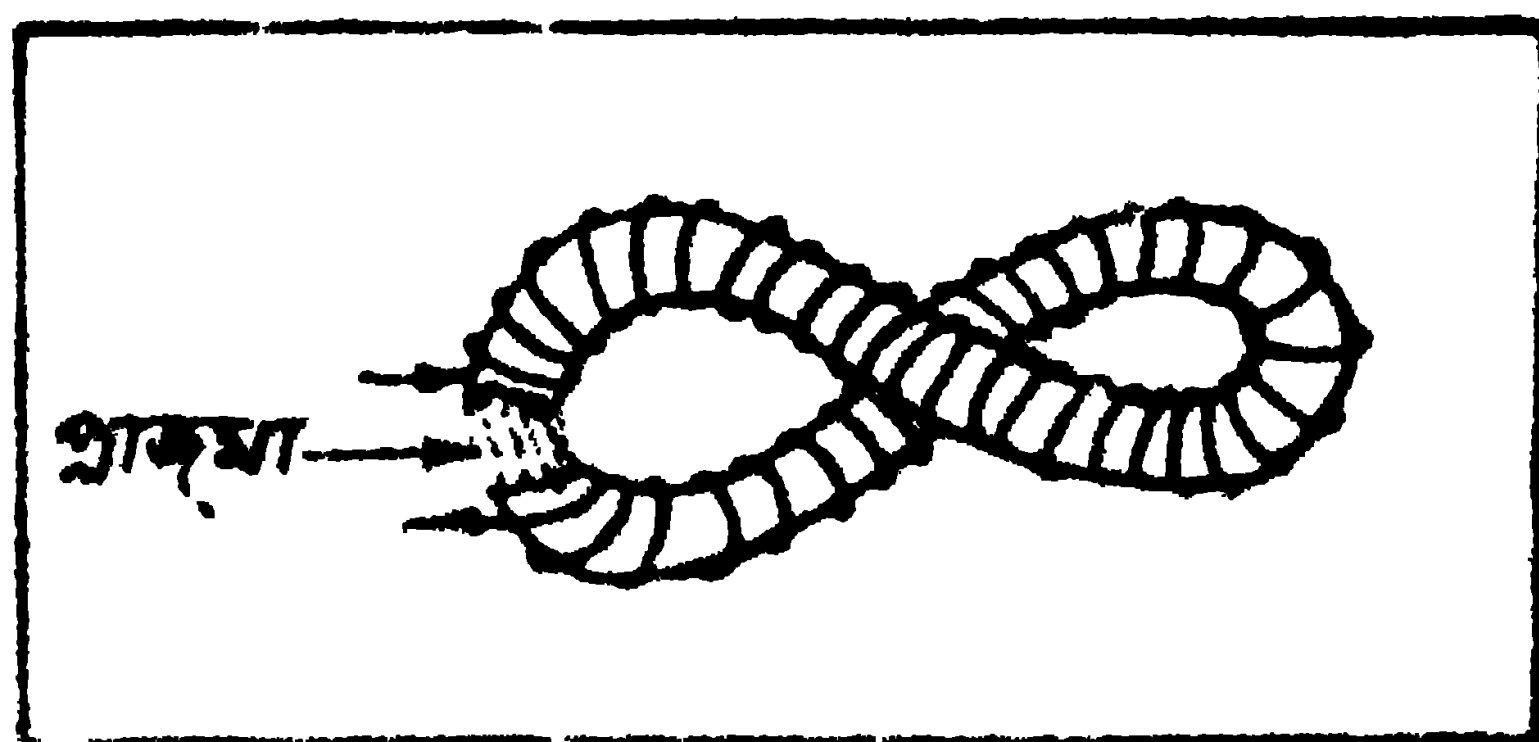
2নং চিত্র

চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ভিতরের দেয়ালের তুলনায় কম হয়, ফলে আয়ন ও ইলেকট্রনগুলি পরস্পরের তুলনায় বিপরীত দিকে সরে যেতে চায়। এই আধান বিভাজনের (Charge separation) ফলে উদ্ভূত তড়িৎ-ক্ষেত্র ও অক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্রের সম্মিলিত প্রভাবে প্লাজ্‌মা কণাগুলি ছিটকে দেয়ালের সংস্পর্শে এসে পড়ে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে নলটিকে পেঁচিয়ে ইংরেজী '8' সংখ্যার মত করা হয় (2নং চিত্র) একেই বলে Stellarator যন্ত্র।

Stellarator যন্ত্রে প্লাজ্‌মা উত্তপ্তীকরণ করা হয় চৌম্বক পাম্পিং, আয়ন-সাইক্লোট্রোন অনুনাদ ইত্যাদি পদ্ধতিতে। তবে নিষ্পেষণ প্রক্রিয়ার মত এক্ষেত্রেও প্লাজ্‌মার নানান ধরনের অস্থায়িত্ব বর্তমান।

এর পর আর এক পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে, তা হলো চৌম্বক দর্পণ (Magnetic mirror) পদ্ধতি। এক্ষেত্রে চোঙাকৃতি নলের বাইরে সলিনয়েডের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে এমন চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় যে, ক্ষেত্রের শক্তির মান নলের মধ্য ভাগের তুলনায় দুই প্রান্তে বেশী হয়। দুই প্রান্তের এই শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রকেই চৌম্বক দর্পণ

3নং চিত্র

বলা হয় (3নং চিত্র)। গাণিতিক উপায়ে দেখানো যায় যে, দর্পণের মধ্যে অবস্থিত কিছু সংখ্যক আহিত কণা, যাদের গতিশক্তি চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব দিকের গতির ফলে উদ্ভূত, তারা দুর্বলতর ক্ষেত্র (চিত্রে C স্থান) থেকে শক্তিশালী ক্ষেত্রের (চিত্রে A বা B স্থান) দিকে অগ্রসর হলে সেই স্থান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার দুর্বলতর ক্ষেত্রে ফিরে আসে। এই ভাবে প্লাজ্‌মাকে দর্পণের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়।

যে সব কণার গতিশক্তি চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল বেগের ফলে উদ্ভূত, সেগুলি প্রতিফলিত না হয়ে দর্পণ থেকে নির্গত হয়ে যায়। দর্পণের মধ্যে প্লাজ্‌মাকে প্রবেশ করানো এক কঠিন কাজ। সাধারণতঃ দু-ভাবে তা করা হয়—প্রথমতঃ দ্রুতগামী নিরপেক্ষ (Neutral) পরমাণুগুলিকে দর্পণের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং তাদের আয়নিত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ শক্তিশালী এবং আয়নিত ডয়টেরিয়াম অণুগুলিকে প্রবেশ করানো এবং তাদের আর্ক-স্রাবের সাহায্যে বিয়োজিত করা হয়। দর্পণের মধ্যে প্লাজ্‌মাকে উত্তপ্ত করা হয় অ্যাডিয়াবেটিক সংনমনের (Adiabatic compression) দ্বারা। এক্ষেত্রে প্লাজ্‌মাকে অক্ষ বরাবর সংনমিত করা হয় দর্পণ সৃষ্টিকারী কুণ্ডলীগুলির কাছা-কাছি সরিয়ে এনে এবং ব্যাসার্ধ বরাবর সংনমিত করা হয় চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির মান বৃদ্ধি করে।

এর পর Astron-এর ব্যবস্থার কথায় আসা যাক। এক্ষেত্রেও বায়ুশূন্য এবং চোঙাকৃতি কক্ষের বাইরে জড়ানো সলিনয়েডের কুণ্ডলীর

সাহায্যে চৌম্বক দর্পণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। এখন অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন (প্রায় 30-50 Mev) ইলেকট্রনগুচ্ছকে কক্ষের এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই ইলেকট্রনগুলি কক্ষের অক্ষের চতুর্দিকে একটি ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন স্তর (E-স্তর) সৃষ্টি করবে এবং এর প্রভাবে চৌম্বক বলরেখাগুলি একটি বদ্ধ বলরেখা গঠন করবে (4নং চিত্র)। এখন

4নং চিত্র

প্লাজ্‌মাকে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করালে তা ইলেকট্রনগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হবে ও বদ্ধ বলরেখার দ্বারা আবদ্ধ থাকবে। তবে এই সম্পর্কে পরীক্ষার বিশেষ অগ্রগতি হয় নি।

তাছাড়াও প্লাজ্‌মাকে উত্তপ্তকরণ এবং তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আবদ্ধ রাখবার আরও নানা পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে বর্তমানে যে দুটি পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে, তার একটি হলো লেসারের (Laser) সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত সংযোজন বিক্রিয়া ঘটানো। লেসার হলো ঘনকৃত তীব্র আলো, যার প্রতিটি রশ্মি পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল এবং ঘন সন্নিবিষ্ট। ফলে এই রশ্মি অধিক শক্তিসম্পন্ন এবং এর উত্তপ্তকরণ ক্ষমতা অনেক বেশী। এখন এই লেসার যদি ডয়টেরিয়াম-ট্রাইটিয়ামের জমানো গুটিকার (Pellet) উপর ফেলা যায়, তবে তা কঠিন গুটিকাকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করবে ও তাকে প্লাজ্‌মাতে পরিণত করবে। কিন্তু প্লাজ্‌মার মধ্যে উচ্চ চাপ সৃষ্টি হবার ফলে তার স্থায়িত্ব খুব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি প্লাজ্‌মার আয়তন বাড়ানো যায়, তাহলে এর স্থায়িত্ব বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে উপযুক্ত তাপমাত্রায় পৌঁছাবার জন্যে আরও অধিক শক্তিসম্পন্ন লেসার দরকার (প্রায় 10^5 জুল)। কাজেই লেসারের সাহায্যে সংযোজন বিক্রিয়া ঘটাবার মূল প্রশ্ন হলো উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন লেসার তৈরি করা।

অপর পদ্ধতিটি হলো রাশিয়ার Tokamak কার্যক্রম। এই বিষয়ে প্রথম কাজ আরম্ভ হয় 1960 সালে মস্কোর I. V. Kurchatov Institute-এ। পূর্ববর্ণিত টোরাসের মধ্যে নিষ্পেষণ-প্রক্রিয়া ঘটাবার জন্য এক্ষেত্রেও একটি বায়ুশূন্য ধাতব টোরাসের মধ্যে অবস্থিত গ্যাসে ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে উচ্চ তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট করা হয়। এই প্রবাহ, উৎপন্ন প্লাজ্‌মার ওহ্‌মীয় তাপের সঞ্চার করে; টোরাসের দেয়ালে জড়ানো সলিনয়েড কুণ্ডলীর সাহায্যে এমন চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়, যা অভ্যন্তরীণ প্রবাহের ফলে উদ্ভূত ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। দুই ক্ষেত্রের সম্মিলিত প্রভাবে যে

ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তা কুণ্ডলীর আকারে বক্র (Helical) হয়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে সেনার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং Tokamak সম্পর্কিত যে সব ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে, তা বিশেষ আশাপ্রদ। আশা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সফলতা অর্জন করা যাবে।

নিয়ন্ত্রিত সংযোজনে চুল্লী নির্মাণের জন্যে আরও কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখতে হবে; যেমন—অত্যুত্তপ্ত প্লাজ্‌মা থেকে বিকিরণজাত ও তাপ-পরিবহনের ফলে শক্তির অপচয়, চৌম্বক ক্ষেত্রে প্লাজমার ব্যাপন (Diffusion), প্লাজ্‌মার অস্থায়িত্ব ইত্যাদি।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, 1 গ্যালন জল থেকে যে পরিমাণ ডয়টেরিয়াম পাওয়া যায়, সংযোজন বিক্রিয়ায় তা 10^{10} ক্যালোরির পরিমাণ শক্তির সমতুল্য অথচ এই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে প্রয়োজন 300 গ্যালন গ্যাসোলিন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কত কম খরচে আমরা কত অধিক শক্তির অধিকারী হতে পারবো! তাছাড়া এ-ক্ষেত্রে আরও একটা সুবিধা এই যে, কিছু পরিমাণ শক্তিকে আমরা সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিরূপে পাব এবং বিভাজন চুল্লীর মত এক্ষেত্রে কোন তেজস্ক্রিয় ভস্ম (যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর) উৎপন্ন হবে না। কাজেই নিয়ন্ত্রিত সংযোজন বিক্রিয়া ঘটানো বিজ্ঞানীদের কাছে বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

ক্যান্সার

স্বপনকুমার রায়চৌধুরী ও বীণা ভৌমিক

মানুষের জীবনে ক্যান্সার একটি দুরারোগ্য প্রাচীনতম ব্যাধি। মানুষ এখন গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে, কিন্তু আজও ক্যান্সার দুরারোগ্য ব্যাধির দলেই রয়ে গেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে তো বটেই—এমন কি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতেও ক্যান্সার একটি ভীতিপ্রদ নাম। যদিও এই রোগে যে কোন বয়সের স্ত্রী কিংবা পুরুষ আক্রান্ত হতে পারে, তবুও সাধারণভাবে বলা যায়, ক্যান্সার বয়স্ক মানুষের অসুখ। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন, 45 বছরের অধিক বয়স্ক মানুষের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বছর প্রায় দুই কোটি লোক ক্যান্সারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমাদের দেশে প্রতি বছর এক লক্ষ লোকের মধ্যে পঁচাশি জন এই রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রতি বছর এই বিরাট সংখ্যক লোকের মৃত্যু বিজ্ঞানীদের বহুদিন থেকেই আগ্রহান্বিত করেছে ক্যান্সারের কারণ এবং নিরাময়ের উপায় জানবার জন্যে। ক্যান্সারের কারণ সম্বন্ধে জানতে হলে প্রাণিদেহের বৃদ্ধি এবং গঠন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন। প্রতিটি বহুকোষী প্রাণী জীবন সুরু করে এককোষী ভ্রূণ অবস্থা থেকে। এই এককোষী ভ্রূণ বিভাজিত হয়ে বহু কোষের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই বিভাজন যেমন-তেমন ভাবে হয় না—কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। ভাবলে অবাক হতে হয়, একটি মাত্র কোষ বিভাজিত হয়ে অসংখ্য কোষ উৎপন্ন করে এবং তারাই হাত, পা, চোখ, মুখ, পাকস্থলী, ফুসফুস ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, একটি পূর্ণবয়স্ক

মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির বৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবার পর সাধারণতঃ বন্ধ হয়ে যায়। একটা ছোট উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক প্রাণীরই শৈশবের আকৃতি ছোট থাকে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে থাকে; অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিদেহে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর সাধারণতঃ সব প্রাণীরই দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়; অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট বয়সের পর বিশেষ কতকগুলি প্রত্যঙ্গ ছাড়া অন্য প্রত্যঙ্গগুলিতে কোষ-বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। এখন আমরা ক্যান্সারের কথায় ফিরে যাই। ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় তখনই, যখন সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করে শরীরের কোন একটি অংশের কোষ-বিভাজন-প্রবণতা বেড়ে যায় এবং পরবর্তী কালে মাংসপেশী কেটে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

ক্যান্সার রোগীর আক্রান্ত স্থানে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন ঐ স্থানের মাংসপেশীতে পচন ধরেছে। কিন্তু রোগের সুরুতেই ক্ষতের সৃষ্টি হয় না। প্রথমে আক্রান্ত স্থানে অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধির ফলে একটা টিউমারের সৃষ্টি হয়। পরে ঐ টিউমার কেটে গিয়ে ক্ষতের আকার ধারণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, টিউমারমাত্রেরই সৃষ্টি হয় অপ্রয়োজনীয় কোষ বৃদ্ধির ফলে, কিন্তু সব টিউমারই ক্যান্সারে পরিণত হয় না।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। তাঁরা দেখেছেন যে, সাধারণতঃ জিনের পরিবর্তনের ফলেই কোষের বিভাজন-প্রবণতা বেড়ে যায়। এই পরিবর্তন অনেক কারণেই ঘটতে পারে এবং কারণগুলি বাইরে থেকে কৃত্রিমভাবে অথবা কোষের ভিতরে আপনা থেকে সৃষ্টি হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, প্রাণিদেহের কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন-প্রবণতা এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত করাও সম্ভব। ক্যান্সারাক্রান্ত কোন প্রাণীর আক্রান্ত কোষগুলি অস্ত্রোপচারের সাহায্যে যদি ঐ শ্রেণীর অন্য প্রাণীর দেহে স্থাপন করা যায়, তবে সেই প্রাণীও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। গবেষণার ফলে জানা গেছে, প্রায় 500 রকমের রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। এগুলির মধ্যে কোন কোন রাসায়নিক পদার্থকে—এমন কি, যদি শরীরের কোন অংশে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে ঐ অংশের কোষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন-প্রবণতা দেখা যায়।

যদিও সুনিশ্চিতভাবে বলা মুস্কিল তবুও বিজ্ঞানীদের ধারণা, দিনের পর দিন কলকারখানার ধোঁয়ার বিষাক্ত বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে ফুস্ফুসে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রসঙ্গে ধূমপান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে রাখা দরকার। প্রাণিদেহে ধূমপানের প্রভাব সম্বন্ধে সারা পৃথিবীতে হাজার রকমের গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। 1962 সালে ইংল্যাণ্ডের একদল চিকিৎসক (Royal college of physicians) সিগারেটের অপকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা চালান। আমেরিকার সার্জন জেনারেলের পরিচালনায় 1964 সালে আর একদল চিকিৎসকও ঐ একই কাজে ব্যাপৃত হন। এঁদের মতে, ধূমপানের সঙ্গে ফুস্ফুসের ক্যান্সারের সুনিশ্চিত যোগাযোগ আছে। বৃটেনের চিকিৎসকদের সমীক্ষার ফলে জানা গেছে, গড়ে যারা দিনে কুড়িটির বেশী সিগারেট খান, এমন প্রতি এগারো জনের মধ্যে একজন ফুস্ফুসের ক্যান্সারে মারা যান। আমেরিকার চিকিৎসকেরা দেখেছেন—ধূমপান করেন না, এমন এক লক্ষ লোকের মধ্যে গড়ে সাতজন ফুস্ফুসের ক্যান্সারে মারা যান, অথচ ধূমপান করেন, এমন প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে ঐ রোগে আক্রান্তের

সংখ্যা 125 জন। যারা পাইপ খান, তাদের মধ্যে কিন্তু ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এরা সাধারণতঃ ঠোঁট এবং গলনালীর ক্যান্সারে ভোগেন।

সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত যে অতিবেগুনী রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার অতি সামান্য অংশই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে পৃথিবীর মাটিতে এসে পৌঁছায়। এই অতিবেগুনী রশ্মিও ক্যান্সারের আর একটি কারণ। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, যারা ঘরের মধ্যে কাজ করেন, তাদের চেয়ে যারা খোলা আকাশের নীচে কাজ করেন, তাদের মধ্যেই ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা বেশী। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি পদার্থ থেকে বিকিরিত তেজস্ক্রিয় রশ্মিও প্রাণিকোষের অনিয়মিত বিভাজন-প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়।

শরীরের মধ্যে জৈব প্রক্রিয়ায় ত্রুটির ফলেও ক্যান্সার হতে পারে। ছেলেদের প্রোস্টেট গ্রন্থি এবং মেয়েদের বক্ষ-ক্যান্সার সাধারণতঃ হর্মোন ক্ষরণের ত্রুটির ফলেই হয়ে থাকে।

বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন না যে, ক্যান্সার কোন জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে কিনা। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে, আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চোয়ালের ক্যান্সার (Burkitt's lyphoma) এক ধরণের ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট। আরো জানা গেছে যে, প্রাণিদেহে ক্যান্সার একাধিক ধরণের ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। চোয়ালের ক্যান্সার নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী অধ্যাপক এম. এফ. স্ট্যানলী বলেছেন, এই সব ভাইরাস সাধারণতঃ মশকের দ্বারাই পরিবাহিত হয়ে থাকে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু অবধারিত ছিল। আজ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে সব ক্যান্সার না হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ চিকিৎসার দ্বারা ক্যান্সার নিরাময় করা সম্ভব। অন্যান্য রোগের মত ক্যান্সার নিরাময়ের জন্যে রোগের কারণ দূর করাই সবার আগে প্রয়োজন। ডাক্তারেরা প্রথমে রোগাক্রান্ত কোষগুলিকে অস্ত্রোপচারের দ্বারা শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রদায়ক হয় না এবং সব জায়গায় অস্ত্রোপচারও সম্ভব নয়। আধুনিককালে রঞ্জন রশ্মি ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সারের চিকিৎসায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এই ধরণের চিকিৎসা দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং রশ্মি প্রয়োগের পদ্ধতিরও দিন দিন উন্নতি ঘটছে। প্রোস্টেট গ্রন্থি এবং বক্ষ-ক্যান্সারের শতকরা পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে হর্মোন চিকিৎসার ফলে সুফল পাওয়া গেছে।

ক্যান্সার সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য— এই রোগের নিরাময়কারী ওষুধ আবিষ্কার করা। কেন না, অস্ত্রোপচার ও রশ্মি প্রয়োগ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয় এবং সর্বক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার অথবা রশ্মি প্রয়োগ সম্ভবও নয়। প্রায় 1500 রকমের রাসায়নিক পদার্থের কথা জানা গেছে— ক্যান্সারের উপর যেগুলির কম-বেশী প্রভাব আছে। আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে প্রায় 1500 রকমের উদ্ভিদ এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এদের মধ্যে 45 রকমের উদ্ভিদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আশা রাখেন। যে সব উদ্ভিদ এই ব্যাপারে যথেষ্ট আশাপ্রদ, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Podophylum glycosides।

ক্যান্সার শুধু মানুষের অসুখ নয়, অন্যান্য অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়। ক্যান্সার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে হাজার রকমের গবেষণা চলেছে, তবুও এই রোগের নিরাময় সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আগেই

বলেছি, জিনের গঠনের পরিবর্তনের ফলেই ক্যান্সারের সৃষ্টি হয়। যদিও কৃত্রিম উপায়ে এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব, তবুও ঠিক কি ধরণের পরিবর্তনের ফলে ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় এবং কেন এই পরিবর্তন ঘটে—তা আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

সুন্দরবনের নদীগুলিতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্য পদ্ধতি ও পরিকল্পনা

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস*

সুন্দরবন—পশ্চিমবঙ্গের 24-পরগণা জেলার প্রায় অর্ধেকাংশ জুড়ে এই অঞ্চল পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এর দক্ষিণাংশে অজস্র দ্বীপে রয়েছে সংরক্ষিত বনভূমি। এই বনভূমির আয়তন ক্রমশঃ দক্ষিণে সাগরের দিকে বেড়েই চলেছে। ছোট-বড় অসংখ্য নদী জালের মত এই সুন্দরবনকে পরিবৃত করে রেখেছে। উপরের দিকে নদীগুলির অধিকাংশ স্থানে চরা-ভূমির সৃষ্টি হচ্ছে, অনেক নদী মজে যাচ্ছে, নূতন নূতন জমি জেগে উঠছে, ফলতঃ ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে নূতন নূতন বসতি স্থাপিত হচ্ছে।

ভৌগোলিক অবস্থানের তারতম্যে এই অঞ্চলের নদীগুলিতে প্রায় ছয় ঘন্টা অন্তর অন্তর দিনে দু বার জোয়ার ও দু-বার ভাঁটা সংঘটিত হয়। নদীগুলিতে প্রায় প্রতি দিন জলস্ফীতির সময় নিম্নতম জলতলরেখা থেকে উচ্চতম জলতল-রেখার পার্থক্য 15 ফুট থেকে 30 ফুট পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এই জোয়ার ও ভাঁটার জলের স্রোতবেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 5 ফুট থেকে 10 ফুট পর্যন্ত—এমন কি, কোন কোন নদীতে এর গঠন-তারতম্যে আরও বেশী স্রোতবেগের সৃষ্টি হয়। এই নদীগুলিতে জোয়ার-ভাঁটার একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভাঁটার সময় জলের স্রোতবেগ, জোয়ারের স্রোতবেগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

ইছামতী, কালিন্দী, কাটাখালি, গোরেশ্বর, বিদ্যাধরী, ডাঁসা, ছোট কলাগাছিয়া, বড় কলাগাছিয়া, সাহেবখালি, রায়মঙ্গল, রামপুর, ছুবখালি, পুইজালি, বিদ্যা, ঠাকুরান, মাতলা, হাড়িভাঙা ইত্যাদি নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখার বিভিন্ন অবস্থানে এবং আকৃতির তার-তম্যে জোয়ার-ভাঁটার স্রোতবেগের বিভিন্নতা দেখা যায়। এত অফুরন্ত জলের রাশি ও জলের স্রোতবেগের আধিক্য, ভাঁটা ও জোয়ারের জলতলের এত অধিক পার্থক্য, এই দুটি মৌলিক সত্য এবং একটি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা রূপায়ণের মূল উৎস। এই তথ্যকে অবলম্বন করে এই নদীবহুল সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে প্রকৃষ্ট স্থানে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। একাজে নদীগুলির সংগঠন, প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট নদীগুলির সঙ্গে প্রবাহিত নদীটির সংযোজন বা বিয়োজনের সম্ভাব্যতা, পরিকল্পিত স্থানের অবস্থান, আকৃতি-প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের ভূসংস্থান-বিন্যাসাদির সম্যক পর্যবেক্ষণ ও মনোনিবেশ

*পূর্ত (সড়ক) বিভাগ, সার্ভে ডিভিশন—নং-3, ভবানীভবন, কলিকাতা-27

সহযোগে ঐকান্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এই প্রস্তাবিত জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হতে পারে।

প্রাকৃতিক এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা এইরূপ জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণের সঠিক পন্থা নির্ধারণ করতে অপারগ হই, তবে তাকে আমাদের জাতীয় জড়তা ও নিশ্চেষ্টতার পরিচয় ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

প্রকৃতি থেকে জীব কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় অংশটুকু গ্রহণ করে নিজের সুবিধে তাকে যথোচিত রূপদান করে সেই প্রাকৃতিক উৎপত্তির উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করে নিজের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়।

সুন্দরবনের নদীগুলিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা রূপায়ণের কয়েকটি রূপরেখা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। এই প্রবন্ধে কোন

1নং চিত্র—নদীবিধৌত সুন্দরবন অঞ্চলের কিয়দংশ।

প্রকৃতির রাজ্যে জীবের কল্যাণ ও অকল্যাণ— এই দুইয়ের নিমিত্তই প্রকৃতি নানাভাবে ইতস্ততঃ সীমায়িত হয়ে রয়েছে। বুদ্ধিমান জীব এই
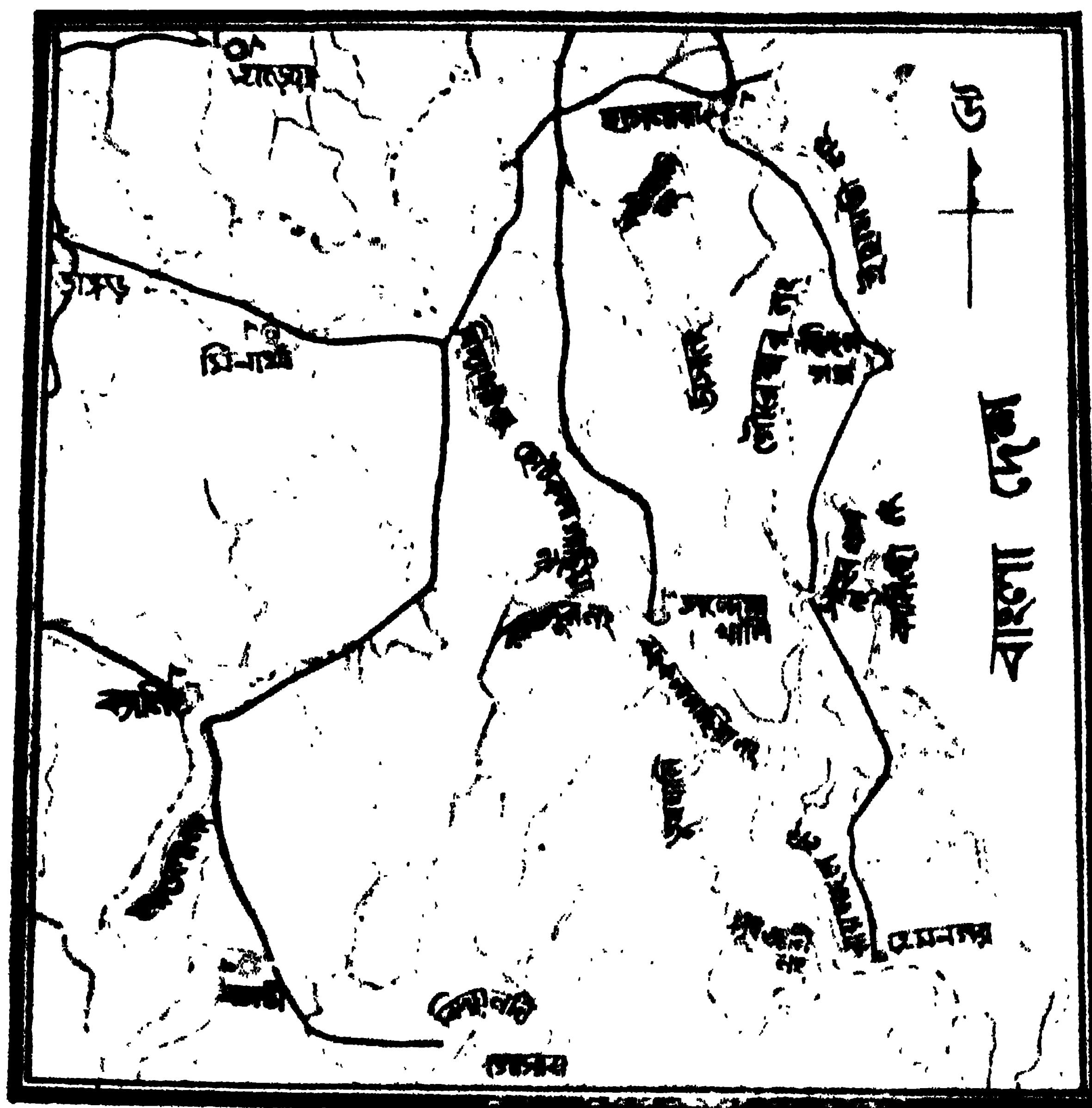
গাণিতিক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে অতি সহজভাবে যা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব, তার উপর ভিত্তি করে এই পরিবেশে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন

পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি পন্থার পর্যালোচনা করবো। অবশ্য গণিতের যুক্তিও এর পশ্চাতে রয়েছে।

জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপাদান পর্যাপ্ত জল ও টার্বাইন প্রকোষ্ঠ থেকে জলাধারে জলের যথেষ্ট উচ্চতা। এই উচ্চতা পাবার জন্যে পার্বত্য অঞ্চলে কোন নদীর উর্ধ্বপথে উপযুক্ত স্থানে উচ্চ জলরেখার কৃত্রিম বাঁধের সাহায্যে জলাধার সৃষ্টি করে সেখান থেকে কোন পেনস্টক বা সুড়ঙ্গের সাহায্যে নদীর নিম্ন পথে নির্মিত টার্বাইন প্রকোষ্ঠে জল প্রবাহিত করা হয়। এই পদ্ধতিই সাধারণতঃ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্রহণ করা হয়। পার্বত্য নদীতে এর নির্মাণকার্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্বৎসরব্যাপী প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা এইসব নদী মিটাতে পারে না। আবার জল প্রবাহের সঙ্গে প্রায়ই ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড ও বালি বাহিত হয়ে এসে টার্বাইনের যথেষ্ট ক্ষতিসাধনও করে। ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহেরও যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্র এইরূপ জলবাহী নদী পাওয়া সম্ভব নয়। আবার এমন অনেক নদী আছে, যাদের উৎপত্তি স্থলে বা এর গতিপথে এইরূপ পরিকল্পনায় নির্মিত জলাধার সৃষ্টি করলে তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী বহু জমি জলমগ্ন করে। এতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় বটে, কিন্তু বহু চাষের জমি ও বনভূমি বিনষ্ট হয়। পর্যায়ক্রমে বনের ধ্বংসসাধন পরবর্তী কালে পাহাড়ের ধস্ নামায় সহায়তা হয়। একের বিনাশ অপরের বিকাশ সাধনের সূচনা করে।

সুন্দরবনের নদীগুলির সংযোগে জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণে অপেক্ষাকৃত অনেক কম অর্থের প্রয়োজন হবে। কেন না, এখানে নদীতে আড়াআড়িভাবে তেমন কোন বিশালকায় বাঁধের প্রয়োজন হবে না। কেবলমাত্র রাজ্যের সেচ দপ্তর কর্তৃক নদীর ধারে ধারে নির্মিত মাটির বাঁধই এই পরিকল্পনার পক্ষে যথেষ্ট। নদী থেকে জল গ্রহণকারী ও অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জলাধার অর্থাৎ বড় বড় পুকুরের আকারে শ্রেণীবদ্ধভাবে কয়েকটি জলাধার চতুর্দিকে মাটির বাঁধের সাহায্যে নির্মাণ করলেই চলবে। আর টার্বাইন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং টার্বাইন থেকে পরিত্যক্ত জলরাশিকে নদীতে বের করে দেবার জন্যে জল-নিকাশী একটি খাল খননের প্রয়োজন হবে। এই তো গেল পরিকল্পনার মুখ্য অংশগুলি। তদুপরি রয়েছে আনুষঙ্গিক অন্যান্য গৌণ অংশগুলি; যেমন—নদীর জলে ভাসমান ও প্রলম্বিত পদার্থগুলি জলগ্রহণকারী খালে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্যে নদীসংলগ্ন খালের মুখে উপযুক্ত ছাকনি স্থাপন, জল-গ্রহণকারী ও জলনিকাশী খালের মুখে নদীসংলগ্ন স্থানে কপাট কল স্থাপন প্রভৃতি কাজগুলির সম্পাদনও সম্পূর্ণ প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে।

সাধারণতঃ দুটি পদ্ধতিতে এই জাতীয় প্রকল্পে টার্বাইনে জল প্রবাহিত করা যেতে পারে; যথা—(1) প্রত্যক্ষ ও (2) পরোক্ষ পদ্ধতি। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে নদীর জলস্রোতের গতিবেগকে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগানো হয়। কোন খাল, হ্রদ্ বা পেনস্টকের সাহায্যে নদী থেকে জল টার্বাইনে প্রবাহিত করানো হয়। জলগ্রহণের পথগুলি মৌলিকভাবে সাধারণতঃ তিনটি পন্থায় নির্মাণ করা যেতে পারে।

(ক) প্রথমোক্ত পন্থায় জল নদী থেকে সোজা পথে কোন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন না হয়ে টার্বাইনে প্রবেশ করে। এই পথের আকৃতি নদী থেকে টার্বাইনের দিকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে বৃহত্তর প্রস্থচ্ছেদের আয়তন থেকে ক্ষুদ্রতর প্রস্থচ্ছেদের আয়তনের পরিমাণে নির্মিত হয়। এই পথে প্রবাহিত জলস্রোতের বেগ নদী থেকে গৃহীত স্রোতবেগের চেয়ে কয়েক গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে

এমন ভাবে পরিকল্পিত হতে হবে—যাতে জোয়ারের ছয় ঘণ্টা স্রোতে জল পাওয়া যাবেই, তদুপরি জোয়ারের শেষে ভাঁটা আরম্ভ হবার পরেও দুই ঘণ্টা জল পাওয়া যাবে। এমনিভাবে জলস্রোতকে এই একই পদ্ধতিতে টার্বাইনে প্রবাহিত করা যেতে পারে। ভাঁটার স্রোতবেগ জোয়ারের স্রোতবেগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ—এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভাঁটার সময়ের
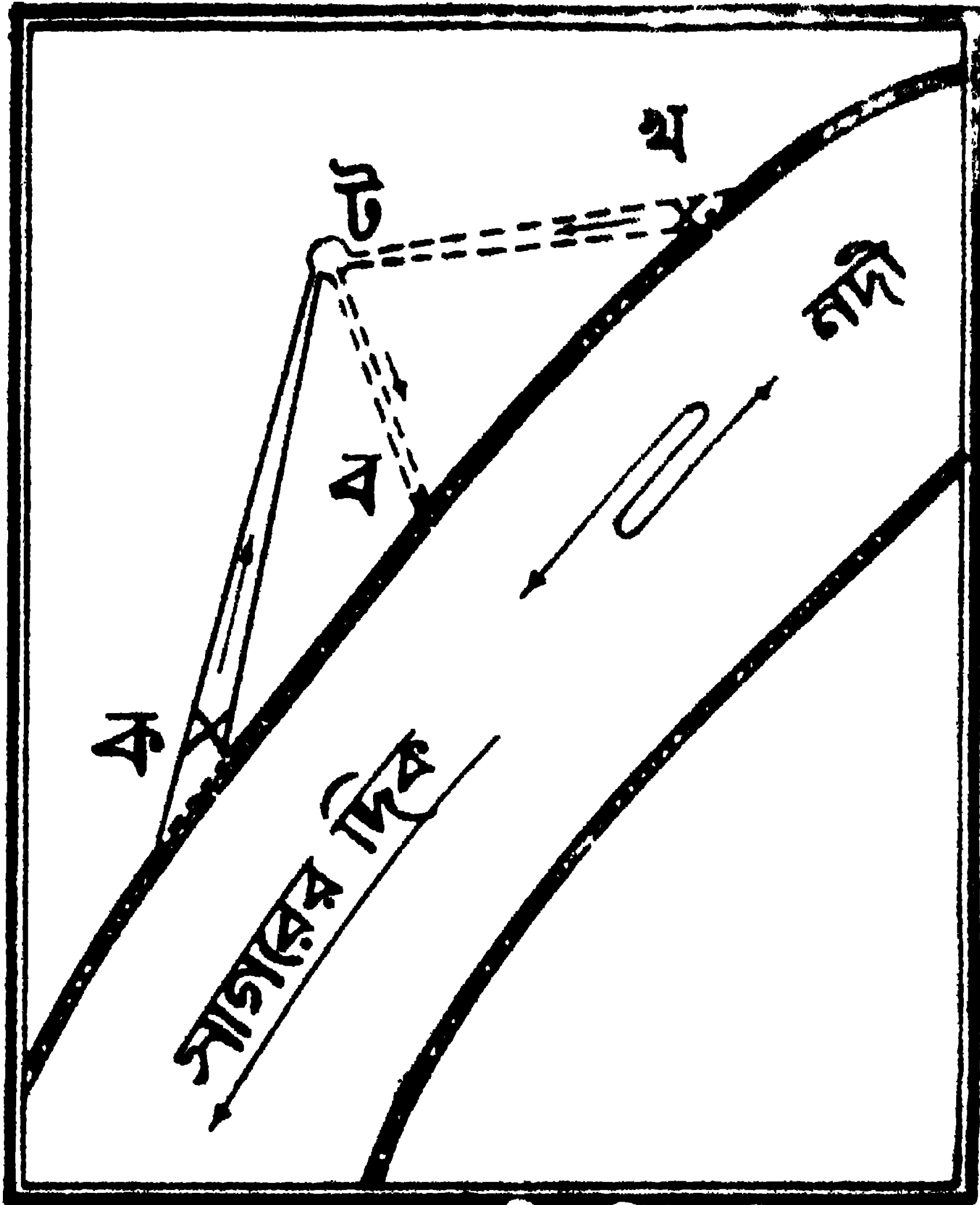
3নং চিত্র—প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নদীর জল জোয়ার ও ভাঁটার সময় সমকোণীয় সর্পিল আকৃতির খাল, ডুব বা পেনষ্টকের সাহায্যে টার্বাইনে প্রবাহিত করা হচ্ছে। ছবিতে ট—টার্বাইন, ক খ গ ট ও চ গ ট—যথাক্রমে জোয়ার ও ভাঁটার জলগ্রহণকারী পথ এবং ট ব—টার্বাইন থেকে জল বের হয়ে যাবার পথ।

দিনের 24 ঘণ্টা সময়ের মধ্যে 16 ঘণ্টাব্যাপী এই একই জলপথের সাহায্যে টার্বাইনে জল সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে।

আবার নদীর আকৃতি-প্রকৃতি ও আঞ্চলিক ভূপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভাঁটার সময় দ্বিতীয় জলগ্রহণকারী পথের সাহায্যে ভাঁটার জল বেশী সময়ব্যাপী টার্বাইনে প্রবাহিত করালে, জল-বিদ্যুৎ একক উৎপাদন অনেক সহজসাধ্য হবে।

আবার এমনও সম্ভব হতে পারে—জোয়ার ও ভাঁটা—এই উভয় সময়েই জল পরিস্রোতকে দুটি বিভিন্ন পথে টার্বাইনে প্রবাহিত করিয়ে (চিত্র-4)

দ্রষ্টব্য) ও পর পর খোলা রেখে দিনে 24 ঘণ্টাব্যাপী টার্বাইন চালানো হবে।

(গ) অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভূপ্রকৃতি ও নদীর আকৃতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নদী থেকে জল গ্রহণকারী পথ এমনভাবে পরিকল্পনা করা যায়, যাতে খালের প্রশস্ততর মুখ দিয়ে জোয়ারের ধাক্কায় এককালীন অনেক পরিমাণ জল নদীর জলের গতিবেগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী বেগে প্রবিষ্ট হয়ে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর প্রস্থচ্ছেদ আয়তন-বিশিষ্ট পথে আরও অনেক গুণ গতিবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কিছুক্ষণ টার্বাইন চালাতে সক্ষম হবে। এতে টার্বাইন 24 ঘণ্টা ধরেই চলবে।

অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল, যে জলে প্রলম্বিত পদার্থ বিশেষ থাকে না, যে নদীর জলে পলিমাটির পরিমাণ খুব কম থাকে, যেখানে নদীর জল স্বচ্ছ, সেখানে এই পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে। টার্বাইন প্রকল্প থেকে বহিষ্কৃত জলরাশি যাতে সহজেই ভাঁটার সময় নদীপথে বের হয়ে যেতে পারে—তার সম্ভাবনাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
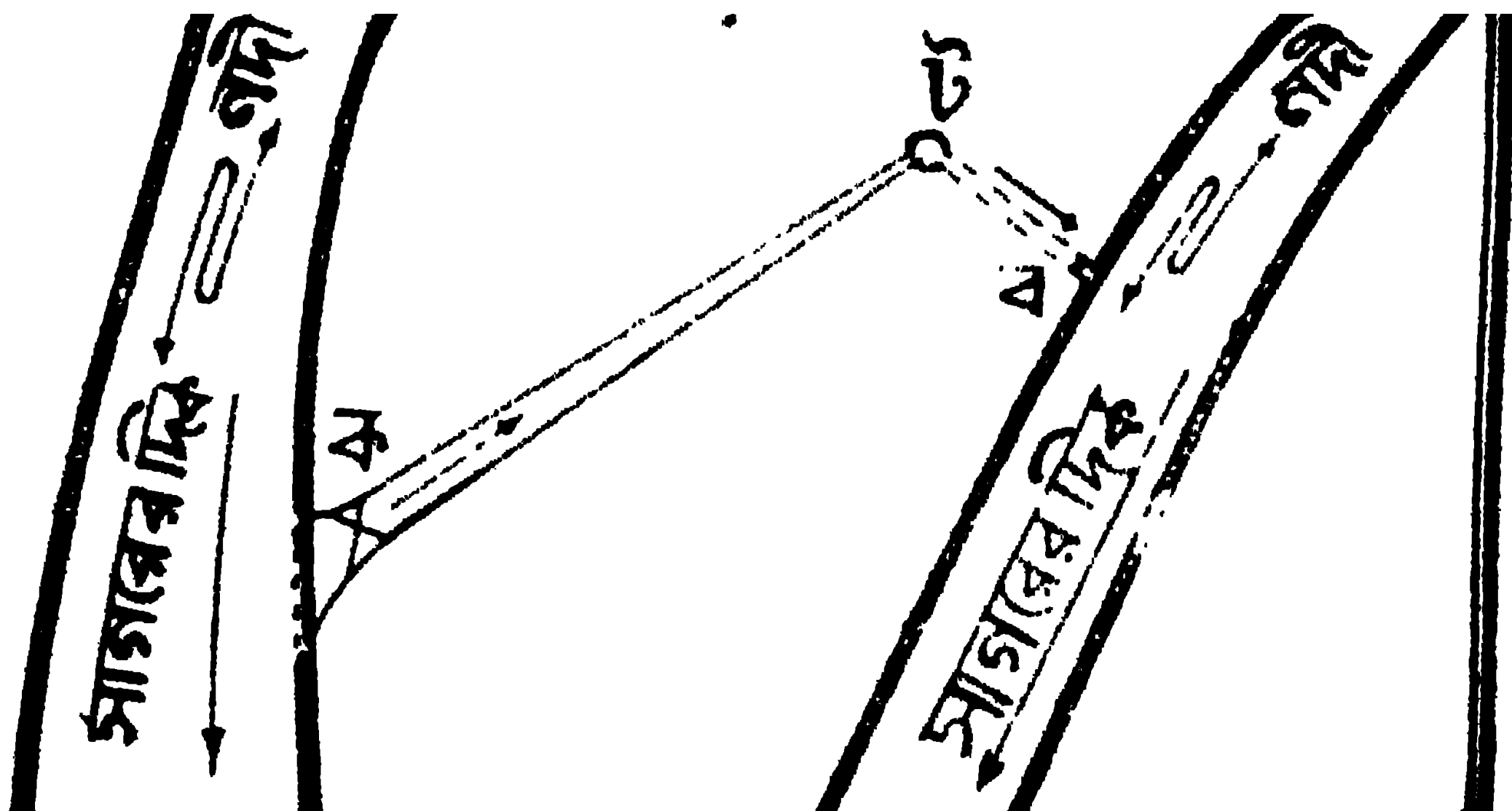
4নং চিত্র—প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নদীর জল জোয়ারের সময় প্রবল বেগে জলগ্রহণকারী খালে ঢুকে খালের পরিকল্পিত দৈর্ঘ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জল সঞ্চিত হচ্ছে। ছবিতে ট—টার্বাইন, ক ট—জলগ্রহণকারী পথ এবং ট খ—টার্বাইন থেকে জল বের হয়ে যাবার পথ।

হয়ে টার্বাইনের দিকে ধাবিত হতে থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত জলপ্রবাহ খালের অভ্যন্তরের দিকে থাকবে, ততক্ষণই এর নদীসংলগ্ন মুখ উন্মুক্ত থাকবে এবং খালে বিপরীত দিকে জলপ্রবাহ আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে কপাট কলের সাহায্যে মুখ বন্ধ হয়ে যাবে (4 নং চিত্র)। খালে প্রবিষ্ট জলরাশি পরবর্তী জোয়ার আরম্ভ হবার পরেও

পরোক্ষ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে নদীর জলস্রোতের বেগ প্রত্যক্ষভাবে টার্বাইন চালনায় ব্যবহৃত হয় না। নদী থেকে জোয়ারের সময় আঁকাবাঁকা খালের সাহায্যে জল উপযুক্ত জলাধারে সংগৃহীত হয় (5 নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই আঁকাবাঁকা পথ পরিক্রমণের সময় জল তার পলি ও অন্যান্য প্রলম্বিত পদার্থ

খালের তলদেশে পরিত্যাগ করে অবশেষে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত অবস্থায় জলাধারে গিয়ে সঞ্চিত হয়। পর পর কয়েকটি জলাধার নির্মাণ করলে ভাল হয়—কেন না, এক জলাধার থেকে ব্যাপী টার্বাইন চালানো যেতে পারে। টার্বাইন কর্তৃক 24 ঘণ্টাব্যাপী ব্যয়িত জলের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে জলাধারগুলির আয়তন স্থির করা বাঞ্ছনীয়। টার্বাইন এখন থেকে জলাধারের
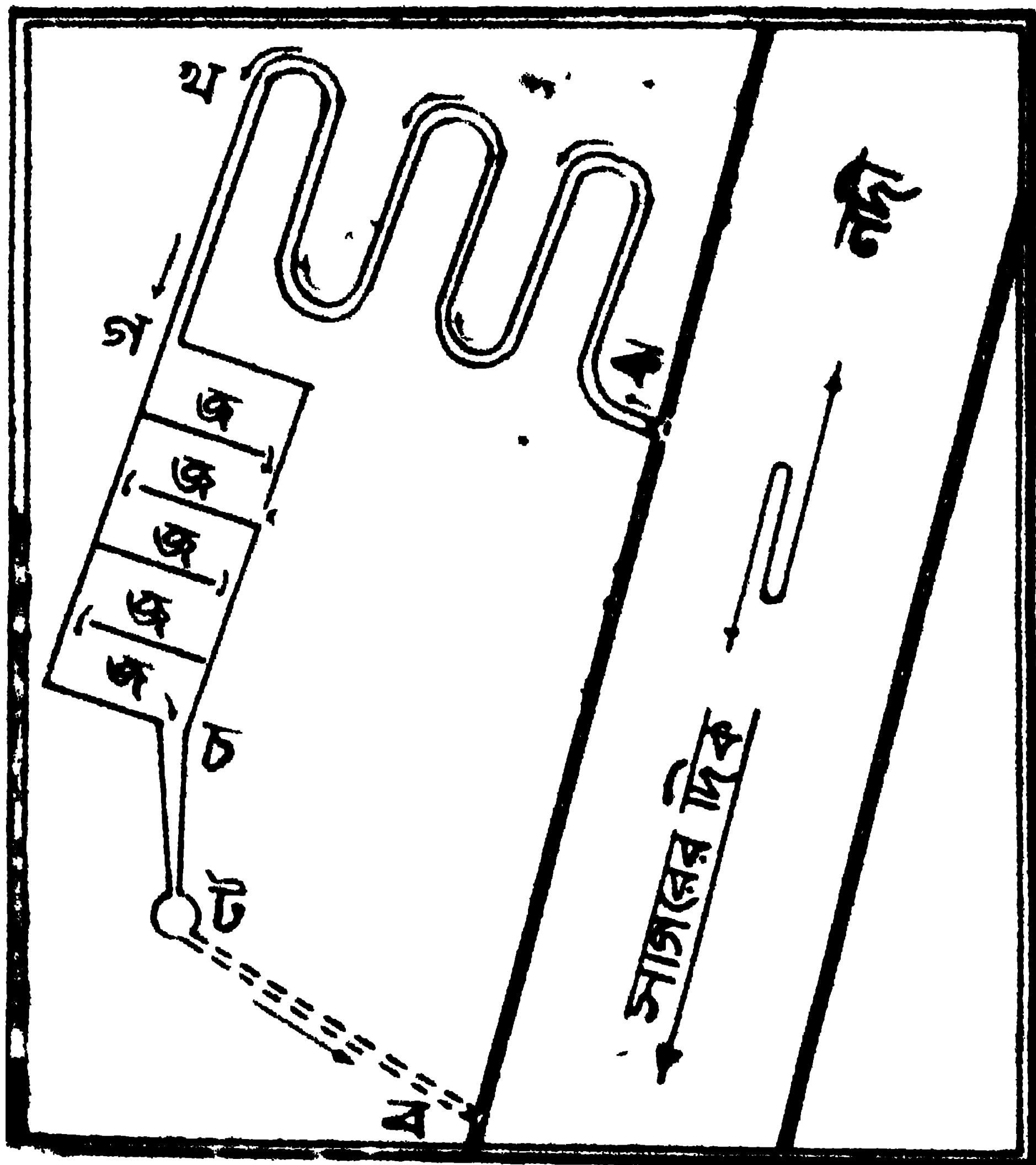
5নং চিত্র—পরোক্ষ পদ্ধতিতে নদীর জল জোয়ারের সময় আঁকাবাঁকা পথে শ্রেণীবদ্ধ জলাধারসমষ্টিতে প্রথমতঃ সংরক্ষিত হয় এবং পরে পেনষ্টক বা হ্রদের সাহায্যে টার্বাইনে জল প্রবাহিত করানো হয়। ছবিতে ট—টার্বাইন, ক থ গ—আঁকাবাঁকা জল-প্রবেশকারী পথ, জ—জলাধারসমূহ, চ ট—পেনষ্টক বা হ্রদ ও ট ব—টার্বাইন থেকে জল বের হয়ে যাবার পথ।

পেনষ্টক বা হ্রদের সাহায্যে জল টার্বাইনে প্রবাহিত করাবার সময় অন্য জলাধারগুলি জোয়ারের জলে ভর্তি হতে থাকবে। পরিকল্পিত কয়েকটি জলাধারে সঞ্চিত জল থেকে নদীর ভাঁটার সময়েও টার্বাইন চালনা করা যায়, অর্থাৎ 24 ঘণ্টা-জলের উচ্চতা যত বেশী সম্ভব রাখা যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পিত জলাধার নির্মাণ করতে হবে।

যে-সব নদীর জলে পলিমাটি ও অন্যান্য প্রলম্বিত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে, সে সব

নদীর জল এই পদ্ধতির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বদ্ধ অবস্থায় টারবাইনে প্রবাহিত করানো যায়। সংরক্ষিত জলাধারে জলের উচ্চতা জোয়ারের জলের উচ্চতম জলরেখা পর্যন্ত রাখা হয়। টারবাইন চেম্বারটি নদীর ভাঁটার জলতলের কয়েক ফুট ঊর্ধ্বে সংস্থাপিত করা হয় এবং টারবাইন প্রকোষ্ঠ জলাধারের যত নিকট সম্ভব নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জলাধার মুখ থেকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর প্রস্থচ্ছেদ আয়তনবিশিষ্ট পেনস্টকের সাহায্যে জলের গতিবেগ ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট গতিবেগ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ জল টারবাইনে প্রবাহিত করা হয়।

জলগ্রহণকারী খাল, হ্রদ বা পেনস্টকের মুখে নদীসংলগ্ন স্থানে উপযুক্ত ছাঁকনি স্থাপন করে নদী থেকে কচুরীপানা বা অন্যান্য ভাসমান পদার্থের আগমন প্রতিরোধ করা হয়। এতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। জোয়ার ও ভাঁটার জল গ্রহণের জন্যে কয়েকটি বিকল্প খাল খনন করা হয়। এতে পলি বা বালি জমে খালের তলদেশ ভরাট হয়ে গেলে প্রয়োজন মত পর পর তাদের সংস্কারসাধনে সুবিধা হয়। তেমনিভাবেই জল সংরক্ষণের নিমিত্ত কয়েকটি জলাধারসমষ্টি ও জলগ্রহণকারী বিকল্প আঁকাবাঁকা খাল খনন করলে প্রয়োজনের সময় একটি সমষ্টি বন্ধ রেখে তার সংস্কার করা যায় ও অপর সমষ্টির সাহায্যে টারবাইন চালানো যায়। এই একই উদ্দেশ্যে টারবাইন থেকে বহির্গত জল নিকাশের জন্যেও একাধিক জলনিকাশী খাল খননের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই জলনিকাশী খাল এমনভাবে পরিকল্পিত হতে হবে, যাতে টারবাইন কর্তৃক অন্ততপক্ষে 12 ঘন্টা সময়ের ব্যবহৃত জল ঐ নিকাশী খাল ধারণ করতে পারে। ভাঁটার সময় কপাট খুলে এই সংগৃহীত জল নদীপথে বের করে দেওয়া হয়।

অবক্ষয়রোধে সমকোণীয় সর্পিল আকৃতির খাল, হ্রদ বা সাধারণ খালের তলদেশ ও তির্যকভাবে পার্শ্বদেশ পাকা ও মসৃণ করে নির্মিত হলে জলের গতিবেগের আধিক্যে খালের পার্শ্বদেশে বা তলদেশে কোনরূপ ভাঙন বা গর্তের সৃষ্টি হতে পারে না। পার্শ্বদেশ ও তলদেশ মসৃণ হওয়ায় ঘর্ষণের ফলে জলের গতিবেগের কোনরূপ হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে না এবং প্রায় সম্পূর্ণ গতিশক্তি অক্ষুন্ন থাকে।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি যথাযথভাবে প্রকৃতির বিশ্লেষণ সহকারে গবেষণা করলে এইরূপ পদ্ধতিগুলির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইরূপ প্রকৃতি বিশ্লেষণে আরও আনুষঙ্গিক নূতন তথ্য ও নূতন জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যাবে এবং তাদের সহজ প্রণয়ন ও রূপায়ণের পথ উন্মুক্ত হবে।

উদাহরণস্বরূপ এখানে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দুই পদ্ধতিতেই প্রয়োজনবোধে টারবাইনে প্রবাহিত জলপথকে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সঙ্কীর্ণতর প্রস্থচ্ছেদ আয়তনের পেনে, পূর্বনির্ধারিত জলের গতিবেগ ও গতিশক্তি অর্জনের পর টারবাইন থেকে পূর্বনির্ধারিত দূরত্বে, উচ্চতায় ও পূর্বপরিকল্পিত সম-প্রস্থচ্ছেদ হিসাবে নির্মাণ করলে গতিপথে জলের সুষম গতিবেগ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহধারা পাওয়া সম্ভব হয় (6 নং চিত্র)। এতে প্রবাহমান জলধারার জলশক্তির বিশেষ কোনরূপ অপচয় ঘটে না। এই পরিকল্পনা জলগ্রহণকারী যে কোন আকারের পথের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

সুন্দরবনের নদীগুলির জল লবণাক্ত। এই নোনা জলের অনবরত সংস্পর্শে পেনস্টক ও টারবাইনের ধাতুনির্মিত অংশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে কোনস্টীল ইত্যাদি নোনা নিরোধক ধাতুর সাহায্যে পেনস্টক ও টারবাইনের

অংশগুলি নির্মিত হলে এই গোলযোগের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

নদীতে জলের অবস্থানের বিভিন্নতা, জলের পরিবেগ, জলের পরিমাণ, জলের স্বচ্ছতা এবং

সুন্দরবনের নদীগুলির অনেক নদীতেই এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে টার্বাইন চালানো সম্ভব হবে। যদিও নদীগুলিতে জোয়ার-ভাঁটার জলতলের পার্থক্য 15 ফুট থেকে 30 ফুট যায়,
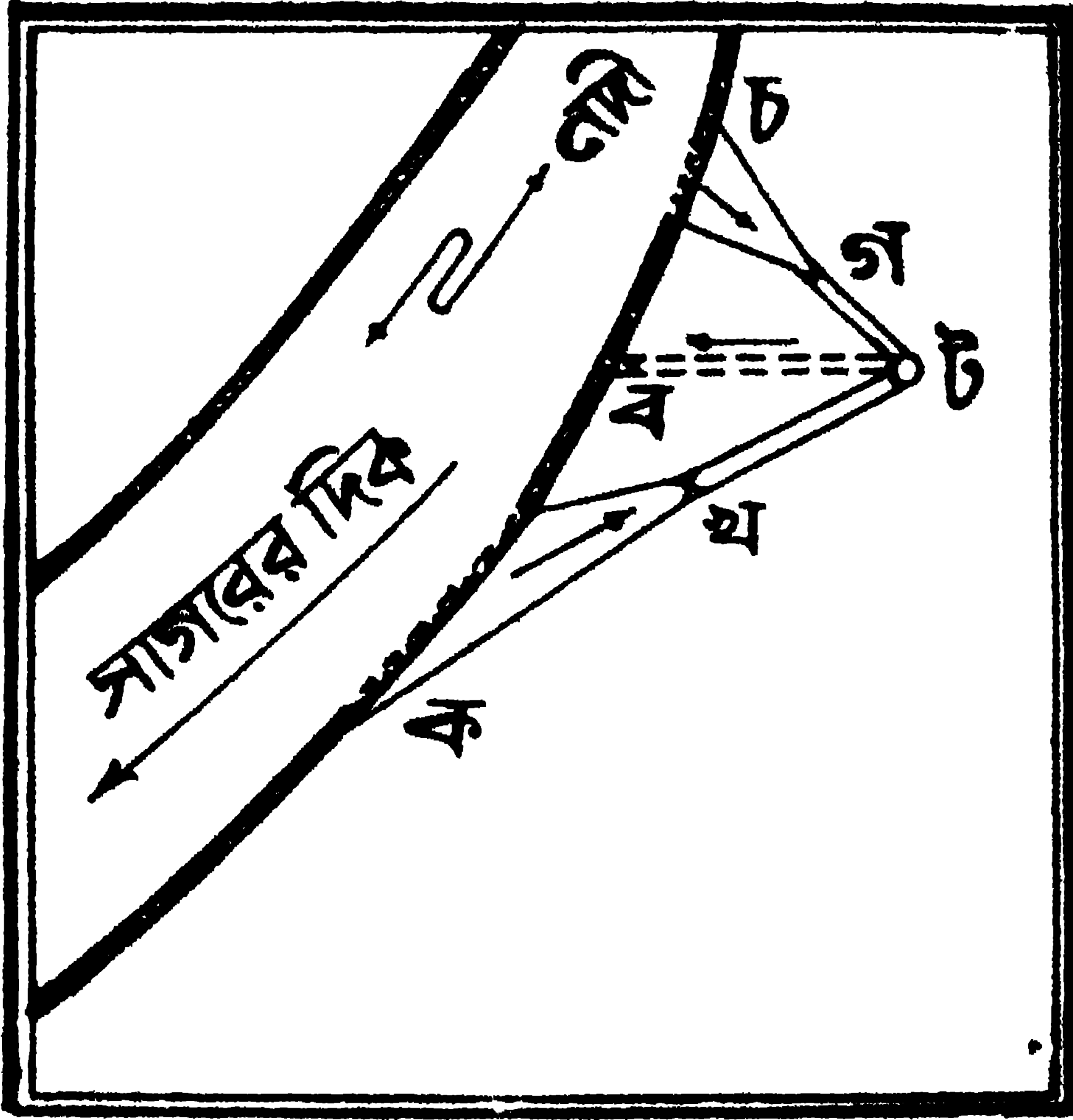
6নং চিত্র—ট—টার্বাইন, ক খ ট ও চ গ ট—যথাক্রমে জোয়ার ও ভাঁটার জলগ্রহণকারী পথ। ক খ ও চ গ—ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল প্রস্থচ্ছেদ আয়তনবিশিষ্ট পথ এবং খ ট গট সম-প্রস্থচ্ছেদ আয়তনবিশিষ্ট পথ। ট ঘ—টার্বাইন থেকে জল বের হয়ে যাবার পথ।

আঞ্চলিক ভূসংস্থানের বিবরণাদির উপর নির্ভর করে কোন্ নদীর কোন্ স্থানে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, তা নির্ণীত হয়। জলে পলি ও অন্যান্য প্রলম্বিত পদার্থের অবস্থিতির পরিমাণের উপর এর সফলতা অনেকটা নির্ভর করে। অবশ্য টার্বাইনে প্রবাহিত জলকে এই সব পদার্থ থেকে মুক্ত করবার নানা কৌশলাদিও উদ্ভাবন করতে হবে, তবেই এই প্রকল্প রূপায়ণে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করা যাবে।

তবুও আশা করা যায় এই স্বল্প উচ্চতার সাহায্যেও ছোট ছোট টার্বাইন জেনারেটর ইউনিট স্থাপন করে সাফল্যের সঙ্গে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। এইরূপ কয়েকটি ক্ষুদ্র ইউনিট থেকে কয়েক শত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এই ক্ষুদ্র ইউনিট সংস্থাপনে ব্যয়ও কম পড়বে। অনেক ইউনিট সংস্থাপনে ও পরিচালনায় বহু লোকের কর্মসংস্থানও হবে।

ভূখণ্ডের এই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত হলে দেশের বিদ্যুতের অভাব মোচন হবে, বিদ্যুতের মূল্যও কম পড়বে, গ্রাম্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র যান্ত্রিক শিল্প বিকাশের প্রসারতা লাভ করবে। গ্রাম্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনার রূপায়ণও সহজতর হয়ে উঠবে। দেশের 'সবুজ বিপ্লব' তখন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। এই পরিকল্পনা দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। দেশের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে। নিকটবর্তী রাজ্য ও দেশসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে।

চিঠি-পত্র

বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ

মহাশয়,

বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠিকা হিসাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র সম্পাদক মণ্ডলীর সমীপে কিছু বক্তব্য আছে। আজকের যুগ বিজ্ঞানের যুগ—এ বুলি দিনরাত আমরা যে না শুনছি, তা নয়। কিন্তু যতটা শুনছি, ততটা ঠিক সাধারণ সমাজে এসে পৌঁছয় নি—বিশেষতঃ আমাদের দেশের মত উন্নতশীল দেশগুলিতে। উদাহরণস্বরূপ রকেটের গতির যুগেও কলকাতা থেকে বম্বে যেতে প্রায় তিন দিন লেগে যাচ্ছে আর কলকাতা থেকে সাওপোলোতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আসতে তো প্রায় ছ মাস।

ব্যবহারিক জগতে যদিও বিজ্ঞান কিছুটা সফল, কিন্তু মনোজগতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এখনও সাধারণ মহলে সাড়া দিতে পারে নি। বাইরের বাড়ী পেরিয়ে ভিতরের অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার বিজ্ঞান এখনও পায় নি; তার একমাত্র কারণ জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখকের অভাব। (শ্রীঅমল-রতন বসুচৌধুরী 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও বাংলা সাহিত্য)' জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুলাই সংখ্যা '72 সকলকে পড়তে সবিশেষ অনুরোধ করি)। বিদেশে পরিচিত ও আত্মীয় ছাড়া কাউকে কি আমরা বৈঠকখানা ছাড়িয়ে ভিতরের ঘরে নিয়ে যাই? যাই না।

বেশীর ভাগ বিজ্ঞানের লেখা হয় ইংরেজী কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক থেকে অনুবাদ সমূহ কেবলমাত্র কতকগুলি তথ্যের সমষ্টি—এতে করে পড়তে ভাল লাগে না মোটেই।

এজন্যে অনুরোধ করি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিটি রচনা প্রকাশের আগে যেন লেখকের প্রকাশভঙ্গী, নিজস্বতা, সাবলীলতা, মনোগ্রাহিতা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর যেন আরো বেশী জোর দেওয়া হয়, শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। লেখার মান উন্নত করবার জন্যে বৎসরান্তে কোন্ লেখাটা সে বছরের শ্রেষ্ঠ ও মনোজ্ঞ হয়েছে, সে ব্যাপারে নির্বাচক মণ্ডলী পাঠক-পাঠিকা মহলের মত গ্রহণ করে সেই বছরের শ্রেষ্ঠ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' লেখককে পুরস্কৃত করতে পারেন। মূল্যটাই বড় নয়—স্বীকৃতিটাই বড়। যুবকদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম এবং তাতে লেখার মান উন্নত, আধুনিক ও সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ হবে, তখন কিন্তু সাধারণ পাঠক সমাজ তাদের অন্দরের দ্বার বিজ্ঞানের কাছে আপনি খুলে ধরবে। যাঁরা বিজ্ঞানের বহুল প্রচারের জন্যে দিনরাত শ্রম করে চলেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টাও তখন সার্থক হবে। ইতি—

মেধিকা বসু
Rua Maria Antonia 100
Apto—500, Sao Paulo, Brazil

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিজ্ঞান বিভাগ

মহাশয়,

এই পত্রের মাধ্যমে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা সম্পর্কে উপদেষ্টা ও সম্পাদক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বর্তমানে বিজ্ঞান চর্চাকারী ও বিজ্ঞানার্থী ছাত্রসমাজের যুগপৎ বলা যায়, এরকম কোন স্থায়ী পত্রিকা বাংলাভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে না। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাভাষী ছাত্রসমাজের জন্যে কিছু করণীয় আছে। বাংলাভাষী বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটায় তাদের বক্তব্য শোনবার সুযোগ হয়েছে। তাদের বক্তব্য থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, তারা বাংলাভাষার মাধ্যমেই ভালভাবে বিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয়গুলি অনুধাবনে ইচ্ছুক, কিন্তু উপযুক্ত পরিশীলিত পাঠ্যপুস্তকের অভাব তাদের ইচ্ছাপূরণের পথে বাধাস্বরূপ। বাংলাভাষী জনসমাজে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' একমাত্র সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-পত্রিকা। স্বাভাবিকভাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র কাছে আমাদের আশা, তারা আমাদের ছাত্রদের জন্যে কিছু করবেন। কি করা যেতে পারে আমি তার কিছুটা আভাস দিতে পারি।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রতি সংখ্যায় একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা যেতে পারে। ঐ ক্রোড়পত্রে থাকবে ছাত্রপাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত মূল্যবান তথ্যবহুল সরল আকর্ষণীয় প্রবন্ধাবলী। সম্ভব হলে ধ্রুপদী (Classic) গবেষণা-নিবন্ধসমূহের অনুবাদ ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত আকর্ষণীয় প্রবন্ধাদির অনুবাদ।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রপাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাভাষায় বক্তৃতামালার আয়োজন করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তি ও ছাত্রদের সমাবেশে বক্তা তাঁর বক্তব্য বলবেন এবং বক্তৃতান্তে আলোচনাও হবে। ঐ বক্তৃতামালা এবং আলোচনাদি ক্রোড়পত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। সম্ভব হলে, বক্তাকে কিছু সম্মান-দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রস্তাবিত ক্রোড়পত্র 'ছাত্র বিজ্ঞানীর দপ্তরে'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং এজন্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় 'ছাত্র বিজ্ঞানীর দপ্তর' অবিলম্বে খোলবার প্রয়োজন অনুভব করছি। এই বিশেষ দপ্তরটি ছাত্রদের বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার সম্ভবপর সকল সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। এই বিশেষ দপ্তরটির পরিচালকমণ্ডলীতে থাকবেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ব্যক্তিগণ। কিন্তু নানাবিধ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্যে বাংলাভাষা ও বিজ্ঞান কাজ চালানোর মত জানেন এরকম একজন উৎসাহী কর্মীকে স্থায়ী পদ সৃষ্টি করে বহাল করতে হবে।

এভাবে আমাদের ছাত্রসমাজের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত পরিশীলিত পাঠ্যপুস্তকের অভাব কিছুটা মেটানো সম্ভব হবে এবং দেশের তরুণ সম্প্রদায় মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করায় উৎসাহী হবেন।

আশা করি, আমার পত্রটি আপনাদের সাগ্রহ বিবেচনার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হবে না।

শ্রদ্ধান্তে নিবেদন
ইতি

বিনীতা
অনিতা কুণ্ডু
15, বসাক বাগান
কলিকাতা-48

কৃষি-সংবাদ

গভীর জলের ধানগাছ

আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এন. বরঠাকুর এই সম্বন্ধে লিখেছেন—ধান একটি এমন ফসল যা নানা বিরুদ্ধ আবহাওয়া ও পরিস্থিতিতে জন্মানো যায়। এই ফসল যেমন অনেক উঁচু ও খাড়াই জায়গায় জন্মানো যায়, তেমনি খুব নীচু জলমগ্ন অঞ্চলে—এমন কি 4-5 মিটার পর্যন্ত দাঁড়ানো জলের মধ্যেও জন্মানো যেতে পারে। এই ধরনের জলে-ডোবা অঞ্চলের উপযুক্ত ধানকে গভীর জলের ধান বলা হয়। কখনও কখনও এগুলিকে বন্যা সহনশীল প্রকারও বলা হয়, কারণ এগুলি কিছু সময় পর্যন্ত নিজেদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত জলস্ফীতি সহ্য করতে পারে। অবশ্য এই গাছগুলি সব ধরনের বন্যা সহ্য করতে পারে না। বিশেষতঃ আসামের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের পক্ষে এগুলি উপযুক্ত নয়। এদের অনেক সময় ভাসমান ধানও বলা হয়ে থাকে।

গভীর জলের ধানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এগুলি ক্রমবর্ধমান জলের স্তরের সঙ্গে বাড়তে পারে। তবে ক্রমবর্ধমান জলের বন্যা সহ্য করবার জন্যে চারাগাছগুলির অন্ততপক্ষে ছয় সপ্তাহ বয়সের হওয়া দরকার। তারপর থেকেই এই প্রকারের ধানগাছ জলস্ফীতির সঙ্গে সমতা রেখে বড় হতে থাকে। জলের স্তর যখন দ্রুত বাড়ে, তখন ধানগাছের মধ্যপর্বগুলি লম্বা হয় এবং জলের স্তর যখন একভাবে থাকে, তখন সেগুলি ছোট থাকে। অবশ্য জলের মধ্যে বেড়ে উঠবার বা ছড়িয়ে পড়বার ক্ষমতা প্রকারের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। কোন কোন প্রকার খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে ও 5 মিটার পর্যন্ত জলের স্তরে ডুবে থাকা সহ্য করতে পারে। আবার কোন কোন অগভীর প্রকার 2 মিটারের বেশী জল সহ্য করতে পারে না। এছাড়া জলের আকস্মিক স্ফীতি সহ্য করতে পারবার ক্ষেত্রেও প্রকারের তারতম্য আছে।

গাছের গোড়ার শিকড় তৈরি হওয়া ছাড়া জলের নীচেকার গ্রন্থি বা পর্বগুলি থেকেও শিকড় গজায়। এই ধরনের শিকড়ের মধ্যে যেগুলি প্রথম দিকে গজায়, সেগুলি পাতলা ও বহুশাখাযুক্ত হয়। গাছ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর দিককার গ্রন্থি থেকে কয়েকটি শক্ত শাখা-প্রশাখা বর্জিত শিকড় তৈরি হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাছগুলির মূল শিকড় মাটিতে না থাকা সত্ত্বেও এগুলি বড় হয় ও ফসল উৎপন্ন করতে পারে। এর ফলে বন্যার জলে গাছগুলি শিকড়সহ উঠে এলেও অনায়াসেই বেঁচে থাকতে পারে। শেষে যখন জল কমে যায়, তখন গাছগুলি শুয়ে পড়ে ও গ্রন্থি-শিকড়গুলি মাটিতে ছড়িয়ে যায়।

গভীর জলের ধানে তিনবার বিয়ান নির্গত হয়। প্রথমতঃ জল বাড়তে আরম্ভ করবার আগে গাছ মাটিতে থাকাকালীন অবস্থায় মূল বিয়ান নির্গত হয়। দ্বিতীয়তঃ জলের স্তর যখন স্থিতিশীল হবে, তখন জলের তলায় কয়েকটি গ্রন্থি থেকে বিয়ান নির্গত হয়। তৃতীয়তঃ যখন জল কমে যায় এবং গাছগুলি মাটিতে সমান হয়ে শুয়ে পড়ে, তখন গ্রন্থিগুলি থেকে আবার বিয়ান নির্গত হতে আরম্ভ করে। প্রধানতঃ প্রথম অবস্থার বিয়ানগুলি থেকেই ফসল উৎপাদিত হয়। তাই বেশী উৎপাদনের জন্যে প্রাথমিক অবস্থায় চারা গাছগুলির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ও সর্বাধিক পরিমাণে মূল বিয়ান নির্গত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

গভীর জলের ধান আলোক-সংবেদনশীল ও

দীর্ঘ স্থিতিকালের। সাধারণতঃ মার্চের শেষ থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এর বীজ বোনা হয়, যাতে জল প্রবেশ করবার আগেই চারাগাছগুলি তা সহ্য করতে পারবার উপযুক্ত বয়সের হতে পারে। নভেম্বরের শেষের দিকে সাধারণতঃ এই ফসল তোলা হয়। অবশ্য এর মধ্যে কিছু কিছু জলদি জাতও আছে, যেগুলি অক্টোবরের শুরুতেই পেকে যায়। এই প্রকারগুলি আলোক-অসংবেদনশীল বা সামান্য মাত্রায় সংবেদনশীল হতে পারে।

গভীর জলের ধান চাষ করবার সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ চারাগাছগুলি সতেজ থাকা বিশেষ দরকার; কারণ তাহলে তারা বন্যার প্রথম আক্রমণ সহ্য করতে পারবে ও সেগুলি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাথমিক বিয়ান নির্গত হতে পারবে। প্রাথমিক জলস্ফীতি সহ্য করবার জন্যে চারাগাছের দীর্ঘতার চেয়ে তাদের পরিণত বয়স অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা সহ্য করবার আগে চারাগাছগুলির বয়স অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ হওয়া দরকার। চারাগাছগুলি যদি অল্প সময়ের মধ্যে সতেজ ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে, তাহলে বন্যার জল তাড়াতাড়ি এসে গেলেও ফসলের ক্ষতি হবে না।

দেখা গেছে যে, জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে প্রাথমিক বিয়ানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণও স্বভাবতঃই বেড়ে যায়। অবশ্য বিয়ান বের হবার ক্ষমতা প্রধানতঃ প্রকারবিশেষের উপর নির্ভর করে। যে প্রকারগুলির বিয়ান তাড়াতাড়ি নির্গত হয়, সেগুলির চারাগাছগুলিও অল্প বয়সেই সতেজ হয়ে ওঠে। কোন কোন প্রকার একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়ে এবং 1-2 মিটার দাঁড়ানো জলে জন্মাবার উপযুক্ত। এ-আর-আই (পানিধান)—এই ধরনের একটি জাত। আবার ই বি-আই (বেবেতি)-এর মত কোন কোন প্রকার আছে, যেগুলি 3-5 মিটার গভীর দাঁড়ানো জলের অবস্থায়ও জন্মানো যেতে পারে। বিভিন্ন অবস্থায় জন্মাবার জন্যে দুই প্রকার ধানেরই চাষ করা উচিত।

গভীর জলের ধানগাছের বৃদ্ধি তাদের জলে ডোবা অবস্থা সহ্য করতে পারবার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। যে প্রকারগুলি দীর্ঘকালের জন্যে নিমজ্জিত অবস্থা সহ্য করতে পারে না, সেগুলি জলের স্তর বেড়ে ওঠবার সঙ্গে মাথা বজায় রেখে অপেক্ষাকৃত বেশী তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

দীর্ঘ সময়ের জন্যে গভীর জলমগ্নতা সহ্য করতে পারবার ক্ষমতা এই ধরনের ধানের আদর্শ গুণ। প্রকারভেদে এই ধানের গাছ ছয় ইঞ্চি থেকে 3 ফুট পর্যন্ত জলে ডোবা অবস্থা সহ্য করতে পারে। ডুবে থাকতে পারবার সময়কালও প্রকারভেদে একদিন থেকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এছাড়া জলের স্তরের হঠাৎ বেড়ে ওঠা সহ্য করতে পারবার ক্ষমতাও প্রকারভেদে বিভিন্ন। যেমন 'কেকোয়া' প্রকারটি জলের হঠাৎ বেড়ে ওঠা সহ্য করতে পারে, কিন্তু 'তারাবাও' তা সহ্য করতে পারে না।

যে সমস্ত আশু জাতের ধান সেপ্টেম্বরের শেষে বা অক্টোবরের প্রারম্ভে পাকে, সেগুলির ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ জল না কমবার ফলে ফসল তোলায় অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই ধরনের ধানের বীজ সুপ্তাবস্থায় থাকলেও গাছ ঝুঁকে পড়বার ফলে যদি পরিণত বীজ জলের সংস্পর্শে আসে, তবে শস্য অঙ্কুরিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে সাধারণতঃ এই ধানের প্রকারগুলি নাবী প্রকৃতির হয় এবং নভেম্বরের শেষের দিকে পাকে। যে প্রকারগুলি অক্টোবরের শেষে বা নভেম্বরের শুরুতে পাকে, সেগুলি চাষ করাই সবচেয়ে ভাল; কারণ তাহলে সেই জমিতে আবার অন্য ফসল চাষ করা যেতে পারে।

এই ধানের বেশীর ভাগ জাতের রং লালচে

ধরণের। কিন্তু সাদা চালই সাধারণতঃ বেশী জনপ্রিয়। অবশ্য সাদা দানাযুক্ত কয়েকটি প্রকারও আছে। তার মধ্যে 'জারাবাও' প্রকারটি সম্প্রতি চাষের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে।

গভীর জলের ধানে উৎপাদনের বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্যে তাদের থেকে সাধারণ উচ্চ ফলনশীল প্রকারের মত ফলন আশা করা যায় না। এই চাষের গড়-ফলন হেক্টর প্রতি 2300 থেকে 2700 কিলোগ্রাম। অবশ্য এই উৎপাদনের উন্নতি করা যেতে পারে।

গভীর জলের ধানের জাতের উন্নতিসাধন করে এর সংশ্লিষ্ট অসুবিধাগুলি দূর করা যেতে পারে। গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে যে, এই ধরনের চাষের বিভিন্ন প্রকারগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের গুণ আছে। সুতরাং এই সব প্রকারের-সংকরণের দ্বারা উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল প্রকারের উদ্ভাবন করা সম্ভব। জলে ভেসে থাকবার ফলে এক সঙ্গে জন্মানো গাছের ডগাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে। সেই জন্যে নতুন প্রকার উদ্ভাবনের সময় চারাগাছগুলির মধ্যে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে প্রত্যেকটি গাছের সঙ্গে একটি করে লম্বা কাঠি আলাদাভাবে বেঁধে দিলে বিভিন্ন গাছগুলিকে আলাদা করে রেখে দিতে সুবিধা হবে।

আসামে সম্প্রতি প্রচলিত প্রকার 'বেবেরি' ও 'কেকোয়া' 5 মিটার পর্যন্ত দাঁড়ানো জলে ডুবে থাকতে পারে। কেকোয়া প্রকারটি জলের হঠাৎ বেড়ে ওঠা সহ্য করতে পারে। এছাড়া সাদা শস্যযুক্ত একটি উচ্চ ফলনশীল প্রকারও চাষের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

গভীর জলের ধান চাষের সময় আগাছার সমস্যার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আগাছা বিশেষতঃ বুনো ধানগাছ দমন করা বেশ শক্ত, কারণ এদের বীজ নিজে থেকেই ঝরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং সেই জন্যে আগাছা নিয়ন্ত্রণের এই দিকটির প্রতি এখন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি ভবন, নতুন দিল্লী।)

চণ্ডীগড়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক জয়ন্তী

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

এই বছর (1973) ছিল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক জয়ন্তী অর্থাৎ 60তম বার্ষিক অধিবেশন। এই বিশেষ অধিবেশনের আসর বসেছিল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে মহান স্থপতি কার্বুজের পরিকল্পিত অনুপম চণ্ডীগড় শহরে। একে হীরক জয়ন্তী অধিবেশন, তার উপর চণ্ডীগড় শহর—এই 'মণিকাঞ্চন' যোগাযোগ প্রতিনিধিদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ বহন করে এনেছিল। তাই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি এবারের অধিবেশনে সমবেত হয়েছিলেন।

প্রতি বছরের মত এবারও যথানির্দিষ্ট 3-9 জানুয়ারী (1973) এক সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তেসরা জানুয়ারী সকালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে নির্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপে হীরক জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের আগে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুরজ ভান প্রধান মন্ত্রী, বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সমবেত প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান। তিনি বলেন: চণ্ডীগড়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন এই দ্বিতীয়বার হচ্ছে। এর আগে 1966 সালে এখানে প্রথমবার অধিবেশন হয়েছিল। সেবারও অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে এই দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের উদ্যোগী হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণের জন্যে চাই সুচিকিৎসা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুযোগ, খাদ্য ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত। আর এই কাজগুলি করতে হলে বিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবতে হবে এবং নব নব উদ্ভাবন-শক্তির পরিচয় দিতে হবে।

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের বর্তমান বছরের মূল সভাপতি ডক্টর এস ভগবন্তম তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—আমাদের সমস্যাগুলি একান্তভাবে আমাদেরই। কোন্‌টার মোকাবিলা আগে আর কোন্‌টার পরে, তা বিচার করতে হবে আমাদের নিজের দিকে তাকিয়ে। কাজেই আমাদের দেশের বিজ্ঞানচর্চা মার্কিন বা রুশ মার্কা নয়, সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন—দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্রে চাই আধুনিকতা। আর এর জন্যে বিজ্ঞানীদেরই আত্মনিয়োগ করতে হবে অধিকতর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে।

তিনি বলেন—স্বাধীনতার পর এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সংখ্যায় তা এক-শ'র কাছাকাছি। এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে বের হচ্ছেন—যাঁরা বিজ্ঞানচর্চায় অবশ্যই আত্মনিয়োগে উৎসুক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সেই পরিমাণে বাড়ানো হয় কি?

---

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলকাতা-29

এর জন্যে আর্থিক ব্যবস্থাও যেমন উদারভাবে করা হয় নি। ফলে সম্ভাবনা যা-ও ছিল, তা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ পায় নি। গত কয়েক দশক ধরে আমাদের বিজ্ঞানীদের নানা প্রয়াস সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে। তাদের যথেষ্ট খাদ্য জোটে না, যাও বা জোটে তার খাদ্যগুণ নামমাত্র। বিজ্ঞানের উপর আমলাতন্ত্রের খবরদারিতে এই অবস্থার প্রতিকার হবে না। আমলাতন্ত্র বিজ্ঞানী সৃষ্টি করতে পারে না।

মূল সভাপতির ভাষণের পর বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচয় দেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়। এবারের অধিবেশনে বিদেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা হলেন আফগানিস্থানের এম. মহম্মদ নাজারী, বাংলা দেশের ডক্টর আনাস আলি, শ্রীলঙ্কার সি. পন্নম্বলম, চেকোশ্লোভাকিয়ার ডক্টর বোহুমির রোসিকি এবং ডক্টর জেনেক লেজেক, ডেনমার্কের ই. এ. জেনসেন, ফ্রান্সের মাদাম এম. টি. কাজিন, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অধ্যাপক সি. ক্রোগে, অধ্যাপক এইচ কাংজলেবেন, ইরানের অধ্যাপক আলি আকবরনিসর; হংকং-এর অধ্যাপক বি. লফংস, জাপানের অধ্যাপক জি. মুরাযামা; কুয়েতের এম. ড'বু. আল-জাহির; মালয়েশিয়ার ডক্টর জে হক হেঙ্, মঙ্গোলিয়ার কে. নেমেক এবং এন. আদিয়াব; পোল্যান্ডের অধ্যাপক আর সিকোরস্কি, রুমানিয়ার এন. বেবান, বৃটেনের নোবেল পুরস্কারবিজয়ী স্যার জর্জ পোর্টার, ডক্টর লিয়ন রালফস, ডক্টর আর. বেনস্কিন; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডক্টর উইলিয়াম উইলিয়ামস, ডক্টর জে. বি. নিমক্রোফার এবং ডক্টর এনরিকো গ্যালো; সোভিয়েট রাশিয়ার অ্যাকাডেমিশিয়ান এম. এম. শাজারভো।

প্রতি বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান পুস্তকের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবে অন্যান্য বারের তুলনায় প্রদর্শনীটি এবার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়েছিল। মূল অধিবেশনে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক মন্ত্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম।

ঐ দিন বিকেলে প্রবাসের বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 'ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা' সম্পর্কে একটি আলোচনা-সভা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে গান্ধী ভবনে। আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান ডক্টর রমেশচন্দ্র কাপুর এবং বাকী ডক্টর সত্যপ্রকাশ, বি. কে. নাগার, বর্তমান লেখক প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচারের যে প্রয়াস চলছে, তা বাংলা ভাষায় বিবৃত করেন লেখক। ডক্টর সত্যপ্রকাশ আশা প্রকাশ করেন—এমন দিন শীঘ্র আসছে, যখন বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখার কার্যাদি ভারতীয় ভাষায় লিখিত ও পঠিত হবে। সভাপতি ডক্টর কাপুর হিন্দীতে 'ভারতে জড়িৎ বৈদ্যুতিক রসায়নের প্রগতি' সম্পর্কে অভিভাষণ পাঠ করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 4ঠা জানুয়ারী থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ষোলটি বিভিন্ন শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন শুরু হয়। এবার বিভিন্ন শাখায় যাঁরা সভাপতিত্ব করেন, তাঁরা হলেন—ডঃ পি. কে. আয়েঙ্গার (পদার্থবিদ্যা), অধ্যাপক আর. সি. কাপুর (রসায়ন), অধ্যাপক আর. পি. বাম্বা (গণিত), ডক্টর এম. ভি. ম্যাথিউজ (পরিসংখ্যান), এম. এস. বালসুব্রহ্মণ্যম (ভূগোল ও ভূতত্ত্ব), অধ্যাপক অরুণকুমার শর্মা (উদ্ভিদবিদ্যা), ডক্টর অশোক ঘোষ (প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব), ডক্টর প্রবোধকুমার ভৌমিক (নৃতত্ত্ব ও

প্রাণিতত্ত্ব), অধ্যাপক পি. এন. ভগাদি (চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা), ডক্টর এম. কে. থিরুমালাচার (কৃষি বিজ্ঞান), ডক্টর এস. কে. মুখোপাধ্যায় (শারীরতত্ত্ব), অধ্যাপক বি. কুন্ডাপ (মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান) এবং ডক্টর জি. আর. তোশনিওয়াল (যন্ত্র ও ধাতুবিদ্যা)।

বিভিন্ন শাখায় সভাপতির ভাষণ ছাড়া আলোচনা-চক্র, গবেষণাপত্র পাঠ চলেছিল কয়েক-দিন ধরে। এছাড়া বিভিন্ন শাখায় কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্যার জর্জ পোর্টার, অধ্যাপক বি. লকৎস্, অধ্যাপক জি. ওয়াইটরিজ, শ্রী টি. ভি. বিশ্বনাথন, ডক্টর এম. কে. পানিকার, অধ্যাপক কে. জি. রামানাথন, ডক্টর নিত্যানন্দ, ডক্টর এস. পি. রায়চৌধুরী, অধ্যাপক পি. এন. ভাটনগর, অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসু, ডক্টর গোপীনাথ রায়, অধ্যাপক এফ. সি. অ্যাউনাক, অধ্যাপক এম. এস. মানি, অধ্যাপক বি. এল. রাউ, অধ্যাপক বি. কে. আনন্দ, অধ্যাপক কে. এন. নায়ার, ডক্টর আর. জি. ধ্যানেশ্বর, অধ্যাপক এম এস. থামস্, অধ্যাপক আর. শিকোরুশি প্রমুখ কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা দেন।

প্রতি বছরই বিদেশাগত ও এদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি লোকরঞ্জক বা জনপ্রিয় বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এই বছর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় বক্তৃতা হয় নোবেল পুরস্কারবিজয়ী স্যার জর্জ পোর্টারের। 'বিজ্ঞানের সত্যস্বরূপ' প্রসঙ্গে তিনি একটি অতি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—সমরাস্ত্রের দ্বারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার দূষিতকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত অপব্যয়ের জন্যে যাঁরা বিজ্ঞানের উপর দোষারোপ করেন, তাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্যটা গুলিয়ে ফেলেন না। বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানচর্চা এবং মানুষকে তার প্রগতির জন্যে এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। বিজ্ঞানের প্রয়োগ দিয়েই সমস্যার সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞান দিয়ে নয়। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগকেই নৈতিক দিক থেকে বিচার করতে হবে, বিজ্ঞানকে নয়। প্রযুক্তিবিদ্যার বিকল্প অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে অজ্ঞতা। পৃথিবীর অর্ধেক লোক যখন উন্নয়নের অপেক্ষায় রয়েছে, তখন এই জ্ঞানচর্চা কিংবা সেই উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিবিদ্যাকেও আমরা কি পরিহার করতে পারি? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও বিশ্ব সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান আহরণের ফলে আমরা যদি প্রচলিত নীতিবোধ হারিয়েও থাকি, তা হলেও বলা যায় আমাদের জীবনের নতুন নীতিবোধের পথ রচিত হবে আরও অধিক জ্ঞানচর্চা এবং বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের আরও জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য ও সত্যস্বরূপ।

স্যার পোর্টার ছাড়া অধ্যাপিকা পার্বতীদেবী, অধ্যাপক সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডক্টর নীলরতন ধর, ডক্টর পি. কে. ভেওয়ার্সি। অধ্যাপক পি. এন. মেহরা, ডক্টর মোহনলাল জৈন কয়েকটি লোকরঞ্জক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী স্মারক পদক প্রাপ্তি উপলক্ষে বক্তৃতা দেন ডক্টর এম. এস. স্বামীনাথন, মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা দেন ডক্টর এস. পি. রায়চৌধুরী, পঞ্চম বার্ষিক জিলিপ হোয়াইট স্মারক বক্তৃতা দেন ডক্টর এম. আর. এস. আয়েঙ্গার এবং 'প্রোটিন সমস্যা' সম্পর্কে দ্বাদশ বার্ষিক বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন ডক্টর পি. জি. মুখার্জি।

যুব-ছাত্রদের জন্যে বিশেষ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয় এবং তাতে ডক্টর এফ. জিমকল র‍্যাল্ফ, এবং শ্রীশিবাজী চট্টোপাধ্যায় দুটি বিশেষ বক্তৃতা দেন। এছাড়া বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিকল্পনা' সম্পর্কে বিশেষ আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজ্যপাল এবং অভ্যর্থনা সমিতি সমবেত বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের তিন দিন প্রীতি-সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। সারা দিনের গুরুগম্ভীর আলোচনার পর প্রতিনিধিদের চিত্তবিনোদনের জন্যে কয়েক দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী দিনের সন্ধ্যায় বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুমার গন্ধর্ব রাগপ্রধান ও ভজন গানে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় চণ্ডীগড়ের গৃহ-বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রীরা রাজকুমার কে. পি. সিন্হার পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' অবলম্বনে একটি চিত্তাকর্ষক নৃত্য-নাট্য পরিবেশন করেন। তৃতীয় দিন স্থানীয় সরকারী মহিলা কলেজের ছাত্রীরা 'আম্রপালী' সঙ্গীত-নৃত্য-নাটিকা পরিবেশন করেন। আগের দিনের নৃত্য-নাট্যের তুলনায় এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু তেমন রসোত্তীর্ণ হয় নি। চতুর্থ দিনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও কৌতুক-নক্সার একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানে সকলের মনোরঞ্জন করেন।

প্রতি বছরের মত এবারেও অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিদের জন্যে চণ্ডীগড়ের দর্শনীয় স্থানগুলি, ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধ, পিঞ্জোর মোগল উদ্যান ও শিমলা ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। অনেকে এই সুযোগ গ্রহণ করেন।

এবারের অধিবেশন শেষে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ কমিটির সভায় 1973 সালের জন্যে মূল সভাপতিপদে অধ্যাপিকা ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞান কংগ্রেসের 60 বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলা মূল সভাপতি-রূপে বৃত হলেন। এই ঘোষণায় সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন।

এবারের অধিবেশনে এক সপ্তাহকাল আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রানী লক্ষ্মীবাঈ ছাত্রীনিবাসে ছিলাম, সেখানকার ওয়ার্ডেন শ্রীমতী ভাবরা ও ছাত্রীরা প্রতিনিধিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যে সব সময় আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসে-ছিলেন, তাতে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁদের এই আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা সহজে ভোলবার নয়।

সমাজ-বিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার

সত্যেন্দ্রনাথ গিরি*

যুক্তি ও সংখ্যার সাহায্যে কতকগুলি জানা বিষয় থেকে কতকগুলি অজানা বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করাই গণিতের কাজ। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে অজানা বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে গণিতের অবদান সত্যই অনন্য।

প্রাচীন কালে গণিতের সৃষ্টি হয়েছিল এই সামাজিক প্রয়োজন থেকেই। সংখ্যা গণনার পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে আদিম মানুষ বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাতে চাইতো। কোন আদিম মানুষ দশটা ফল কুড়িয়েছে, এটা বোঝাবার জন্যে তাকে হয়তো নাকে ডান হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। কোন মেষপালক হয়তো দু-হাতে দু-কান ধরে বোঝাতে চাইতো, তার কুড়িটা মেষ আছে। প্রাচীন ভারতের যজ্ঞকুণ্ডের বেদী নির্মাণে গণিতের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এমনিভাবে যুগে যুগে প্রধানতঃ সামাজিক প্রয়োজন থেকেই গণিতের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়ে আসছে।

ভৌত বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানে গণিতের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়ছে ও বাড়বে। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় গণিতের সাহায্যে অভাবিত উন্নতিলাভ করেছে। গণিত-নির্ভর বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য অগ্রগতি আমাদের সমাজ-জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

ভৌত বিজ্ঞান ছাড়া সমাজ-বিজ্ঞানেও গণিতের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় গণিতের সাহায্যে আজ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গণিতের প্রয়োগ সম্বন্ধে দু-চার কথা আজ এখানে আলোচনা করবো।

অর্থনীতিতে গণিতের প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক। যোগান-চাহিদার নিয়ম, বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, বাজার দরের পরিবর্তন, অর্থবিনিয়োগ ব্যবস্থা, জাতীয় আয় প্রভৃতি বিষয় বুঝতে হলে লেখচিত্র, প্রতীকের ব্যবহার ও পরিসংখ্যান পদ্ধতি আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সাধারণতঃ দেখা যায় খুব কম উৎপাদন করতে উৎপাদন-খরচ বেশী পড়ে। তাই প্রান্তিক লাভ কম হয়। আবার অপেক্ষাকৃত বেশী উৎপাদন করলে একক প্রতি খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয় ও প্রান্তিক লাভ বেশী হয়। আবার খুব বেশী উৎপাদন করলে এই সব জিনিষ সঞ্চিত করে রাখবার খরচ, মূলধন বিনিয়োগের খরচ, চাহিদার তুলনায় যোগানের আধিক্য প্রভৃতি কারণে প্রান্তিক লাভ কমে যায়। এখন প্রশ্ন হলো—বেশী লাভ করতে হলে কখন উৎপাদন বন্ধ করা হবে? প্রান্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি, উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ালে আমরা এমন একটা সীমায় পৌঁছই যখন আমাদের প্রান্তিক লাভ থাকে না ও ক্রমশঃ ক্ষতি হতে থাকে। লাভ কমে গেলেও উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে, তাতে মোট লাভ বেশী হবে। কিন্তু প্রান্তিক লাভ শূন্য হলে উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। গাণিতিক বিশ্লেষণের দ্বারা অর্থনীতির এরকম অনেক বিষয়কেই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

---

* ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, 25/3 বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-19

দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগ যে আছে, তা আমরা জানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও গণিতের প্রভাব যথেষ্ট। আমরা জানি বেশী জিনিষপত্র মজুদ রাখতে গেলে বেশী মূলধন লাগে ও বেশী পরিমাণ জায়গা লাগে। তাতে ব্যবসায়ীর বেশী খরচ হয়। আবার কম জিনিষ রাখলে ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, ফলে কম কেনা হয় ও লাভ কম হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে জিনিষ খুব বেশী রাখলেও ক্ষতি, আবার খুব কম রাখলেও ক্ষতি। এখন জানা দরকার ঠিক কত পরিমাণ জিনিষ রাখলে লাভ সবচেয়ে বেশী হবে। গাণিতিক উপায়ে আমরা এর সঠিক সমাধান পেতে পারি। রৈখিক কার্য নির্দেশনার (Linear programming) সাহায্যে বিশেষ সর্তসাপেক্ষে সর্বাধিক মান নির্ণয় করতে পারি। বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থাবলম্বন করবার ক্ষেত্রে সংযোজনমূলক প্রক্রিয়ার (Combinatorial method) সাহায্য নেওয়া যায়। উৎপন্ন দ্রব্যের মান সঠিক রাখবার জন্যে গুণ নিয়ন্ত্রণ (Quality control) তত্ত্বের সাহায্যে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

পৌরবিজ্ঞানেও গণিতের বিভিন্ন বাস্তব প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। লোকসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতির কথা চিন্তা করে জেলা মহকুমা গঠন ও তাদের প্রতিনিধির সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে আমরা পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকি। বিশেষ করে নির্বাচনে ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেশের কোন্ অঞ্চলে কিরকম রাজনৈতিক প্রভাব আছে তা বোঝা যায়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিভিন্ন প্রদেশের এম. এল. এ ও এম. পি-দের ভোটের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের নির্বাচক মণ্ডলী প্রদেশে বা দেশের নির্বাচক মণ্ডলীর তুলনায় কত ভাগ, তা দেখি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যাকে মোট এম. এল. এ-র সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে এক-হাজারের এককে প্রকাশ করলে পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক এম. এল. এ-র ভোটের সংখ্যা পাওয়া যাবে। এইভাবে বিভিন্ন প্রদেশের এম. এল এ-র ভোটের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। অনুরূপভাবে এম. পি.-দের ভোটের সংখ্যাও স্থির করা হয়। একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটদানের এই গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে দেশের অর্ধেকেরও বেশী নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন।

লোকসংখ্যা সম্বন্ধে ম্যালথাসের তত্ত্ব পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ম্যালথাসের মতে, একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর লোকসংখ্যা বাড়ে দ্বিগুণ চারগুণ, আটগুণ করে। আর খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ঐ সময় অন্তর বাড়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ অর্থাৎ লোকসংখ্যা বাড়ে গুণোত্তর শ্রেণীতে ও খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে সমান্তর শ্রেণীতে। ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে ভবিষ্যতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন আনুপাতিকভাবে কম হবার জন্যে খাদ্যাভাব দেখা দেবার সম্ভাবনা। কৃষি-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ও জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাবলম্বন সত্ত্বেও বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের অভাব এখন চরমে উঠেছে। ম্যালথাসের সাবধানবাণীর দিকে লক্ষ্য রেখে লোকসংখ্যা সীমিত করবার জন্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির তৎপরতা ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংখ্যা-পরিসংখ্যান ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিশ্লেষণ থেকেই দেশের জাতীয় পরিকল্পনার কাঠামো রচিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প, স্কুল, কলেজ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপনের জন্যে ঐ অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, লোকসংখ্যা প্রভৃতির পরিসংখ্যানমূলক বিবরণ বিবেচনা করা হয়। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি একটা অপরিহার্য উপায় বলা যেতে পারে।

কোন বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে কোন্ বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প কতটা কার্যকরী হতে পারে, তা পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। শিক্ষা-বিস্তার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ পরিকল্পনা প্রভৃতির সাহায্যে অনুন্নত অঞ্চলের সম্ভাব্য উন্নতি-পরিকল্পনা সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়। সেই অঞ্চলের পরিসংখ্যান-গত তথ্যের সাহায্যে গাণিতিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে এইসব তথ্যের বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচনায় নিখুঁত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমাদের দেশের সঠিক অগ্রগতি সম্ভব।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবার ক্ষেত্রেও গণিতের ভূমিকা কম নয়। কোন্ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থা থাকে, তাও গাণিতিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায়। ইংল্যাণ্ডের লুইস রিচার্ডসন প্রত্যেক দেশের জাতীয় চরিত্র, প্রতিরক্ষা বাজেট, বাজেট বৃদ্ধির হার, সমরোপকরণ যুদ্ধভীতি প্রভৃতিকে একটি বিশেষ সমীকরণে প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠীর সমরায়োজনের সমীকরণ সমাধান করে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সাম্যাবস্থার শর্ত নির্ণয় করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থাবলম্বন শান্তির উপায় হলেও দেখা যায়—আত্মরক্ষার জন্যে অনেক সময় আক্রমণের প্রয়োজন। তাঁর মতে এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠীর পরিমিত সমরায়োজনের মাধ্যমে শক্তিসাম্যই শান্তিরক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। বিশ্বযুদ্ধ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও যুদ্ধায়োজনের ঘটনা থেকে সমীকরণ নিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তিনি এসব সিদ্ধান্তে এসেছেন। সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টির মৌলকারণগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধকেও তিনি গাণিতিক সংকেত ও সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের গঠন প্রণালী মুখ্যতঃ গাণিতিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সম্ভাবিত উন্নতি আমাদের সামনে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে এইসব যন্ত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্প সময়ে হিসাব-নিকাশ করবার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রয়োগের কথা আমাদের সকলেরই জানা। কেবলমাত্র গণনাগত সমস্যার ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় পরিকল্পনা, সামাজিক সমস্যা এমনকি মানসিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আজ এগিয়ে আসছে।

জাতীয় পরিকল্পনার জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলের পরিসংখ্যানকে কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়। রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে খুব কম সময়ে বিভিন্ন প্রকার তথ্যের পরিসংখ্যান-গত বিশ্লেষণ সম্ভব। রেলওয়ে ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক-ভাবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রয়োগ করা যেতে পারে। ট্রেন আসা-যাওয়ার সময় নির্ধারণ, তাদের গতিবেগ, নির্দিষ্ট সময়ে-দূরত্ব, বেশীপক্ষে ওজনের পরিমাণ ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে খুব অল্প সময়ে বের করা সম্ভব। রাশিয়ায় তড়িৎচালিত ভূগর্ভ রেলের-গতিবেগ, সময়, ওজন রেলের কামরার সংখ্যা তড়িৎ চালনা আরম্ভ ও শেষ করবার সময় ইত্যাদি সঠিকভাবে নির্ণয় করবার জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এমন কি, পড়াশুনার ক্ষেত্রেও আজকাল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। কতকগুলি প্রাথমিক ধারণা অল্প অল্প করে ছাত্রের সামনে ধরা হয়। পরে মেশিনের ভাষাতে প্রশ্ন আসে, প্রশ্নের উত্তর ঠিক হলো কিনা মেশিনের হাতল ঘোরালেই তা বোঝা যাবে। ঠিকভাবে শেখা হলে ছাত্রেরা পরবর্তী নিয়ম শিখে নিতে পারবে। অন্যান্য দেশে শিক্ষণের ক্ষেত্রেও আজকাল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র পথ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে গবেষণা চলছে। বলা বাহু

রোগীর অসুখ হয়েছে, ডাক্তারখানায় না গিয়ে বিশেষ এক গণক-যন্ত্রের সামনে তিনি দাঁড়াবেন, অসুখের বিভিন্ন লক্ষণের জন্যে কয়েকটি বিশেষ বোতাম টিপবেন, অমনি অসুখের বিবরণ ও ঔষধের ব্যবস্থাপত্র টাইপ হয়ে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসবে। এমনিভাবে অদূর ভবিষ্যতে গণক-যন্ত্র সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তর আনবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অবশ্য একটা মনে রাখা দরকার, গণক-যন্ত্রের কার্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর সম্ভাবনার সূত্র মেনে চলে। সে ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভবিষ্যদ্বাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্রান্ত হলেও সব ক্ষেত্রে ঠিক হবে এমন কোন কথা নেই।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহারের একটা সামাজিক কুফল অবশ্য আছে। যান্ত্রিক দ্রুততার উপযোগিতা স্বীকৃত হলে কিছু যন্ত্রবিদের চাহিদা বাড়বে ঠিকই; কিন্তু সাধারণভাবে কর্মী নিয়োগের চাহিদা কমে যেতে পারে। আমাদের দেশের বর্তমান বেকার সমস্যার যুগে এটা অবশ্য খুবই চিন্তার কথা, তবে যেখানে দ্রুততা, নির্ভুলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যেতে পারে।

সম্প্রতি গণিতের সহযোগে সাইবারনেটিক্স (Cybernetics) নামে এক নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। কোন বিশেষ তথ্য (Information) প্রতীকের সাহায্যে যন্ত্রে রাখলে ঐ যন্ত্রের ক্রিয়ার সঙ্গে একটা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। ঐ প্রতিক্রিয়া নিজেই আবার একটি উদ্দীপকের কাজ করে ও যন্ত্রের পরবর্তী কাজে সাহায্য করে। যন্ত্রটি চালু থাকবার সময় বিভিন্ন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তা সচল থাকে ও এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনে সুবিধা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায়, শারীরতত্ত্ব বিশ্লেষণে সংখ্যামূলক ও যুক্তিমূলক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ও উপযোগিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার ক্ষেত্রেও গণিতের অবদান কম নয়। তীর-ধনুকের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই গণিতের ব্যবহার হয়েছে। যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে সৈন্যসংখ্যা নির্বাচন, উপ-দল গঠন, ব্যূহগঠন, রণাঙ্গনের অবস্থান, ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী আক্রমণের ধারা নির্ধারণ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর গণিত লাগছে। বিশেষ করে বর্তমান নৌযুদ্ধ ও আকাশযুদ্ধ বিশেষভাবে গণিতনির্ভর। মহাসাগরের কোন্ দুর্গম স্থানে শত্রুপক্ষের জাহাজ আসছে, কোথায় টর্পেডো বা মাইন লুকানো রয়েছে, তার নিশানা জানাতে নির্ভুল গাণিতিক হিসাবের তুলনা নেই। কত উঁচুতে বিমান কি গতিবেগ নিয়ে আসছে এবং সেই বিমান ধ্বংস করতে হলে কত গতিবেগ নিয়ে কোন দিকে বিমান-বিধ্বংসী কামান গর্জে উঠবে, তার সঠিক খবর মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে দিতে সঠিক গাণিতিক হিসাবই আমাদের সাহায্য করে। মহাকাশ থেকে শত্রুপক্ষের ভৌগোলিক অবস্থান সঠিকভাবে বুঝে যথাস্থানে ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করতে হলে চাই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের নির্ভুল হিসাব। ঠিক দিক নির্ণয় ও সঠিক গতিবেগ নির্ণয়ে সামান্য ত্রুটি বিপুল ব্যর্থতা এনে দিতে পারে। ব্যবহারিক গণিতের সাহায্য ছাড়া আধুনিক যুদ্ধের কথা চিন্তাই করা যায় না।

সাধারণভাবে আমরা জানি ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্কের তেমন সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের উত্থান-পতনের মধ্যে অবশ্য একটা সূক্ষ্ম গাণিতিক নিয়ম প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। বিভিন্ন দেশের উন্নতি-অবনতির ইতিহাস আলোচনা করলে এই পতন-অভ্যুদয়ের নিরপেক্ষ কারণ নির্ণয় করতে পারা যায়। সম্প্রতি প্রাচীন হরফ পড়বার ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতি যথেষ্ট সাহায্য করছে। আমেরিকার মায়া সভ্যতার

বিস্তৃত বিবরণ জানবার জন্যে দীর্ঘ 120 বছর চেষ্টা করেও মন্দিরে খোদাই করা লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। আক্রমণকারীরা আমেরিকা আক্রমণ করে তাদের অধিকাংশ মন্দির, শিলালিপি ইত্যাদি নষ্ট করে ফেলে, অবশিষ্ট মন্দিরগুলির অদ্ভুত অক্ষরের কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারছিলেন না। অবশেষে কয়েকজন গণিতবিশারদ সাংকেতিক অক্ষরের পাঠোদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন।

ঐ সমস্ত মন্দিরলিপিতে বিভিন্ন আকারের অক্ষর ও চিত্র ছিল। ঐ সব অক্ষরকে কয়েকটি সংকেতে রূপান্তরিত করা হয় ও তাদের বিভিন্ন সম্ভাব্য অর্থ করা হয়। মানুষের পক্ষে এত বিভিন্ন ধরণের অর্থ মনে রাখা ও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়; কিন্তু যন্ত্র অক্লান্তভাবে প্রত্যেক বাক্যের বিভিন্ন সম্ভাব্য অনুবাদ অল্প সময়ের মধ্যে জানিয়ে দিল। ঐ সব বিভিন্ন অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে অর্থবহ ও সঙ্গতিপূর্ণ অর্থকে সঠিক অনুবাদ বলে ধরা হলো। দু-বছরের মধ্যে সমস্ত মন্দিরলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হলো। মানুষের ও কম্পিউটারের সম্মিলিত চেষ্টায় একটা বিলুপ্ত জাতির ইতিহাস জানা গেল। জানা যায় মায়া সভ্যতার মন্দিরলিপিগুলির সংখ্যা ছিল 340, শব্দসংখ্যা ছিল 64000। অনেক শব্দের অর্থ আবার একটা বাক্যেও প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রাচীন ইতিহাস জানবার এরকম একটা প্রায় অসাধ্য কাজও সাংখ্যিক পদ্ধতিতে করা সম্ভব হলো।

সমাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সাংখ্যিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক, পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির অর্জিত স্বভাবের সম্পর্ক কি, তাও অনেক ক্ষেত্রে প্রতীকের সাহায্যে সাংখ্যিক সূত্রাকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বংশধারার ধর্ম তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে কিভাবে প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে মেণ্ডেলের সুবিদিত সাংখ্যিক সূত্র আছে।

অর্থনীতি উন্নয়ন করবার ক্ষেত্রে শ্রম ও শ্রম-মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সাংখ্যিক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। কোন শ্রমিক বেশী পরিশ্রম করলে বেশী বেতন পেতে পারে, কিন্তু একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম করবার পর বেশী পরিশ্রম করলে তার ক্লান্তি আসে ও সে ক্ষেত্রে তার শ্রম কম উৎপাদনশীল হয়। অধিক বেতনেও সে উৎসাহী হয় না, এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকের মানসিক শান্তি, পরিশ্রম, বিশ্রাম ও শ্রমমূল্যের পরিমাণের মধ্যে যথোপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে প্রকৃত সমাধান পেতে হলে সাংখ্যিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তা সঠিকভাবে করা সম্ভব।

শিক্ষা ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও গণিতের অবাধ গতি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার পরিসংখ্যান তুলনা করে আমরা আমাদের দেশের জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারি। পরীক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি বেশী যথার্থ ও নির্ভুল বলে ধরা হয়। আমরা জানি কোন ছাত্র ইংরেজী ও অঙ্ক উভয় বিষয়ে 70 পেলে ইংরেজীতে অপেক্ষাকৃত ভাল বলেই বিবেচনা করে থাকি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষার নম্বরের কোন আদর্শ মান নেই। প্রশ্ন সোজা বা কঠিন হবার উপর ও খাতা দেখবার পদ্ধতির উপরই পরীক্ষার নম্বর অনেকাংশে নির্ভর করে। পরীক্ষার নম্বরকে একটা বিশেষ স্কেলে পরিণত করলে বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ করা যায়। অন্যান্য দেশে পরীক্ষার নম্বরকে স্কেলে পরিণত করে ছাত্রদের জ্ঞানের মান নির্ণয় করা হয়। পরীক্ষার নম্বরের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের সাহায্যে এভাবে পরীক্ষার সংস্কার সম্ভব।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করেছে। বুদ্ধির বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

বিশ্লেষণ করে যুক্তির স্বরূপ ও তার মৌল উপাদানগুলি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। যুক্তির সঙ্গে ব্যাকরণ, মানসিক সাম্যের সঙ্গে পরীক্ষার কৃতিত্বের কেমন সম্বন্ধ, তাও আমরা পরিসংখ্যানের সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি। বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে গাণিতিক বিশ্লেষণের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। হীনমন্যতা, আত্মতুষ্টি, বিদ্বেষের মনোভাব, নীতিপূর্ণ ব্যবহার, বাকপটুতা প্রভৃতির সঙ্গে মানসিক শান্তি, কৃতিত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধ কেমন ধরণের, তা বুঝতে হলে ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে যাচাই করতে হলে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমালা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে গণিতের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

আমরা সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানের সব শাখাতেই গণিতের অবাধ সঞ্চরণ। সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বিশ্লেষণে গণিতের ভাষা ও গাণিতিক পদ্ধতির প্রচলন ক্রমশঃ বাড়ছে। বিদ্যালয়ে বা কলেজে গণিত পড়াবার সময় গণিতের সামাজিক প্রয়োগের কথা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরলে ছাত্রেরা গণিতকে ভয় না করে ভালবাসতে শিখবে সন্দেহ নেই। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে এই ব্যবহারিক দিকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলে, পাঠ্যপুস্তকে এই সব জীবনকেন্দ্রিক সমস্যার প্রয়োগ থাকলে—গণিতশিক্ষা ছাত্রদের কাছে আরও অর্থবহ, উপযোগী ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

পুস্তক-পরিচয়

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা	লেখক সুনীল সরকার	দাম দুই টাকা	প্রকাশক রবীন্দ্র লাইব্রেরী, 15/2, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-12
বিজ্ঞানের গল্প শোনো	"	তিন টাকা	বিশ্বাস পাব্লিশিং হাউস, 5/1এ, কলেজ রো, কলিকাতা-9
কেমন করে আবিষ্কার হলো	"	"	" "
বিজ্ঞানীদের ছেলেবেলা	"	"	এ-সাহা, 122/এ, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-30

উল্লিখিত পুস্তকগুলি অল্পবয়স্ক তরুণদের জন্যে লিখিত হইলেও বড়রা পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা নামক পুস্তকটিতে অক্সিজেন, বেলুন, রবার, কাচ প্রভৃতি উনিশটি বিষয়ের আলোচনা আছে। প্রাণিজগৎ সম্পর্কিত ডলফিন, গাধবার্ড, লুকোচুরি ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি সুলিখিত ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। রবার, কাচ প্রভৃতি রসায়ন-বিজ্ঞানের আলোচনা সুখপাঠ্য, তবে এই সব আলোচনায় প্রসঙ্গের বৈজ্ঞানিক দিকটি একটু বিশদভাবে তুলিয়া ধরিতে পারিলে পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইত। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবিষ্কারের ইতিহাসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মহাকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যে নূতন ব্যাখ্যাগুলির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহা সন্নিবেশিত হয় নাই। সহজ করে বলিতে হইলে ভাষার সাবলীলতা প্রয়োজন—

কয়েকটি আলোচনায় তাহার অভাব থাকিলেও পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞানের গল্প শোনো পুস্তকটিতে রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের কথা সহজভাবে আলোচিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র, সৌরশক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি তথ্যে ও ভাষায় যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পরমাণু ও রেডিয়াম প্রসঙ্গে কিছু ভুল তথ্য রহিয়াছে। যেমন "যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে দেখলে দেখা যাবে—কি যেন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে"—পরমাণু সম্পর্কে এই উক্তি ঠিক নয়। রেডিয়াম প্রসঙ্গে (94 পৃঃ) রেডিও-অ্যাকটিভ বলতে যে ব্যাখ্যা, তাও ত্রুটিপূর্ণ। এগুলি সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। তাহাড়া পুস্তকটির বিষয় নির্বাচন, প্রসঙ্গের আলোচনা পাঠকের পক্ষে সুখপাঠ্য সন্দেহ নাই।

ছেচল্লিশটি আবিষ্কারের কাহিনী 'কেমন করে আবিষ্কার হলো' পুস্তকটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিশোরদের কাছে এই সকল আবিষ্কারের গল্প চিত্তাকর্ষক হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকটি বিদ্যালয়ের দ্রুতপঠন পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইয়াছে।

'বিজ্ঞানীদের ছেলেবেলা' বইটিতে পনেরো জন বিজ্ঞানীর শৈশবকালের কথা চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চারজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীর কথাও আছে। এই পুস্তকের লেখার ধরণ উৎকৃষ্ট হইয়াছে—ইহাও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্রুতপঠনের পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হইতে পারে।

পুস্তকগুলির ভাষা আর একটু সাবলীল হইলে, ছাপার ভুল সংশোধিত হইলে পুস্তকগুলির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইত। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভুল শব্দও প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেগুলি সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। তবু বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি এত সহজভাবে উপস্থাপিত করিয়া লেখক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সূর্যেন্দু বিকাশ কর

"বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষার্থে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসী যে কেবলই ভাবপ্রবণ স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র (1917)

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল — 1973

ষড়বিংশতিতম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

পরমাণু কেন্দ্রীনবিষয়ক গবেষণার উদ্দেশ্যে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুতাহিত কণিকা উৎপাদনের জন্যে চার-দেয়ালের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটর ভ্যান ডি গ্রাফের (Van de Graaff) দৃশ্য।

নিউটনের গতিসূত্র ও তার আলোচনা

স্যার আইজ্যাক নিউটন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক। গতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি গতির তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এই তিনটি সূত্রই বলবিদ্যার ভিত্তি। এই সূত্রগুলি থেকে আমরা জানতে পারি—কিভাবে অচল বস্তু সচল হয়, অথবা তার গতি ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত হয়। গ্রহ-উপগ্রহের গতি, জীবজন্তুর চলাফেরা প্রভৃতি বিশ্বের যাবতীয় গতি এই তিনটি সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সূত্রগুলি থেকে আমরা বস্তুর ভর, তার গতি এবং তার উপর প্রযুক্ত বলের ভিতর সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি। সূত্রগুলি হলো—

প্রথম সূত্র :—বাইরে থেকে প্রযুক্ত বলের দ্বারা বস্তুর গতীয় অবস্থার পরিবর্তন করতে না পারলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং চলমান বস্তু সমবেগে সরলরেখা অবলম্বন করে চিরকাল চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র :—কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে প্রযুক্ত হয়, ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

তৃতীয় সূত্র :—প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এইবার সূত্র তিনটি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করছি।

প্রথম সূত্রের আলোচনা :—প্রথম সূত্র থেকে আমরা দুটি জিনিষ জানতে পারি—(1) পদার্থের জাড্য এবং (2) বলের সংজ্ঞা।

পদার্থের জাড্য :—প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন বস্তু যদি স্থির থাকে, তবে তার ধর্মই হলো চিরদিন স্থির থাকা এবং কোন বস্তু যদি গতিশীল হয়, তবে তার ধর্মই হলো চিরদিন সমবেগে সরলরেখায় গতি বজায় রাখা। পদার্থের এই ধর্মকে বলে পদার্থের জাড্য।

জাড্যকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(1) স্থিতিজাড্য এবং (2) গতি জাড্য।

স্থিতিজাড্য :—নিশ্চল বস্তু চিরকাল নিশ্চল থাকবে। বস্তুর এই ধর্মকে স্থিতিজাড্য বলে। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে, যেখানে যে বস্তু রাখা হয়, যতক্ষণ বাহ্যিক বলপ্রয়োগ করে না সরানো হয় বা ধাক্কা না দেওয়া হয়, ততক্ষণ তা সেখানেই থাকে।

স্থিতিজাড্যের দৃষ্টান্ত :—যখন যাত্রীসহ কোন গাড়ী হঠাৎ বেগে চলতে আরম্ভ করে তখন প্রত্যেক যাত্রীই পিছন দিকে হেলে পড়ে। গাড়ী যখন স্থির, তখন যাত্রীর দেহও স্থির। হঠাৎ গাড়ী চললে যাত্রীর দেহের নিম্নাংশ গাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন বলে গতিশীল হয়

কিন্তু ঊর্ধ্বাংশ স্থিতিজাড্যের দরুণ স্থির থাকতে চেষ্টা করে। ফলে যাত্রী পিছন দিকে হেলে পড়ে।

গতিজাড্য :—গতিশীল বস্তু অনন্ত কাল একই গতিতে একই অভিমুখে চলতে থাকবে, যদি কোন বলের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়। বস্তুর এই ধর্মকে গতিজাড্য বলে। কিন্তু আমরা কার্যতঃ সেইরূপ দৃষ্টান্ত দেখি না। প্রত্যেক সচল বস্তু কিছুকাল চলবার পর থেমে যায়। একটি বলকে যদি মাটিতে গড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হলে বলটি কিছুক্ষণ পরে থেমে যায়। তা হলে গতিজাড্যের সত্যতা প্রমাণিত হলো কোথায়? এখানে আমরা একটা কথা ধরি নি। তা হচ্ছে, বলটি মাটিতে গড়াবার সময় বাহ্যিক বলের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। মাটির সঙ্গে ঘর্ষণজনিত বল, হাওয়ার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বল প্রভৃতি বস্তুটির উপর কাজ করে বলেই বলটি কিছুক্ষণ পরে থেমে যায়। মাটিতে একটি বল গড়িয়ে দিলে যতটা যাবে, মসৃণ মেঝে বা বরফের উপর তা অপেক্ষা অনেক বেশী যাবে। সুতরাং এই সব বাহ্যিক বল সম্পূর্ণ অপসারণ করলে বস্তু সর্বদা গতি বজায় রাখবে। এভাবে আমরা গতিজাড্য ধারণা করে নিতে পারি।

গতিজাড্যের দৃষ্টান্ত :—চলন্ত গাড়ী থেকে যখন কোন আরোহী অসাবধানে নামে, তখন সে সামনের দিকে হেলে যায়। চলন্ত গাড়ীতে থাকবার সময় আরোহীর সমস্ত দেহই গতিশীল। কিন্তু মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের নিম্নাংশ গতিহীন হয়, কিন্তু গতিজাড্যের দরুণ দেহের ঊর্ধ্বাংশ গতি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। ফলে আরোহী সামনের দিকে হেলে পড়ে। সেই কারণে গাড়ীর গতির দিকে মুখ করে পিছনে হেলে নামলে এই ভয় থাকে না।

বলের সংজ্ঞা :—প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে বাইরে থেকে বস্তুটির উপর বল প্রয়োগ করতে হয়। স্থির বস্তুকে সচল করতে বা সচল বস্তুকে স্থির করতে অথবা জোরে বা আস্তে চালাতে হলে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করতে হয়। বস্তু আপনা থেকে চলতে পারে না বা স্থির হতে পারে না। সুতরাং বাইরে থেকে যা প্রয়োগ করে বস্তুর গতীয় অবস্থার পরিবর্তন করা হয় বা করতে চেষ্টা করা হয়, তাকে বল বলে।

দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনা :—দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলের পরিমাপ এবং বল ও ত্বরণের বা মন্দনের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারি। দ্বিতীয় সূত্র আলোচনা করবার আগে ভরবেগ সম্বন্ধে কিছু বলি। ভর ও বেগের সমন্বয়ে কোন গতিশীল বস্তুতে যে ধর্মের উৎপত্তি হয়, তাকে ভরবেগ বলে। এই ভরবেগ বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলের সমান। যদি কোন বস্তুর ভর হয় m এবং বেগ হয় v, তবে তার ভরবেগ হবে $m \times v$।

দ্বিতীয় সূত্র থেকে বলমাপক সমীকরণ :—

ধরা হলো কোন বস্তুর ভর m এবং বস্তুটির বেগ u, এখন t সময় ধরে যদি বস্তুটির

উপর P বল প্রয়োগ করা হয়, তবে বস্তুটির একটি ত্বরণ সৃষ্টি হবে অর্থাৎ বেগের পরিবর্তন হবে। ধরা যাক t সময় পরে বস্তুটির বেগ v এবং ত্বরণ f।

এক্ষেত্রে ভরবেগের পরিবর্তন $= mv - mu$.

অতএব ভরবেগের পরিবর্তনের হার $= \frac{mv-mu}{t} = m\left(\frac{v-u}{t}\right)$ (1)

কিন্তু আমরা জানি $v = u + ft$ $\therefore$ $f = \frac{v-u}{t}$

অতএব, (1) থেকে ভরবেগের পরিবর্তনের হার $= mf$.

এখন দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি $P \propto$ ভরবেগের পরিবর্তনের হার বা $P \propto mf$, সুতরাং $P = K. mf$ [K একটি ধ্রুবক], এখন যদি আমরা ধরে নিই যে, একক ভরের উপর ক্রিয়া করে একক ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে যে বল, তাই বলের একক অর্থাৎ $P = 1$ যখন $m = 1$ এবং $f = 1$, তা হলে $K = 1$, অতএব $P = mf$ অর্থাৎ বল $=$ ভর $\times$ ত্বরণ—এই সমীকরণ থেকে আমরা বলের পরিমাপ করতে পারি।

তৃতীয় সূত্রের আলোচনা :—যখনই একটি বস্তু A অন্য একটি বস্তু B-এর উপর বল প্রয়োগ করে, তখনই B বস্তুও A বস্তুর উপর সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে। প্রথম বলকে বলে ক্রিয়া (Action) এবং দ্বিতীয় বলকে বলে প্রতিক্রিয়া (Reaction)। ক্রিয়া অনেক রকম হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকবে। একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যে সমান, তা ভালভাবে বোঝানো যায়। দুটি স্প্রিং-তুলা নিয়ে একটির হুকের সঙ্গে অন্যটির হুক আটকানো হলো এবং স্প্রিং-তুলা দুটি কে দু-হাত দিয়ে সমানভাবে বিপরীতমুখী টান দেওয়া হলো এবং দেখা গেল স্প্রিং-তুলা দুটির কাঁটা সমান পাঠ দেখালো। এবার একটি তুলাকে কোন দৃঢ় অবলম্বনের সঙ্গে আটকানো হলো এবং অন্য তুলাকে আগের মত সমান টান দেওয়া হলো। এবারও স্প্রিং-তুলার কাঁটা সেই একই পাঠ দেখালো। উভয়ের পাঠ সমান হওয়ায় প্রমাণিত হলো যে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীতমুখী।

তৃতীয় সূত্রের দৃষ্টান্ত :—(1) যখন বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়, তখন যে বন্দুক ছোঁড়ে সে পিছন দিকে ধাক্কা অনুভব করে। এটি গুলি কর্তৃক বন্দুকের উপর প্রতিক্রিয়ার ফল।

(2) হাউই বা রকেটের গতি এই প্রতিক্রিয়া বলের জন্যেই সম্ভব হয়। হাউই বা রকেটে কিছু জ্বালানী রাখা হয়। ঐ জ্বালানী দহনের ফলে উচ্চ চাপবিশিষ্ট গ্যাস উৎপন্ন হয়ে একটি সরু নালী দিয়ে নীচের দিকে সজোরে বেরিয়ে আসে। এর ফলে যে প্রচণ্ড বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল উৎপন্ন হয়, তা রকেটকে তীব্রবেগে আকাশের দিকে চালিত করে।

কাঞ্চনপ্রকাশ দত্ত

পারদর্শিতার পরীক্ষা

তোমার কি ধারণা, তুমি অঙ্কে যথেষ্ট পারদর্শী? তাহলে চেষ্টা করে দেখ তো, এক মিনিটের মধ্যে নীচের দশটি গুণেরই গুণফল সঠিক বলতে পার কি না।

1. 96×89
2. 98×97
3. 88×91
4. 989×988
5. 99972×99992
6. 999981×999997
7. 114×105
8. 109×119
9. 1008×1025
10. 100015×100016

(উত্তরের জন্যে 252নং পৃষ্ঠা দেখ)

প্রজ্ঞানন্দ দাশগুপ্ত ও অরূপ বসু*

---

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

বর্গ করবার সহজ পদ্ধতি

তোমরা যারা উঁচু শ্রেণীতে পড়ছো, তাদের অঙ্ক করবার সময় প্রায়ই বহু সংখ্যার বর্গ (Square) করবার দরকার হয়। শুধু স্কুলেই নয়, কলেজে পড়বার সময়ও প্রচুর সংখ্যার বর্গ করবার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় বেশ কতকগুলি বড় সংখ্যার বর্গ করতে গিয়ে বেশ অসুবিধা হয় এবং সময়ের অপচয় হয়। কিন্তু যদি বর্গ করবার একটা সহজ পদ্ধতি জানা থাকে, তাহলে আর কোন দিক দিয়েই অসুবিধা হয় না। আজ তোমাদের এমন একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দেব, যার সাহায্যে তোমরা সমস্ত বড় বড় সংখ্যার বর্গ মুখে মুখে অনায়াসেই করতে পারবে।

এখন নিয়মটা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

1 থেকে 9 পর্যন্ত যে কোন রাশির বর্গ অনায়াসেই করতে পারি। এর জন্যে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু ধর, একটা দ্বি-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার বর্গ করতে হবে। তখন কি করতে হবে সেটাই আলোচনা করছি।

প্রথমে সংখ্যাটির এককের ঘরে যে রাশিটি থাকবে, তার বর্গ করে যা পাওয়া যাবে, তাকে উত্তরের ডানদিকে লিখে যদি হাতে কিছু থাকে, তবে সেটা মনে রাখতে হবে। এরপর

আবার এককের রাশিটিকে যথাক্রমে 2 এবং দশকের ঘরের রাশিটির দ্বারা গুণ করে হাতে থাকা সংখ্যাটির সঙ্গে যোগ দিয়ে যা পাওয়া যাবে, সেটা উত্তরের আগের সংখ্যার বাঁ-দিকে লিখতে হবে। এস্থলেও হাতে কিছু থাকলে সেই সংখ্যাটা মনে রাখতে হবে। এরপর দশকের সংখ্যাটির বর্গ করে তার সঙ্গে মনে রাখা সংখ্যাটি যোগ দিয়ে প্রাপ্ত রাশিটি উত্তরের একদম বাঁ-দিকে লিখলেই পাওয়া যাবে সংখ্যাটির বর্গ। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে কর 47 এই সংখ্যাটির বর্গ নির্ণয় করতে হবে। তাহলে কি করতে হবে—

$$\begin{array}{r} 47 \\ \underline{47} \\ \underline{2209} \end{array}$$

47-এর এককের ঘরে আছে 7। 7-এর বর্গ করে পেলাম 49। এই 49-এর 9 সংখ্যাটি উত্তরের একদম ডানদিকে লিখে 4 হাতে রাখলাম। এরপর 7-কে 2 দিয়ে গুণ করে পেলাম 14। আবার 14-কে দশকের সংখ্যা 4 দিয়ে গুণ করে পাই 56। আর হাতে ছিল 4 মোট হলো 60। 60-এর 0 পূর্বে লেখা 9-এর বাঁ-দিকে লিখে 6 হাতে রাখলাম। এরপর দশকের সংখ্যা 4-এর বর্গ করে পেলাম 16 এবং 16-এর সঙ্গে হাতে রাখা সংখ্যা 6 যোগ করে পেলাম 22। এবারে এই 22 সংখ্যাটিকে আগে লেখা 09-এর বাঁ-পাশে লিখতেই মোট হলো 2209 তাহলে 47-এর বর্গ হলো 2209। বেশ সহজেই হয়ে গেল। এখন দেখে অবশ্য একটু কঠিন মনে হবে, কিন্তু অভ্যাস করলে আস্তে আস্তে দেখবে খুবই সহজ মনে হবে। এই পদ্ধতির সাহায্যে তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার বর্গও অতি সহজে করা যায়। সে ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরণের পদ্ধতি। ধর, 118—এই সংখ্যাটির বর্গ করতে হবে।

$$\begin{array}{r} 118 \\ \underline{118} \\ 13924 \end{array}$$

এক্ষেত্রেও প্রথমে একক ঘরের সংখ্যা 8-এর বর্গ করে পেলাম 64। তারপর আবার 8-কে 2 দ্বারা গুণ করে পেলাম 16। এবার এই 16-কে পূর্বের মত 11 দ্বারা গুণ করে পেলাম 176। 8-এর বর্গ করে প্রাপ্ত 64-এর 4 উত্তরের ডানদিকে লিখে হাতে রাখা 6 এই 176-এর সঙ্গে যোগ করে পাই 182। এই 182-এর 2 পূর্বে লেখা 4-এর বাঁ-দিকে লিখলাম এবং হাতে থাকলো 18। এবার 11-এর বর্গ করে পাওয়া 121-এর সঙ্গে 18 যোগ করে পেলাম 139। ঐ 139 সংখ্যাটি পূর্বে লেখা 24-এর বাঁ-পাশে লিখতেই পেলাম 13924। এটিই 118-এর বর্গ। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে, দুই অঙ্ক বা তিন অঙ্কবিশিষ্ট যে কোন সংখ্যার বর্গ এই পদ্ধতির সাহায্যে অতি সহজেই করা যায়। এখন কিছু দিন একটু অভ্যাস করলেই নিয়মটা অনেক সহজ লাগবে এবং তখন তোমরা এর সাহায্যে অনায়াসেই বড় বড় সংখ্যার বর্গ করতে পারবে।

শ্রীসুজিতবরণ সাহা

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. 8544
2. 9506
3. 8008
4. 977132
5. 9996400224
6. 999978000057
7. 11970
8. 12971
9. 1033200
10. 10003100240

[প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী গুণ করলে এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত গুণগুলি করতে পারা কারোর পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা সম্ভব হয় বুদ্ধিসহকারে গুণ করবার দ্রুত পদ্ধতি অবলম্বন করলে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী 1নং অঙ্কটি করলে এই রকম দাঁড়ায় :

1. (ভিত্তি : 100)

$$\begin{array}{r} 96-\ 4 \\ \underline{89-11} \\ 85/44 \end{array}$$

এখানে 10, 100, 1000 ইত্যাদি সংখ্যার মধ্যে কোন্‌টি প্রদত্ত দুটি সংখ্যার সবচেয়ে কাছে, সেটা স্থির করতে হবে। এক্ষেত্রে ঐ সংখ্যা হলো 100। এই 100-কে ভিত্তি ধরে তাথেকে 96 বিয়োগ করলে 4 হয় ; 96-এর পাশে −4 লিখতে হবে। সেই রকম 100 থেকে 89 বিয়োগ করলে 11 হয় ; 89-এর পাশে লিখতে হবে −11। এবার 96-এর থেকে কোণাকুণিভাবে যে সংখ্যাটি আছে, অর্থাৎ 11, 96 থেকে তাই বিয়োগ করে বিয়োগফল 85-কে সংখ্যাগুলির নীচে বাঁ-দিকে লেখা হলো। (লক্ষণীয় যে, 89-এর থেকে কোণাকুণিভাবে যে সংখ্যা রয়েছে, অর্থাৎ 4, 89 থেকে সেটা বিয়োগ করলেও একই বিয়োগফল 85 পাওয়া যায়।) এইবার ডান দিকের দুটি সংখ্যা 4 ও 11-কে গুণ করে গুণফল 44-কে সংখ্যাগুলির নীচে ডান দিকে লেখা হলো। নির্ণেয় গুণফল : 8544।

কয়েকবার অভ্যাস করলে এই পদ্ধতিতে খুব তাড়াতাড়ি বড় বড় গুণ করতে পারা যায়। এর মূলে আছে বীজগণিতের নিম্নলিখিত সূত্রটি—

$$(x-a)(x-b)=x(x-a-b)+ab$$

1নং অঙ্কে $x=100$, $a=4$, $b=11$; $x-a-b=85$ এবং $ab=44$।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে গুণ করবার সময় মনে রাখতে হবে, ভিত্তিরূপ সংখ্যাটিতে যতগুলি শূন্য থাকবে, গুণফলের ডান দিকের অংশে ততগুলি অঙ্ক (Digit) থাকতে হবে, কারণ তবেই না $(x-a-b)$-কে কার্যতঃ x দিয়ে গুণ করা হবে। 1নং গুণে ভিত্তিরূপ সংখ্যাতে আছে দুটি শূন্য ; গুণফলের ডান দিকের 44-এও আছে দুটি অঙ্ক। কিন্তু ডান দিকের অংশে অঙ্কের সংখ্যা কম বা বেশী হলে কি করতে হবে, 2নং ও 3নং গুণ দুটি করলে তা বোঝা যাবে।

2. (ভিত্তি : 100)

98 − 2
97 − 3
———
95/06

এখানে গুণফলের ডান দিকে দরকার দুটি অঙ্কের, কিন্তু 2 ও 3-কে গুণ করে এক-অঙ্কের সংখ্যা 6 পাওয়া গেল ; এজন্যে 6-এর আগে একটা শূন্য বসানো হয়েছে। এই রকম দরকার মত এক বা একাধিক শূন্য বসানো যেতে পারে।

3. (ভিত্তি : 100)

88 − 12
91 − 9
———
79/(1)08
= 8008

এখানে 12 ও 9-কে গুণ করে তিন-অঙ্কের 108 পাওয়া গেল, অর্থাৎ গুণফলের ডান দিকে প্রয়োজনের চেয়ে একটি বেশী অঙ্ক থাকছে। ঐ অতিরিক্ত অঙ্কটিকে (এক্ষেত্রে 1) বাঁ-দিকের সংখ্যার সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে ; $79+1=80$।

উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী 4, 5 ও 6নং অঙ্কগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি করে কষা যায়।

4. (ভিত্তি = 1000)

989 − 11
988 − 12

977/132

5. (ভিত্তি = 100000)

99972 − 28
99992 − 8
———
99964/00224

6. (ভিত্তি : 1000000)

999981 − 19
999997 − 3

999978/000057

7নং অঙ্কে প্রদত্ত দুটি সংখ্যা ভিত্তিরূপ সংখ্যার চেয়ে বড়—আগেকার মত ছোট নয়। যে অঙ্ক ঐ সংখ্যার সঙ্গে যত যোগ করলে প্রদত্ত সংখ্যা পাওয়া যায়, সেই সংখ্যাটিকে যোগ

চিহ্নসমেত প্রথম সংখ্যার পাশে লিখতে হবে এবং প্রথম সংখ্যা থেকে কোণাকুণিভাবে অবস্থিত সংখ্যাটিকে আগেকার মত বিয়োগ না করে দুটিকে একেবারে যোগ করতে হবে। অন্যান্য প্রক্রিয়া আগেকার মত একই রকম। এই পদ্ধতিতে 7নং অঙ্কটিকে কষলে দাঁড়ায়—

7. (ভিত্তি : 100)

114+14
105+ 5

119/70

এখানে বীজগণিতের যে সূত্রটি কাজে লাগছে, তা হলো,

$$(x+a)(x+b)=x(x+a+b)+ab$$

7নং অঙ্কে $x=100, a=14, b=5$; $x+a+b=119$ এবং $ab=70$।

7নং অঙ্কের মত অনুরূপভাবে 8, 9 ও 10নং অঙ্ক কষে দেখা যায়।

8. (ভিত্তি : 100)

109+ 9
119+19

128/(1)71
=12971

9. (ভিত্তি : 1000)

1008+ 8
1025+25

1033/200

10. (ভিত্তি : 100000)

100015+15
100016+16

100031/00240]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1.: লাক্ষা কি?

সায়ন্তিকা সেন, ভাগলপুর

প্রশ্ন 2.: পাইরোমেটার কি?

আনন্দময় মিত্র, কলিকাতা-40

উত্তর 1.: এক ধরণের বিশেষ কীটের দেহ থেকে নির্গত রস জমাট বেঁধে রজনজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। একেই বলা হয় লাক্ষা। এই জাতীয় কীটকে বলা হয় লাক্ষাকীট। একজাতীয় গাছের শাখায় লাক্ষাকীট আশ্রয় নেয়। ভারত, ব্রহ্মদেশ

প্রভৃতি জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে লাক্ষার উৎপাদন হয়। প্রধানতঃ, দুটি রঙীন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে লাক্ষা গঠিত। লাক্ষা দেখতে লাল রঙের হয়ে থাকে। উপরিউক্ত রাসায়নিক পদার্থ দুটির নাম হচ্ছে ল্যাকাফিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ এবং অ্যারিথ্রোল্যাকিন। প্রথমটি জলে দ্রবণীয় এবং এর জলীয় দ্রবণের রং হয় হাল্কা লাল। দ্বিতীয়টি জলে অদ্রবণীয়, অ্যারিথ্রোল্যাকিন স্পিরিটে দ্রবণীয় এবং এটি বার্ণিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লাক্ষা অল্প তাপেই গলে যায় এবং রবারের মত স্থিতিস্থাপক। লাক্ষার প্রধান অংশ হচ্ছে রজন। পরিশোধিত লাক্ষা থেকে দু-রকমের রজন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি অ্যাসিটোনে দ্রবণীয় (নরম রজন) এবং অন্যটি অদ্রবণীয় (কঠিন রজন)। কঠিন রজনকে ক্ষারের মাধ্যমে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা অ্যালুরিটিক অ্যাসিড, কেরোলিক অ্যাসিড, সেলোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি অ্যাসিড এবং নরম রজনের আর্দ্র-বিশ্লেষণে কয়েকটি চর্বিজাতীয় অ্যাসিড পেয়েছেন। এসব কারণে বর্তমানে লাক্ষা-রজনকে নরম রজন ও কঠিন রজনের সাধারণ মিশ্রণে তৈরি একটি পদার্থ বলা হয়।

ষ্টীক্ লাক্ষা, সেলাক লাক্ষা, ছিদ্র লাক্ষা, সিড লাক্ষা—এই চার ভাগে লাক্ষাকে ভাগ করা হয়। অবশ্য এই শ্রেণিবিভাগ মূলতঃ তাদের বিশুদ্ধতাকে ভিত্তি করেই করা হয়। আমরা যে গালা ব্যবহার করি, তা উপরিউক্ত লাক্ষারই নামান্তর।

উত্তর 2.: কেলাসযুক্ত কাচকে পাইরোসেরাম বলা হয়। সাধারণতঃ কাচ কেলাস-মুক্ত হয়ে থাকে। কারণ, কাচ তৈরির সময় তরল কাচের সান্দ্রতা খুবই বেশী থাকে এবং কাচের কঠিন ও গলিত অবস্থার মধ্যে মুক্ত শক্তির পার্থক্য খুবই কম থাকে, যার ফলে কেলাসের সৃষ্টি হতে পারে না। এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে গলিত কাচের মধ্যে টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড দেওয়া হয়। টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড গলিত কাচে দ্রবণীয়। ঠাণ্ডা হবার সময় এই পদার্থটি কেলাস তৈরির কেন্দ্রীনের কাজ করে এবং পরবর্তী কালে ঠাণ্ডা অবস্থায় পাইরোসেরাম কাচের সৃষ্টি করে।

এই জাতীয় কাচ খুবই শক্ত এবং সহজে এতে দাগ কাটা যায় না। তাপমাত্রার পরিবর্তন সহ্য করবার ক্ষমতাও সাধারণ কাচের তুলনায় এদের বেশী

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

কোপার্নিকাসের পঞ্চশত জন্মবার্ষিকী
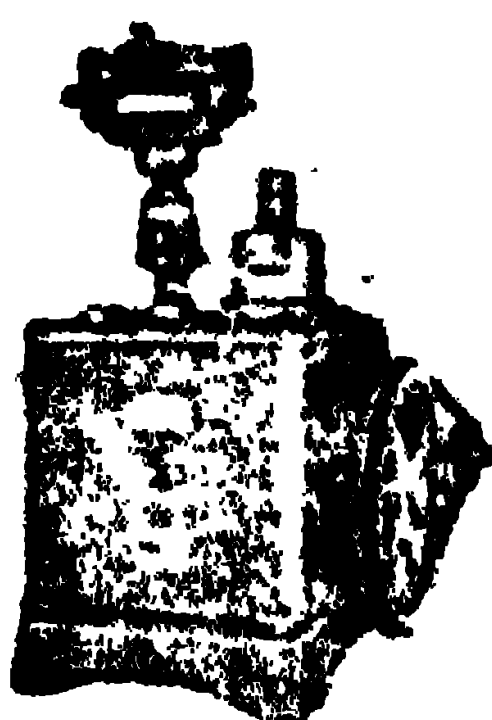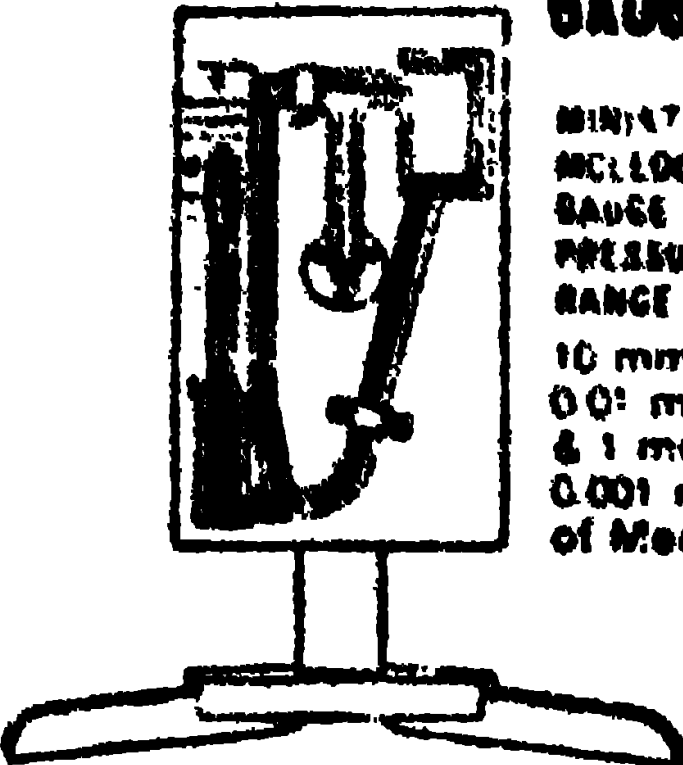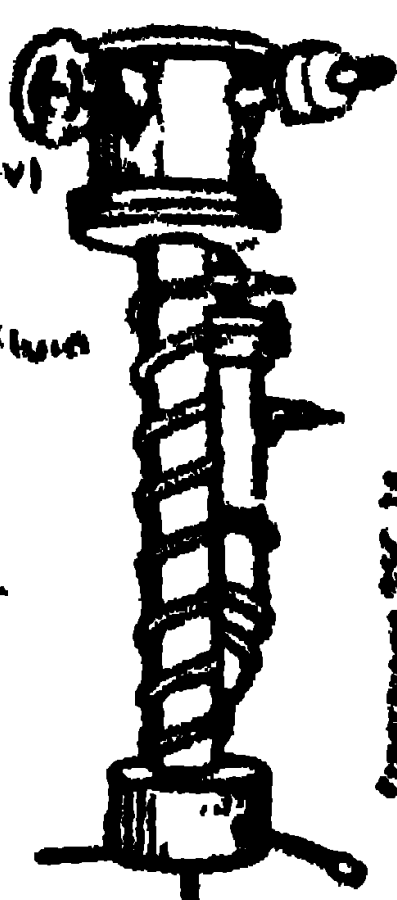
প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ নিকোলাস কোপার্নিকাসের পঞ্চশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত 19-20 ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তর ও ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পর্ষদের (Indian National Science Academy) যৌথ উদ্যোগে নূতন দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল হাসান। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এবং পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ্ এবং পদার্থ-বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র আলোচনার অনুষ্ঠানটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়: (ক) কোপার্নিকাসের জীবনী ও কার্য, (খ) প্রাক্-কোপার্নিকাস যুগে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা এবং (গ) প্রাক্-কোপার্নিকাস ও পরবর্তী যুগে ইউরোপে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা। কোপার্নিকাসের জীবনী ও কার্যাবলী সম্বন্ধে নিবন্ধ পাঠ করেন পোল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ সংস্থার প্রোফেঃ স্ম্যাক (Prof. Smak), রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের (Academy of Science) সহ-সভাপতি প্রোফেঃ খার্‌দ্যে (Prof. Kharadze) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসমীরকুমার ঘোষ (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য)। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রাক্-ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণামূলক বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হয়; তন্মধ্যে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পর্ষদের শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায়ের 'আর্যভট্ট ও তাঁর তত্ত্ব' শীর্ষক নিবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাক্-কোপার্নিকাস যুগেও যে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ধারণা প্রচলিত ছিল, শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের এই নিবন্ধে তা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। এই অধিবেশনে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত প্রতিনিধি-বৃন্দের তথ্যমূলক প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। তৃতীয় এবং শেষ অধিবেশনে পোলিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের (Polish Academy of Science) প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্ প্রোফেঃ ট্রাউটম্যানের (Prof. Trautman) 'কোপার্নিকাস ও আধুনিক পদার্থবিদ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছিল সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। এতদ্ব্যতীত ভারতে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা এবং গবেষণা সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করেন কোদাইক্যানাল জ্যোতির্বিদ্যা সংস্থার পরিচালক ডক্টর ভেইনু বাপ্পু (Dr. Vainu Bappu), নৈনিতাল মানমন্দিরের পরিচালক ডক্টর সিন্‌ভাল (Dr. Sinhval) এবং বোম্বাইয়ের টাটা মৌলিক গবেষণা কেন্দ্রের ডক্টর মেনন (Dr. Menon)। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক কোঠারির এক মনোজ্ঞ ভাষণও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পোলিশ দূতাবাসের সহযোগিতায় কোপার্নিকাস সম্বন্ধে একটি চলচ্চিত্র এবং একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার

নিয়মাবলী

1. পরিষদের বার্ষিক সভ্য-চাঁদা 16·00 টাকা ও পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 15·00 টাকা; ষান্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে 8·00 টাকা ও 7·50 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সভ্যগণকে প্রতিমাসে পত্রিকা প্রেরিত হয়ে থাকে।

2. প্রতি মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক ও সদস্যগণকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; কোন মাসের 15 তারিখের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পরে জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

3. টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

4. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।

5. প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে।

6. বানানে রেফের পরে দ্বিত্ব বর্জন বাঞ্ছনীয়; উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

7. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।

8. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

9. চিঠি-পত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষড়বিংশতিতম বর্ষ | মে, 1973 | পঞ্চম সংখ্যা

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌ সম্মেলন

উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশেই আজ প্রগতি ও জনকল্যাণের কাজে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ভাবা পরমাণুশক্তি গবেষণা কেন্দ্র এবং সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি কলকাতার উপকণ্ঠে বিধান নগরে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের তিন-দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের নানা রাজ্য থেকে দেড় শতাধিক বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্‌, শিল্প পরিচালক, যোজনাকার, শিক্ষাবিদ্‌ প্রভৃতি এই সম্মেলনের আলোচনায় যোগদান করেন।

এই ধরণের আলোচনা-চক্র কলকাতায় এর আগে হয় নি, ভারতেও অনুরূপ খুব কম হয়েছে। এই আলোচনা-চক্রের ঘোষিত উদ্দেশ্য বিরাট। পঞ্চম যোজনার অন্তর্ভুক্তির জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা তৈরি হবে। ইতিমধ্যে ঐ পরিকল্পনার একটি খসড়া-পত্রও প্রস্তুত করা হয়েছে। এই খসড়াপত্রের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনার আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। কলকাতায় এই সম্মেলনের আগে বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর ও কানপুরে তিনটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থটি অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায়।

কলকাতায় সম্মেলনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটির সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের কাছে

কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন :

(1) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাসম্পর্কিত গবেষণায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তার উপযুক্ত প্রতিদান কি আমরা পাচ্ছি ?

(2) মৌলিক ও ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে কি ?

(3) আমরা কি উপযুক্ত লোককে বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছি ?

(4) বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত ?

(5) পঞ্চম যোজনায় আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কর্মকাণ্ডের রূপরেখা কি হওয়া উচিত ?

দুঃখের বিষয়, বিধান নগরের সম্মেলনে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে তেমন কোন সুচিন্তিত আলোচনা হতে দেখা গেল না। কয়েকজন অবশ্য প্রবন্ধের আকারে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিদেশ থেকে প্রযুক্তিগত কৌশল আমদানীর বিপদ সম্পর্কে বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার সমস্যা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে একটা সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত রূপ দেবার চেষ্টা আদৌ হয় নি।

বিধান নগরে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেছেন—রাজনৈতিক ও প্রশাসকদের আধিপত্যের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এখন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের আধিপত্যের দিন এসেছে। কিন্তু সত্যই কি তাই ? পয়লা এপ্রিলের (1973) সংবাদপত্রে মন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তব্য বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল। আবার ঐ দিনই তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায়, বেতন কমিশন সাধারণ প্রশাসকদের বেতনের হার বিশেষজ্ঞদের উপরে রাখবার সুপারিশ করেছেন।

সত্য কথা বলতে কি, এই দেশের প্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন আজও করেন নি। তাঁদের কাছে প্রশাসকদের মূল্যই সর্বাধিক। সমাজ-ব্যবস্থায় শেষ কথা বলবার দাবী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা করেন না। তাঁরা শুধু দাবী করেন—প্রশাসকেরা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, সেটা যেন সঠিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সেটা কাজে পরিণত করবার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে—সেখানে প্রশাসকদের খবরদারী অবাঞ্ছনীয়।

কলকাতায় সম্মেলনের আগে কানপুর ও ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞানী সমাজের কাছে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম একটি দাবী করেছেন। তিনি বলেছেন—পাশ্চাত্যের জমকালো গবেষণার মোহ আপনারা ছাড়ুন, বিজ্ঞান-চর্চার ভারতীয় পথ আপনারা গ্রহণ করুন।

কি অর্থে মন্ত্রী মহোদয় এই কথা বলেছেন, তা আমরা জানি না। অবশ্য যদি ভারতীয় জনগণের প্রয়োজন অনুসারে ভারতে প্রাপ্ত সামগ্রী দিয়ে অনাড়ম্বর প্রথায় গবেষণার উপর মন্ত্রীমহোদয় অগ্রাধিকারের কথা বলে থাকেন, সেটা অন্য কথা। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা সে পথে অগ্রসর হতে সব সময়ই আগ্রহী বলে আমরা মনে করি।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষাতত্ত্বে গণিতের প্রয়োগ প্রসঙ্গে নোয়াম চোমস্কি

স্বপন মজুমদার*

দিল্লীতে 1972 সালের নেহরু স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্যে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (Massachusets Institute of Technology) ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নোয়াম চোমস্কি (Noam Chomsky) আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নব্য ভাষাতত্ত্বে অধ্যাপক চোমস্কির কাজ সম্বন্ধ পরিচিত না হলেও সেটা বোঝা খুবই দুরূহ। এই প্রবন্ধে আমরা ভাষাতত্ত্বে চোমস্কি গণিতের ও অটোমাটা তত্ত্বের (Automata theory) যে ধারণাগুলি প্রয়োগ করেছেন, মুখ্যতঃ সেগুলির একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো। কৌতূহলী পাঠকদের চোমস্কি ও মিলারের (Miller) গবেষণা-পত্রগুলির[1],[2] দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। মানুষের ভাষাকে গাণিতিক কাঠামোর মধ্যে আনতে চেয়েছেন যে সব ভাষাবিদ্, চোমস্কি তাঁদের অগ্রতম। আমরা যে ভাষায় কথা বলি, তার ধ্বনি, রূপ, বাক্যরীতি ও শব্দার্থের মধ্যে স্বভাবতঃই এত বৈচিত্র্য রয়েছে যে, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে একটি গাণিতিক সূত্রের মধ্যে ফেলা অসম্ভব। কিন্তু একটি ভাষার ব্যাকরণ যে বহুলাংশে যুক্তিবিদ্যার (Logic) সাহায্যে গঠিত হতে পারে, তা আমাদের দেশের পাণিনি প্রমাণ করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণ মানব-মনীষার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—একথা পাশ্চাত্ত্যের ভাষাতত্ত্ববিদেরাও[4] স্বীকার করেন। একটি ভাষার ব্যাকরণ যদি একটি যুক্তিগ্রাহ্য কাঠামোর মধ্যে আনা যায়, তবে সেই ব্যাকরণের মাধ্যমে ভাষাটিই বা বিধীত হবে না কেন? চোমস্কি তাই ব্যাকরণকেই তাঁর আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হিসাবে নিয়েছেন। আমরা জানি যে, ব্যাকরণের আলোচনা প্রধানতঃ তিন ভাবে হতে পারে[3] :
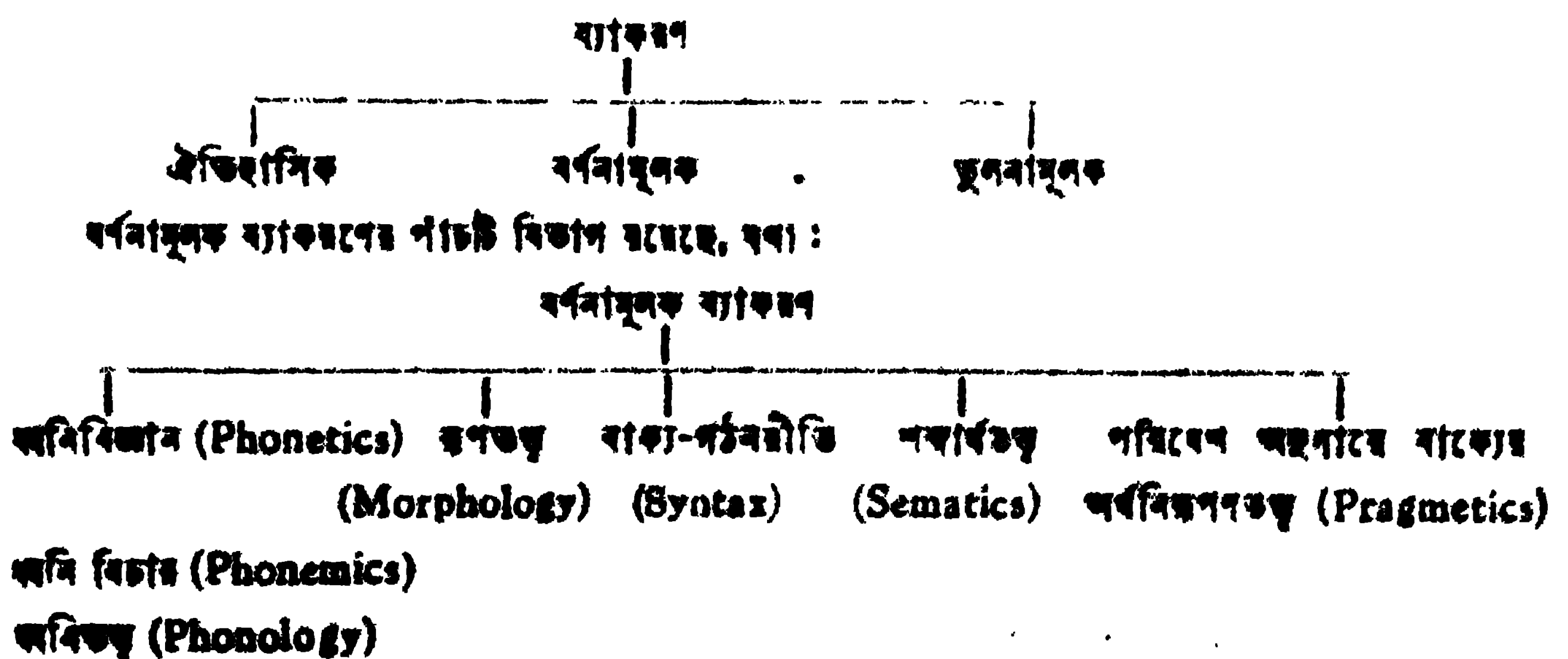
এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে আমাদের আলোচনা প্রধানতঃ বর্ণনামূলক ব্যাকরণের একটি বিভাগ

* কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

বাক্য গঠন রীতিতে গণিতের যে সব ধারণার (Concepts) প্রয়োগ করা হয়েছে, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রথম অংশ

ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞায় চোমস্কি গণিতের সেট (Set) তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর মতে, লিখিত বা কথিত ভাষা কতকগুলি সীমিত সংখ্যক শব্দ বা পদ দিয়ে গঠিত বাক্যের সংগ্রহ (A set of sentences, each finite in length)। এই সংগ্রহ সীমিতও হতে পারে কিংবা অসীমিতও হতে পারে অর্থাৎ একটি ভাষায় অসংখ্য বাক্য থাকতে পারে। ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) কতকগুলি সীমিত সংখ্যক নিয়মের সংগ্রহ (A finite set of rules). যেটা ভাষার শব্দ সংগ্রহ (Vocabulary) থেকে বাক্য তৈরি করে ঐ ভাষাকে রূপায়িত করছে। ব্যাকরণের এই সংজ্ঞা গণিতের ফাংশনের (Function) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 1নং নক্সা দ্রষ্টব্য।

ব্যাকরণ
শব্দ সংগ্রহ ←———————→ অর্থপূর্ণ বাক্যের
(Domain) (Function) সংগ্রহ (Range)

1নং নক্সা

ব্যাকরণের সূত্রগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন, যার দ্বারা ভাষার প্রত্যেক বাক্য এবং ঐ বাক্যের মধ্যস্থিত শব্দের বিন্যাস, শব্দের গঠন-প্রণালী, ধ্বনি ও পুরো বাক্যটির ব্যবহার ও অর্থ সবই নিরূপিত হবে। ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা অবশ্যই সীমিত হওয়া চাই; কারণ এক-একটি বাক্যের জন্যে এক-একটি নিয়ম একেবারেই অর্থহীন।

ব্যাকরণের এই নিয়মগুলির আংশিক রূপ নির্ণয় করবার অন্যতম প্রয়াস হিসাবে চোমস্কি উদ্ভাবিত বাক্যাংশের (Phrase) গঠনভিত্তিক ব্যাকরণের (Phrase-Structure Grammar বা সংক্ষেপে PSG) উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী একটি বাক্যকে বাক্যাংশে (Phrase) ভাঙলে বাক্যাংশের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গণিতের ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যকে বলা যায় পৌনঃপুনিক আবির্ভাব (Recursion) এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে কিছু বলবার আগে একটি অর্থপূর্ণ বাক্যে শব্দের বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য প্রয়োজন। এখানে গণিতের ক্রম (Sequence) ও গ্রুপের (Group) ধারণা প্রয়োগ করা যায়। এই ধারণাগুলি ইংরেজী ভাষার বাক্যের বা ইংরেজীর অনুরূপ যে সব ভাষায় লাটিন লিপি (Latin script) ব্যবহৃত হয় না, সেই সব ভাষার বাক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে সব ভাষায় লাটিন লিপি ব্যবহৃত হয় না, সেই সব ভাষার ক্ষেত্রে এই ধরণের গাণিতিক ব্যাখ্যা সম্ভব নাও হতে পারে।

মনে আছে এই রকম একটি ইংরেজী বাক্য নেওয়া হলো। আমরা জানি যে, ইংরেজী ভাষার শব্দ সংগ্রহের (Vocabulary) কয়েকটি সীমিত সংখ্যক শব্দ (বা রূপায়িত শব্দ) ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পাশাপাশি বসিয়ে (Concatenation) বাক্যটি তৈরি হয়েছে এবং এই কারণে বাক্যের মধ্যে প্রত্যেক শব্দের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। ক্রমান্বয়ে সাজানো এই শব্দ সংগ্রহকে আমরা বলবো শব্দক্রম (String)। দুটি পাশাপাশি বসানো শব্দের মধ্যে খানিকটা জায়গা ফাঁক থাকে। এই শূন্য স্থানকেও (Blank space) আমরা একটি শব্দ হিসাবে ধরবো ও গণিতের 'o' প্রতীক দিয়ে নির্দেশ করবো। অন্য শব্দগুলিকে আমরা গণিতের 'x', 'y' ইত্যাদি প্রতীক দিয়ে ও পাশাপাশি বসানোকে আমরা ⌢ চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করবো। দেখা যায় যে, বাক্যের শব্দগুলি নিম্নলিখিত সূত্র মেনে চলে:

(1) 'x' এবং 'y' যদি দুটি বিভিন্ন শব্দ হয়, তাহলে তাদের পাশাপাশি বসিয়ে যে শব্দ সৃষ্টি হলো, অর্থাৎ $x \frown y$ সেটা শব্দগুচ্ছেরই একটি উপাদান (Element)

(2) 'x', 'y' এবং 'z' যদি তিনটি পাশাপাশি বসানো শব্দ হয়, তবে তাদের পাশাপাশি বসানোটা সংযোগ নিয়ম (Associative law) মেনে চলে অর্থাৎ $(x \frown y) \frown z = x \frown (y \frown z)$

(3) $x \frown 0 = x$

গণিতে যোগ মূলতঃ দুটি সংখ্যা বা বস্তুকে নিয়ে করা হয় (Binary operation)। অনুরূপভাবে পাশাপাশি বসানোটা একটা দ্বিপদী ক্রিয়া (Binary operation), যার সাহায্যে দুটি শব্দ থেকে নতুন শব্দক্রম তৈরি হয়। 2নং সূত্রে বন্ধনীর ( ) ব্যবহার এই জন্যেই করা হয়েছে। গণিতের গ্রুপতত্ত্ব (Group theory) অনুসারে যে সংগ্রহের (Set) উপাদানগুলি (Elements) উপরিউক্ত তিনটি নিয়ম মেনে চলে, সেই সংগ্রহকে বলা হয় মনয়েড (Monoid)। গণিতের প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা যেন ভুলে না যাই যে, 'ভাষা বহতা নদী'। তার বৈচিত্র্য মনয়েড (Monoid) বা ঐ ধরনের কোন বিমূর্ত (Abstract) আধারে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যেমন গঠন ও উচ্চারণ এক থেকেও বন্ধনীর ( ) অবস্থান ভেদে একটি বাক্যের অর্থের তারতম্য ঘটতে পারে। চোমস্কির দেওয়া একটি বিখ্যাত উদাহরণ 'They are flying planes'। বাক্যটি দু-ভাবে লেখা যায়:

They⌢(are⌢(flying⌢planes)) (1ক)

অথবা They⌢((are⌢flying)⌢planes) (1খ)

(1ক) ও (1খ)-এর অর্থ পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলাতে অনুরূপ একটি বাক্য

'দেখা দিক তারা আকাশে'। দু-ভাবে লিখতে পারি

(দেখা⌢(দিক⌢তারা))⌢আকাশে

অথবা (দেখা⌢দিক)⌢(তারা⌢আকাশে)।

বাক্যের অর্থের এই দিকগুলি সেমান্টিক্স (Semantics)-এর অন্তর্ভুক্ত। দ্ব্যর্থক বাক্য সব ভাষায় অনুমোদিত নয়। উদাহরণ হিসাবে কম্পিউটারে ব্যবহৃত ভাষার উল্লেখ করা যেতে পারে। কম্পিউটার বিজ্ঞানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় (Programming language), তাকে বলা হয় কৃত্রিম ভাষা বা artificial language। কৃত্রিমতার প্রধান কারণ দুটি:

(1) এই ভাষাগুলি লিখিত ভাষা। এই ভাষায় কেউ কথা বলে না।

(2) এই ভাষায় দ্ব্যর্থক (Ambiguous) বাক্য (Programme) ব্যবহার নিষিদ্ধ।

দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের ভাষার দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম ভাষায় অনুপস্থিত।

একটি বাক্যকে বিশ্লেষণ করতে আর কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ নির্ধারণকেই বোঝায়। অথবা বাক্যের একটি নির্দিষ্ট অর্থপ্রকাশক অংশকে (Phrase) পৃথক করেও পুরো বাক্যটির গঠন ও অর্থ বোঝা যায়। চোমস্কি তাঁর PSG তত্ত্বে এই দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। একটি বাক্যকে আমরা নিম্নলিখিত নক্সায় (2নং) ভাঙবো:

মূল বাক্য (Sentence)

বিশেষ্য-প্রধান বাক্যাংশ (Noun phrase) | ক্রিয়াপদ-প্রধান বাক্যাংশ (Verb phrase)

2নং নক্সা

চোমস্কি ও গিনারের উল্লিখিত ইংরেজী ভাষার একটি বাক্য 'The boy hit the ball' নেওয়া যাক। ইংরেজী বড় অক্ষর S দিয়ে মূল বাক্যটিকে (Sentence) নির্দেশ করা হলো

(বাক্যের noun ও verb phrase-কেও বড় অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়)। এই বাক্যের বিশেষ্য পদ প্রধান বাক্যাংশ হচ্ছে 'the boy' এবং ক্রিয়াপদ প্রধান বাক্যাংশ 'hit the ball'। বিশেষ্য পদ হচ্ছে 'boy', 'ball' ও নির্দেশক পদ (definite article) 'the'। ক্রিয়াপদ 'hit' ও তার কর্ম (object) হচ্ছে 'ball'। ইংরেজী ভাষার আভিধানিক শব্দগুলিকে সাধারণতঃ ভাষার ছোট অক্ষর দিয়ে নির্দেশ করা হয়। এখন 'The boy hit the ball' এই বাক্যটি (এবং এই ধরণের অসংখ্য বাক্য) ইংরেজী ব্যাকরণের নিম্নলিখিত কয়েকটি মাত্র নিয়মের সাহায্যে তৈরি করা যায়:

1 নং নিয়ম: S→AB

2 ,, , A→cd

3 ,, , B→eA

4 ,, , c→{a, the, another,⋯} (2)

5 ,, , d→{ball, boy, girl,⋯}

6 ,, , e→{hit, strike, play,⋯}

এখানে A — বিশেষ্যপদ-প্রধান বাক্যাংশ (the boy)

B — ক্রিয়াপদ-প্রধান বাক্যাংশ (hit the ball)

'→' — এই চিহ্নটির অর্থ 'S' এর বদলে AB লিখতে হবে (rewriting rule) ইত্যাদি।

(2)-এ বর্ণিত ব্যাকরণটি একটি গাছের মত নক্সার (Tree diagram) বা বাক্যাংশ নির্দেশকের (phrase-marker) সাহায্যে দেখানো যেতে পারে (3নং নক্সা)।
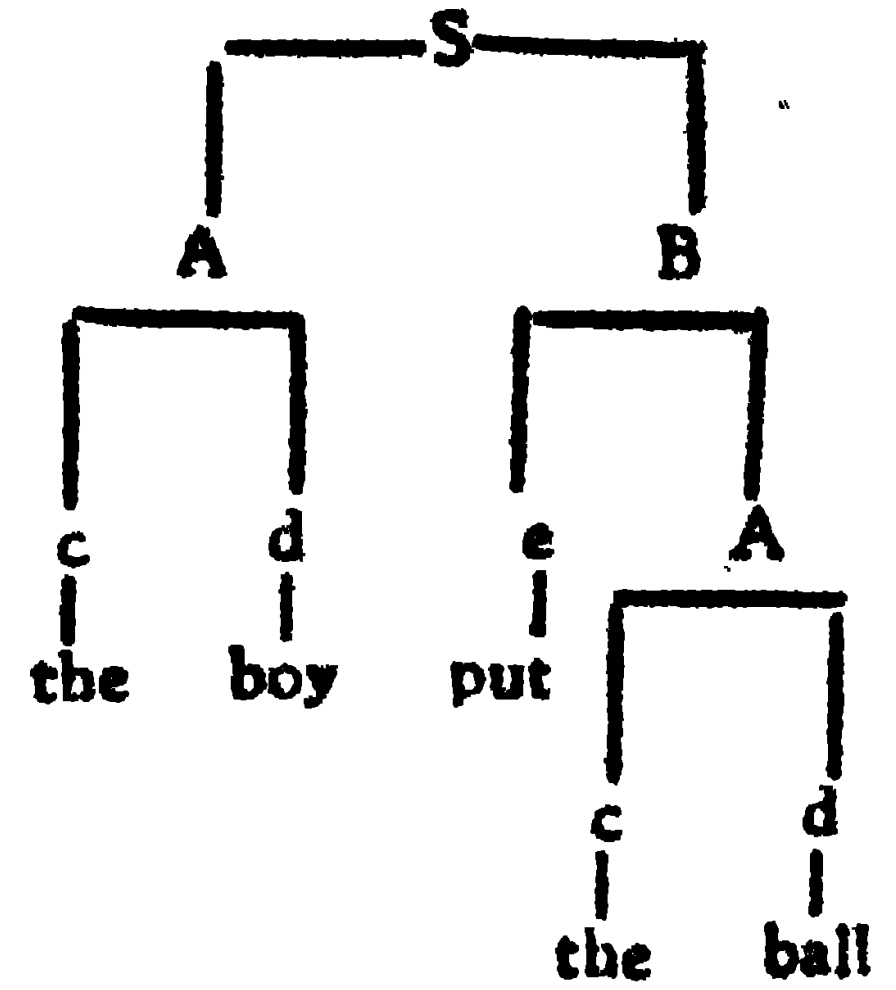
3নং নক্সা

'A' ও 'B' বলতে কি বোঝায়, আগেই তা বলা হয়েছে। পুরা বাক্যটি (S) তৈরি হয়েছে A ও B-কে পাশাপাশি বসিয়ে। 'c', 'd' ও 'e'-এর দ্বারা ইংরেজী ভাষার অভিধানগত শব্দ সংগ্রহের কতকগুলি উপাদান (Elements বা Atomic constituents) নির্দেশিত হয়েছে। এই উদাহরণের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরের ছকে বিশেষ্য বাক্যাংশ (Noun phrase) A একাধিকবার দেখা দিয়েছে। একটি বাক্যের মধ্যে একটি বাক্যাংশের (Phrase) এই পৌনঃপুনিক আবির্ভাবকে চোমস্কি বলেছেন পুনরাবির্ভাব গুণ (Recursion)। ভাষার প্রত্যেক বাক্যের (বিশেষ করে জটিল বাক্যের) বাক্যাংশের এই পুনরাবির্ভাব গুণটি আছে বলেই সম্ভবতঃ ব্যাকরণের কতকগুলি সীমিত সংখ্যক সূত্র ভাষার সমস্ত সম্ভাব্য বাক্য তৈরি করতে সক্ষম। উপরের (2) নং সূত্রে চোমস্কি একটি খুবই ছোটো ব্যাকরণের যে নমুনা দিয়েছেন, তা থেকেই সাধারণভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তগুলি করতে পারি:

(1) ব্যাকরণ কতকগুলি সীমিত সংখ্যক সূত্রের সংগ্রহ

(2) প্রত্যেক সূত্রে একটি পুনর্লিখন রীতি (Rewriting rule) বলা হয়েছে (পুনর্লিখন

রীতি '→' এই চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা হয়) যার সাহায্যে একটি বাক্যকে তার যৌগিক উপাদানে (অর্থাৎ শব্দ বা পদে) ভাঙা হয়।

(3) যৌগিক উপাদানে বিশ্লেষণ তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন পুনর্লিখন রীতিগুলির সাহায্যে কোনও নতুন শব্দ বা পদ আর পাওয়া যাবে না।

উপরের উদাহরণ থেকে খুব সম্ভবতঃ এটা বোঝা যায় যে, ব্যাকরণের সূত্রগুলি কিভাবে একটি গাছের মত নক্সার সাহায্যে বাক্যের বাক্যাংশকে চিহ্নিত করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংরেজী ভাষায় আমরা এমন অনেক বাক্য তৈরি করতে পারি, যাদের মধ্যে কোনও একটি phrase 'A' গাছের মত নক্সার মাধ্যমে তিনভাবে তার পুনরাবির্ভাব রূপ প্রকাশিত করতে পারে, যথা (4নং নক্সা):
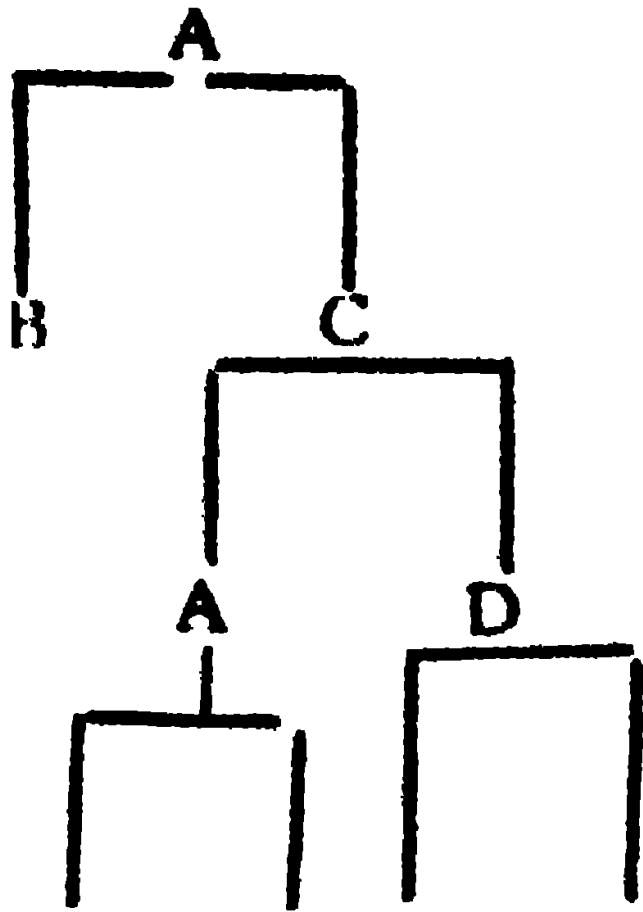
(i) মধ্যে (Self-embedding)
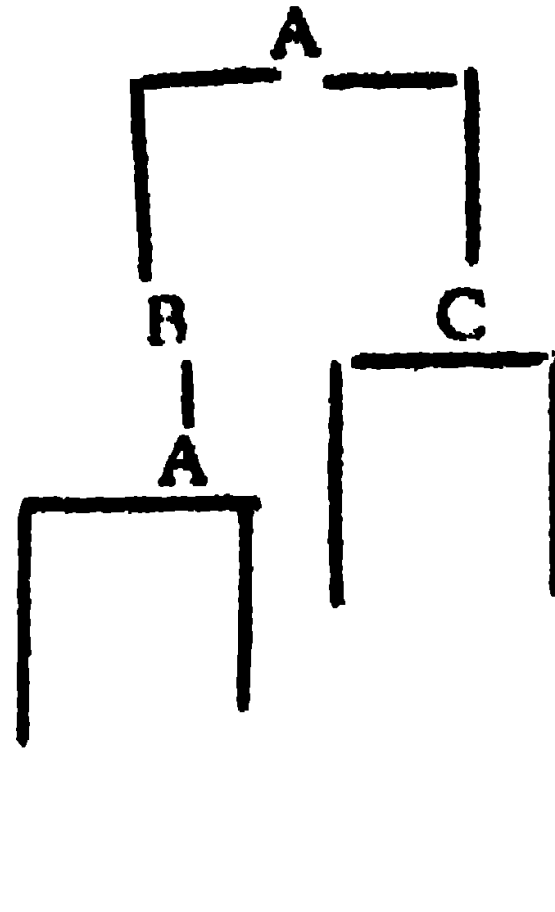
(A-এর পুনরাবির্ভাব)
(ii) বাঁয়ে (Left recursion)
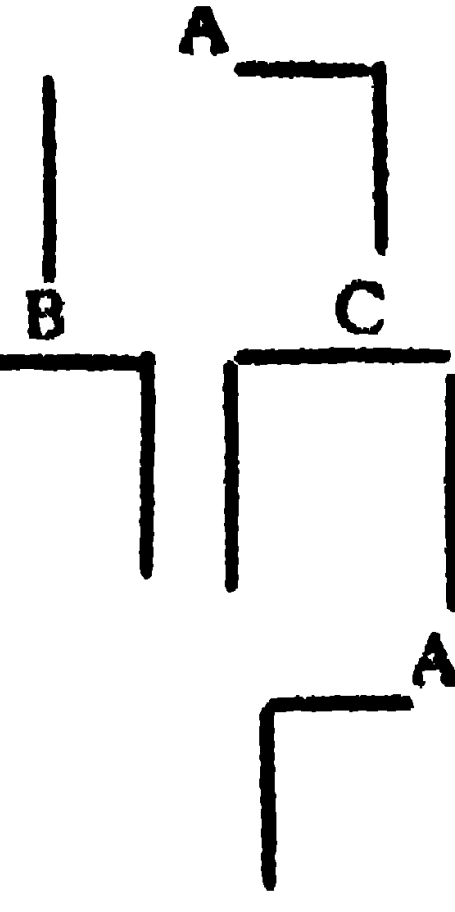
(iii) ডাইনে (Right recursion)

4নং নক্সা

কৌতূহলী পাঠকরা চোমস্কি ও মিলারের[1] প্রবন্ধে এই ধরণের ইংরেজী বাক্যের উদাহরণ পাবেন।

PSG ইংরেজী ভাষার বাক্য গঠনের অনেক বৈচিত্র্য (যেমন কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যে লিখিত বাক্য, একই অর্থ বহন করে কেন—(Identity of meaning of active & passive sentences), তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। PSG-এর এই ত্রুটি সংশোধন করবার জন্যে চোমস্কি রূপান্তরকারী ব্যাকরণের (Transformational grammar) অবতারণা করেছেন। এর বিশদ বিবরণ উল্লিখিত প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় অংশ

চোমস্কি তাঁর অন্য এক গবেষণাপত্রে[2] মূলতঃ পুনর্লিখন রীতির গঠনের উপর ভিত্তি করে চার শ্রেণীর ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যাকরণের সঙ্গে পৃথক পৃথক ধরণের এক-একটি অটোমাটন (Automaton) বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসংযোজন (C rrespondence) করা কি ভাবে সম্ভব, তারও বর্ণনা দিয়েছেন। এই অটোমাটনের সাহায্যে কোন একটি বাক্য দেওয়া হলে সেই বাক্যটি ঐ অটোমাটনের সঙ্গে সংযোজিত ব্যাকরণের অন্তর্গত কিনা স্থির করা যাবে। এখানে আমরা ব্যাকরণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

শূন্যতম শ্রেণীর ব্যাকরণ বা টাইপ জিরো ব্যাকরণে (Type 0 grammar) পুনর্লিখন রীতির উপর কোন শর্ত নেই (Unrestricted re-writing system)। এইজন্যেই এই ব্যাকরণকে

টাইপ 0 বলা হয়েছে। প্রথম অংশে 2নং সূত্রে যে ব্যাকরণের কথা বলা হয়েছে, সেটা টাইপ 0 ব্যাকরণের উদাহরণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ বা টাইপ 2 ব্যাকরণে (Type 2 grammer) প্রতি পুনর্লিখন রীতিতে বাঁ-দিকের একটি প্রতীক (Symbol) মাত্র বদ্লানো যাবে। দ্বিতীয়তঃ, বাঁ-দিকের যে প্রতীকটি বদ্লানো হবে, তার দু-পাশে প্রতীক থাকা চাই। টাইপ 2-এর পুনর্লিখন রীতির চেহারা

$$xAy \rightarrow xBy$$

অর্থাৎ x—y এর প্রসঙ্গে (Context) A-এর উল্লেখ থাকলে সেটা বদ্লে xBy লেখা চলবে। টাইপ 2 ব্যাকরণকে তাই প্রসঙ্গমুখাপেক্ষী (Context sensitive) ব্যাকরণ বলা হয়। ইংরেজী ভাষায়[8] The boy runs, কিন্তু The boys run প্রসঙ্গ মুখাপেক্ষী নিয়মের একটি সহজ উদাহরণ। উপরের পুনর্লিখন রীতিতে ইংরেজী বড় অক্ষর ও ছোট অক্ষর দিয়ে কি বোঝায় সেটা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাকরণ বা টাইপ 4 ব্যাকরণের প্রতি পুনর্লিখন রীতির চেহারা :

$$A \rightarrow cDe$$

অর্থাৎ বাঁ-দিকে একটিমাত্র বড় অক্ষরের প্রতীক (বড় অক্ষরের প্রতীকগুলিকে বলা হয় non-terminal symbols এবং ছোট অক্ষরের প্রতীকগুলিকে বলা হয় terminal symbols) এবং ডানদিকে দুই ধরণের প্রতীকই থাকতে পারে (A → blank space লেখা চলবে না)। ডানদিকের প্রতীকগুলি প্রসঙ্গের (অর্থাৎ 'A'-এর উপর) উপর নির্ভর করতে পারে আবার নাও করতে পারে। এই মতে টাইপ 4 ব্যাকরণকে প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষ ব্যাকরণ (Context-free grammar) বলা হয়। কম্পিউটারে ব্যবহৃত ALGOL ভাষা এই ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত।

টাইপ 4 ব্যাকরণের উপর আরও কতকগুলি শর্ত আরোপ করে আর এক শ্রেণীর ব্যাকরণ তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যাকরণ তিন প্রকারের হতে পারে। আমরা এদের বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে কেবলমাত্র এদের পুনর্লিখন রীতিগুলি দিলাম।

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাকরণের পুনর্লিখন রীতি :

(i) $A \rightarrow Bc$

(ii) $A \rightarrow aB$

(iii) $A \rightarrow Ba$

(iv) $A \rightarrow a$

সূত্র (i) এবং (iv) নিয়ে স্বভাবী ব্যাকরণ (Normal grammar) গঠিত। সূত্র (ii)—(iv) নিয়ে রৈখিক ব্যাকরণ (Linear grammar) গঠিত। কেবলমাত্র সূত্র (ii) ও (iv) যে রৈখিক ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে ডান রৈখিক (Right linear) এবং কেবলমাত্র সূত্র (iii) ও (iv) যে রৈখিক ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে বাম রৈখিক (Left linear) ব্যাকরণ।

আমরা টাইপ 1 ও টাইপ 3 ব্যাকরণের উল্লেখ করি নি, তার কারণ এদের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ।

উপসংহারে আমরা একটি বিশেষ ধরণের অটোমাটন যন্ত্রের বর্ণনা দিয়ে এবং কোন পাঁচ ধরণের অটোমাটনের সঙ্গে চমস্কি-উচ্চাবচ (Chomsky hierarchy) যথাক্রমে টাইপ 0, 2, 4 ও রৈখিক ব্যাকরণগুলিকে সংযোজিত করা হয়, তার উল্লেখমাত্র করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি।

সসীম সংখ্যক অবস্থা গ্রহণে সক্ষম অটোমাটন (Finite state automaton) 5নং নক্সা একটি

অটোমাটন ● → বৈদ্যুতিক বাল্ব

→ | a b | a → টেপের গতি নির্দেশক

টেপ → পাঠযন্ত্র

নিয়ামক যন্ত্র

5নং নক্সা
ফাইনাইট স্টেট অটোমাটনের বিভিন্ন অংশ

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, যার তিনটি অংশ (Component) রয়েছে। একটি অংশের দায়িত্ব পুরো যন্ত্রটির কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করা (Control unit)। মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে এর কার্যকারিতা অতুলনীয়। দ্বিতীয় অংশের কাজ কোন বার্তা (Tape) পাঠ করা (Reading head)। এই টেপ অটোমাটনের তৃতীয় অংশ। টেপ (Tape) হচ্ছে কতকগুলি প্রতীকের পরম্পরা (A sequence of symbols) অথবা পদক্রম (String)। পাঠযন্ত্রকে (Reading head) মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে আর টেপ হচ্ছে বাইরের জগতের (External world) প্রতিরূপ। ধরা যাক অটোমাটনটি কেবল টাইপ 0 ব্যাকরণের ভাষা বুঝতে পারে (Correspondence)। কোন একটি অজানা ভাষার অক্ষরসমষ্টি ঐ অটোমাটনে দেওয়া হলো। যদি ঐ অক্ষরসমষ্টি টাইপ 0 ব্যাকরণের অক্ষর বা পদ হয়, তাহলে অটোমাটন একটি সংকেত দিয়ে (অটোমাটনের সঙ্গে যুক্ত একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলে ওঠা ইত্যাদি) জানিয়ে দেবে যে, ঐ ভাষা টাইপ 0 ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিধায় পড়লে (Loop) কোন সংকেত নাও দিতে পারে। বলা বাহুল্য অটোমাটনের এই বর্ণনা অনেক পরিমাণে সরল করা হয়েছে। এর বিশদ কার্যকলাপ ও তার সঙ্গে যুক্ত বহু দুরূহ প্রশ্নের আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। নিচের তালিকায় কেবল চোমস্কি ক্রমবাচিক (Hierarchy) বিভিন্ন ব্যাকরণের সঙ্গে যে ধরণের অটোমাটন[8] সংযোজিত হতে পারে, তা দেখানো হলো। অটোমাটনের কতকগুলি নামের বাংলা প্রতিশব্দ না দিতে পারার আমরা দুঃখিত।

তালিকা

ব্যাকরণ	অটোমাটনের বর্ণনা
টাইপ 0	Turing Machine (টুরিং মেশিন)
„ 2	Non-deterministic linear bounded automaton
„ 4	Non-deterministic push down storage „
দ্বৈধিক ব্যাকরণ	Two tape automaton (দুই টেপ যুক্ত)
ভাব দ্বৈধিক	Finite „ (সীমিত অবস্থাবিশিষ্ট)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—এই প্রবন্ধের কিয়দংশ জাতীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পড়ে দেখেছেন ও সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনার পরি

প্রেক্ষিতে মূল পাণ্ডুলিপির অনেক অংশ পরিবর্তন করেছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের মূল্যবান সমা-লোচনায় আমি বিশেষ উপকৃত ও তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সূত্র নির্দেশ

(1) N. Chomsky and G. A. Miller — Introduction to Formal Analysis of Natural Languages, Hand book of Mathematical Psychology Vol. II. Edi ted by R. Duncan Luce et al Jonn Wiley and Sons, Inc (1967)

(2) N. Chomsky — Formal properties of Grammars. Ref. as above

(3) সুকুমার সেন — ভাষার ইতিবৃত্ত (সাহিত্য সভা প্রকাশনী 5 সং, 1957)

(4) John Lyons — Introduction to Theoretical Linguistics (Camb. Univ. Press, 1969)

(5) ,, — Noam Chomsky, (Fontana Modern Masters Series, 1970)

"আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই। • • • মনে করিও না, বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থলাভই হয়। সংসারে মানুষের চেয়ে বড় কে? মানুষের মনের চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন বিজ্ঞানবলে মার্জিত, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। সমাজনীতি, ধর্মনীতি সবই নানাপ্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, সভ্য মানবমণ্ডলীর মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

তাৎক্ষণিক আলোকলিখন

সলিলকুমার চক্রবর্তী*

1947 সালের গোড়ার কথা। আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর এডুইন এইচ. ল্যাণ্ড (Dr. Edwin H. Land) ফটোগ্রাফির (Photography) বা আলোকলিখনের জগতে আনলেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পোলারয়েড ল্যাণ্ড ক্যামেরা (Polaroid Land Camera) আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা তাদের ক্যামেরা-ধারকদের প্রতি নির্দেশ জারী হলো—Press the button and the rest will follow automatically. অর্থাৎ বোতাম টেপ, বাকী কাজটা আপনাআপনিই হবে। অন্ধকার ঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ডেভেলপিং (Developing) বা ফিক্সিংয়ের (Fixing) কোন প্রয়োজন নেই। সমস্ত অন্ধকার ঘরটাকেই এখন বন্দী করে ফেলা হয়েছে ক্যামেরাধারকের ছোট ক্যামেরাটির মধ্যে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে না। এক্সপোজারের (Exposer) কিছুক্ষণ পরেই ছবি একেবারে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসবে। ঈপ্সিত বস্তুর যে কোন রঙের, যে কোন আকারের ছবি পেতে গেলে আজকের দিনে অপেক্ষা করতে হবে মাত্র কয়েক মিনিট। যে বিশেষ পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ ছাপানো ছবি পাওয়া যায়, তাকেই বলে তাৎক্ষণিক আলোকলিখন (Instant photography)।

শুরুতে সাধারণ আলোকলিখন (Ordinary photography) সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় (Photo chemical reaction) কিছু কিছু আলোক সুবেদী (Photosensitive) পদার্থের বর্ণ পরিবর্তনের তথ্যটি উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বৈজ্ঞানিকদের প্রলুব্ধ করে আসছে। এই তথ্যকে উপজীব্য করেই 1839 খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুইস ড্যাগেয়ার (Louis Daguerr) আলোক রাসায়নিক পদ্ধতিতে একটি ধাতব প্লেটে স্থায়ী প্রতিবিম্ব গঠনে সক্ষম হন। তার অব্যবহিত পরেই ইংল্যাণ্ডের ফক্স ট্যালবট (Fox Talbot) সেলুলয়েড ফিল্মে স্থায়ী ছবি নির্মাণ করেন। এখনও একটু উন্নত ধরনের ট্যালবট প্রক্রিয়ারই অনুসরণ করে আসছেন ফটোগ্রাফারেরা।

ছবি তোলবার জন্যে বাজারে যে সব ফিল্ম কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলি তৈরি করা হয় জিলেটিন মাখানো পাতলা চাদরের উপর যতখানি সম্ভব সমানভাবে (Unifomly) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাসদানাসম্পন্ন সিলভার ব্রোমাইড (AgBr) ও সিলভার ক্লোরাইডের (AgCl) মিশ্রণকে বিছিয়ে দিয়ে। ফটো তোলবার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ক্যামেরার পিছন দিকে এই ফিল্মকে জড়িয়ে রাখবার ব্যবস্থা থাকে। ঈপ্সিত বস্তু থেকে নিঃসৃত বা প্রতিফলিত আলো ক্যামেরার সম্মুখের লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হয়ে লেন্সটির ফোকাসতলে রক্ষিত ফিল্মের উপর গিয়ে পড়ে। অমনি কিছু কিছু সিলভার হ্যালাইড কণিকা এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, ডেভেলপার (Developer) নামক এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক দ্রবণে নির্দিষ্ট সময় ফিল্মটিকে ডুবিয়ে রাখলে ঐ সকল সিলভার হ্যালাইড কণিকা বিজারিত হয়ে ধাতব সিলভার কণায় পরিবর্তিত হয়।

---

*ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব সিলভার কণা, কয়লার মত ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ শস্যাকৃতি বস্তুর জায় ফিল্মের উপর থেকে যায়। এটাই হচ্ছে ঈপ্সিত বস্তুর সুপ্ত প্রতিবিম্ব (Latent image)। তারপর, 'ফিক্সার' (Fixer) নামক আর এক প্রকার বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণে এই ডেভলপড্ (Developed) ফিল্মকে ডুবিয়ে দিলে, সেলুলয়েড চাদর থেকে সিলভার হ্যালাইডগুলি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেবলমাত্র কালো রঙের ধাতব সিলভার কণাগুলি লেগে থাকবে সেলুলয়েড চাদরের গায়ে এবং এর ফলে পাওয়া যাবে বাঞ্ছিত বস্তুর নেগেটিভ (Negative)।

আমরা জানি, কালো রঙের কোন বস্তুর আলোক বিকিরণের ক্ষমতা নেই ;— সমস্ত আলোই এরা শুষে নেয়। কাজেই ভুরু, চুল, চোখের মণি প্রভৃতি অংশ থেকে কোন আলো না আসবার দরুণ প্রতিবিম্বে ঐ সকল স্থানের সিলভার হ্যালাইড অপরিবর্তিত থাকবে। আর দেহের যে সকল অংশ কালো নয়, সেখান থেকে আলো গিয়ে ফিল্মে কালো রঙের ধাতব সিলভার উৎপন্ন করবে।

সেলুলয়েড ফিল্মকে ডেভলপড্ এবং ফিক্সড্ করে নেবার পর দেহের সাদা জায়গাগুলিকে কালো আর কালো জায়গাগুলিকে সাদা দেখায় বলে এটা হচ্ছে আসল ছবির নেগেটিভ।

পরের কাজটা হচ্ছে নেগেটিভকে পজিটিভ করার পদ্ধতি, সেই আগের মতই খানিকটা।

ছবি ছাপানোর সাদা কাগজখানার উপর সিলভার ক্লোরাইডের পাত্‌লা প্রলেপ থাকে। সেই কাগজখানার উপর নেগেটিভকে রেখে তার উপর এক বিশেষ ধরণের কাচের প্লেট চাপিয়ে যখন সমস্ত জিনিষটাকে কিছুক্ষণের জন্যে আলোকের কাছে উন্মুক্ত রাখা হয়, তখন নেগেটিভের কালো অংশ থেকে কোন আলো পজিটিভ প্লেটে যেতে পারে না। ফলে ঐ সকল অংশের সিলভার ক্লোরাইড অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু বাকী অংশ থেকে আলো গিয়ে পজিটিভ প্লেটের সিলভার ক্লোরাইডকে বিজারিত করে ধাতব সিলভার উৎপন্ন করে। এর পরে অনেকটা পূর্ব-প্রক্রিয়ার পজিটিভকে ডেভলপড্ এবং ফিক্সড্ করিয়ে নিলেই আসল ছবি পাওয়া যাবে।

ছবির রংটাকে আরও সুন্দর করতে গেলে ফিক্সিং-এর পর পজিটিভ প্লেটটাকে পটাসিয়াম্ অরিক্লোরাইড ($KAuCl_4$) দ্রবণে সিক্ত করা দরকার। এই প্রক্রিয়ার নাম টোনিং (Toning)। এর ফলে কিছু কিছু রৌপ্যকণা স্বর্ণকণিকার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে ছবিটাকে আরও সুন্দর করে তোলে।

$$3Ag + KAuCl_4 - Au + KCl + 3AgCl$$
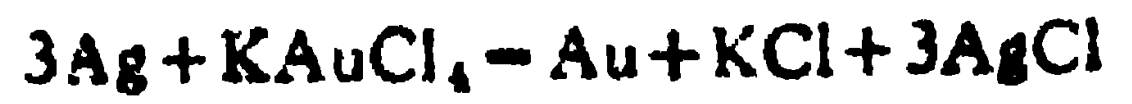
মনে রাখা দরকার সমস্ত ডেভেলপিং এবং টোনিং প্রক্রিয়াটিকে অন্ধকার ঘরে সম্পন্ন করতে হবে।

এবারে ফিরে আসা যাক তাৎক্ষণিক আলোক-চিত্রের কথায়। পোলারয়েড ল্যাণ্ড ক্যামেরা (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য) দেখতে অনেকটা সাধারণ ক্যামেরার মত। নেগেটিভকে ডেভেলপ করা এবং পজিটিভ ছবি ছাপানোর কাজটা চলে ক্যামেরার পিছনের অংশে। কাজেই অন্যান্য সাধারণ ক্যামেরার চেয়ে এর পিছনের দিকটার আয়তনও খানিকটা বড় আর যান্ত্রিক জটিলতাও কিছু বেশী। আলোক-সুবেদী সেলুলয়েড ফিল্ম, ছবি ছাপানোর সাদা কাগজ এবং রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে সাজিয়ে রাখা হয় এই পিছনের অংশে।

এই ক্যামেরায় একটার বদলে দুটি ফিল্মের রোল থাকে। সেগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিল্মের রোল (ক), এবং অপরটি ছবি ছাপানোর উপযোগী সাধারণ সাদা কাগজের রোল (খ)। এই দুটি রোলকে পৃথকভাবে বসিয়ে রাখবার জন্যে ক্যামেরার মধ্যে দুটি

বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ (Chamber) রয়েছে। নীচের প্রকোষ্ঠে থাকে পজিটিভ রোল আর উপরের প্রকোষ্ঠে নেগেটিভের জন্যে সেলুলয়েড রোল। কাগজ কিন্তু সাধারণ আলোকচিত্রের পজিটিভ ছাপানোর জন্যে ব্যবহৃত সাদা কাগজের মত ততটা শক্ত নয়। ক্যামেরার নীচের প্রকোষ্ঠে
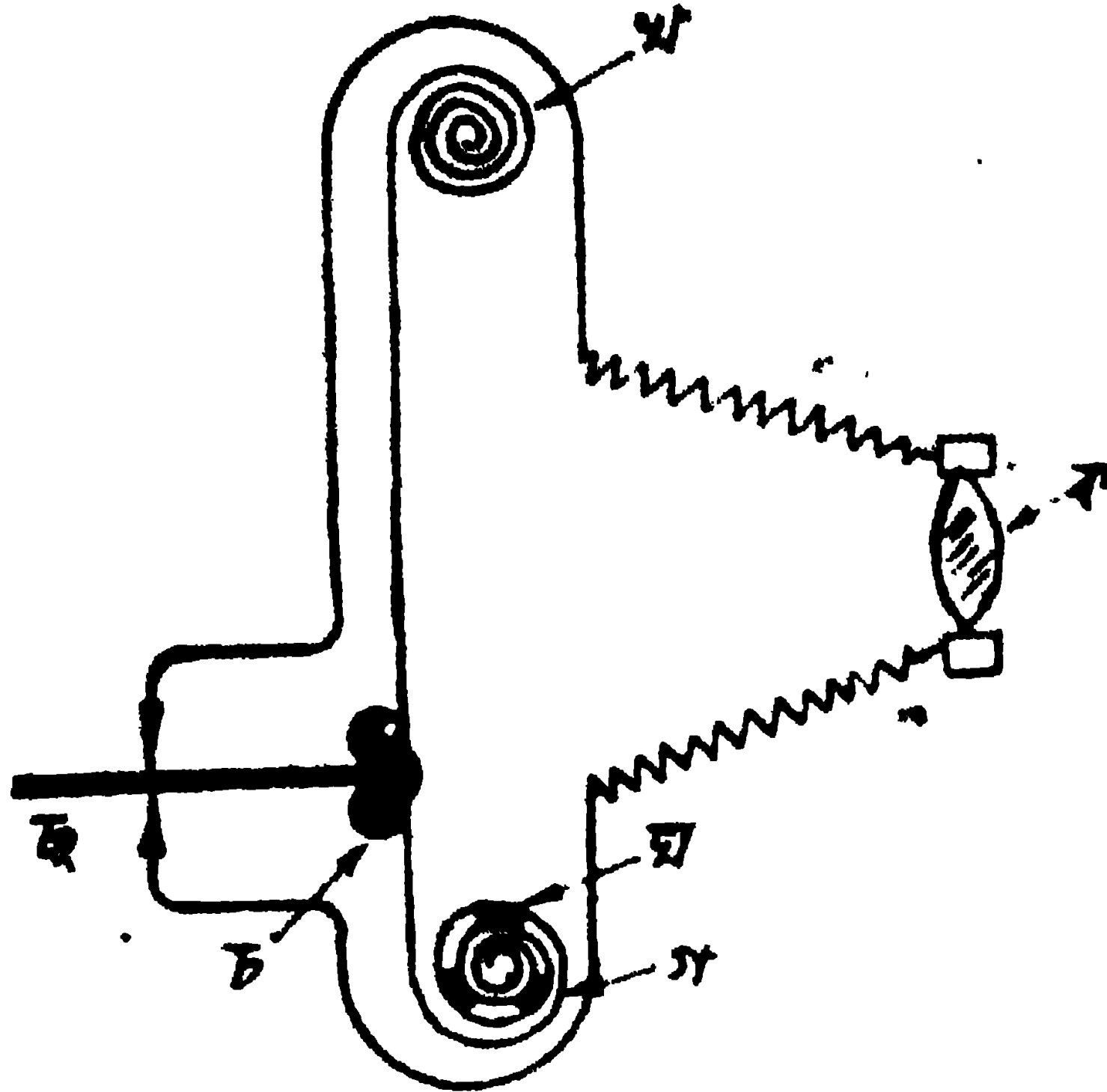
1নং চিত্র
পোলারয়েড ল্যাণ্ড ক্যামেরা

এই দুটি রোলকে একটা মজবুত কাগজের ফিতার সঙ্গে এরূপভাবে যুক্ত করা থাকে যে, ঐ কাগজের ফিতা দুটি রোলকেই একই সঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট এক জোড়া স্টীল রোলারের (চ) মাঝখান দিয়ে পরিচালিত করতে পারে। প্রত্যেক বার স্ন্যাপ (Snap) নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্টীল রোলার দুটি, নেগেটিভ ফিল্মকে এবং ছবি ছাপানোর সাদা কাগজকে পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরে।

সাটার (Shutter) টিপবার কিছু পরে যখন পরবর্তী ছবি তোলবার জন্যে নেগেটিভ রোলের অব্যবহৃত অংশকে ক্যামেরার লেন্সের (ক) সামনে আনা হয়, তখনই আপনা থেকে শুরু হয়ে যায় ডেভলপিং-এর কাজ।

তাৎক্ষণিক আলোকচিত্রে ব্যবহৃত সাদা যেখানে পজিটিভ রোলটা থাকে, তার ঠিক কাছেই ডেভেলপিং সলিউশনকে (Developing solution) (ঘ) থকথকে জেলীর মত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। নেগেটিভ রোলের সংস্পর্শে আসবার আগে পজিটিভ রোলকে আসতে হয় ঐ জেলীর মত থকথকে পদার্থের মধ্য দিয়ে। এর ফলে পজিটিভ রোলের গায়ে সমানভাবে প্রায় 0·0003 ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু থকথকে জেলীর মত সলিউশনের স্তর পড়ে যায়।

স্টীল রোলারের মধ্য দিয়ে আসবার কালে যখন পজিটিভ রোল নেগেটিভ রোলের সঙ্গে পিষ্ট (Pressed) হয়, তখন যুগপৎ নেগেটিভের ডেভেলপিং প্রক্রিয়া এবং নেগেটিভ রোল থেকে পজিটিভ রোলে প্রতিবিম্বের স্থানান্তরিকরণ (Transfer) প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সাধারণ

ফটোগ্রাফির মত এক্ষেত্রে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ করবার জন্যে পুনরায় আলোক প্রেরণের (Re-exposing) কোন প্রয়োজন নেই।

নেগেটিভ কোষের যে অংশ বস্তু থেকে আসা আলোর কাছে উন্মুক্ত, সেখানে কালো ধাতব সিলভার গঠিত হয়। আর আলোক-স্পর্শহীন অন্যান্য স্থানের অপরিবর্তিত সিলভার হ্যালাইডকে দ্রবীভূতকরণের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য উপস্থিত আছে ঐ জেলীর মত থকথকে পদার্থে।

দ্রবণযোগ্য সিলভার হ্যালাইড কমপ্লেক্স (Complex) এবং প্রোসেসিং রিএজেন্টের (Processing reagent) পাতলা প্রলেপের মধ্য দিয়ে ডিফিউজ (Diffuse) করে পজিটিভ কোষে স্থানান্তরিত হয়। স্থানান্তরিকরণ শেষ হলে দ্রবণযোগ্য কমপ্লেক্স সিলভার লবণ, ডেভেলপিং সলিউশনে উপস্থিত উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ কর্তৃক বিজারিত হয় এবং সিলভারের কালো কণাগুলি সঞ্চিত হয় পজিটিভ প্লেটে। ছবি তৈরির কাজ একবারেই শেষ। সমস্ত প্রক্রিয়াটা ঘটতে সময় লাগে মাত্র এক থেকে দেড় মিনিট। একই সঙ্গে ক্যামেরার পিছন (ছ) থেকে একটা নেগেটিভ এবং একটা পজিটিভ প্রিন্ট বের করে নেওয়া যাবে। উভয়েই শুষ্ক এবং পরিষ্কার।

তাছাড়া বিশেষ ধরণের পোলারয়েড ফিল্ম ব্যবহার ক'রে আজকাল আবার রঙীন ছবিও তোলা যাচ্ছে এই ক্যামেরার সাহায্যে।

স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা আর পোলারয়েড রঙীন ফিল্ম (Polaroid colour film) একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে ক্যামেরার খাঁজে পয়সা ছুঁড়ে দিলেই হলো—রঙীন ছবি ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসবে কয়েক মিনিটের মধ্যে। ফটোগ্রাফি এখন অটোমেশনের যুগে পৌঁছে গেছে। নিপসে, ড্যাগেরো, ট্যালবট, জর্জ ইষ্টম্যান প্রমুখ ব্যক্তিরা এতকাল ধরে যা করেছেন ফটোগ্রাফির জন্যে, ল্যাণ্ড-এর সাফল্য যেন সব কিছুকেই ম্লান করে দিয়েছে।

মিষ্টত্ব ও হাইড্রোজেন বন্ধনী

পরাশর বিশ্বাস ও সুস্মিতা চৌধুরী*

শর্করা শ্রেণীর বিভিন্ন সদস্যের মিষ্টত্বের পরিমাণ ভিন্ন। আবার শর্করা শ্রেণীর বাইরেও আমরা অনেক মিষ্ট স্বাদযুক্ত যৌগের দেখা পাই; যেমন— স্যাকারিন, ক্লোরোফর্ম, এমিনো-নাইট্রো-বেঞ্জিন। মিষ্ট স্বাদ এবং তার তীব্রতার প্রকারভেদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

আলোচ্য বিষয়ে যিনি সর্বাধিক আলোকপাত করেন, তিনি হলেন বিজ্ঞানী শ্যালেনবার্জার (Shallenberger, 1963)। তাঁর মতে বিভিন্ন শর্করার মিষ্টত্ব নির্ভর করে ঐ শর্করা যৌগের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত কার্বন পরমাণুতে যুক্ত হাইড্রক্সিল (−OH) গ্রুপগুলির উপর।

বিজ্ঞানী কুন্ (Kuhn)-এর মতে হাইড্রক্সিল গ্রুপগুলির মধ্যে সৃষ্ট হাইড্রোজেন বন্ধনীই মিষ্টত্বের প্রধান কারণ।
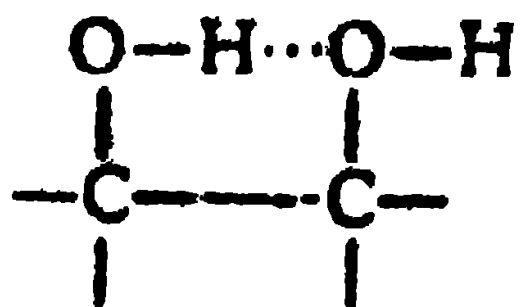
শ্যালেনবার্জার আরও বলেন: মিষ্টত্বের তীব্রতার প্রকারভেদের জন্যে যৌগের যে অংশটুকু প্রধান ভূমিকা নেয়, তা হাইড্রোজেন বন্ধনীর স্থিরতার উপর নির্ভরশীল। হাইড্রোজেন বন্ধনীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে, মিষ্টত্বের তীব্রতা ততই হ্রাস পাবে।'

দু-টি পাশাপাশি অবস্থিত হাইড্রক্সিল গ্রুপের অক্সিজেনের মধ্যে বন্ধ-দূরত্ব (Bond distance) যখন 2·5A° থেকে 2·8A° পর্যন্ত হবে, তখন হাইড্রোজেন বন্ধনী সম্ভবপর হবে অর্থাৎ একটি −OH গ্রুপের হাইড্রোজেন পরমাণু সাময়িকভাবে অপর −OH গ্রুপের অক্সিজেনের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং একটি অল্প শক্তিসম্পন্ন বন্ধনী উৎপন্ন হবে—একেই নাম হাইড্রোজেন বন্ধনী)। 5টি সদস্যবিশিষ্ট বৃত্তাকার যৌগে যখন পাশাপাশি হাইড্রক্সিল গ্রুপ অবস্থান করে, তখন ঐ যৌগের অবয়বীয় গঠনের জন্যে হাইড্রক্সিল গ্রুপগুলি দুই ভাবে থাকতে পারে—(i) একটি

1নং চিত্র
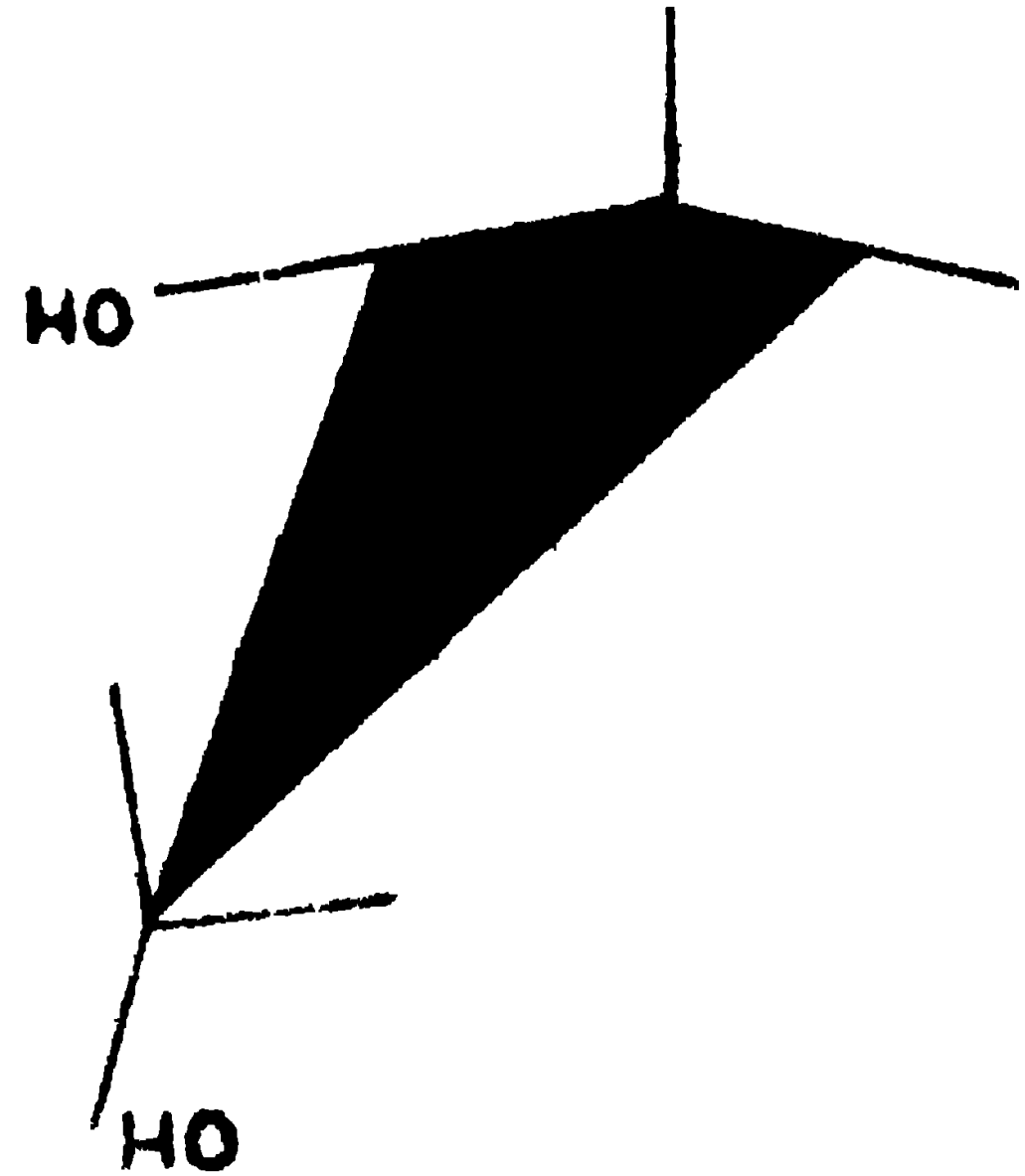
gauche (বেঁকানো) অবস্থান: এতে দুটি অক্সিজেনের দূরত্ব 2·86A°। (1নং চিত্র)।

(ii) অপরটি eclipse অবস্থান, এতে দুটি অক্সিজেনের দূরত্ব হবে 2·51A°।

−OH গ্রুপ দুটির Cis বা eclipsed অবস্থান (2নং চিত্র)।

সুতরাং শর্করা শ্রেণীতে ও বৃত্তাকার যৌগ-

---

*রসায়ন বিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা-35।

দ্রবণে দ্রবীভূত করলে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং দ্রবণে মিউটারোটেশনের সঙ্গে সঙ্গে −OH গ্রুপগুলির অবস্থান এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, বোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে অধিকতর বিক্রিয়া হয় এবং হাইড্রোজেন বন্ধনীও বৃদ্ধি পায়। আর অধিক হাইড্রোজেন বন্ধনী মিষ্টতা হ্রাস করে। অনুরূপভাবে আলফা-ডি-গ্লুকোজকে বোরিক অ্যাসিডে দ্রবণে দ্রবীভূত করলে ক্রমশঃ পরিবাহিতা কমে; অর্থাৎ হাইড্রোজেন বন্ধনী হ্রাস পায়।

গ্যালাকটোজ ও ম্যানোজকে বোরিক অ্যাসিড দ্রবণে যোগালে দেখা যায় বিটা অ্যানোমারগুলি অধিক দ্রুততায় বিক্রিয়া করে। আবার ম্যানোজ অপেক্ষা গ্যালাকটোজ দ্রুততর বেগে জটিল যৌগ গঠন করে। যেহেতু বোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করবার জন্যে পাশাপাশি দুটি Cis −OH গ্রুপই যথেষ্ট নয় (বোরিক অ্যাসিড ত্রিদন্তী [Tridentate] লিগ্যাণ্ড), সেই কারণে বিজ্ঞানী বাউন বলেন যে, তিনটি −OH গ্রুপকে জটিল যৌগ গঠনের উপযুক্ত অবস্থানে থাকতে হলে শর্করা অণুটিকে বোট ফর্মে (Boat form) থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আলফা-ডি-গ্লুকোজ দেওয়া যাক (4নং চিত্র)।

4নং চিত্র

অনুরূপভাবে বিটা-ডি-গ্যালাকটোজ এবং ম্যানোজ বোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অংশ নেবে। যার cis −OH গ্রুপের সংখ্যা বেশী, তার বোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে জটিল যৌগ গঠনের ক্ষমতা ও হাইড্রোজেন বন্ধনীর সংখ্যাও বেশী আর মিষ্টত্বের পরিমাণ কম।

অবলোহিত বর্ণালী থেকে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেন বন্ধনীর শক্তি গ্লুকোজ অপেক্ষা গ্যালাকটোজে দ্বিগুণ এবং মিষ্টত্বের তীব্রতা গ্যালাকটোজ অপেক্ষা গ্লুকোজের দ্বিগুণ।

অতএব শর্করা শ্রেণীতে অণুর গঠন (Configuration and conformation) অনেকাংশে মিষ্টত্বের জন্যে দায়ী।

পরীক্ষায় দেখা যায়, গ্লাইকলের সঙ্গে শর্করা অণুর মিষ্টতা উৎপাদনকারী অংশের পরমাণুগুলি অভিঅণবিক (Intermolecular) হাইড্রোজেন বন্ধনী তৈরি করলে মিষ্টতা হ্রাস পায়।

শালেনবার্জার শর্করার মিষ্টতা উৎপাদনকারী অংশটিকে AH এবং B—এই দুই অংশে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে A ও B উভয়ে তড়িৎ ঋণাত্মক এবং 2·5A° থেকে 4A° দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। হাইড্রোজেন পরমাণু A অথবা B যে কোন একটির সঙ্গে সমযোজ্যতায় বাঁধা যুক্ত। সুতরাং মিষ্ট স্বাদসম্পন্ন যৌগের ক্ষেত্রে

এই ধরণের নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত প্রোটনের উপস্থিতি অপরিহার্য উদাহরণ—(5নং চিত্র)।

অনুরূপভাবে গ্রাহক অণুতেও একইভাবে AH ও B এই দুটি অংশের উপস্থিতি অপরিহার্য,

AH, B, OH, CH_2OH

বিটা-ডি-ফ্রাক্টোজ

O, C, NH, S, AH, B

স্যাকারিন

Cl, C, H, AH, B

ক্লোরোফর্ম
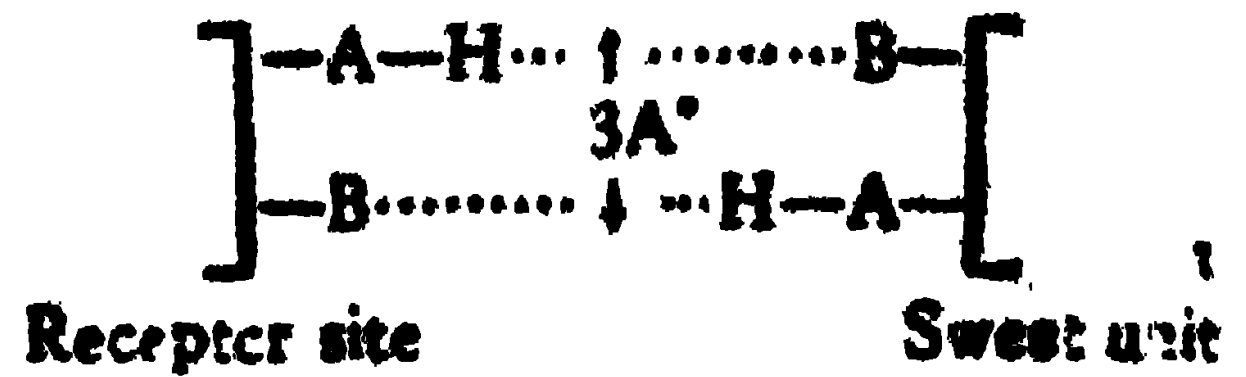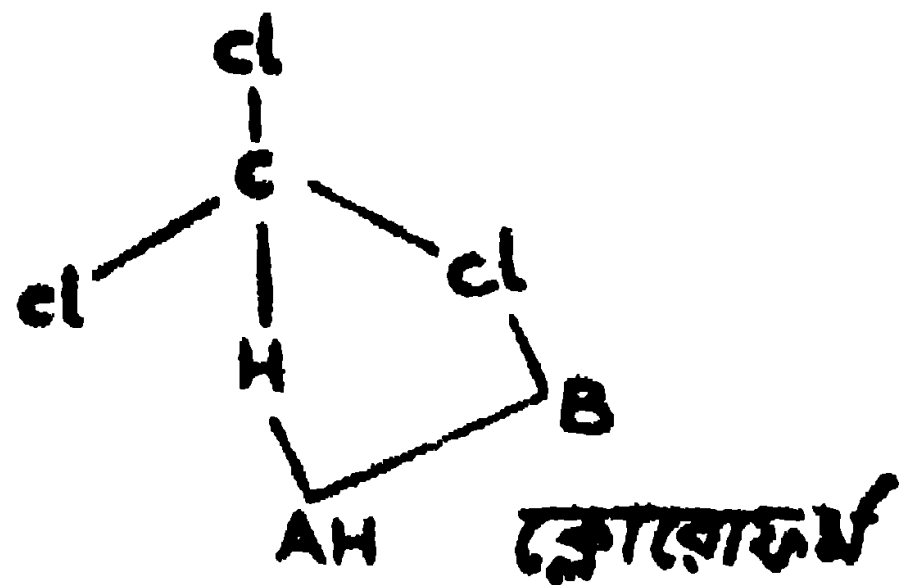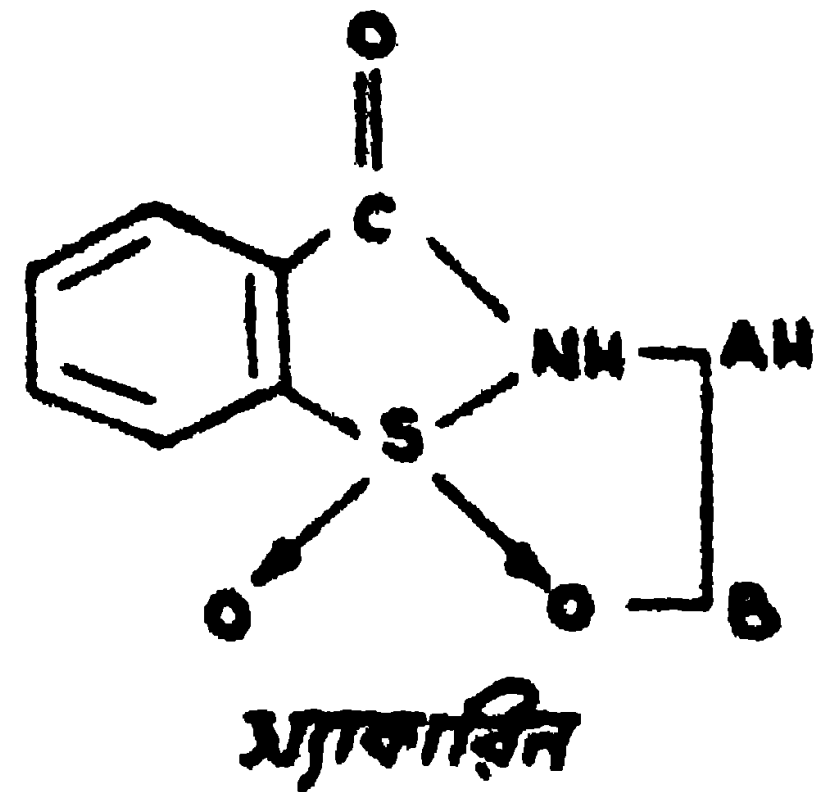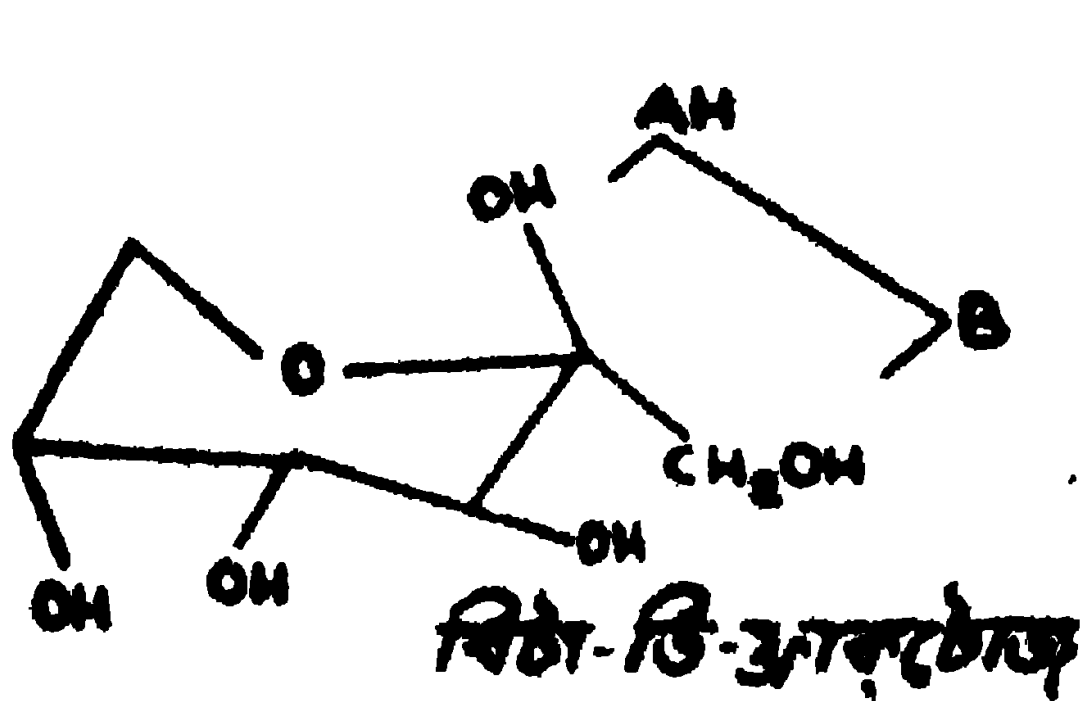
5নং চিত্র

কেন না গ্রাহক অণুর AH ও B অংশ মিষ্টতা উৎপাদনকারী অণুর AH ও B অংশের সঙ্গে একই সময়ে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী তৈরি করে—

—A—H··· ↑ ·········B—
3A°
—B········· ↓ ···H—A—

Recepter site — Sweet unit

মিষ্টি স্বাদ পেতে হলে স্বাভাবিকভাবে মিষ্টতা উৎপাদনকারী যৌগের AH, B অংশের সঙ্গে জিহ্বার স্বাদ গ্রহণকারী কোষগুলির (Taste bud receptor site) AH, B অংশের আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনী উৎপন্ন হয়, ফলে আমরা মিষ্টি স্বাদ অনুভব করি।

প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্য ও নগর-বিন্যাস

অবনীকুমার দে*

প্রাক্-সভ্যতার যুগ

মানুষ বহু হাজার বছর আগে সর্বপ্রথম গুহা থেকে বন্য বড় জন্তুদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই সেই সব গুহায় বাস করতে থাকে। তারপর থেকে গুহা-মানব ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান হয়ে ধাপে ধাপে উন্নত হতে থাকে।

তারপর মানুষ গাছের ডালপালায় তৈরি এবং গাছের পাতা ও জন্তু-জানোয়ারের চামড়া দিয়ে ঢাকা কুঁড়ে ঘরে বাস করতে শুরু করে। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হ'য়ে বসবাস করতো।

প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগে মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হলো। এই যুগগুলির এই রকম নাম করণ করা হয়েছে এই কারণে যে, এই সব বিভিন্ন যুগে মানুষ এই সব জিনিষের তৈরি যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো। সুদীর্ঘ প্রস্তর যুগকে পুরাতন, মধ্য ও নতুন—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল অসভ্য। এই সময়ে তারা দল বেঁধে মাছ ধরে ও শিকার করে তাদের খাবার সংগ্রহ করতো। সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর তারা নির্ভর করতো। প্রাকৃতিক কোনও কারণে বা তাদের মাছ ধরা বা শিকার করবার ফলে যখন এক জায়গায় খাবার ফুরিয়ে যেত, তখন তারা খাদ্যের অন্বেষণে অন্য আর এক জায়গায় চলে যেত। ফলে কোন এক জায়গায় স্থায়ীভাবে তারা বসবাস করতে পারতো না। খাবারের খোঁজে তারা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতো।

আদিম মানুষ ক্রমশঃ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হলো, আগুন জ্বালানো, কৃষিকর্ম, পশুপালন, গৃহনির্মাণ, কাপড় বোনা ও ধাতুর ব্যবহার শিখলো, আর আরম্ভ করতে লাগলো এবং নগর, শহর ইত্যাদি গড়ে তুললো।

প্রকৃতির উপর পরগাছার মত নির্ভর না করে মানুষ প্রথমে প্রকৃতির সক্রিয় সঙ্গী হতে চেষ্টা করলো। ক্রমে সে জমিতে বীজ বপন করতে শিখলো। ফলে ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্যসংস্থান হলো। পরে কেবলমাত্র নতুন নতুন ফসল ও খাদ্য ফলিয়েই সে ক্ষান্ত হলো না—প্রকৃতিতে পাওয়া যেত না, এমন সব জিনিষও সে ক্রমে তৈরি করতে শুরু করলো। শণ থেকে সে সুতো তৈরি করতে শিখলো। পরে চুন ও পাথরের ব্যবহারও শিখলো। বাসগৃহ তৈরি করবার নতুন কৌশলও সে আয়ত্ত করলো। কাদা, নল-খাগড়া বা পাথর দিয়ে তৈরি কুটীরে সে বাস করতে লাগলো। এই সব কাজে সহায়তা করবার জন্যে সে নানা রকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলো। এগুলির মধ্যে পাথর দিয়ে তৈরি কুড়ুলের মত ধারালো এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন প্রস্তর যুগের এই মানুষ কয়েক প্রকার পশুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগালো। পুরাতন প্রস্তর যুগের অসভ্য মানুষের মত তাকে খাদ্যের অন্বেষণে যাযাবরের মত আর ঘুরে বেড়াতে হতো না। কৃষি-কার্যের ফলে যখন এক জায়গার মাটির উর্বরতা শেষ হয়ে আসতো, তখন তারা সেই জমি ছেড়ে দিয়ে কাছাকাছি অন্য জমিতে সরে গিয়ে চাষ

* স্থাপত্য, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

শুরু করতো। বেশীর ভাগই তারা তাদের পুরাতন কুটিরের ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন কুটির তৈরি করতো। সাধারণতঃ তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট গ্রামে বাস করতো। অর্কনীর (Orkney) স্কারা-ব্রে (Skara-Brae) গ্রামে এই রকম একটি ছোট গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই গ্রামে সরু সরু পথ দিয়ে যুক্ত মাত্র আটটি কুটির ছিল। উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ রাশিয়ার এই সময়কার যে গ্রামগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলিতে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি করে কুটির ছিল।

জমি থেকে বাড়তি ফসল উৎপাদন করতে শেখবার ফলে ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খুবই সুবিধা হলো। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফলে গ্রামে শস্য সংরক্ষণ করবার মরাই ও শস্যাগারের প্রয়োজন হলো। শস্য, গৃহপালিত পশু, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হলো তখনকার মানুষের সম্পত্তি। ফলে শুরু হলো দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রয়োজন হলো নিজেদের আত্মরক্ষার। পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন লোকেরা মিলেমিশে এক একটি গ্রামে বাস করতে লাগলো। আত্মরক্ষার সুবিধার জন্যে উঁচু জায়গা, দ্বীপ অথবা প্রাকৃতিক কারণে আত্মরক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করে তারা সেখানে তাদের গ্রাম গড়ে তুলতো। গ্রামের চারপাশ বেড়া ও পরিখা দিয়ে ঘেরা থাকতো। গ্রামের মধ্যে তারা তাদের দেবতার পূজা করতো এবং প্রয়োজনে সবাই মিলে সমবেত হতো। ক্রমে গ্রাম তাদের ব্যবসার কেন্দ্র হয়ে উঠলো।

গ্রামের মধ্যেও আবার ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতো। গৃহপালিত পশু, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সম্পদের ভিত্তিতে গ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি গ্রামের দলপতি হয়ে ক্রমে রাজা হতো। বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবার ফলে তারা দেখলো যে, প্রতিবেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অথবা কোন কোন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত এড়াবার জন্যে—হয় তাদের পালিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে অথবা তাদের বাসস্থানকে সুরক্ষিত করে তুলতে হবে। অন্যত্র চলে যেতে হলে সঙ্গে করে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি সব কিছুই নিয়ে যেতে হয়। উর্বর জমিও তাহলে ছেড়ে চলে যেতে হয়। সুতরাং সেই স্থানেই আত্মরক্ষার জন্যে তারা তাদের গ্রামের চারদিকে বেড়া ও ক্রমে দেয়াল তৈরি করলো, পরিখা খুঁড়লো এবং এভাবে গ্রামকে সুরক্ষিত করে তুললো। এই ঘেরা স্থানের মধ্যে তারা বসবাস ও তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতো। এভাবে দেয়াল ঘেরা স্থানের মধ্যে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠলো, প্রাচীন মানুষ সেটাকে তার নিজস্ব জগৎ বলে মনে করতো।

প্রতিবেশীর সঙ্গে শত্রুতা থাকায় ও দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে খাদ্যের প্রয়োজনে প্রায়ই প্রতিবেশীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হতো এবং ক্রমে সেটা যুদ্ধে পরিণত হতো। যুদ্ধের ফলে বিজিত দলের কাছ থেকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত। বিজয়ী দল বিজিত গ্রামগুলিকে তাদের অধীনে এনে বিজিত দলের লোকদের নিজেদের গৃহপালিত পশুর মত ক্রীতদাস করে রাখতো। বিজয়ী দলপতি তখন সকলকেই শাসন করতো। ক্রমে ক্রমে এই সব সুরক্ষিত স্থানে নগর গড়ে উঠলো এবং মানুষের ইতিহাসে প্রথম নাগরিকতার পত্তন হলো। কালক্রমে এই সব দলপতিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সাম্রাজ্য পরিণত হলো এবং শাসনকর্তা হলেন রাজা এবং ক্রমে সম্রাট।

নতুন প্রস্তর যুগের পর সর্বপ্রধান আবিষ্কার হলো ধাতুবিদ্যা। নদীর উপত্যকায় যেখানে পাথর পাওয়া যেত না, সেখানে ধাতুর প্রচলন বেশী ছিল। যে সব লোকেরা ধাতুনির্মিত জিনিষপত্র তৈরি ও অন্যান্য কারিগরী কাজ

কখনো অনেক কৃষিকর্ম ও খাদ্যদ্রব্য তৈরির কাজ করতে হতো না। অবসরকালে মানুষের প্রচুর অবসর থাকায় সে ভ্রমণ করে বেড়াতো এবং তার ফলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটতো। মানুষ প্রথমে তামা ও পরে সীসা, টিন ও রূপা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখলো।

প্রাচীন সভ্যতা

প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয় পলিমাটির দ্বারা উর্বর মিশর দেশের নীল নদের উপত্যকায়, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায়, ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের উপত্যকায় ও চীনদেশে। এই সব স্থানে যথেষ্ট জল ও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত এবং যাতায়াতের খুব সুবিধা থাকায় প্রথম নাগরিকতা এখানে গড়ে ওঠে। নদীর জল দিয়ে সেই জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হতো।

মহেঞ্জোদারো

প্রাচীন মিশরের সমসাময়িক যুগে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের উপত্যকায় আগুনে পোড়ানো ইটের তৈরি বাড়ী ও স্থায়ী নগর তৈরি করা হয়েছিল। সিন্ধুসভ্যতার মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার নগরের রাস্তাঘাট সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত ছিল। বাড়ীতে ভিতরকার চত্বরের চারধারে ঘরগুলি পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট থাকতো। রাস্তার ধারে অবস্থিত বাড়ীগুলির উচ্চতা রাস্তার প্রশস্ততার উপর নির্ধারিত হতো। বেশীর ভাগ বাড়ীই হয় একতলা না হয় দোতলা উঁচু হতো। বাড়ী থেকে ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা খুব উন্নত ধরণের ছিল। বাড়ীর শৌচাগার নগরের রাস্তার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই প্রাচীন সভ্যতার বিশেষ কোন চিহ্নই আজ আর নেই।

প্রাচীন মিশর

পাঁচ ছয় হাজার বছর আগেকার প্রাচীন মিশরে মিশরীয়েরা তখন কারিগরীবিদ্যা বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছে। বাড়ী ঘর, নৌকা, পরিধেয় বস্ত্র, অলঙ্কার, আসবাবপত্র ইত্যাদি সব কিছুই তারা তৈরি করতে শিখেছে। পাথর কেটে এরা বিরাট মূর্তি খোদাই করতো। তাদের রাজা ফারাও, দেবদেবী ও পুরোহিতদের বড় বড় মূর্তিই তারা তৈরি করতো। বিরাট বিরাট পিরামিড, স্ফিংস এবং মন্দিরও তারা তৈরি করেছিল।

মিশরের নীল নদ বহু প্রাচীনকাল থেকেই যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বর্ষায় নদীর জল দু'ধার ছাপিয়ে পড়ে পলিমাটি মরুভূমির বালিকে উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করতো। এই সব কারণে খুব প্রাচীনকাল থেকেই মিশরীয়েরা নীল নদের তীরে তাদের গ্রাম, নগর ইত্যাদি স্থাপন করেছিল তারা এখানেই। রাজাদের পিরামিড, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাধি এবং পুরোহিতদের দ্বারা পরিচালিত মন্দিরগুলি তৈরি করেছিল। মিশর দেশে প্রচুর পরিমাণে পাথর পাওয়া যায় বলে মন্দির ও সমাধিগুলি নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। রাজপ্রাসাদ ও গৃহগুলি রৌদ্রপক্ব বড় বড় মাপের ইটের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

ফ্যারাওদের মৃতদেহ নীল নদের পশ্চিম পারে (যে স্থানকে বলা হতো 'মৃতদের রাজ্য') বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো ও সেখানে সমাধিস্থ করা হতো। রাজাকে সকলে ভগবানের মত শ্রদ্ধা করতো এবং সে যুগে সে সময়ে রাজা ও ভগবানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বসতবাড়ীকে মানুষের সাময়িকভাবে বাস করবার স্থান বলে মনে করা হতো এবং সমাধিস্থানকেই মনে করা হতো মানুষের চিরকালের বাসস্থান। এ জন্যেই সমাধিস্থান নির্মাণেই এত প্রাধান্য দেওয়া হতো।

প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্য

প্রধানতঃ মন্দির, পিরামিড ও অন্যান্য সমাধিগুলি প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ বর্তমান। থাম ও কড়িকাঠ (Post and beam) শৈলীই হলো এই স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। এই নিদর্শনগুলি এতই বিশালাকার যে, মনে হয় যেন এইগুলিকে চিরস্থায়ী করেই তৈরি করা হয়েছিল।

মন্দির

চিত্তাকর্ষক পথের দু-ধারে স্ফিংসের সারি। সেই পথ ধরে প্রাচীন মিশরীয় মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলতে হতো। এই স্ফিংস হলো এক অদ্ভুত কাল্পনিক জীব, যার শরীরটি হলো সিংহের মত এবং মাথাটি পুরুষ, স্ত্রীলোক, ভেড়া অথবা বাজ পাখীর মত। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দু-পাশে থাকতো দুটো বিরাট Pylon। ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমে একটি প্রশস্ত চত্বর, তারপর Hypostyle হল এবং পরে দেবতার পবিত্র কক্ষ ও তার অন্যান্য আনুষঙ্গিক কক্ষগুলি। সামনের বিরাট ও জমকালো Pylon থেকে পিছনে মন্দিরের অন্যান্য অংশগুলি যথাক্রমে পর পর বিস্তৃত এবং ক্রমশঃ উচ্চতায় নীচু হয়ে এসেছে।

ধর্মীয় মন্দিরগুলির মধ্যে অ্যামনের বিরাট মন্দির (The Great temple of Ammon, Karnak, Thebes, 1530 থেকে 323 খৃষ্ট-পূর্বাব্দ) সমস্ত প্রাচীন মিশরীয় মন্দিরের মধ্যে বৃহৎ। অনেক শতাব্দী ধরে বহু রাজা এই মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। 1200 ফুট লম্বা ও 360 ফুট চওড়া স্থান জুড়ে মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। এটির চারপাশ ঘিরে প্রাচীর ছিল কুড়ি থেকে তিরিশ ফুট প্রশস্ত।

ধর্মীয় মন্দিরের মধ্যে একটা আদর্শ মন্দির হলো কর্ণাকের খনসের মন্দির (Temple of Khons, Karnak. 1193 খৃষ্টপূর্বাব্দ)। প্রাচীন মিশরীয় মন্দির-নির্মাণ রীতি অনুযায়ী এই মন্দিরেরও সামনে প্রশস্ত পথের ধারে ছিল
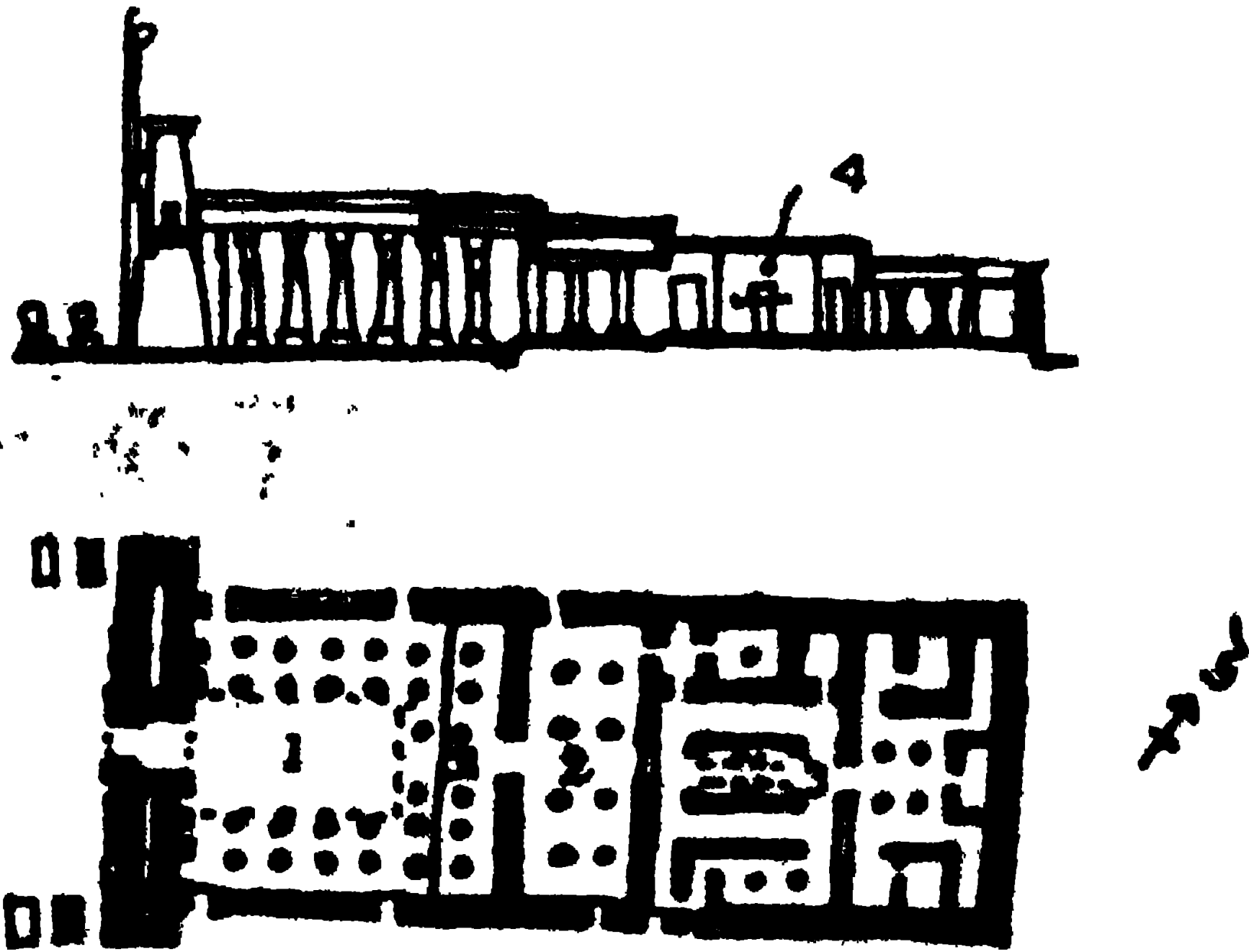
1নং চিত্র—কর্ণাকের খনসের মন্দির
1—চত্বর, 2—হাইপোস্টাইল হল, 3—দেবতার পবিত্র কক্ষ, 4—খনসের পবিত্র নৌকা

স্ফিংক্সের সারি। প্রবেশ দ্বারের পাশে দুটি বিরাট Pylon ও তাদের সামনে দীর্ঘ, চতুষ্কোণ ও সূচ্যগ্র স্তম্ভগুলি (Obelisks), তারপর প্রশস্ত চত্বর, উপর থেকে আলো আসবার বন্দোবস্ত করা Hypostyle হল এবং শেষে দেবতার পবিত্র কক্ষ ও অন্যান্য পূজাকক্ষগুলি পর পর বিন্যস্ত ছিল। সব কিছুই উঁচু ও প্রশস্ত প্রাচীর ঘেরা ছিল। এই ক্ষেত্রেও মন্দিরের সামনে থেকে পিছন দিকে অবস্থিত দেবতার কক্ষের দিকে মন্দির ও প্রাচীরের উচ্চতা ক্রমেই কমে এসেছে।

Obelisk বা চতুষ্কোণ, সূচ্যগ্র স্তম্ভগুলি ছিল হেলিওপোলিসের সূর্য-দেবতার পবিত্র প্রতীক। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সামনে ও কাছেই একসাথে এই রকম দুটি করে স্তম্ভ থাকতো। এক একটি স্তম্ভ বিরাট একটি সম্পূর্ণ গ্র্যানিট পাথর কেটে তৈরি করা হতো। এগুলিকে স্লেজগাড়ীর মত টানা গাড়ীতে ও নদীপথে বিরাট নৌকার উপর বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। তারপর যেখানে এগুলিকে খাড়া করা হবে, সেখানে মাটি দিয়ে তৈরি ঢালুতলের উপর টেনে তোলা হতো ও তারপর কাৎ করে ভিতের উপর খাড়া করা হতো। রোমক সম্রাটেরা এই রকম অনেক স্তম্ভ মিশর থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'ক্লিওপেট্রার নিডল' নামে পরিচিত স্তম্ভটি প্রথমে হেলিও-পোলিসে ছিল। এটি উচ্চতায় 68 ফুট 6 ইঞ্চি এবং এর নীচের দিকের মাপ 8 ফুট×7 ফুট 6 ইঞ্চি। এটির ওজন 180 টন। 1878 খৃষ্টাব্দে এটিকে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এখন লণ্ডন সহরের টেমস্ নদীর বাঁধের উপর এটি রাখা আছে।

পিরামিড

প্রাচীন মিশরীয়েরা মৃত্যুর পরেও জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। সে জন্যে মৃত্যুর পরেও যাতে মৃতদেহ বহুদিন পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে, সে রকম ভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমত স্থায়ী কবর তৈরি করতো। চিরকালের মত ব্যবহারের জন্যে মৃতের সব কিছু পার্থিব প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তাঁরা মৃতদেহের সঙ্গে কবরে রেখে দিতো। মৃত ব্যক্তিদের আত্মা ফিরে আসবার জন্যে পিরামিডে রক্ষিত তাঁর মমিকে সুরক্ষিত করে রাখা হতো।

প্রাচীন মিশরীয়দের সমাধি সাধারণতঃ তিন প্রকার ছিল: যথা—মাস্তাবা (Mastaba), রাজকীয় পিরামিড ও পাহাড়ের গায়ে পাথর কাটা সমাধি।

সব পিরামিডগুলির মধ্যে কায়রোর কাছে গীজের (Gizeh) তিনটি পিরামিড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো Cheops (Khufu)-এর বিরাট পিরামিড। খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরেরও আগের তৈরি এই পিরামিড। মূলতঃ এটি ছিল 480 ফুট উঁচু। 13 একর জায়গা জুড়ে এই পিরামিডটি দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যানে এটি বর্গাকার এবং এর প্রত্যেক দিক 756 ফুট লম্বা। এর চারটি পাশ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। উত্তর দিকে মাটি থেকে 55 ফুট উঁচুতে ভিতরে যাবার প্রবেশ দ্বার। এখান থেকে পিরামিডের ভিতরে একটি পথ নীচের দিকে নেমে গেছে। কিছু দূর নেমে যাবার পর পথটি আবার উপরের দিকে উঠে গেছে ও Grand Gallery-তে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই গ্যালারী 7 ফুট চওড়া ও 7 ফুট 6 ইঞ্চি উঁচু। এই গ্যালারীর শেষে রাজার মৃতদেহ রাখবার কক্ষ। এই কক্ষ থেকে 8 ইঞ্চি×6 ইঞ্চি মাপের দুটি ছোট সুড়ঙ্গ পিরামিডের বাইরে পর্যন্ত চলে গেছে। বায়ু চলাচল করা এবং খুব সম্ভব মৃত রাজার আত্মা যাতে সহজেই পিরামিডের মধ্যে প্রবেশ করতে

ছোট চত্বরের চারধারে কয়েকটি ছোট ঘর বিস্তৃত থাকতো। রান্না ও গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ ওখানেই করা হতো। হয়তো কারিগরেরা তাদের কারুকর্মও ওখানেই করতো।

গরম আবহাওয়ার জন্যে বাড়ীতে ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় থাকা ও শোবার বন্দোবস্ত ছিল। সকলে খোলা ছাদে থাকা ও শোয়া খুবই পছন্দ করতো। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ী খুবই প্রশস্ত ছিল এবং সেখানে প্রচুর দামী আসবাবপত্র থাকতো। এই সব বাড়ীর ছাদে বহু অর্থব্যয়ে সুন্দর বাগান তৈরি করা হতো। এই বাগানের উপর শামিয়ানা দিয়ে ঢাকা থাকতো। বাড়ীর ভিতরের ঘরগুলিকে কিছুটা ঠাণ্ডা রাখবার উদ্দেশ্যে ছাদ থেকে হাওয়া চলাচল করবার জন্যে এক রকম বন্দোবস্ত থাকতো। রাত্রিবেলায় হয়তো বাড়ীতে জলিত তেলের বাতি জ্বালানো হতো। শীতের সময় প্রয়োজনীয় উত্তাপ পাবার জন্যে জলন্ত কাঠকয়লা পাত্রে রাখা হতো।

নগরের সাধারণ বাড়ীগুলি প্রধানতঃ রৌদ্র-শুষ্ক ইঁট দিয়েই তৈরি হতো। প্রাচীন মিশরীয়েরা সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী ছিলেন। অনুমান করা হয় যে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহ পাথর দিয়ে তৈরি করা হতো এবং পাথরের দেয়ালের উপর প্লাস্টার করা থাকতো। বাড়ীর বাইরের দেয়ালের বহির্ভাগ এভাবে আবহাওয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা করা হতো।

নগর-বিন্যাস

প্রাচীন মিশরীয়েরা ফ্যারাওদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতো। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে যে সব নগর তারা গড়েছিল, সেগুলি ফ্যারাওদের আদেশ অনুসারেই তৈরি হয়েছিল। রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাধিস্থান—বিরাট পিরামিডগুলির নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত কারিগর ও ক্রীতদাসদের বসবাসের জন্যেই এই নগরগুলি তৈরি করা হয়েছিল। নগরের বাড়ীগুলি রৌদ্রশুষ্ক ইটের তৈরি ছিল। বাড়ীতে সকলের ব্যবহারের জন্যে চত্বরের চারধারে ছোট ছোট ঘরগুলি ঘেঁষাঘেঁষি করে বিস্তৃত ছিল। বাড়ীতে যাতায়াত করবার গলিগুলি ছিল সরু। খোলা নর্দমা দিয়ে ময়লা জল নিষ্কাশিত করা হতো। নগরের চারধারে ছিল প্রাচীর। সম্রাট ছিলেন শক্তিশালী এবং তাঁর সাম্রাজ্যও ছিল বড়। সুতরাং মনে হয় যে, আক্রমণকারী শত্রুর হাত থেকে নগরকে রক্ষা করবার জন্যে নগর-প্রাচীর তৈরি করা হয় নি। বর্ষার সময় প্রধানতঃ নদীর বন্যা থেকে নগরকে রক্ষা করবার জন্যেই খুব সম্ভব এই প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে মিশরীয় রাজারা নীল নদের ধারে বড় বড় মন্দির-নগরী তৈরি করিয়েছিলেন। মেম্ফিস (Memphis), থিব্‌স্ (Thebes) ও টেল-এল-অমরনাতে সুপ্রশস্ত রাস্তা, বিশাল মন্দির চত্বর এবং পাথর কেটে তৈরি করা সমাধিস্থানের ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলি তদানীন্তন রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার সাক্ষ্য দেয়। এই সময়কার সাধারণের বসবাসের জন্যে তৈরি নগরের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। থিব্‌স্-এ স্ফিংক্সের সারের রাস্তা ছিল সুপ্রশস্ত এবং টেল-এল-অমরনার মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল আধ মাইল লম্বা ও ¼ মাইল চওড়া। এই সব নগরে মনে হয় বস্তিও ছিল।

কাহুন (Kahun)

প্রায় 3000 খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন মিশরে ইল্লাহুন (Illahun) পিরামিডের নির্মাণ কাজে নিযুক্ত কারিগর ও ক্রীতদাসদের বসবাসের জন্যে কাহুন নগর তৈরি করা হয়েছিল। নগরের রাস্তা-ঘাট Grid-iron বা দাবার ছক প্রণালীতে বিন্যস্ত ছিল না। কেবলমাত্র লম্বা লম্বা সমান্তরাল

রাস্তাই নগরে ছিল। নগরের প্রত্যেক রাস্তায় একই ধরণের বাড়ী ছিল। ছোট ছোট কুঠুরীগুলি পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট এবং বড় বড় আয়তাকার অংশে বিভক্ত ছিল। কুঠুরীগুলির সামনে দিয়ে যাতায়াতের জন্যে সরু গলি ছিল। বাড়ীতে কোন বাগান ছিল না, কিন্তু যতই ছোট হোক না কেন, প্রত্যেক বাড়ীতেই খোলা উঠান থাকতো। সাধারণ শ্রমিকের বাড়ীতে উঠান ছাড়া কমপক্ষে তিনটি ঘর থাকতো। অন্যান্য বাড়ীতে চারটি, পাঁচটি—এমন কি, ছয়টি পর্যন্ত ঘর থাকতো এবং সম্ভবতঃ উপর তলায় কয়েকটি চালাঘরও থাকতো।

নগরের ডানদিকের উপরের দিকে নগরের প্রায় এক-চতুর্থ অংশে প্রশস্ত ধরের অনেকগুলি বাড়ী ছিল। এই থেকে মনে হয় এই বাড়ীগুলি বোধ হয় উচ্চশ্রেণীর লোকদের বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। অপেক্ষাকৃত বড় সব বাড়ী দোতলা সমান উঁচু হতো এবং উপরে যাবার জন্যে সিঁড়ি থাকতো। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রাসাদে পঞ্চাশেরও উপর ঘর এবং পাঁচটি পর্যন্ত হলঘর থাকতো। এই সব প্রাসাদ প্রায় দু-বিঘা জমির উপর বিস্তৃত ছিল। অধ্যাপক পেট্রির মতে একটি পিরামিড তৈরি করতে এক লক্ষ শ্রমিক ও দু-হাজার কুশলী রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন হতো।

কালক্রমে মাটির তৈরি বাড়ীর এই সব নগরগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে।

টেল-এল-অমরনা (Tel-el-Amarna)

কায়রোর আরও এক হাজার বছরেরও পরে সম্রাট আখেনাটেন (Akhenaten) থিব্‌স শহরের দু-শ' মাইল উত্তরে নতুন রাজধানী তৈরি করান। এই শহর সুপরিকল্পিত ছিল না এবং খুব তাড়াহুড়া করে এই শহর তৈরি করা হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই রাজধানী ও রাজকীয় সমাধিগুলি তৈরির কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের বাসের জন্যে টেল-এল-অমরনা নামে একটি আদর্শ গ্রাম তৈরি হয়েছিল। রাজধানীর কয়েক মাইল পূর্বে এই গ্রামটি অবস্থিত ছিল। স্যার লিওনার্ড উলী বলেছেন যে, চারদিকে প্রাচীর ঘেরা এই গ্রামটি ছিল বর্গাকার। এই গ্রামটি খুবই নিখুঁতভাবে বিভক্ত ছিল এবং সমস্ত গ্রামটিতে একই রকমের বিন্যাসনীতি অনুসৃত হয়েছিল। সমস্ত গ্রামটি বাড়ীতে ভর্তি ছিল। উত্তর-দক্ষিণমুখী সরু সরু সমান্তরাল রাস্তাগুলির দু-ধারে ছোট ছোট বাড়ীগুলি সারিবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বাড়ীর সামনের দিকে ছিল বসবার ঘর ও রান্নাঘর এবং বাড়ীর পিছনের দিকে ছিল শোবার ঘর।

প্রাচীন মিশরীয় শহর-বিন্যাসের কোন নিদর্শন যদিও পাওয়া যায় নি, তবুও সেই সময়কার স্থাপত্যের বিরাট বিরাট নিদর্শন (যথা পিরামিড, মন্দির ইত্যাদি) দেখে মনে হয় যে, সেই সময়ের তৈরি শহরও নিশ্চয়ই প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের বিশালতার উপযোগী বেশ বড় ও সুবিন্যস্ত ছিল। অ্যামন-এর শহর থিব্‌স-এর এক শতটি প্রবেশ দ্বার ছিল। এই শহরের কোন চিহ্নই আর এখন নেই।

ধাতব বন্ধনী

ললিতা পত্রী*

পৃথিবীর অধিকাংশ মৌল ধাতু। ধাতুর স্ফটিকে পরমাণুসমূহ যে বিশেষ ধরণের বন্ধনী দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে, তাকেই বলা হয় ধাতব বন্ধনী। ধাতব পদার্থে আয়নী (Ionic) বন্ধনীর উপস্থিতি সম্ভব নয়। ধাতুতে পরমাণুসমূহের পারস্পরিক আকর্ষণী শক্তির মান ভ্যান ডার ওয়ালস আকর্ষণী শক্তির মানের তুলনায় বহু গুণ বেশী; কাজেই ভ্যান ডার ওয়ালস আকর্ষণের জন্যে পরমাণুসমূহ পরস্পর সংবদ্ধ তাও বলা যায় না। তাহলে দেখা যায় আর মাত্র সমযোজী বন্ধনীর সম্ভাবনা এক্ষেত্রে থাকতে পারে। কিন্তু ধাতব স্ফটিকে একটি পরমাণু সাধারণতঃ 8টি বা 12টি নিকটতম প্রতিবেশী পরমাণুর দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং এতগুলি নিকটতম প্রতিবেশী একটি মাত্র পরমাণুর সঙ্গে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক (Normal) সমযোজী বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং ধাতব পরমাণুসমূহ পরস্পরের প্রতি এক বিশেষ ধরণের আকর্ষণবশতঃ সংযুক্ত বলা যায়।

নিঃসঙ্গ (Isolated) ধাতব পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন পরমাণুটির কেন্দ্রক প্রভাবিত ক্ষেত্রে যাতায়াত করে, কিন্তু কোন ধাতব স্ফটিকে কোন একটি পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন ঐ বিশেষ পরমাণুটির কেন্দ্রক প্রভাবিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ধাতুখণ্ডের সমস্ত পরমাণুর কেন্দ্রকসমূহের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষেত্রে যাতায়াত করে। ধাতব স্ফটিকের পরমাণু ও নিঃসঙ্গ ধাতব পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রনসমূহের স্বভাবের এই পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়। অধিকাংশ ধাতব স্ফটিক এমনভাবে কেলাসিত হয় যে, ধাতব স্ফটিক পরমাণুসমূহের এক আদর্শ সুসংবদ্ধ বিন্যাস ঘটে। ধাতব স্ফটিকগুলি অন্যান্য স্ফটিকের মতই নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট এবং ধাতুর উপর এক্স-রশ্মির পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে, ধাতব পরমাণুসমূহের সম্ভবপর নিকটতম (Closest) সন্নিবেশের (Packing) ফলে তিন প্রকার ধাতব স্ফটিক পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ ধাতু তলকেন্দ্রী ঘনকীয় আকৃতি (Face centred cubic lattice) বা ঘনবদ্ধ ষড়্কোণী আকৃতিবিশিষ্ট (Close packed hexagonal) হয়ে কেলাসিত হয়। কিছু স্ফটিককে অন্তঃকেন্দ্রী ঘনকীয় আকৃতি-বিশিষ্ট (Body centred cubic lattice) হয়েও কেলাসিত হতে দেখা গেছে। অন্তঃকেন্দ্রী ঘনকে প্রত্যেকটি পরমাণুর 14টি প্রতিবেশী পরমাণুর দ্বারা ঘেরা থাকে। এই 14টির মধ্যে 8টির সঙ্গে আন্তঃপারমাণবিক দূরত্বের (R) ব্যবধান সর্বাপেক্ষা কম এবং আর 6টি থাকে 1.15R দূরত্বে। তলকেন্দ্রী ঘনকে এবং ঘনবদ্ধ ষড়্কোণে প্রতিটি পরমাণু সমদূর (Equidistant) 12টি প্রতিবেশী পরমাণুর দ্বারা বেষ্টিত। নিকটতম প্রতিবেশী পরমাণুর সংখ্যাকে বলা হয় ধাতব স্ফটিকে পরমাণুর সমবায় (Coordination) সংখ্যা। অন্তঃকেন্দ্রী ঘনকীয় আকৃতিতে পরমাণুর সমবায় সংখ্যা 8 এবং ঘনবদ্ধ ষড়্কোণ ও তলকেন্দ্রী ঘনকের বেলায় 12।

ধাতুর প্রত্যেকটি পরমাণু তার নিকটতম প্রতিবেশী পরমাণুসমূহের সঙ্গে সমযোজী বন্ধনী তৈরি করে কিন্তু বন্ধক (Bonding) ইলেকট্রনের

* রসায়নবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, কলিকাতা-6

সংখ্যার তুলনায় বন্ধন কক্ষের (Orbital) সংখ্যা বেশী, কারণ প্রতিবেশী পরমাণুর সংখ্যা পরমাণুটির যোজ্যতা ইলেকট্রনের সংখ্যার তুলনায় বেশী। পাউলিং (Pauling) তত্ত্বানুসারে, এর ফলে লভ্য (Available) আন্তঃপারমাণবিক অবস্থানগুলির (Interatomic positions) মধ্যে সহযোজী বন্ধনীগুলি অনুকম্পিত হয়। অনুকম্পনের (Resonance) জন্যেই ধাতবিক সহযোজী বন্ধনীর অস্তিত্বের অনুমান করা যেতে পারে এবং সম্ভবপর সকল সমতুল পরমাণু যুগ্মের মধ্যে (Between all the possible equivalent pairs of atoms) এই বন্ধনীগুলির অনুকম্পন সম্ভব।

ক্ষার ধাতুসমূহ, ভ্যানাডিয়াম, নায়োবিয়াম, ট্যান্টালাম এবং মলিবডেনাম ওজনকেন্দ্রী ঘনকীয় জাফ্রি বিশিষ্ট স্ফটিকাকারে কেলাসিত হয়। এসব স্ফটিকে একটি পরমাণুর ৪টি প্রতিবেশী থাকে। সোডিয়াম ধাতুর কথা ধরা যাক। সোডিয়াম পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন একটি; প্রতিবেশী পরমাণুর সংখ্যা 8; অর্থাৎ 1টি পরমাণুকে ৪টি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে যুক্ত থাকতে পারে? ধরা যাক, পরমাণুটি প্রথম প্রতিবেশীর সঙ্গে কোন এক সময় একটি দৈত ইলেকট্রন বন্ধনী তৈরি করতে পারে। অনুরূপভাবে আর কোন সময় দ্বিতীয় প্রতিবেশীর সঙ্গেও দৈত ইলেকট্রন বন্ধনী তৈরি করতে পারে, পারে তৃতীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে, পারে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম প্রতিবেশীর সঙ্গেও। কিন্তু একটি পরমাণু একটিমাত্র প্রতিবেশীর সঙ্গেই বন্ধনী তৈরি করতে সক্ষম, অন্ত সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে একযোগে নয়; অর্থাৎ বন্ধনীটি কোন সময় থাকছে পরমাণু ও প্রথম প্রতিবেশীর মধ্যে, কোন সময় থাকছে পরমাণু ও দ্বিতীয় প্রতিবেশীর মধ্যে, কোন সময় বা পরমাণু ও অন্ত (তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমের যে কোন একটি ধরা যাক) যে কোন প্রতিবেশী পরমাণুর মধ্যে। বন্ধনীর এই চলমান অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে অনুকম্পনের জন্যেই।

সোডিয়াম ধাতুর স্ফটিককে দৈত ইলেকট্রন বন্ধনীর বিন্যাস এভাবেও দেখানো যেতে পারে,

Na—Na   Na   Na $\overline{\text{Na}}$—Na
            | | |
Na—Na   Na   Na   Na Na^{+}
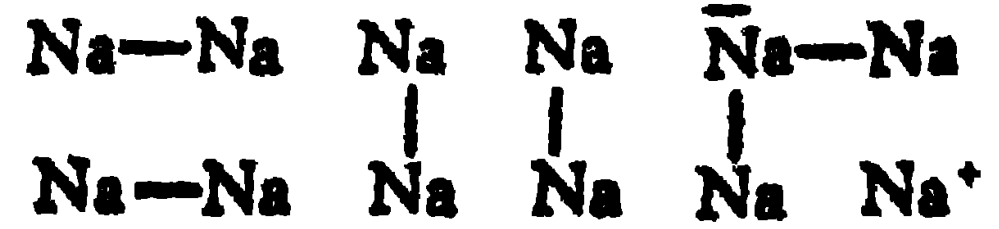
অর্থাৎ, এই গঠনগুলি (Structures) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এমনও সম্ভব হতে পারে যে, একটি পরমাণু একই সময়ে দুটি পরমাণুর সঙ্গে দুটি বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত এবং আর একটির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও স্থির তড়িদাকর্ষণবশতঃ কাছাকাছিই থাকছে। এর ফলে ধাতব বন্ধনীর প্রকৃতি খানিকটা আয়নী, খানিকটা সহযোজী ধরণের দেখা যায়। উপরের অনুকম্পায়ী (Resonating) গঠনগুলি থেকে $\overline{\text{Na}}$ গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি অতিরিক্ত বন্ধনী তৈরি করবার জন্যে Na পরমাণুকে যখন একটির পরিবর্তে দুটি ইলেকট্রনকে স্থান দিতে হয়, তখন Na^{-} উৎপন্ন হতে পারে। এই Na^{-} অতি অবশ্যই অতিরিক্ত কক্ষের অধিকারী এবং এই কক্ষকেই তথাকথিত ধাতব কক্ষ (Metallic orbital) বলা হয়। পাউলিং-এর মতে, সোডিয়াম এবং অন্যান্য ধাতুসমূহের তিন-চতুর্থাংশ পরমাণুর স্বাভাবিক কক্ষ ছাড়াও এই অতিরিক্ত কক্ষ থাকে। স্বাভাবিক কক্ষগুলি অসংশক্ত (Unshared) বা বন্ধক (Bonding) ইলেকট্রনের দ্বারা অধিকৃত এবং অনুকম্পনের জন্যে এই অতিরিক্ত কক্ষ বা ধাতব কক্ষই বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধাতব স্ফটিক অনুকম্পন সমৰ্থ গঠনটির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং স্ফটিকটি এই অনুকম্পনের জন্যেই স্থায়িত্ব লাভ করে। শূন্য কক্ষগুলি (Empty orbitals) তড়িৎ-ক্ষেত্রের

প্রভাবে ইলেকট্রনগুলিকে সহজেই তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেয়। ফলে, ধাতুর তড়িৎ-পরিবাহিতা দেখা যায়।

ধাতুর বিশেষ তড়িৎ-পরিবাহিতা ও প্রায় সম্পূর্ণ আলোক প্রতিফলনের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গেলে ধরে নিতে হয় যে, ধাতুতে প্রচুর মুক্ত (Free) ইলেকট্রন আছে। এ জন্যে ধাতব বন্ধনীর প্রথম তত্ত্বে বলা হয়েছিল যে, ধাতব ক্ষটিকের কাঠামো আসলে ধাতব আয়নের দ্বারা গঠিত এবং যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলি কোন একটি বিশেষ পরমাণুর প্রভাবমুক্ত। সমগ্র ধাতব কাঠামো দ্বারা নির্দিষ্ট তথাকথিত এই মুক্ত ইলেকট্রনের ধর্ম একটি নির্দিষ্ট আয়তনে বদ্ধ গ্যাসাণুর মত। এই তত্ত্বের ধাতব পরিবাহিতার একটি সহজবোধ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে এই ইলেকট্রন গ্যাস (Electron gas theory) তত্ত্বের একটি বিশেষ ত্রুটি ধরা পড়ে। এই তত্ত্বানুসারে এই ইলেকট্রনগুলির শক্তি ম্যাক্সওয়েল-বোল্ৎস্ম্যান বিতরণ (Distributi.)n) সূত্রানুযায়ী বিতরিত হয় এবং প্রতিটি ইলেকট্রন, ধাতুর আপেক্ষিক তাপের জন্যে $\frac{3}{2}kT$ পরিমাণ তাপ সরবরাহ করে (k=বোল্ৎস্ম্যান ধ্রুবক)। ধাতুর অন্তর্ভুক্ত পরমাণুগুলির তাপীয় স্পন্দনের জন্যে $\frac{6}{2}R$ পরিমাণ তাপ পাওয়া যায় এবং এটিই ধাতুর পারমাণবিক তাপ। কিন্তু ইলেকট্রন গ্যাস তত্ত্ব অনুসারে আরও $\frac{3}{2}R$ পরিমাণ তাপ পাওয়া যায় ইলেকট্রনের জন্যে। ফলে ধাতুর পারমাণবিক তাপ এই তত্ত্বানুযায়ী হওয়া উচিত $\frac{9}{2}R$। ডুলং ও পেটিটের পরীক্ষালব্ধ ফলের দ্বারা জানা যায় যে, ধাতুর পারমাণবিক তাপের পরিমাণ প্রায় $\frac{6}{2}R$। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইলেকট্রনের উপর ধাতুর আপেক্ষিক তাপ নির্ভর করে না। অতএব ক্লাসিক্যাল ইলেকট্রন গ্যাস তত্ত্বের কিছু সংশোধন অতি আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়।

1928 সালে সোমারফেল্ড এই সংশোধনে প্রয়াসী হলেন। তাঁর মতে, ফের্মি-ডিরাক বিতরণ সূত্রানুযায়ী ইলেকট্রনগুলির শক্তি বিভক্ত হয়। তিনি বললেন—প্রতিটি ধাতব শক্তিস্তরে (Metallic energy levels) বিপরীত স্পিনযুক্ত দুটি মাত্র ইলেকট্রন থাকতে পারে (তুলনীয়, পাউলির সূত্র)। কিন্তু ক্লাসিক্যাল ম্যাক্সওয়েল-বোল্ৎস্ম্যান তত্ত্বে কোন শক্তিস্তরেই ইলেকট্রনের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয় নি। শক্তিস্তরগুলির ব্যবধান তাপশক্তি kT-র তুলনায় বেশী হলে ক্লাসিক্যাল ভাবে সমস্ত ইলেকট্রনগুলিকে শক্তির সর্বনিম্ন স্তরে থাকতে হতো এবং শূন্য পরম তাপমাত্রায় ইলেকট্রন গ্যাসের শক্তি হতো শূন্য। ফের্মি ডিরাক সূত্রানুযায়ী ইলেকট্রনগুলি উচ্চতর শক্তিস্তরগুলিতে বিভক্ত হলো, কারণ শক্তির শূন্য স্তরে দুটির বেশী ইলেকট্রনের থাকবার অধিকার নেই এবং প্রত্যেক ইলেকট্রনযুগ্ম ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শক্তিস্তরগুলির অধিকারী হয়। ফলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বাড়াবার জন্যে এই তত্ত্বানুসারে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বানুযায়ী যে শক্তি লাগবার কথা ছিল, তার তুলনায় কম লাগে। যেহেতু এই নতুন তত্ত্বানুযায়ী সর্বোচ্চ শক্তিস্তরস্থিত ইলেকট্রন দুটিই আপেক্ষিক তাপের অতি সামান্য ফেরফের ঘটাতে পারে, অতএব ইলেকট্রনীয় আপেক্ষিক তাপ শূন্য ধরা যেতে পারে। সুতরাং ধাতুর পারমাণবিক তাপের পরিমাণ $\frac{6}{2}R$ থাকছে।

ধাতব ক্ষটিকগুলি নিঃসঙ্গ ধাতব পরমাণু অপেক্ষা অধিক স্থায়ী, কারণ ক্ষটিকে যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলি একাধিক কেন্দ্রক প্রভাবিত তড়িৎ-ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ। এই ধারণাটি থেকে বলা সম্ভব যে, ধাতুগুলিতে অনাঞ্চলিক (Delocalised) বা বহুকেন্দ্রী (Multicentred) বন্ধনীর চরম বিকাশ দেখা যায়। সাধারণতঃ একটি ইলেকট্রন-যুগ্ম দুটি পরমাণুকে বন্ধন করে। কিন্তু একটি ইলেকট্রনযুগ্মের দ্বারা দুইয়ের বেশী পরমাণুর বন্ধন

সম্ভব হলে এই বন্ধনীকে অনাঞ্চলিক বা বহু-কেন্দ্রী বন্ধনী বলা হয়। বহুকেন্দ্রী বন্ধনীর বিকাশ কিভাবে হয় দেখাবার জন্যে একটি একমাত্রিক লিথিয়াম কেলাস গঠন করবার কথা ভাবা যাক। দ্বিপরমাণুক Li_2 গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এই চিত্রটিতে পৃথক পৃথক লিথিয়াম পরমাণু দুটিতে এবং একত্রীভূত Li_2 অণুটিতে একটি ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক শক্তি এবং সামগ্রিক শক্তি কিভাবে বিভক্ত,
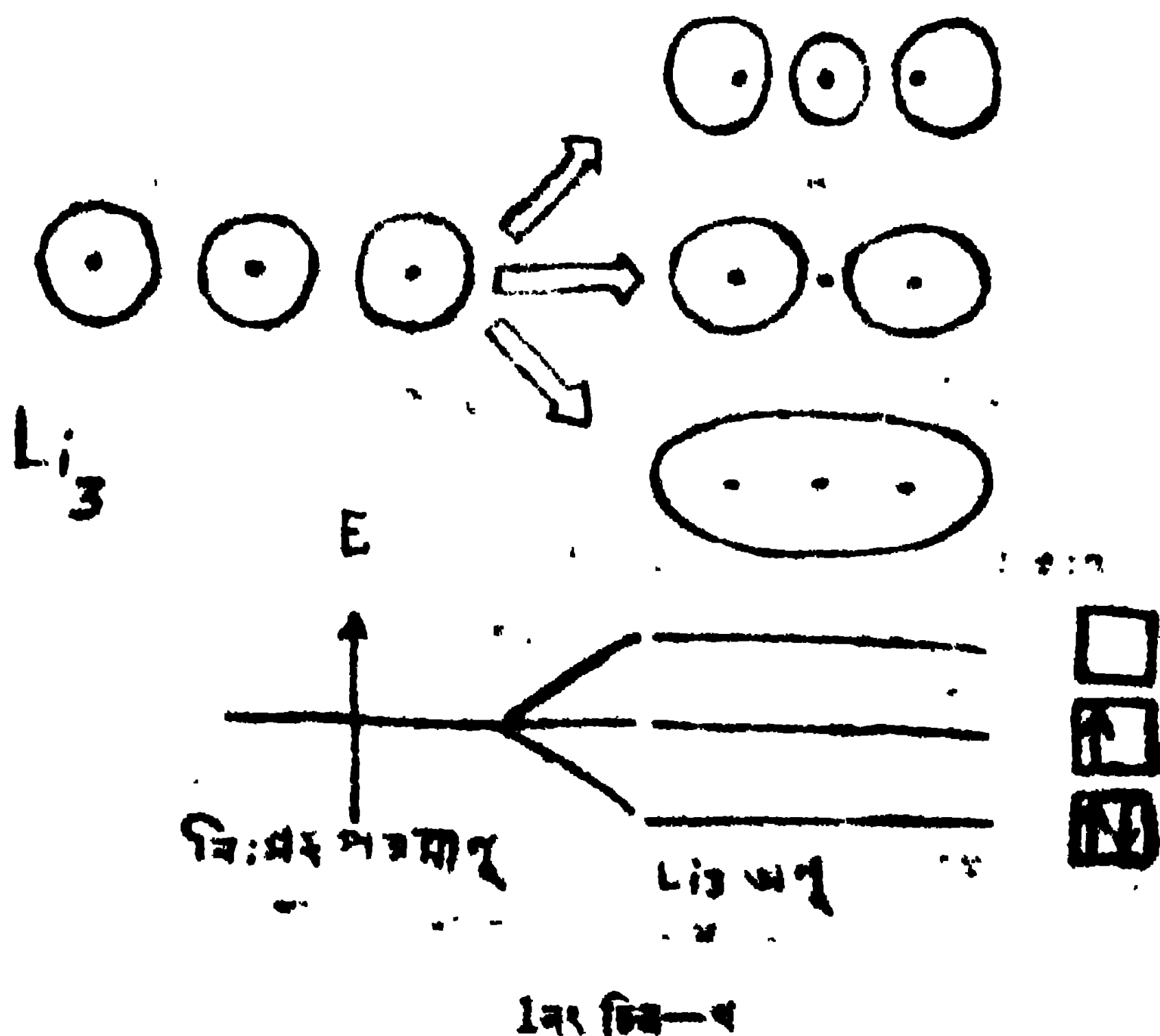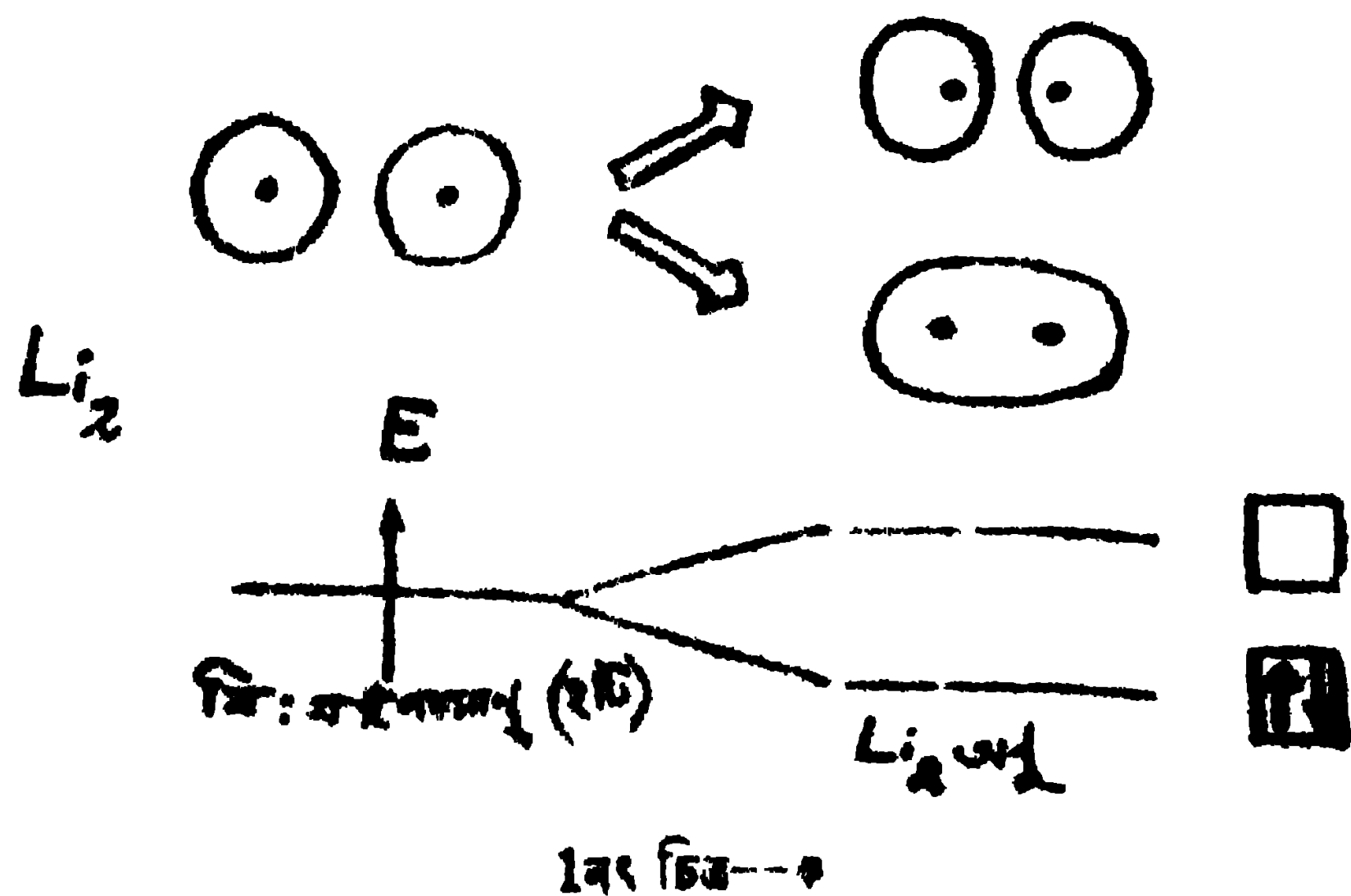
1নং চিত্র—ক

1নং চিত্র—খ

1নং চিত্র—(ক) ও (খ)—দ্বিপরমাণুক ও ত্রিপরমাণুক লিথিয়াম অণুকণের নির্মাণ এবং নির্মাণকালীন শক্তি পরিবর্তন।

মনে করা যাক, কেলাসটি একের পর এক লিথিয়াম পরমাণু এনে গঠন করা হচ্ছে।

1নং চিত্র (ক)-এ দুটি লিথিয়াম পরমাণু থেকে তা দেখানো হয়েছে। পরমাণু দুটিকে কাছাকাছি আনবার পর পরমাণু 2s ইলেকট্রনগুলির শক্তিস্তরগুলি দুটি নূতন শক্তিস্তরে বিভক্ত হয়। এই

শক্তিস্তর দুটি $\sigma 2s$ এবং $\overset{*}{\sigma}2s$। $\sigma 2s$ হচ্ছে বন্ধন অণুকক্ষ (Bonding orbital) এবং $\overset{*}{\sigma}2s$ হচ্ছে প্রতিবন্ধন (Antibonding) অণুকক্ষ। দ্বিপরমাণুক লিথিয়ামে ইলেকট্রনগুলি $\sigma 2s$ অণুকক্ষে থাকে, কিন্তু $\sigma 2s$ বা $\overset{*}{\sigma}2s$ অণুকক্ষেই থাকুক না কেন, যে কোন ইলেকট্রনই সমগ্র অণুটির সম্পত্তি। অপরপক্ষে, 1s ইলেকট্রনগুলির বিশেষ বিশেষ পরমাণুর সন্নিকটে আঞ্চলিক অবস্থিতি দেখা যায়, কারণ এই ইলেকট্রনগুলির সামগ্রিক শক্তি দুটি পরমাণুর মাঝে বিদ্যমান স্থিতিশক্তির বাধা (Potential energy barrier) অতিক্রম করতে সমর্থ নয়। সামগ্রিক শক্তি-বাধা (Barrier) স্থিতিশক্তির তুলনায় কম বলেই এটা সম্ভব।

1নং চিত্র (খ)-এ তিনটি লিথিয়াম পরমাণু একত্রে আনা হলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় দেখানো হয়েছে। এখানে তিনটি অণুকক্ষ থাকা সম্ভব এবং তিনটি অণুকক্ষ আছেও। যে কোন অণুকক্ষে থাকা ইলেকট্রন সমগ্র অণুটির সম্পত্তি এবং তা বিশেষ কোন পরমাণুর এক্তিয়ারভুক্ত নয়। যখন যাতে N সংখ্যক অণুকক্ষ সৃষ্টি হয় এবং এদের অণুকক্ষের শক্তি অত্যল্প ব্যবধানবিশিষ্ট ঘনবদ্ধ শক্তিস্তরগুচ্ছে (Closely spaced energy band) বিভক্ত হয়। অনুরূপভাবে, 2p পরমাণু-কক্ষের সম্মিলনের ফলে আরও অণুকক্ষ সৃষ্টি হয় এবং এদের অণুকক্ষের শক্তিও একটি ঘনবদ্ধ শক্তিস্তর-গুচ্ছে বিভক্ত হয়। এই শক্তিস্তরগুচ্ছ আগের অর্থাৎ 2s পরমাণুকক্ষ সম্মিলনজাত অণুকক্ষের শক্তিস্তরগুচ্ছের সঙ্গে মিশ্রিত যুক্ত। এই সকল অণুকক্ষস্থিত যে কোন ইলেকট্রনই সমগ্র স্ফটিকটির সম্পত্তি এবং এই সকল ইলেকট্রনই একত্রে বহু কেন্দ্রককে একটি স্ফটিক খণ্ডে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়। এজন্যেই বলা যায় যে, ধাতু-গুলিতেই বহুকেন্দ্রী বন্ধনের চরম বিকাশ দেখা যায়।

একমাত্রিক লিথিয়াম স্ফটিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই মোটামুটি ধারণাটি ত্রিমাত্রিক স্ফটিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, স্বাধীন পরমাণুর সমস্ত যোজ্যতাকক্ষ-গুলি একটি বাস্তব স্ফটিকে একগুচ্ছ অনাঞ্চলিক
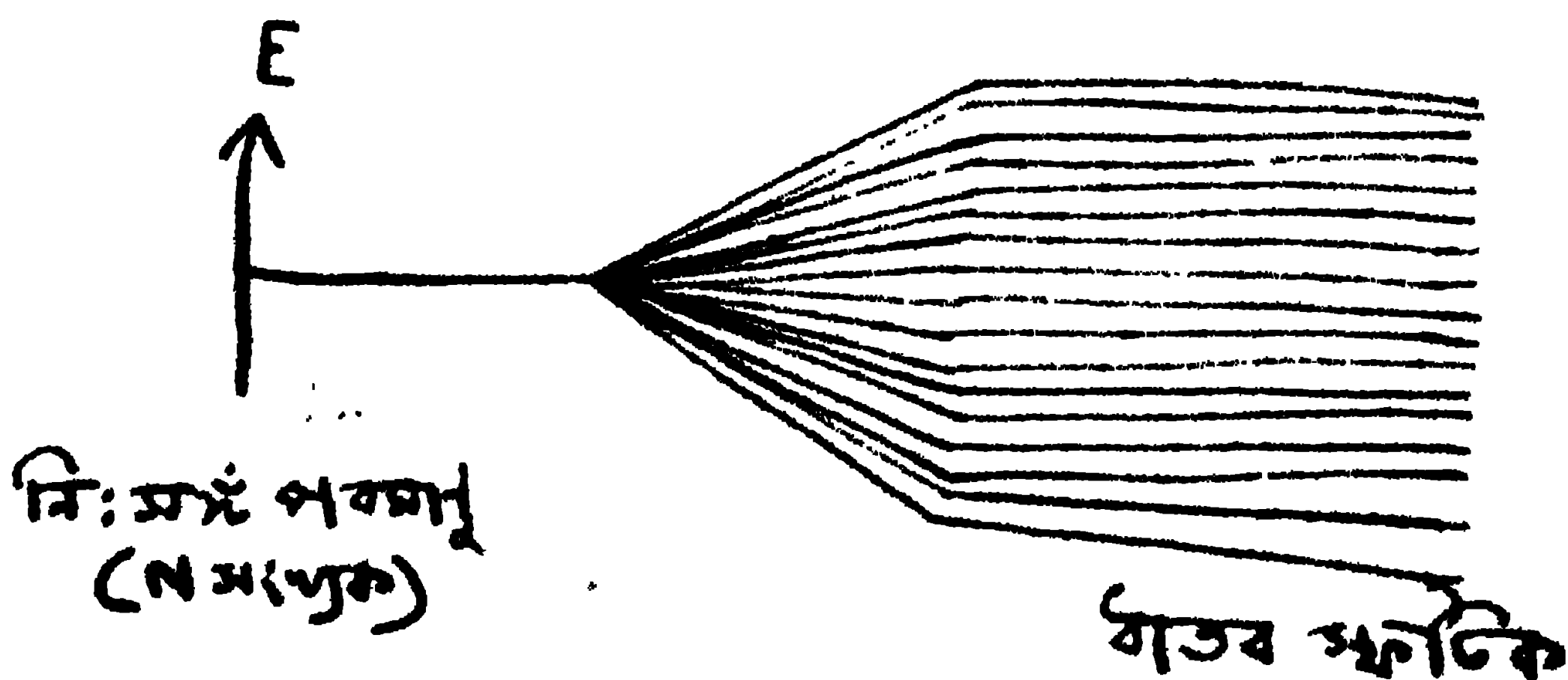
2নং চিত্র—লিথিয়াম স্ফটিকে শক্তিস্তরসমূহের বিন্যাস

অনেকগুলি পরমাণু একত্রে আনা হয় অবস্থাটা 2নং চিত্রানুযায়ী হয়। শুধু 2s পরমাণু-কক্ষের সম্মিলনের ফলেই N সংখ্যক পরমাণুর বা বহুকেন্দ্রী অণুকক্ষের সৃষ্টি করে এবং এদের অণুকক্ষের শক্তি একগুচ্ছ ঘনবদ্ধ অত্যল্প ব্যবধান-বিশিষ্ট শক্তিস্তরে বিভক্ত হয়। এই শক্তিস্তর-

স্তরকে বলা হয় যোজ্যতা শক্তিস্তরগুচ্ছ (Valence band)।

ধরা যাক সোডিয়াম স্ফটিকের কথা। প্রতি পরমাণুকক্ষ (Atomic orbital) শক্তিস্তরগুচ্ছে একটি স্তর তৈরি করে। নিম্নমানের শক্তিস্তরগুচ্ছে (1s, 2s, 2p) স্তরের সংখ্যা এমন নির্দিষ্ট যে, যতগুলি ইলেকট্রন পাওয়া সম্ভব, ঠিক ততগুলিই এই স্তরগুলিতে বিন্যস্ত থাকতে পারে, অর্থাৎ শক্তিস্তরগুচ্ছ ইলেকট্রনের দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকৃত। বহিঃস্থ তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রভাবে পূর্ণ স্তরগুচ্ছের ইলেকট্রনগুলির গতির বদল হওয়া সম্ভব নয়, কারণ তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রভাবে তাদের গতির বদলের অর্থ তাদের কোন উচ্চ শক্তিস্তরে উন্নতি। অথচ তা সম্ভব নয়, কারণ ঠিক পরবর্তী উচ্চ শক্তিস্তরগুলি অন্য ইলেকট্রন যুগ্মসমূহের দ্বারা অধিকৃত এবং পাউলির সূত্রানুসারে একটি বাস্তব শক্তিস্তরে দুটির বেশী ইলেকট্রন থাকতে পারে না। আবার উচ্চতম শক্তিস্তরের ইলেকট্রনযুগ্মও অতিরিক্ত শক্তি গ্রহণ করতে পারবে না, কারণ তাদের উন্নীত হবার মত শক্তিস্তর ঐ গুচ্ছে আর নেই। অবশ্য এমন হতে পারে যে, অতিরিক্ত শক্তি গ্রহণ করবার ফলে উচ্চতম শক্তিস্তরের ইলেকট্রন ঐ গুচ্ছ থেকে বেরিয়ে অন্য উচ্চতর শক্তিস্তরগুচ্ছের কোন স্তরে চলে যেতে পারে।

নিম্নমানের একই গুচ্ছের শক্তিস্তরগুলির ইলেকট্রনগুলির সাম্যাবস্থা বজায় থাকলেও সর্বোচ্চ শক্তিস্তরগুচ্ছের কথা কিন্তু আলাদা, কারণ এটি (3s) অর্ধ-অধিকৃত। ঐ গুচ্ছের গভীরে থাকা ইলেকট্রনের সাম্যাবস্থা বজায় থাকছে, কারণ তার উপরের স্তরও অধিকৃত হয়ে আছে। অধিকৃত স্তরের শীর্ষে থাকা ইলেকট্রনগুলিই মাত্র সহজে অনধিকৃত স্তরগুলি অধিকার করতে পারে। ব্লখ (Bloch) ও তাঁর সহকর্মীরা ব্যাপারটাকে আর একটু পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের ব্যাখ্যানুযায়ী বাস্তব স্ফটিকের এক-একটি বাস্তব কেন্দ্রক একাধিক সমকেন্দ্রী (Concentric) নির্দিষ্ট জ্যামিতি-বিশিষ্ট অঞ্চলসমূহের (Zones) দ্বারা বেষ্টিত। ইলেকট্রনের তরঙ্গ-প্রকৃতির জন্যে এই বিশেষ গঠনবিন্যাস (Configuration) দেখা যায় এবং এই গঠনবিন্যাসের জন্যে ইলেকট্রনগুলি মাত্র কয়েকটি অনুমোদিত (Permitted) শক্তিস্তরগুচ্ছে বিন্যস্ত থাকে। এই অনুমোদিত শক্তিস্তরগুচ্ছকে বলা হয় ব্রিলুয়াঁ অঞ্চলসমূহ (Brillouin zones)। ব্রিলুয়াঁ অঞ্চলসমূহের মধ্যবর্তী অনধিকার্য শক্তিস্তরগুচ্ছগুলিকে বলা হয় নিষিদ্ধ শক্তিস্তরগুচ্ছ। এই অনধিকার্য শক্তিস্তরগুচ্ছ অতিক্রম করতে ইলেকট্রনের প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। ব্রিলুয়াঁ অঞ্চল নিঃসঙ্গ পরমাণুর কোয়ান্টাম শক্তিস্তরের সঙ্গে তুলনীয় এবং একটি কোয়ান্টাম স্তর থেকে অন্য কোয়ান্টাম স্তরের ব্যবধানের সঙ্গে তুলনীয় নিষিদ্ধ শক্তিস্তরগুচ্ছ। বাস্তব শক্তিস্তরের সর্ব-বহিঃস্থ অঞ্চলে মাত্র সেই ইলেকট্রনগুলিই থাকে, যেগুলি স্পন্দনমান (Vibrating) কেন্দ্রক থেকে যথোপযুক্ত শক্তির সরবরাহ পেয়ে এই অঞ্চলে উঠে আসবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। একটি ব্রিলুয়াঁ অঞ্চলের প্রস্থ নির্ভর করে ইলেকট্রন মেঘগুলির পারস্পরিক আচ্ছাদনের (Overlapping) উপর। এই আচ্ছাদন সর্বাপেক্ষা বেশী হয় সর্ববহিঃস্থ অঞ্চলের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে। ধাতব স্ফটিকের নির্মাতা পরমাণুসমূহের খুব ভিতরের ইলেকট্রনগুলির শক্তিস্তরগুচ্ছের প্রস্থ খুবই কম এবং এই ইলেকট্রনগুলি অনুমোদিত শক্তিস্তরগুচ্ছের বহু সুবিন্যস্ত শাখাস্তরগুলি অধিকার করে আছে। অতএব এই ইলেকট্রনগুলি নিঃসঙ্গ পরমাণুতে যে শক্তিস্তরগুলি অধিকার করে, বলা চলে, ধাতুর স্ফটিকেও প্রায় সেই স্তরগুলির অধিকার করে এবং এরা বন্ধনী নির্মাণে অংশগ্রহণ করে না। ধাতব পরমাণুগুলির ঘনসন্নিবেশের (Close packing) ফলে

কেন্দ্রকসমূহের চতুর্দিকে থাকা সর্বোচ্চ স্থিতিশক্তি-বিশিষ্ট সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরগুলির কিছুটা পারস্পরিক আচ্ছাদন হয়। উচ্চ শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রনসমূহ, যেগুলি আচ্ছাদিত অঞ্চলে থাকে, সেগুলিকে কোন একটি বিশেষ পরমাণুর বলে চিহ্নিত করা যায় না এবং এগুলি সমগ্র ক্রিস্টালের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। এই ইলেকট্রনগুলি চলমান (Mobile)। এই চলমান ইলেকট্রনগুলিই ধাতব বন্ধনীর নির্ধারক। আচ্ছাদিত অঞ্চলসমূহকে বলা হয় আণবিক শক্তিস্তরসমূহ (Molecular energy levels) এবং এই সব শক্তিস্তরেও পাউলি নিবারণ নীতি (Pauli exclusion principle) প্রযোজ্য, অর্থাৎ কোন একটি পারমাণবিক শক্তিস্তরের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই কোন আণবিক শক্তিস্তরেও দুটি ইলেকট্রনের বেশী থাকতে পারে না এবং এই দুটিও থাকতে পারে যদি তারা বিপরীত স্পিনবিশিষ্ট হয়।

ধাতব বন্ধনীর তত্ত্বে ধাতুর গঠন বা ধাতুর (State) নিয়ে বেশী আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ধাতুর বিশেষ ধর্মসমূহ অন্যান্য যৌগ থেকে ধাতুকে আলাদা করে চিনতে সাহায্য করে। সে কয়টি হচ্ছে: (ক) বিশেষ ধাতব উজ্জ্বলতা বা দৃশ্য আলোককে প্রায় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা। অতি পাতলা ধাতুর চাদরও অস্বচ্ছ (Opaque)। এই অস্বচ্ছতার দরুণ অনুমান করা যায় যে, ধাতুর পাতলা চাদরেও প্রতি একক আয়তনে অনেক ধাতব পরমাণু আছে বা ধাতব চাদরে ধাতব পরমাণুর ঘনত্ব বেশ বড়। (খ) ধাতুকে অতি সূক্ষ্ম তারাকারে বা অতি পাতলা চাদরে বিস্তৃত করা যায় [প্রসারণশীলতা (Ductility) এবং নমনীয়তা (Malleability)], এথেকে বোঝা যায় যে, ধাতব ক্রিস্টালের আকৃতি দৃঢ় নয় এবং আকৃতি তলগুলির (Lattice planes) পারস্পরিক বিচ্যুতি সহজে ঘটতে পারে। (গ) ধাতু তাপ বা বিদ্যুতের সুপরিবাহী। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বা ধাতু গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হলে তড়িৎ-পরিবাহিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এথেকে বোঝা যায় যে, ক্রিস্টাল আকৃতির ভিতর দিয়ে আহিত (Charged) মূলকের (Species) সহজ চলাচল ঘটে।

ধাতুর অন্তঃস্থিত ইলেকট্রনসমূহের স্পন্দনই ধাতব বর্ণ দ্যুতিমান হবার কারণ। দৃশ্য আলোকের কম্পন সংখ্যাবিশিষ্ট ফোটন বা আলোক কণার দ্বারা চলমান ইলেকট্রনগুলি স্পন্দিত হয় বলেই ধাতব উজ্জ্বলতা দেখা যায়—এরকম অনুমান করা হয়। বর্ণালীর দৃশ্য অংশের সকল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো ধাতুতে অবশোষিত (Absorbed) হয়। তামা এবং সোনায় এই ধর্মের ব্যত্যয় দেখা যায়। চলমান ইলেকট্রনগুলি আলোকশক্তির তাৎক্ষণিক গ্রহণ এবং বর্জনে সক্ষম। বর্জিত আলোকশক্তির জন্যেই প্রতিফলিত দৃশ্য আলো দেখা যায়। আলোকশক্তির এই তাৎক্ষণিক গ্রহণ-বর্জন ধাতুর বিশেষ উজ্জ্বলতার কারণ।

আন্তঃপারমাণবিক চলমান বন্ধনীগুলি ধাতুকে অটুট রাখে, কিন্তু আকৃতির বিকৃতি (Deformation) ঘটানোর বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। ধাতব ক্রিস্টালের আকার পরিবর্তনকালে ধাতব পরমাণুসমূহের স্তরগুলি নির্দিষ্ট তলের উপর দিয়ে পিছ্‌লে যায়। ধরে নেওয়া হচ্ছে, ধাতব পরমাণুগুলি কঠিন গোলকের ন্যায় ব্যবহার করে। পিছ্‌লানো বা স্খলন (Gliding) ক্রিয়ায় খুবই কম শক্তিক্ষয় হয়। যে সকল ধাতব পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ কক্ষে দুটির অধিক ইলেকট্রন আছে, সেগুলিই সর্বাপেক্ষা কম নমনীয় এবং সম্প্রসারণশীল অর্থাৎ এই সকল ধাতু সহজে পাতলা চাদরে বা সরু তারে পরিণত হয় না। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের প্লাষ্টিকতা (Plasticity) থেকে এমন অনুমান করা খুব অসঙ্গত নয় যে, এই নীতিটি একদেশদর্শী হলেও হতে পারে; অর্থাৎ অ্যালু-

মিনিয়াম পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ কক্ষে কার্যতঃ একটি ইলেকট্রন থাকে বলে অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুসমূহ সহজে স্থানান্তরে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে—এই পরমাণুসমূহ স্থানান্তরে স্খলিত হয় কিভাবে—সদলে অথবা একাকী?

ধাতুতে সামান্য অবিশুদ্ধির উপস্থিতি অসামান্য ক্রিয়া দর্শায়—ধাতুর নমনীয়তা ও সম্প্রসারণশীলতায় ঘটে অস্বাভাবিক পরিবর্তন। আবার সামান্য পরিমাণ গন্ধক যেখানে তামা হয়ে যায় অত্যন্ত ভঙ্গুর। পরযৌগী (Foreign) পরমাণু উপস্থিত থেকে স্খলনতলে (Glide plane) ধাতব পরমাণুর স্খলন-ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায় এবং ধাতু সহজভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এথেকে অনুমান করা অসঙ্গত নাও হতে পারে যে, স্থানান্তরে যাবার সময় একটি পরমাণুই এক সময়ে স্খলিত হয়, পরমাণুসমূহ একযোগে একই সময়ে স্খলিত হয় না। তা যদি হতো, তবে সামান্য পরিমাণ অবিশুদ্ধির প্রভাবে ধাতুর ভঙ্গুরতা এত অস্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতো না।

পরিবাহিতা, অর্ধ-পরিবাহিতা (Semiconductivity) এবং অপরিবাহিতা শক্তিস্তরগুচ্ছের ধারণার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। প্রযুক্ত তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রভাবে স্ফটিক আকৃতির ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনগুলি একটি নির্দিষ্ট দিকে চলে এবং তড়িৎ-পরিবাহিতা ধর্মটি দৃশ্যমান হয় ইলেকট্রনের এই গতিশীলতার জন্যেই। পরিবাহী ও অপরিবাহী বস্তুদ্বয়ের পার্থক্য এই যে, উভয়ে পরিবাহিতার জন্যে সমসংখ্যক পরিবাহক ইলেকট্রন পায় না। পরিবাহী যৌগের সর্বোচ্চ শক্তিস্তরগুচ্ছ ইলেকট্রনসমূহের দ্বারা আংশিক অধিকৃত এবং এই গুচ্ছের অনধিকৃত শক্তিস্তরগুলি আরো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। অধিকৃত এবং অনধিকৃত শক্তিস্তরগুলির মধ্যে শক্তির ব্যবধান কম হওয়ায় উপরিউক্ত গুচ্ছের আদিতে অধিকৃত স্তরসমূহের ইলেকট্রনগুলি অনধিকৃত স্তরগুলিতে সহজে চলে আসে এবং এজন্যেই স্ফটিক আকৃতির ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন-প্রবাহ বয়ে যায়। ইলেকট্রনসমূহের দ্বারা একটি গুচ্ছের অর্ধেকের বেশী শক্তিস্তর অধিকৃত থাকলে স্বভাবতঃই পরিবহনের জন্যে গুচ্ছে উপস্থিত ইলেকট্রনের সংখ্যার তুলনায় কম সংখ্যক ইলেকট্রন পাওয়া যায়। ধাতুর একক আয়তনে কত সংখ্যক ইলেকট্রন আছে, তার উপর ধাতুর তড়িৎ-পরিবাহিতা নির্ভর করে না—করে যত সংখ্যক ইলেকট্রন কম শক্তিবিশিষ্ট অনধিকৃত স্তরগুলি অধিকার করে নিতে পারে—তার উপর। এই ইলেকট্রন সংখ্যাকে বলা হয় কার্যকর ইলেকট্রন সংখ্যা (Effective electron number)। উদাহরণস্বরূপ বলা যাক প্রথম বর্গীয় তামা, রূপা এবং সোনার কথা। এরা উত্তম তড়িৎ-পরিবাহী। কারণ, এদের প্রথম শক্তিস্তরগুচ্ছে 2N সংখ্যক ইলেকট্রনের উপস্থিতি সম্ভব হলেও আসলে উপস্থিত ইলেকট্রনের সংখ্যা N এবং এই সকল ইলেকট্রনই তড়িৎ-পরিবহনের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে। অপরপক্ষে ক্ষারমৃত্তিক ধাতুসমূহ (Alkaline earth metals), জিঙ্ক (দস্তা), ক্যাডমিয়াম, মার্কারি (পারদ) প্রথম শক্তিস্তরগুচ্ছে 2N সংখ্যক ইলেকট্রন ধারণ করে এবং প্রথম শক্তিস্তরগুচ্ছ পূর্ণ করবার জন্যে ঠিক 2N সংখ্যক ইলেকট্রনেরই প্রয়োজন হয়। যেহেতু এই সকল ধাতুও তড়িৎ-পরিবাহী, অতএব এরকম ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, এই সকল ধাতুতে প্রথম পূর্ণ গুচ্ছের সঙ্গে দ্বিতীয় অপূর্ণ (Vacant) গুচ্ছের পারস্পরিক আচ্ছাদন (Overlapping) ঘটেছে এবং প্রথম পূর্ণ গুচ্ছের ইলেকট্রনসমূহ প্রযুক্ত তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রভাবে দ্বিতীয় অপূর্ণ গুচ্ছে উঠে যায়। ফলে এই সকল ধাতুতেও তড়িৎ-পরিবাহিতা দেখা যায়।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবাহী ধাতুর তড়িৎ-পরিবাহিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কেন? শূন্য পরম তাপমাত্রায় ইলেকট্রনসমূহ কম শক্তিবিশিষ্ট

$\frac{1}{2}N$ শক্তিস্তরসমূহ অধিকার করে থাকে এবং প্রত্যেক স্তরে দুটি করে ইলেকট্রন থাকে। তাপশক্তি গ্রহণ করবার ফলে এই ইলেকট্রনসমূহগুলির কিছু ইলেকট্রন একই ওস্বের অনধিকৃত উচ্চতর শক্তিবিশিষ্ট স্তরগুলিতে আসে এবং অপূর্ণ স্তরের সংখ্যা কমে যায়। ইলেকট্রনগুলি উচ্চতর স্তরগুলিতে উঠে আসায় কার্যকর ইলেকট্রনের সংখ্যাও হ্রাস পায়। সুতরাং তড়িৎ-পরিবাহিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

তড়িৎ-অপরিবাহিতা দেখা যায় কেন? কোন যৌগে প্রথম শক্তিস্তরগুচ্ছ পূর্ণ অধিকৃত হয়ে গেলে এবং দ্বিতীয় অপূর্ণ শক্তিস্তরগুচ্ছ থেকে শক্তি-ব্যবধানে অধিক হলে ঐ যৌগ সাধারণতঃ তড়িৎ-অপরিবাহী হয়। প্রযুক্ত তড়িৎ-ক্ষেত্র এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম শক্তিস্তরগুচ্ছের ইলেকট্রনগুলিকে দ্বিতীয় শক্তিস্তরগুচ্ছে পৌঁছে দেবার উপযুক্ত শক্তি সরবরাহ করতে না পারায় অপরিবাহী বস্তুসমূহে কোন দিকেই ইলেকট্রন-প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক—কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম এবং ধূসর (Grey) টিনের কথা। এদের স্ফটিকের গঠন হীরক স্ফটিকের গঠনের মত। প্রধানতঃ সহযোজী ধরণের আকর্ষণ এদের পরমাণুসমূহের কাছাকাছি থাকবার কারণ হলেও উপরিউক্ত ব্যাখ্যা এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতি পরমাণুতে প্রথম শক্তিস্তরগুচ্ছে দেখা যায় চারটি মাত্র ইলেকট্রন থাকতে পারে। দ্বিতীয় অপূর্ণ শক্তিস্তরগুচ্ছের সঙ্গে প্রথম শক্তিস্তরগুচ্ছের বেশ ব্যবধান থাকায় এই সকল যৌগ উত্তম অপরিবাহী।

যে বস্তুতে পরিবাহিতা ও অপরিবাহিতা—উভয় ধর্মই কিছুটা বিদ্যমান, তাকেই বলা হয় অর্ধ-পরিবাহী। সাধারণতঃ এই সকল বস্তুতে প্রথম পূর্ণগুচ্ছের সঙ্গে দ্বিতীয় অপূর্ণগুচ্ছের খুব কম শক্তির ব্যবধান থাকে। শূন্য পরমতাপমাত্রায় এদের ধর্ম অপরিবাহিতা, কিন্তু তাপমাত্রা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাপশক্তি গ্রহণ করে প্রথম পূর্ণগুচ্ছের কিছু ইলেকট্রন নিকটবর্তী দ্বিতীয় অপূর্ণগুচ্ছে উঠে যায়। এই যে ইলেকট্রনগুলি তাপশক্তির দ্বারা দ্বিতীয় গুচ্ছের স্তরগুলিতে উন্নীত হলো এদের স্বভাবতঃ উত্তম পরিবাহী ইলেকট্রনও বলতে হবে। উত্তেজক শক্তি (Excitation energy) দু-ধরণের এবং ইলেকট্রনসমূহ দু ভাবে উত্তেজিত হতে পারে। এক—কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর দ্বারা আলোকিত (Illuminated) করে, অর্থাৎ উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট আলো ব্যবহার করে ইলেকট্রনগুলিকে উত্তেজিত করা যায় এবং এভাবে সৃষ্ট পরিবাহিতাকে বলা হয় আলোক-পরিবাহিতা (Photoconductivity)। দুই—তাপমাত্রা বাড়াবার সঙ্গে পরিবাহিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে সেই পরিবাহিতাকে বলা হয় তাপীয় পরিবাহিতা। উত্তেজিত ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই সুপরিবাহক ইলেকট্রনের সংখ্যাও বাড়ে বলে এই ধরণের পরিবাহিতা দেখা যায়। গ্র্যাফাইট এই ধরণের তড়িৎ-পরিবাহী।

ধাতুর স্ফটিকে চলমান ইলেকট্রনের জন্যেই ধাতব বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। ধাতুতে ইলেকট্রনের অবস্থা বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে, ধাতব স্ফটিক আসলে একগুচ্ছ ধনাত্মক ধাতব আয়নের সমষ্টি এবং এই আয়নগুচ্ছ প্রবাহমান যোজ্যতা ইলেকট্রনরূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত। ধাতুর এই ইলেকট্রন সমুদ্রই ধাতব আকর্ষণের কারণ তো বটেই, উপরন্তু অদ্ভুত যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং তাপীয় ধর্মাবলীর উৎসও বটে।

বার্ধক্য কেন আসে ?

স্বপনকুমার রায়চৌধুরী

বেশী দিন বেঁচে থেকে বার্ধক্যকে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের জীবনে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। সুদূর পুরাকাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বহু কাহিনীতে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার কথা প্রতিফলিত হয়েছে। কেন এবং কেমনভাবে বার্ধক্য আসে, কিভাবে তাকে বিলম্বিত বা পুরাপুরি আটকে দেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে শাখা আলোচনায় ব্যাপৃত, তাকে বলা হয় Gerontology (Geron = বৃদ্ধ ;) বাংলায় এর নাম করতে পারি বার্ধক্য-বিজ্ঞান। বার্ধক্য-বিজ্ঞানের কয়েকটি বিভাগ আছে :— প্রথম বিভাগের আলোচনার বিষয় বার্ধক্য-জনিত শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে, দ্বিতীয় বিভাগে বার্ধক্যজনিত রোগ নিয়ে গবেষণা হয় এবং তৃতীয় বিভাগের আলোচ্য বিষয় বার্ধক্যজনিত সামাজিক সমস্যা। এখানে আলোচনা প্রধানতঃ প্রথম বিভাগেই সীমাবদ্ধ রাখবো।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি মানুষের জীবনে 25 বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণতঃ শরীরের বৃদ্ধি ঘটে। এই সময়ের মধ্যে শরীরে অবস্থিত সমস্ত প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা বাড়তে থাকে। 25 থেকে 35 বছর বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষমতা এবং শারীরিক বৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট স্তরে স্থিতিশীল থাকে ; 35 বছরের পর থেকে সমস্ত প্রত্যঙ্গ-গুলির কর্মক্ষমতা একটু একটু করে কমতে থাকে অর্থাৎ বার্ধক্য শরীরকে একটু একটু করে দখল করতে থাকে। সুতরাং বার্ধক্যকে বলতে পারি জীবনের একটা অধ্যায়, যখন শরীরে প্রত্যঙ্গগুলির কর্মক্ষমতা একটু একটু করে কমতে কমতে মৃত্যুতে এসে পূর্ণ পরিণত হয়।

কিন্তু বার্ধক্য কেন আসে ? শরীরের মধ্যে কোন্ ঘটনা জীবনে বার্ধক্যের সূত্রপাত ঘটায় ? হাতী এবং ইঁদুর উভয়ে মেরুদণ্ডী শ্রেণীভুক্ত হলেও প্রথমটির গড়-আয়ু 100 বছর অথচ অপরটির গড়-আয়ু মাত্র 2½ বছর কেন ? এই সব প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার কিছু কথা উল্লেখ করছি।

বিজ্ঞানী Szilard 1959 সালে এই মতবাদ প্রচার করেন যে, অনবরত জিন-মিউটেশনের (Gene mutation) ঘটনাই বার্ধক্য আগমনের জন্যে দায়ী। জিন-মিউটেশনের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে যখন তা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে, তখনই শরীর একটু একটু করে বার্ধক্যের আক্রমণে আক্রান্ত হতে থাকে। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে 1961 সালে Curtis কতকগুলি ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। তিনি রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে শরীরে কৃত্রিম মিউটেশন ঘটান এবং লক্ষ্য করে দেখেন যে ঐ ইঁদুরগুলির গড় আয়ু অন্যান্য সুস্থ ইঁদুর থেকে বেশ কিছুটা কমে গেছে। শুধু তাই নয়, যে ইঁদুরের শরীরে মিউটেশনের পরিমাণ যত বেশী, সেই ইঁদুরের আয়ু তত কম। এখানে একটা বিষয় উল্লেখের প্রয়োজন যে, রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে যখন ইঁদুরের শরীরে মিউটেশন ঘটানো হয়, তখন কিন্তু মিউটেশনের পরিমাণ এবং গড়-আয়ুর মধ্যে কোন রকম সমতা থাকে না।

Szilard-এর মতবাদে একথা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বলা হয় নি যে কেমন করে শরীরের স্বাভাবিক

কোষগুলির মধ্যে মিউটেশনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং কেনই বা একই শ্রেণীভুক্ত হয়েও বিভিন্ন প্রাণীর গড়-আয়ু বিভিন্ন হয়। Orgeal 1963 সালে বলেন যে, শরীরে সাধারণতঃ দু-ধরণের প্রোটিন তৈরি হয়; এক ধরণের প্রোটিনের সাহায্যে শরীর গঠিত হয় এবং শরীরের জৈব ক্রিয়াগুলি চলে। অপর ধরণের প্রোটিনের সাহায্যে নূতন নূতন উৎপন্ন কোষগুলির জিন গঠিত হয়। এই দ্বিতীয় ধরণের প্রোটিনের গঠনে যদি কোন কারণে কোন রকম ত্রুটি ঘটে, তবেই জিন-মিউটেশন ঘটে। ব্যাপারটা আর একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। যদি কোষের মধ্যে ভুল RNA-পলিমারেজ এনজাইম গঠিত হয়, তবে তা ভুল m-RNA, t-RNA এবং r-RNA গঠন করে এবং অবশেষে একটা ভুল জিন তৈরি হয়। এই ত্রুটিপূর্ণ জিন আবার নূতন নূতন ত্রুটিযুক্ত জিন তৈরি করতে থাকে, আর এভাবেই শরীরে মিউটেশনের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

Harman-এর বক্তব্য অনুযায়ী প্রাণী-কোষে বয়স বাড়বার সঙ্গে বেজোড় ইলেকট্রনওয়ালা মুক্ত-মূলকের (Unpaired free radical) পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং তা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। বিজ্ঞানী Harman পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ইঁদুরকে 2-mercaptoethylamine এবং 2; 6-di-tert-butythylhydroxytoluene (যা মুক্ত-মূলককে দূরীভূত করে) খাওয়ালে ইঁদুরের গড়-আয়ু শতকরা 30-40 ভাগ বেড়ে যায়। অপর দিকে যখন তিনি অ্যামিনো: অ্যাসিড tyrosine-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান (tyrosine সহজে কোষের মধ্যে মুক্ত মূলকের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়), তখন ইঁদুরের গড়-আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

বিজ্ঞানী Burnet-এর মতে, স্ব-অনাক্রম্যতাই (Autoimmunity) বার্ধক্য আসবার অন্যতম প্রধান কারণ। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক মিউটেশনের ফলে (Somatic mutation) উদ্ভূত লিম্ফোসাইট থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডিগুলি ঐ শরীরেরই প্রোটিনকে আক্রমণ করে আর এর ফলেই জীবদেহে বার্ধক্যের সূত্রপাত ঘটে। আরো লক্ষ্য করে দেখা গেছে—বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিবডি তৈরির ক্ষমতা কমে যায়। এই জন্যেই বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ যুবকদের চেয়ে ভাইরাসের আক্রমণে সহজেই কাবু হয়ে পড়েন।

1969 সালের জুলাই মাসে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বার্ধক্য বিজ্ঞান কংগ্রেসে (International Congress of Gerontology) ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর এম. এস. কানুনগো বলেন যে, জিনের কর্মক্ষমতার নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের ফলেই শরীরে বার্ধক্যের আগমন ঘটে। জিনের কর্মক্ষমতা প্রকাশ পায় সাধারণতঃ বিভিন্ন এনজাইমের মাধ্যমে। শরীরের গঠন এবং বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়ে শরীরে বিভিন্ন এনজাইম দেখা দেয়। আবার জীবনের বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন জিনের কার্যকর্মকে উদ্দীপিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষের জীবনে ভ্রূণ অবস্থায় যে হিমোগ্লোবিন দেখা দেয়, তার নাম HbF. (HbF, 2α-2γ সাব ইউনিটের দ্বারা গঠিত)। জন্মের পর γ-সাবইউনিট আর তৈরি হয় না, তার জায়গা নেয় β-সাবইউনিট। এই হিমোগ্লোবিনকে বলা হয় HbA। ঠিক এই ধরণের আরো কিছু প্রোটিনের পরিবর্তনের ফলেই জিনের কাযকর্মও পরিবর্তিত হয়।

বার্ধক্য আসবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে এনজাইমঘটিত নানা রকম পরিবর্তন নিয়ে যদিও বিভিন্ন বিজ্ঞানী কিছু কিছু কাজ করেছেন, তবুও এসম্বন্ধে জানা গেছে খুবই সামান্য। খুবই সামান্য সংখ্যক এনজাইম নিয়ে আজ

পর্যন্ত কাজ হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য lactic dehydrogenese (LDH)। এছাড়া cholinestrase (ChE) নিয়েও কিছু কাজ হয়েছে। ChE শরীরের কোন এক অংশের অনুভূতিকে একটি স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষে চালান করতে সাহায্য করে। এই কাজকে serotonin এবং epinephrine ভালভাবে করতে বাধা দেয়, আবার r-amino-butyric অ্যাসিড সাহায্য করে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, বৃদ্ধ ইঁদুরের ChE-এর কাজকে সাহায্যকারী পদার্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে। বিজ্ঞানী A. E. Mirsky সাম্প্রতিক-কালে একটি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, বৃদ্ধ এবং যুবক উভয় ইঁদুরের ক্ষেত্রেই tyrosine aminotransferase (TAT) এনজাইমের পরিমাণ শরীরে বাড়তে থাকে, যদি তাকে খুব অল্প উষ্ণতায় (10°C) খুব অল্প সময়ের জন্যে উদ্দীপিত করা যায়। কিন্তু উদ্দীপিত বৃদ্ধদের, যুবকদের চেয়ে কিছুটা বেশী সময় লাগে। যদিও একবার উদ্দীপিত হয়ে গেলে উভয়ের শরীরেই সমপরিমাণ TAT তৈরি হতে থাকে। Arginase, malate dehydro genase ইত্যাদি এনজাইম নিয়েও কিছু কিছু কাজ হয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ এটাই লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন এনজাইমের পরিমাণ বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে, না কমতে থাকে, তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় কিনা ইত্যাদি।

আধুনিক রীতিতে বার্ধক্য নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে খুব বেশী দিন নয়; কিন্তু প্রাচীন কালেও যে বার্ধক্য নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে, তার কিছু কিছু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে। যদিও বার্ধক্য সম্বন্ধে এখনো পর্যন্ত আমরা জেনেছি খুবই অল্প, তবুও আশা করতে পারি, এমন দিন খুব দূরে নয়—যখন বার্ধক্য মানুষের জীবনে কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না

অপারেশন

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য*

আমি মানুষের শরীরে অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের কথাই বলছি। অধিকাংশ লোকেরই অপারেশনের নাম শুনলে মনে ভয় হয়—যদি জ্ঞান না ফিরে, যদি প্রচণ্ড ব্যথা লাগে, যদি মৃত্যু ঘটে। অবশ্য ভয় পাবার যে একদম কোন কারণ নেই তা নয়, মানুষের মৃত্যু অতি সাধারণ কারণেও ঘটতে দেখা গেছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটায় না। আবার সামান্য একটা ইনজেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে—অবশ্য এটা সিভিয়ার এনাফাইল্যাকটিক রিঅ্যাকশনের জন্যে। অপারেশনের নাম শুনলেই সাধারণতঃ যে ছবিটি সকলের মনে আসে—মনে করুন নিজের ক্ষেত্রে—আধা-ঘুম, আধা-জাগা অবস্থায় হাসপাতালের কেউ আমাকে ট্রলিতে করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—আমার অপারেশন হবে। তারপরে একটা কাচের দরজাযুক্ত ঠাণ্ডা ঘরে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে—আশেপাশে ব্যস্ত ডাক্তার, নার্সেরা মুখে মাস্ক পরে ঘুরছে—তারপরে আমাকে ধরে অপারেশন টেবিলের উপরে শুইয়ে দিচ্ছে—

* বি. আর. সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কলিকাতা-14

কে যেন তখন ঐ রকম সাদা-পরা আমার হাতের মধ্যে কি একটা ইনজেকশন দিচ্ছে—আঃ কি ঘুম পাচ্ছে—না, আর জেগে থাকতে পারছি না। লোকটা আমাকে গুণতে বলছে—এক, দুই তিন বলে, আর তো পারছি না—একটু ঘুমিয়ে নিই—সব চেতনা আমার কোথায় যেন চলে যাচ্ছে—আমি আর কিছু বুঝতে পারছি না, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি—হাঁ। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি—তাইতো জাগলাম কখন? একি, আমার একটু ব্যথা লাগছে কেন? হাতে আমার কি দিচ্ছে ছুঁচ ফুটিয়ে? তবে কি আমার অপারেশন হয়ে গেছে—কাউকে কি জিজ্ঞাসা করবো? না জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। এই তো, এই জায়গায় অপারেশন করবার কথা ছিল—সব ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—অপারেশন হয়ে গেছে।

শরীরের ভিতরে বা বাইরে কিছু কাটা-কুটিকে অপারেশন বলে; অবশ্য তাই বলে চুল কাটা বা বাড়তি নখ কাটাকে অপারেশনের আওতায় আনলে হাস্যকর হবে। আমাদের শরীরে এই চুল ও নখের ডগা বাদ দিলে সব জায়গাতেই স্নায়ু বা নার্ভ ছড়ানো আছে—আর এই স্নায়ুর জন্যেই আমরা ব্যথা অনুভব করি—এই স্নায়ুগুলি সাদা সরু সুতা থেকে আরম্ভ করে প্রায় নারকেলের দড়ির মত মোটা দেখতে। কেউ হয়তো হাসি-ঠাট্টা করতে হঠাৎ একটা আলপিন শরীরের কোন জায়গায় ফুটিয়ে দিল—অমনি ঐ ফোটাবার ব্যথার অনুভবটা এই স্নায়ু দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক বা ব্রেনের বিশেষ একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলো—এখানে সেরিব-র‍্যাম মস্তিষ্ক অমনি হুকুম করলো—যে লোকটা গায়ে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে, তাকে একটা চড় মার। এই আদেশটা আবার তার হাতে ঐ স্নায়ু দিয়ে এসে পৌঁছয়, আর অমনি আমার ডান হাত তাকে একটা চড় মারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে—একটা পিন ফোটালেই যখন এত ব্যথা, খানিকটা ছুরি দিয়ে কেটে দিলে না জানি ঐ সেরিবর‍্যাম অর্থাৎ মস্তিষ্ক বোধ হয় লোকটাকে মেরেই ফেলতে বলবে। তবে অনেক সময়ে আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহ্য করে নিই ব্যথাটা, নিজেদের আখেরে ভালর জন্যে।

এই সব কথাগুলি বলছিলাম এই জন্যে যে, ব্যথা বন্ধ না করতে পারলে অপারেশন করাটা কি ভয়ানক, কি কষ্ট উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর। অবশ্য শুনেছি, ধন্বন্তরির বা সুশ্রুতের দ্বারা আগে অনেক বড় বড় অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে—বোধ হয় এই বিদ্যাটা লোপ পেয়েছে বর্তমানে অজ্ঞান করবার বিদ্যাটা ভালভাবে আয়ত্ত করবার অভাবেই। চীনারা নাকি শরীরে প্রায় ছয় শত জায়গা খুঁজে পেয়েছে, যেখানে ছুঁচ ফোটালে শরীরের এক একটা বিশেষ বিশেষ অংশ অবশ হয়ে যায়। অতি প্রাচীনকালে এই চীনদেশেই, মাথায় মুগুরের ঘা দিয়ে অজ্ঞান করে অপারেশন করতো—তবে বহু ক্ষেত্রে বোধ হয় মাথার আঘাতের ফলেই রোগীরা মারা যেত। বর্তমানে এই অজ্ঞান করবার বিদ্যাটার এত উন্নতি হয়েছে যে, শল্য চিকিৎসকগণ নির্ভাবনায় তাদের রোগীর উপর অপারেশন থিয়েটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপারেশন করে যেতে পারেন। কোন অপারেশন করবার আগে চিকিৎসকগণ আগে স্থির করে নেন—কি রোগ, কি রকম অপারেশন, কোথায় করতে হবে, রোগীকে অজ্ঞান করা যাবে কিনা। তারপরে স্থির করেন—কি রকম অজ্ঞান করতে হবে, মানে পুরো অজ্ঞান করতে হবে, না শরীরের একটা বিশেষ অংশ অসাড় করলেই চলে যাবে। শরীরের কোন জায়গায় ছোট ফোড়া হয়েছে—সে ক্ষেত্রে পুরো মানুষটাকে অজ্ঞান করবার কোন দরকার নেই—খালি একটু কাটা দরকার পুঁজটা বের করবার জন্যে—প্রত্যেক লোকেরই খানিকটা ব্যথা সহ্য করবার শক্তি

আছে, সামান্য ব্যথা দিয়ে পুঁজটা বের করে দেওয়া সম্ভব। ইথাইল ক্লোরাইড নামক একটা ওষুধ তা স্প্রে করলে ঠাণ্ডার ফলে ফোড়া ও তার আশেপাশের জায়গা অসাড় হয়ে যায় —তখন সামান্য কেটে দিলে টের পাওয়া যায় না। পুঁজটা বের হয়ে যায়। একে সারফেস অ্যানাস্থেসিয়া (Surface anaesthesia) বলে। অনেক জায়গায় এমন ফোড়া হতে পারে যেখানে এই রকম অ্যানাস্থেসিয়ায় অপারেশন করা যায় না, কারণ রোগীকে একদম ব্যথা না দিয়ে ভালভাবে বেশী সময় নিয়ে অপারেশন করবার জন্যে রোগীকে সে ক্ষেত্রে পুরা অজ্ঞান করা দরকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে সব স্নায়ুগুলি শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—ব্যথা লাগলো কি না তা জানিয়ে দেবে। তাদের কোন রকমে বশ করতে পারলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কার্যসিদ্ধি করা যায়। যেমন—কোন হাতে অপারেশন করতে চাই—সে ক্ষেত্রে মানুষটাকে পুরা অজ্ঞান না করেই অপারেশন করা যেতে পারে। ঐ হাতে যে স্নায়ুগুলি যাচ্ছে, সেগুলিকে ইংরেজীতে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস বলে, ঠিক কণ্ঠাস্থির উপরে থাকে—ঐখানে ইন্‌জেকশন করে ঠিকমত ঐ প্লেক্সাসে জাইলোকেন বা ঐ জাতীয় ওষুধ দিতে পারলে পুরা হাতটা অবশ হয়ে যাবে। তখন হাতে পিন ফোটালেও ব্যথা অনুভব করা যাবে না। এই অবস্থায় ঐ হাতে অল্প সময়ের মধ্যে কোন অপারেশন সেরে ফেলা যেতে পারে। একে স্নায়ু বা নার্ভ ব্লক করে অপারেশন করা বলে। অত দূরে প্রধান নার্ভ ব্লক না করে আরও ছোটখাটো স্নায়ুকে ঐ ওষুধ ইনজেকশন করে অপারেশন করা যেতে পারে—যে আঙুলে অপারেশন করা দরকার, আঙুলটা যেখানে আরম্ভ তারই দু-পাশে নার্ভ ব্লক করলে ঐ আঙুলটা অবশ হয়ে যাবে। অনেক অপারেশন শরীরের একটা অঙ্গ বা অংশ অবশ করে কাজ সেরে ফেলা হয়। এক্ষেত্রে রোগীর কিন্তু পূর্ণ চেতনা থাকে। ইচ্ছা করলে তার শরীরের অপারেশন সে দেখতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তা দেখতে দেওয়া হয় না। তার চোখটা ঢেকে দেওয়া হয়, তবে কানে যন্ত্রপাতির আওয়াজ তো বন্ধ করা যায় না। এই জাইলোকেন বা এই জাতীয় ওষুধ সত্যই অপূর্ব। একটা ইনজেকশনের ছুঁচ ফোটাতে বা ঐ আর ওষুধটা যখন প্রবেশ করানো হয়, তখন যা একটু ব্যথা লাগে—তারপরেই নির্বিঘ্নে সার্জেনের যথেষ্ট অস্ত্রোপচার করা যায়। পুরা জ্ঞান রেখে শরীরের নীচের অংশ অসাড় করেও ঐ অংশে অপারেশন করা যায়, স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে। এতে মেরুদণ্ডের নীচের অংশে ইনজেকশন দেবার প্রয়োজন হয়। আমার ধারণা—সকলেই চায়, একটুকুও লাগবে না, কিন্তু অপারেশন হয়ে যাবে। কচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখেছি কিছু শক্ত ও সাহসী লোকের ক্ষেত্রে। তারা অবলীলাক্রমে তাদের শরীরে ছুরি কাঁচি বা ছুঁচের কাজ করতে দেয়।

তবে একথা ঠিক, পুরা অজ্ঞান করে অপারেশনে যেমন রোগীর দিকে সুবিধা, যিনি অপারেশন করবেন তাঁরও অনেক সুবিধা, যেটুকু ঝামেলা, অ্যানাস্থেটিস্টের (Anaesthetist)। তাঁকেই অজ্ঞান করে অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে পুরা দায়িত্ব তাঁর। সার্জেনের সুবিধা, রোগী চেঁচাচ্ছে না, শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে মন দিয়ে ভাল করে অপারেশন করতে পারছেন। আমার মনে হয়, ছোট ছেলেমেয়ে বাদ দিলে ছোটখাটো অপারেশন লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে করাতে সাধারণের মধ্যে বিশেষ ভয় হয় না। কিন্তু যখনই কেউ জানতে পারেন, তার বড় অপারেশন হবে, সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে হবে, তখনই তার মনে ভয় দেখা দেয়।

বোধ হয় মনে আসে, আবার যদি আর জ্ঞান না ফিরে, যদিও বা বেঁচে যাই, অতখানি কাটবার পরে জেগে উঠে যদি প্রচণ্ড ব্যথা হয়, যদি অপারেশন ভাল না হয়, সারবো তো আমি। সত্য কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রে অপারেশনের পরে কতটা ভাল হবে—এই প্রশ্ন সার্জেনের মনেও আসে।

পুরা অজ্ঞান করে কাউকে অপারেশন করা যাবে কিনা, এটা দেখে নেবার দায়িত্ব অ্যানাস্থেটিস্ট ও সার্জেনেরও। সে ক্ষেত্রে রোগ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যদি সেসব পরীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায় যে, তাকে অজ্ঞান করলে, তখন বা পরে কোন ক্ষতি হবে না, সে ক্ষেত্রেই পুরা অজ্ঞান করে অপারেশন করা হয়। অপারেশন করবো স্থির করলাম আর তখনি টেবিলে চাপিয়ে অজ্ঞান করে অপারেশন করলাম—সাধারণতঃ তা করা হয় না কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, যেমন—জরুরী অপারেশন না করলে রোগী মারা যাবে।

প্রথমেই পুরা অজ্ঞান হয়ে যাবার ছবিটা লিখেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে ইন-জেকশান দিয়ে প্রায় ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়—এই অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়—কখন ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, কখন একজন মাস্ক-পরা ভদ্রলোক কি ইনজেকশন করছে, কখন কানে বলছে, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। অপারেশনের পরে এগুলি একটা আবছা ছবির মত লাগে, কিন্তু মনে গেঁথে থাকে, হাসিমুখে রোগ সারিয়ে বাড়ী চলে যাবার পরেও।

চিঠি-পত্র

ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মহাশয়,

দেশে থাকাকালীন বিজ্ঞান পরিষদের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলাম। এখন দেশ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে বিজ্ঞানশিক্ষার সহজতম উপায়—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। তবে সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর গুরুত্ব যে কতখানি, সে সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাঠকদের কাছে পরিবেশন করতে চাই।

আমাদের দেশে এখনও ইংরেজী ভাষা সর্বক্ষেত্রে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, ইংরেজী সম্পূর্ণ তুলে দিলে যে কি অবস্থা হবে, তা আমরা দেশে থেকে কল্পনা করতে পারি না। আমি বর্তমানে যে দেশে (ব্রেজিল) আছি, সেখানে ইংরেজী কেউ জানে না বললেই চলে—সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম পর্তুগীজ। ফলে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের দুরবস্থা দেখে শঙ্কিত হই। বই সবই ইংরেজীতে, ডক্টরেটের জন্যে যারা কাজ করছে, তাদের যে সব গবেষণা-পত্রিকা পড়তে হয় বা নিজেদের গবেষণা-পত্র লিখতে হয়, তা সবই ইংরেজীতে। ছেলে-মেয়েরা অভিধান নিয়ে বসে একটা একটা শব্দ দেখে অনুবাদ করছে। ফলে একটা অধ্যায় বা একটা প্রবন্ধের পাঠোদ্ধার করতে তাদের মাসাধিককাল সময় লেগে যাচ্ছে। আমরা যারা কিছু বিদেশী অধ্যাপক এখানে আছি—আমরা যখন ক্লাসে

ইংরেজীতে বক্তৃতা দিই—ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি—তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। এসবই ইংরেজী না শেখবার ফল।

একথা মেনে নিতেই হবে যে, ইংরেজী এখনও আন্তর্জাতিক ভাষা এবং গবেষণার স্তরে এসে ইংরেজী না জানলে উপায় নেই। তবে যদি এমন ব্যবস্থা আমরা করতে পারি যে, ভাল ভাল বই ও গবেষণা-পত্রিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা বাংলায় অনুবাদ করে ফেলা হবে এবং আমাদের গবেষণা-পত্রও প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজীতে অনুবাদ প্রকাশিত হবে—তাহলে অবশ্য সমস্যার অনেক সমাধান হতে পারে। কোন কোন উন্নত দেশে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ও হচ্ছে। অনুবাদের ব্যবস্থা যেখানে নেই, সেখানে ইংরেজী জানতেই হবে। তা না হলে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যাবে না—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়তে হবে।

দীপক বসু
Radio Astronomy Section, Mackenzie
University, Sao Paulo, Brazil

পারদর্শিতার পরীক্ষা

মহাশয়,

আমি কয় বছর যাবৎ আপনাদের প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহক। আপনাদের 'পারদর্শিতার পরীক্ষা' শীর্ষক বিভাগটি ছাত্রদের নিকট চিত্তাকর্ষক। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত মার্চ সংখ্যায় (1973) উক্ত বিভাগের 3নং (ক)-এর অংশের সমাধানটা কি করলেন—বুঝতেই পারলাম না। এর উত্তর 2 (দুই) হতেই পারে না। উত্তর $2-\frac{1}{2^n-1}$ হবে; কারণ: $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$ অসীম সংখ্যার, এটি একটি গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত (G.P), যার প্রথম পদ $=1$, সাধারণ অনুপাত $\frac{1}{2}$ এবং যদি পদসংখ্যা অসীম বা n ধরা হয়, তাহলে $S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$। এই সূত্র থেকে পাওয়া যায় —

$$S=\frac{1.\left(1-\frac{1}{2n}\right)}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1-\frac{1}{2n}}{\frac{1}{2}}=2\left(1-\frac{1}{2n}\right)=2-\frac{1}{2n-1}$$

যে কোন পদসংখ্যার যোগফলের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। অতএব আমি বুঝতে পারছি না জয়ন্তবাবু ও শ্যামলবাবুর কেন এ ভুল হলো। আশা করি আগামী সংখ্যায় এটি সংশোধিত হবে।

ইতি

শ্রীসুনীলকুমার মল্লিক
দক্ষিণ বাংলা কে. ইউ. ইনস্টিটিউশন
ডাকঘর: দুবড়া-কাশীপুর। 24-পরগণা

[শ্রীশ্যামল দাশগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্ত বসু জানাচ্ছেন যে, অঙ্কটির উত্তর ঠিকই দেওয়া হয়েছে। সুনীলবাবু যে ভাবে অঙ্কটি করেছেন, তাতেও তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেই সঠিক উত্তর পেতেন। তাঁর সমাধান হলো $S=2-1/(2^n-1)$। এখানে $n=\infty$ বসালে $1/(2^{\infty}-1)=0$ হয়ে যায়। অতএব $S=2$ হবে।

সুনীলবাবু যে লিখেছেন '...যদি পদসংখ্যা অসীম বা n ধরা হয়...', ঐ অংশটিকে এভাবে লিখতে হবে, '...যদি পদসংখ্যা n ধরা হয়...'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কোন অসীম গুণোত্তর শ্রেণী অভিসারী হলে তার সমষ্টি হয় $S=a/(1-r)$।]

বায়ু দূষিতকরণ

বলাই কুণ্ডু*

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যে বায়ুসমুদ্রে বাস করিতেছি, তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বায়ু ক্রমে ক্রমে দূষিত হইতেছে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের নানা রকমের ক্ষতিসাধনে অগ্রসর হইতেছে। কি কি কারণে বায়ু বিষাক্ত হইতেছে, তাহা মোটামুটিভাবে আলোচনা করা যাক। বিবিধ কারণে বাতাসের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইতেছে, তাহার মধ্যে প্রধান কারণগুলি হইল—(1) পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উদ্ভিদের সংখ্যাহ্রাস, (2) দেশে দেশে কলকারখানা বৃদ্ধি, (3) জ্বালানী হিসাবে গ্যাসোলিনের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং (4) পারমাণবিক, হাইড্রোজেন ও অন্যান্য বোমার বিস্ফোরণ

মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদ আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া সূর্যরশ্মি, ক্লোরোফিল ও জলের সাহায্যে কার্বো-হাইড্রেট প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। উদ্ভিদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় মানুষ যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে, বাতাস সেই পরিমাণ অক্সিজেন উদ্ভিদ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, যাহা প্রাণীদের জীবনধারণের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে। আগুনের সাহায্যে কোন কোন জায়গায় জঙ্গল সাফ করিবার পদ্ধতি অবলম্বন এবং জ্বালানী হিসাবে কাঠ, কয়লা ও তরল বা গ্যাসীয় জ্বালানীর ব্যবহারও বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশগুলিতেই কলকারখানা বৃদ্ধির অর্থ হইল বাতাসে ধোঁয়া ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এই ধোঁয়া—যাহার মধ্যে সূক্ষ্ম কার্বন ও ধূলিকণা মিশ্রিত থাকে—কুয়াশার সময় 'ধোঁয়াশার' সৃষ্টি করিয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য পৃথিবীর যে সব দেশে তাপমাত্রা রাত্রিবেলায় খুব তাড়াতাড়ি হ্রাস পায়, সেই সব দেশে কলকারখানা হইতে আগত ধোঁয়া ও অন্যান্য গ্যাস বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে থাকিয়া যায় এবং শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। অদূরে পাহাড় থাকায় এবং কলকারখানার সমৃদ্ধ হওয়ায় ফলে লস্ এঞ্জেলস্ এইরূপ একটি অভিশপ্ত শহর, যেখানকার মানুষকে দূষিত বায়ুসেবনের জন্য মাঝে মাঝে নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের নানারকম জটিল রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

অনেক ধাতু, যেমন—তামা, দস্তা, সীসা ইত্যাদি উহাদের সালফাইড আকরিক হইতে নিষ্কাশিত হয়। সালফাইড আকরিকের বিগলনের সময় প্রচুর পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়, যাহা প্রাণী ও উদ্ভিদের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া সালফার ডাই-অক্সাইড যে অ্যাসিড উৎপন্ন করে, তাহা পাকস্থলীর ক্ষ-

---

* ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টি-ভেশন অব সায়েন্স, যাদবপুর, কলিকাতা-32

সাধনে খুবই তৎপর। ইহা ছাড়া সালফার ডাই-অক্সাইডের জন্য উদ্ভিদদেহেরও দুরবস্থার শেষ থাকে না। যে সকল স্থানে সালফাইড আকরিক হইতে ধাতু নিষ্কাশিত হয়, সেই সকল স্থানের আশেপাশে উদ্ভিদের পাতাগুলিকে প্রথমতঃ সাদা হইতে দেখা যায় এবং পরে কিছুদিনের মধ্যেই অধিকাংশ উদ্ভিদের মৃত্যু হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস কৃষিকার্যের পক্ষেও প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ক্যানাডার বৃটিশ কলম্বিয়ায় অবস্থিত একটি সালফাইড বিগলন চুল্লীর কথা উল্লেখ করা যায়। ক্যানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার নিকটে অবস্থিত এই বিগলন চুল্লী হইতে আগত গ্যাসসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিকার্যের প্রচুর ক্ষতি করায় বর্তমানে এই ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের কথা শোনা যায়। সালফার ডাই-অক্সাইড অপেক্ষা অধিক গুণে বিষাক্ত আর একটি গ্যাসের নাম হইল হাইড্রোজেন ফ্লুওরাইড। অ্যালুমিনিয়াম এবং আরও কয়েকটি ধাতু নিষ্কাশনের সময় এই গ্যাসটি বাতাসে মিশ্রিত হয়। 1930 সালে বেলজিয়াম শহরে এই গ্যাসের জন্যে বেশ কয়েকজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

1952 সালের ডিসেম্বর মাসেই লণ্ডন শহরে প্রায় চার হাজার ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর কারণ নির্ধারণে বিজ্ঞানীরা এখনও একমত নন। অনেকে সালফার ডাই-অক্সাইডকে দোষী সাব্যস্ত করেন আবার আমেরিকার কয়েকজন বিজ্ঞানী মনে করেন, বাতাসে মিশ্রিত গ্যাসোলিন বাষ্পের দ্বারাই এই সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। এক সময় লস এঞ্জেলসে ব্যাপকভাবে যে রোগ দেখা দিয়াছিল, তাহার জন্যও গ্যাসোলিন বাষ্পকে দায়ী করা হয়। আজকাল মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন ও অন্যান্য অনেক যানবাহনে গ্যাসোলিনকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্যাসোলিন সম্পূর্ণরূপে জারিত না হইয়া বাতাসে মিশ্রিত হয়। বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইডের সংস্পর্শে আসিয়া গ্যাসোলিন ওজোনাইড ও পার-অক্সাইড গঠন করে, যাহা উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। সান ফ্রান্সিসকো, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, কোপেনহাগেন, ক্যালিফোর্নিয়া, প্যারিস এবং আরও অনেক দেশ গ্যাসোলিন বাষ্পের কবলে পড়িয়া নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পরমাণু-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পারমাণবিক, হাইড্রোজেন এবং আরও অনেক উন্নত ধরণের বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধরণের বোমাগুলির বিস্ফোরণ বাতাসকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে দূষিত করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে 500টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও চীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। পারমাণবিক বিস্ফোরণ সাময়িক বিপর্যয় ছাড়া সুদূর ভবিষ্যতেও অনেক বিপর্যয় ডাকিয়া আনে। 1945 সালের 6ই এবং 10ই অগাস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বিস্ফোরিত বোমা দুইটির কথাই আলোচনা করা যাক। বিস্ফোরণের ফলে অসংখ্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সৃষ্টি হইয়াছে, যেগুলি ভাসমান অবস্থায় বাতাসে অনির্দিষ্ট কাল থাকিয়া যাইবে। বৃষ্টি, কুয়াশা ইত্যাদির সঙ্গে এই আইসোটোপগুলি ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসে এবং সংহারক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। Sr^{90} আইসোটোপটির কথাই ধরা যাক। খাদ্যের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে এই আইসোটোপটি হাড়ে ক্যান্সারের সৃষ্টি করে—যাহার এখনও কোন উপযুক্ত চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্তমানে ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়িয়া যাওয়ার কারণ হিসাবে অনেকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ও

গ্যালোপিন বাম্পকে বলিয়া থাকেন। 1949 সালে রাশিয়া পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইবার পর 1952 সালে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমেরিকা কর্তৃক হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং চীনও যথাক্রমে 1952, 1960 এবং 1964 সালে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। এই সকল বোমার বিস্ফোরণেই যে বাতাসকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে দূষিত করিয়াছে—সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে যে বিজ্ঞানের জন্ম, সেই বিজ্ঞানের অপব্যবহারই আজ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে দূষিত করিয়াছে।

কৃষি-সংবাদ

সূর্যমুখী

সূর্যমুখীর স্বর্ণকান্তি আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত ফুলের বাগান আলো করে সৌন্দর্য-রসিকের চোখকে আনন্দ দিয়েছে—শিল্পী, কবি, সাহিত্যিককে জুগিয়েছে প্রেরণা। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে সূর্যমুখীকে ব্যবহারিক জগতের মাটিতে, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনা হয়েছে। সন্ধানী মানুষ খোঁজ পেয়েছে সূর্যমুখীর ভিতর লুকিয়ে-থাকা ভোজ্য তেলের বিরাট উৎসের। ভারতে এখন ব্যাপকভাবে সূর্যমুখীর চাষ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে—একান্ত প্রয়োজনীয় বনস্পতি তেলের চাহিদা পূরণ করবার জন্যে।

সূর্যমুখী থেকে বেশ ভাল মানের ভোজ্য তেল পাওয়া যায়। এর গন্ধ ও স্বাদ বেশ ভাল এবং অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। অন্য যে কোন ভোজ্য তেলের মতই এটি ব্যবহার করা যায়। বনস্পতি ও সাবান উৎপাদন শিল্পে এই তেল কাজে লাগে। সূর্যমুখীর তেল বের করবার জন্যে কোন বিশেষ কৌশলের দরকার হয় না। অন্যান্য তৈলবীজের মতই যে কোন তেলকলে কিংবা ঘানিতে পিষে তেল বের করা যায়। সূর্যমুখীর বীজের খৈলে শতকরা 40-45 ভাগ পর্যন্ত উঁচু মানের প্রোটিন থাকে, যা আমাদের পশু-পাখীর পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সূর্যমুখীর মূল বাসস্থান উত্তর আমেরিকা হলেও রাশিয়াতেই এর চাষ বেশী ব্যাপকভাবে করা হয়। সেখানে সূর্যমুখীই উদ্ভিজ্জ তেলের প্রধান উৎস। সমস্ত পৃথিবীতে উৎপাদিত সূর্যমুখীর তেলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই রাশিয়া উৎপাদন করে। রাশিয়ার কৃষি-বিজ্ঞানীরা এই ফুলের বীজের আবরণের স্থূলত্ব কমিয়ে তেলের পরিমাণ শতকরা 28 ভাগ থেকে 50 ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন এই তেলের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাশিয়া থেকে চারটি প্রধান জাতের সূর্যমুখী আমদানী করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে দেখা হয়।

সূর্যমুখীর চাষ সব অঞ্চলেই করা যেতে পারে। তবে পরীক্ষামূলক চাষ থেকে দেখা গেছে যে, মধ্যভারত, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, রাজস্থান ও পশ্চিম বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে তৈলবীজ হিসাবে সূর্যমুখীর চাষ বেশ লাভজনক হতে পারে।

বেলে দোআঁশ থেকে কালো ভারী মাটি পর্যন্ত সব ধরণের জমিতেই সূর্যমুখীর চাষ হতে পারে। তাই যে সব মাটিতে চীনাবাদামের চাষ ভাল হয় না, সেখানে সূর্যমুখীর চাষ করা যায়। তবে অম্ল ও ক্ষারযুক্ত মাটি এই ফসল চাষের জন্যে অনুপযুক্ত। চাষের জমি আর্দ্রতা সংরক্ষণের উপযুক্ত ও ভাল জলনিকাশী হওয়া দরকার।

সূর্যমুখী খুব বেশী ঋতুনির্ভর নয়। প্রয়োজনমত সেচ দেবার ব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই সূর্যমুখীর চাষ করা যেতে পারে। এই ফসল তৈরি হতেও কম সময় লাগে। বিভিন্ন ঋতুর উপর ফসল পাকবার সময় নির্ভর করে। শীতে সবচেয়ে বেশী সময় প্রায় 130 দিন, বসন্তকালে 115 দিন এবং গরমে মাত্র 90 দিনের মধ্যেই ফসল তৈরি হয়ে যায়। এর ফলে জমি তাড়াতাড়ি খালি পাওয়া যায়। কাজেই সূর্যমুখীর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আলু, আখ—এমন কি, লঙ্কা প্রভৃতির সঙ্গেও চাষ করা যেতে পারে। এছাড়া মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে যদি খরিফের ফসল দেরীতে বুনতে হয়, তাহলে চীনাবাদামের বদলে সূর্যমুখীর চাষই বেশী লাভজনক।

সূর্যমুখীতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া দরকার। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা সেচযুক্ত এলাকায় হেক্টর প্রতি 40 কি.গ্রা. নাইট্রোজেন, 60 কি.গ্রা. ফস্ফরাস ও 40 কি.গ্রা. পটাশের প্রয়োগ অনুমোদন করেছেন।

রোগ-পোকার সংক্রমণ ও চারাগাছের মৃত্যুর হার কমাবার জন্যে জমিতে বোনবার আগে সূর্যমুখীর বীজ ডায়াথেন এম 45 (0.3%) এবং এগ্রোসান জি. এন (0.3%) দিয়ে শোধন করে নেওয়া দরকার। প্রতি হেক্টর জমির জন্যে 8-10 কি.গ্রা. বীজই যথেষ্ট। চাষের আগে জমিতে ভালভাবে হাল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। মাটিতে আর্দ্রতা কম হলে হাল্কাভাবে সেচ দিতে হবে। বীজগুলি হল-রেখায় গভীরে এমনভাবে লাগাতে হবে, যাতে চারাগাছগুলির পরস্পরের মধ্যে 30 সে.মি. এবং সারিগুলির মধ্যে 60 সে.মি. করে দূরত্ব থাকে।

সূর্যমুখীতে উপযুক্তভাবে সেচ দেওয়া বিশেষ দরকার। খরিফে যদি যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাহলে সেচ না দিলেও চলে। রবি এবং গরমের ফসলে দু-তিন বার সেচ দেওয়া যথেষ্ট। ফুল ধরা থেকে পক্কবীজ তৈরি হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় সূর্যমুখী ফসলে জলের গুরুত্ব খুব বেশী। বীজ বোনবার সময়ে জমিতে আর্দ্রতা থাকা বিশেষ দরকার।

বীজ লাগাবার প্রথম 4-6 সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্যমুখীর বাড় খুব ধীরে ধীরে হয়। উপযুক্ত আলো বাতাস চলাচলের জন্যে জমিতে নিয়মিত ভাবে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে ফেলা দরকার।

ফসল তৈরি হয়ে গেলে ফুলের পিছন দিকের রং বাদামী হয়ে যায়। তখন সেগুলি কেটে নিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ বের করে ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শতকরা 10 ভাগ পর্যন্ত আর্দ্রতা থাকলেও বীজ নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়। যে কোন তেল কল বা ঘানিতে দিয়ে এই বীজ থেকে তেল বের করে নেওয়া যায়।

ঠিকমত যত্ন নিয়ে চাষ করা হলে সূর্যমুখী থেকে প্রতি হেক্টরে গড়ে প্রায় 20 কুইন্টালের মত ফসল পাওয়া যেতে পারে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি ভবন, নতুন দিল্লী]।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ভারত ও হিমালয়ের সৃষ্টি-রহস্যের উৎস-সন্ধান

ভারত উপমহাদেশ কি এখনও সরে সরে যাচ্ছে? না, প্রকৃত পক্ষে তা নয়, এই ভেসে যাওয়া বন্ধ হয়েছে 6 কোটি বছর আগে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, যার মাধ্যমে এক হয় তা সঠিকভাবে জানা গিয়েছে।

কোন কোন সমুদ্রসংক্রান্ত ভূ-বিজ্ঞানী বহু কালই এই ধারণা পোষণ করে এসেছেন যে, ভারত ছিল একদা গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড নামে দক্ষিণ গোলার্ধের এক বিরাট মহাদেশের অংশ। দশ কোটি বছর আগে ঐ মহাদেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপর সেই অংশসমূহ থেকেই গড়ে ওঠে ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-মেরু অঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। ভারত ভীষণ বেগে উত্তর দিকে সরতে থাকে এবং এশীয় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এসে তার প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। এই ভীষণ সংঘর্ষের ফলে সুপ্রাচীন সমুদ্রগর্ভের বালি, কাদা ও অন্যান্য উপকরণ উপরে উঠে আসে, সৃষ্টি হয় পৃথিবীর উচ্চতম 29 হাজার ফুট গিরি-চূড়াসমন্বিত হিমালয় পর্বত।

সমুদ্র বিজ্ঞানীর ঐ গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অস্তিত্ব ও ভারতের সরে যাবার বিষয়টি প্রকৃত তথ্যের অভাবে পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্যের বৈজ্ঞানিক সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন নানাদেশের একদল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। এরা গভীর সমুদ্রে তথ্যানুসন্ধানী পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। লাজোলার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ক্রিপ্স ইনষ্টিটিউশনের উদ্যোগে ইউ. এস. ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের নির্দেশে এই পরিকল্পনাকে কার্যক্ষেত্রে রূপদান করা হচ্ছে। বিদ্রুপাত্মক নামে গ্লোমার চ্যালেঞ্জার নামে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানী জাহাজে এই সকল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে এবিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। এই জন্যে ঐ সকল সমুদ্রের গভীরে খননকার্য চালানো হচ্ছে।

এই জাহাজটি গত জানুয়ারী মাসে অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রিম্যান্টল বন্দর থেকে কলম্বো যায়। কলম্বো আসবার পথে ভারত মহাসাগরের তলদেশে আটটি স্থানে 2534 ফুট নীচ পর্যন্ত খনন-কার্য চালানো হয়। ঐ মহাসাগরে তখন কোন কোন স্থানে জলের গভীরতা ছিল 20 হাজার ফুটেরও বেশী। কলম্বো থেকে ঐ জাহাজটি যাচ্ছে আরব ও লোহিত সাগরে তথ্যানুসন্ধানী অভিযানে।

সংগৃহীত তথ্যের প্রাথমিক পর্যালোচনা ও সমীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা এই সম্পর্কে উল্লিখিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাদের ধারণা, ভারত অষ্ট্রেলিয়া থেকে যে উত্তর দিকে ক্রমেই সরে যাচ্ছিল, তা বন্ধ হয়েছে প্রায় 6 কোটি বছর আগে।

গ্লোমার চ্যালেঞ্জারের এই বিজ্ঞানীরা হিমালয়ের সেই সকল বালি ও কাদার সন্ধান পেয়েছেন সুদূরের অদূরবর্তী সমুদ্রের তলায়। হিমালয় পর্বত থেকে বহু বড় বড় নদী বঙ্গোপ-সাগরে এসে পড়েছে এবং সকল নদীই এই বালি, কাদা সমুদ্রে বয়ে নিয়ে এসেছে।

এই সকল বিজ্ঞানী ভারত মহাসাগরের তলায় 3000 মাইল দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ শিখরেরও সন্ধান পেয়েছেন। এই সকল পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে কয়লা, মেরুদণ্ডী জীবের শক্ত খোলা প্রভৃতি। এই সকল আছে 5000 ফুট জলের

মা[illegible]কে। এখানে ছিল একদা আরেক পর্বতমালা এবং এই সবের সৃষ্টি হয়েছিল 6 কোটি 50 লক্ষ বছর আগে।

কলম্বো থেকে গ্লোমার চ্যালেঞ্জার আরব সাগরের দিকে যাত্রা করেছে। সেই সাগরেও বিজ্ঞানীরা তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন, গর্ত খনন করেছেন। ঐ সকল গহ্বর থেকে সংগৃহীত উপাদান ভারত মহাসাগর এবং হিমালয় পর্বতের আদিম ইতিহাসের উপর আলোকপাত করতে পারে বলে তাদের ধারণা।

জনৈক বিজ্ঞানী এই প্রসঙ্গে বলেন যে, হিমালয় পর্বত গঠনের সময়েই সিন্ধুনদ এই বিরাট আকার ধারণ করে এবং এই নদই হিমালয় পর্বত থেকে মৃত্তিকা ও অন্যান্য উপাদান বয়ে নিয়ে যায় আরব সাগরে, করাচীর দক্ষিণাঞ্চলে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিপুল পরিমাণে সেই মৃত্তিকা সেখানে জমা হয়েছে। ঐ জায়গায় নানা স্থানেই খননের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গ্লোমার চ্যালেঞ্জারের বিজ্ঞানীরা এবার লোহিত সাগরে তথ্যানুসন্ধানে বের হয়েছেন। সেই সাগরের গভীরে বিপুল পরিমাণে কোন তলানি সঞ্চিত হয় নি। মহাদেশসমূহ যে সরে সরে যাচ্ছে, সে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের বিষয়ে এই ব্যাপারটি খুবই সহায়ক হতে পারে। লোহিত সাগরের দৈর্ঘ্য 1200 মাইল। পৃথিবীর তরুণতম সমুদ্রের এটি অন্যতম। বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, লোহিত সাগরের তলায় একটি সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ ও গভীর ফাটল রয়েছে। সেখানে কোন তলানি নেই ও এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে ভূকম্পন হয়ে থাকে। সমুদ্র বিজ্ঞানীরা এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, আরব রাষ্ট্র ও আফ্রিকা এই ফাটল থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। 20 কোটি বছর পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাও এমনভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

লোহিত সাগরের মধ্যাঞ্চলে উষ্ণ ও লবণাক্ত জলভাণ্ডার বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। ঐ মধ্যাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধাতব সম্পদ রয়েছে। 1960-এর প্রথম দশকের দিকেই এই উষ্ণ জলধারার সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সকল জলাশয়ের উপরিভাগে রয়েছে নানা অপূর্ব রঙের রঙীন তলানি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বিভিন্ন ধাতব পদার্থই রয়েছে এর মূলে। ভবিষ্যতে এই ধাতব সম্পদ মানুষের কাজে লাগাবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে — 1973

ষড়্‌বিংশতিতম বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা
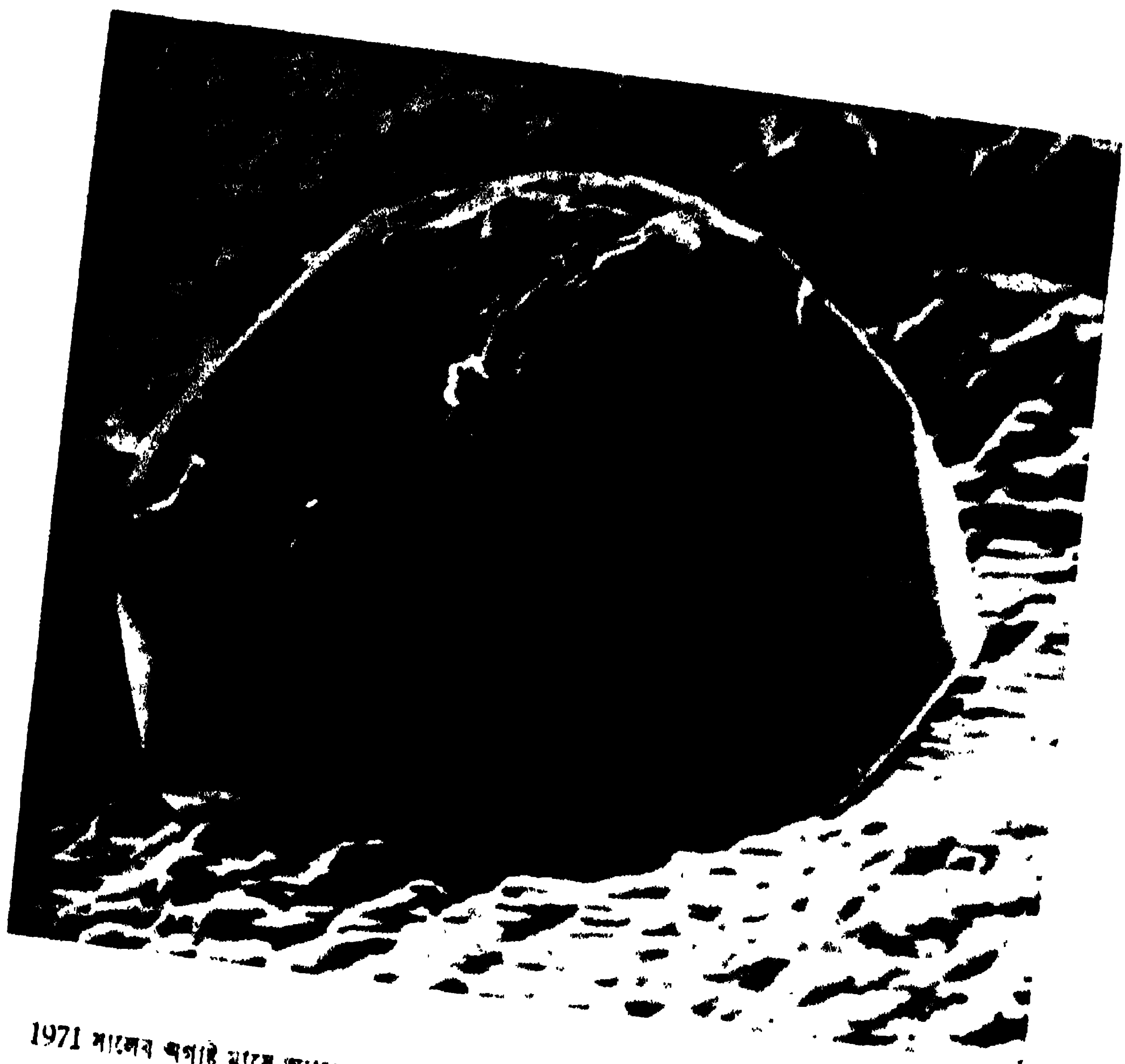
শনিগ্রহ

একথা সকলেরই জানা যে, বিশাল জ্যোতিকমণ্ডল গড়ে উঠেছে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র-মণ্ডলী প্রভৃতি নিয়ে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের পার্থক্য হলো—গ্রহের নিজস্ব কোন আলো নেই, কিন্তু নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে। এতদ্ব্যতীত নক্ষত্র গ্রহ অপেক্ষা আকারে অনেক বড়। সন্ধ্যার পরে আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য আলোর টুকরা দেখা যায়। এদের মধ্যে যেগুলি মিটমিট করে সেগুলি হলো নক্ষত্র। নক্ষত্রমণ্ডলী অনেক দূরে থাকায় এই রকম মিটমিট করে ; কিন্তু গ্রহগুলি অপেক্ষাকৃত কাছে থাকায় তাদের আলো স্থির। পৃথিবী হলো সূর্য নামক নক্ষত্রের একটি গ্রহ। তাছাড়া সূর্যের আরও আটটি গ্রহ আছে, যারা পৃথিবীর মত সূর্যের চারদিকে নিজ নিজ কক্ষপথে অবিরত ঘুরে চলেছে। এই গ্রহসমূহের মধ্যে শনি অন্যতম। এই শনিগ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 29½ বছর। এই শনিগ্রহকে মালার মত বেষ্টন করে আছে এক আশ্চর্য বলয়।

পৃথিবীর মত শনিরও উপগ্রহ আছে। তবে পৃথিবীর মত একটি নয়, তার আছে নয়টি উপগ্রহ। অবশ্য এক সময় শনির দশটি উপগ্রহ ছিল। কিন্তু তার নিকটবর্তী উপগ্রহটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে এবং শনির চারপাশে বলয়ের সৃষ্টি করেছে। এখন শনির সর্বাপেক্ষা কাছে যে উপগ্রহ আছে, তার নাম মিমাস (Mimas)। এর ব্যাস 300 মাইল এবং শনিগ্রহ থেকে এটা 115,400 মাইল দূরে আছে। কিন্তু আমাদের পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব 289,000 মাইল। শনির সর্বাপেক্ষা দূরের উপগ্রহ হলো ফোয়েব (Phoebe)। এটি শনিগ্রহ থেকে 8,050,000 মাইল দূরে এবং এর ব্যাস 400 মাইল। তাছাড়া শনির অন্যান্য উপগ্রহসমূহের মধ্যে আছে—এনসিলেডাস (Enceladus)—এর ব্যাস 300 মাইল এবং এটি শনিগ্রহ থেকে 148,000 মাইল দূরে আছে। টেথিসের (Tethys) ব্যাস 700 মাইল এবং শনিগ্রহ থেকে এর দূরত্ব 183,000 মাইল। ডাইওনের (Dione) ব্যাস 700 মাইল এবং এটির দূরত্ব শনিগ্রহ থেকে 234,700 মাইল। রীয়ার (Rhea) ব্যাস 1,000 মাইল এবং শনিগ্রহ থেকে এর দূরত্ব 328,000 মাইল। টাইটানের (Titan) ব্যাস 2,600 মাইল এবং শনিগ্রহ থেকে এর দূরত্ব 760,000 মাইল। হাইপেরিয়নের (Hyperion) ব্যাস 250 মাইল এবং এটি শনিগ্রহ থেকে 922,000 মাইল দূরে আছে। আইয়াপিটসের (Iapetus) ব্যাস 800 মাইল এবং শনিগ্রহ থেকে এর দূরত্ব 2,215,000 মাইল।

শনিগ্রহ পৃথিবী থেকে আকার, আয়তন এবং ভরে অনেক বড়। শনির ব্যাস 75,100 মাইল এবং পৃথিবীর ব্যাস প্রায় 8,000 মাইল। তাছাড়া শনি থেকে তার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী উপগ্রহ মিমাসের দূরত্ব, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের অনেক কম। এই কারণে শনি তার উপগ্রহসমূহের উপর প্রচণ্ড আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে থাকে। চাঁদের মহাকর্ষ

বলের জন্যে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। শনি তার পৃষ্ঠের খুব নিকটবর্তী উপগ্রহের উপর প্রচণ্ড আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে। যদি শনির পৃষ্ঠদেশের খুব কাছে কোন উপগ্রহের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তবে সেটি খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। সেটি অসংখ্য খণ্ডে পরিণত হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে শনির চারপাশে বলয়ের সৃষ্টি করেছে। শনিগ্রহের প্রচণ্ড আকর্ষণ বলের দরুণ যেখানে বৃহদাকারের উপগ্রহের অবস্থান সম্ভব নয়, সেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট প্রায় এক মাইল চওড়া এই খণ্ডগুলি স্থায়ী হতে পেরেছে। এই অগণিত পদার্থ-খণ্ডসমূহ শনিকে বেষ্টন করে যে বলয়ের সৃষ্টি করেছে সেটা প্রস্থে 40,000 মাইল, কিন্তু মাত্র 10 মাইল পুরু। শনিগ্রহের চতুর্দিক বেষ্টন করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে। একে বলা হয় বিপদ অঞ্চল (Danger zone)। এই অঞ্চলের ভিতরের দিকে থাকে বলয়গুলি এবং বাইরের দিকে থাকে শনির উপগ্রহমণ্ডলী। উপগ্রহগুলি ঐ বিপদ অঞ্চলের মধ্যে স্থায়ী হতে পারে না, ভেঙে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায়। বলয়ের উজ্জ্বল অংশের তিনটি ভাগ আছে। তাদের নাম বহির্বলয় (Outer ring), অন্তর্বলয় (Inner ring) এবং ক্রেপ বলয় (Crepe ring)। এই ক্রেপ বলয়টি অন্তর্বলয়ের মধ্যে অবস্থিত। বলয়গুলি তুষারাবৃত থাকে বলে সূর্যের আলো এদের উপর প্রতিফলিত হওয়ায় এদের খুব উজ্জ্বল দেখায়।

বলয়গুলির মধ্যে অন্তর্বলয় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম। শনির উপর যে সূর্যালোক পড়ে, তাতে গ্রহের উপর বলয়গুলি ছায়ার সৃষ্টি করে। অন্তর্বলয়ের মধ্যে পদার্থের পরিমাণ বেশী। এই কারণে সেটা অস্বচ্ছ। এই অস্বচ্ছতার জন্যে অন্তর্বলয়ের ছায়া খুব তীক্ষ্ণ (Sharp) হয়। কিন্তু বহির্বলয়ের মধ্য দিয়ে কিছু সূর্যালোক চলে যেতে পারে বলে বোঝা যায় যে, তার মধ্যস্থিত পদার্থখণ্ডগুলি একত্রে গায়ে গায়ে লেগে থাকে না। ক্রেপ বলয় প্রায় স্বচ্ছ।

বলয়গুলির অন্তর্বর্তী শূন্যতার মধ্যে পদার্থখণ্ডের কোন অস্তিত্ব নেই। এই শূন্যস্থানকে বলা হয় ক্যাসিনি অঞ্চল (Cassini division)। এটি অন্তর্বলয়কে পৃথক করে দিয়েছে। এই অঞ্চলটি শনির উপগ্রহমণ্ডলী, বিশেষ করে মিমাসের আকর্ষণ বলের জন্যে সর্বদা শূন্য থাকে। চাঁদ যেমন আমাদের পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে একমাস সময় নেয়, শনির উপগ্রহগুলিও শনিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে একটা নির্দিষ্ট সময় নেয়। যদি ক্যাসিনি অঞ্চলের মধ্যে পদার্থখণ্ড থাকতো, তবে তাদের প্রদক্ষিণ কাল মিমাস উপগ্রহের প্রদক্ষিণ কালের অর্ধেক হতো। অবশ্য শনির অপর দুই উপগ্রহ—এনসিলেডাস এবং টেথিস ক্যাসিনি অঞ্চল উৎপত্তির অপর কারণ। এদের প্রদক্ষিণ কাল ক্যাসিনি অঞ্চলের প্রদক্ষিণ কালের সরল গুণিতক। এনসিলেডাস এবং টেথিসের প্রদক্ষিণ কাল ক্যাসিনি অঞ্চলের প্রদক্ষিণ কালের যথাক্রমে তিনগুণ এবং চারগুণ। আবার ক্রেপ বলয় এবং অন্তর্বলয়ের সীমানা অঞ্চলের প্রদক্ষিণ কাল মিমাসের প্রদক্ষিণ কালের এক-তৃতীয়াংশ। বলয়গুলির প্রত্যেকটি পদার্থখণ্ড শনিগ্রহকে নিজস্ব

কক্ষপথে পরিক্রমা করে এবং এদের প্রদক্ষিণ কাল গ্রহ থেকে এদের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। এই দূরত্ব যত বাড়ে, প্রদক্ষিণ কাল তত বাড়ে, আবার দূরত্ব যত কমে, প্রদক্ষিণ কালও তত কমে আসে। এই কারণে অন্তর্বলয়ের মধ্যস্থিত পদার্থখণ্ডগুলি শনিকে যত কম সময়ে প্রদক্ষিণ করতে পারে, বহির্বলয়ের পদার্থখণ্ডগুলি অত তাড়াতাড়ি পারে না। এই তথ্য জানা গেছে, বলয়গুলি কর্তৃক প্রতিফলিত আলো পরীক্ষা করে। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনই প্রমাণ করে যে, বলয়গুলির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বেগে ঘুরছে। ডপ্‌লার নীতি থেকেই এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়। ডপ্‌লার অবশ্য সর্বপ্রথম শব্দ-তরঙ্গ সম্বন্ধে এই নীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর এই নীতিটা হলো—শ্রোতা এবং শব্দ উৎসের মধ্যের দূরত্ব যদি বাড়ে বা কমে, তবে শ্রোতার মনে হয় শব্দ-উৎসের কম্পাঙ্ক যথাক্রমে কমছে বা বাড়ছে। যেমন—দূর থেকে রেলগাড়ীর হুইসিলের আওয়াজ শুনলে সেটা শ্রোতার কানে তত তীক্ষ্ণ লাগে না, কিন্তু রেলগাড়ী যত কাছে আসে, ততই শব্দের তীক্ষ্ণতা বাড়তে থাকে। এটি আলোক-তরঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বহু দূরবর্তী কোন জ্যোতিষ্ক থেকে যে আলো আমাদের পৃথিবীতে আসছে, সেই আলোকরশ্মি পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, আলোক-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কমছে বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়ছে, তবে বোঝা যাবে যে, জ্যোতিষ্কটি পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আবার যদি দেখা যায় যে, আলোক-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বাড়ছে বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমছে, তবে বুঝতে হবে যে, জ্যোতিষ্কটি পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে।

আমাদের পৃথিবীর চতুর্দিকে যেমন গ্যাসীয় আবহমণ্ডল আছে, তেমনি শনিগ্রহের পৃষ্ঠদেশকে বেষ্টন করে আছে মিথেন এবং অ্যামোনিয়ার ঘূর্ণায়মান মেঘ। শনির নিকটবর্তী গ্রহ বৃহস্পতিকে বেষ্টন করেও ঐ রকম ঘূর্ণায়মান মেঘ আছে। তবে সূর্য থেকে শনির দূরত্ব বৃহস্পতির তুলনায় অনেক বেশী বলে শনি খুব বেশী ঠাণ্ডা। শনির মেঘে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বৃহস্পতি অপেক্ষা খুব কম। এর কারণ হলো, সেখানকার ভীষণ ঠাণ্ডায় অ্যামোনিয়ার বেশীর ভাগই জমে কঠিনে পরিণত হয়েছে। পৃথিবী থেকে শনির যে অংশ দৃশ্যমান, সেই অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির বর্ণালী পরীক্ষা করে শনির বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলির খবর জানা গেছে। কিন্তু গ্রহটির অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের উপাদান সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। শনির ঘনত্ব এতই কম যে, এটি জলে ভাসতে পারে। অন্যান্য গ্রহের তুলনায় শনির ঘনত্ব খুবই কম। এর ঘনত্ব আমাদের পৃথিবীর ঘনত্বের শতকরা 13 ভাগ মাত্র। শনিগ্রহের প্রায় অর্ধেকই হাইড্রোজেনে ভর্তি। পৃথিবীর মত শনিরও নিরক্ষীয় অঞ্চলটা একটু বেশী প্রশস্ত। পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষের চতুর্দিকে একবার ঘুরতে 24 ঘণ্টা সময় নেয়, শনি তেমনি নেয় 10 ঘণ্টা 38 মিনিট।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাল

প্রবাল জিনিষটা আমাদের খুব অপরিচিত নয়। ভূগোলে প্রবাল দ্বীপ ইত্যাদির কথা আমরা পড়েছি, তাছাড়া হাতে প্রবালের আংটি পরবার অভ্যাসও অনেকের দেখা যায়। বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট প্রবাল দেখে পূর্বে মানুষ ধারণা করেছিল যে, প্রবাল এক ধরণের সামুদ্রিক উদ্ভিদ। আজ থেকে প্রায় আড়াই-শ' বছর আগে ফরাসী দেশের ডক্টর পিসোনিল প্রথম প্রমাণ করেন, প্রবাল মোটেই উদ্ভিদ নয়, এক শ্রেণীর পোলিপ জাতীয় জীবন্ত কীট। জীব-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রবাল হচ্ছে সিলেনটারেটা অর্থাৎ একনালীদেহী পর্বের অন্তর্গত জীব। এদের দেহ দুই স্তর কোষের দ্বারা গঠিত এবং খাদ্যগ্রহণ ও দেহের অসার পদার্থ পরিত্যাগ, এই দুটি কাজই এরা সম্পন্ন করে মাত্র একটি নালীপথের দ্বারা।

সমুদ্রের সব জায়গায় প্রবাল দেখা যায় না। সাধারণত: 25° উত্তর অক্ষাংশ থেকে 25° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অর্থাৎ মোটামুটি উষ্ণমণ্ডল নামে পরিচিত অঞ্চলের সমুদ্রে 1000 ফুট গভীরতায় কমপক্ষে 70° ফারেনহাইট উষ্ণতায় পরিষ্কার জলে প্রবাল কীট দল বেঁধে বাস করে। তাছাড়া নরওয়ের উপকূলসংলগ্ন সঙ্কীর্ণ সমুদ্রখাতের গভীর ঠাণ্ডা জলেও এক শ্রেণীর প্রবাল দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। প্রবাল কীট জন্মগ্রহণ করে সাধারণত: মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। জন্মগ্রহণের সময় এক-একটি প্রবাল কীটের ব্যাস হয় মাত্র এক মিলিমিটার। এরপর শরীর থেকে চুনজাতীয় এক রকম পদার্থ বের হয়ে এদের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের চারদিকে নলের মত বহু শাখা-প্রশাখা বের হতে থাকে। ফলে বছর তিনেকের মধ্যেই এদের ওজন দাঁড়ায় 700 গ্র্যামের মত। দৈহিক আকৃতির মত প্রবাল কীটের বংশবিস্তার পদ্ধতিও বড় মজার। পূর্ণাঙ্গ প্রবাল কীটের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে গাছের ডালপালার মত অনেক উপাঙ্গ বের হয়। এদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা হাত, মুখ ইত্যাদি থাকে। পরে সময় ও পরিবেশ অনুযায়ী এই সব উপাঙ্গ মূল কীট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক-একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবাল কীটে পরিণত হয়। কয়েক শ্রেণীর প্রবালের মুখ থেকেও এভাবে প্রবাল কীট জন্মায়। প্রবাল কীটের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— এদের কোন দিন স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায় না—যে জায়গায় জন্মায়, ঠিক সেই জায়গাতেই প্রাণত্যাগ করে। বংশানুক্রমে এই অবস্থা চলবার ফলে এদের মৃতদেহের স্তূপ একটার উপর আরেকটা সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে বিরাট প্রবাল দেয়াল সৃষ্টি করে।

আগে অনেকের ধারণা ছিল, প্রবাল কীট বুঝি নিরামিষাশী জীব। পরে বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষায় সে ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এদের দেহাশ্রিত এককোষী উদ্ভিদ এদের জীবনধারণের পক্ষে খুব উপকারী। এরা সমুদ্রজলের

জলাধার থেকে অক্সিজেন টেনে নিয়ে প্রবাল কীটের দৈহিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রবাল কীটের দেহে অতি ক্ষুদ্র, অথচ ধারালো হুলবিশিষ্ট একাধিক শুঁড় আছে। খুব ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণীকে কাছাকাছি পেলেই প্রবাল কীট তার এই শুঁড় দিয়ে তাদের শিকার করে। প্রবালের এই শিকার ধরা কেবল রাত্রিবেলাতেই চলে। অন্যান্য কীট-পতঙ্গের মত প্রবাল কীটও প্রথমে ডিম প্রসব করে। নিষিক্ত ডিম থেকে শূককীট বের হয়। জন্মের সময় এদের আকার হয় আলপিনের মাথার মত এবং মুখ বা কঙ্কাল দেখা যায় না। শূককীট অবস্থায় এরা এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে না, সমুদ্রস্রোত বা তরঙ্গের আঘাতে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভেসে বেড়ায়। আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত নিরাপদ স্থান খুঁজে পেলে তবেই এদের মুখবিবরের উৎপত্তি হয় এবং দেহের চারদিকে চুনজাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়।

রং, আকৃতি প্রভৃতি অনুযায়ী প্রবালকে একাধিক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ভারত মহাসাগরের মাশরুম কোরালই বোধ হয় সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখতে অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মত বলে এদের এই নাম দেওয়া হয়েছে। মাশরুম কোরালের এক-একটির ব্যাস এক ফুটের মত হয়ে থাকে। জীবিত অবস্থায় দূর থেকে এদের দেখলে নানা রঙে রঙীন বেশ বড় আকারের ফুল বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। আরেক শ্রেণীর প্রবালের নাম সি-পেন অর্থাৎ সমুদ্র-কলম, লম্বায় এরা দশ থেকে বারো ইঞ্চি এবং দেখতে অনেকটা লোমবিশিষ্ট পাখীর পালকের তৈরি কলমের মত। এরা নানা রঙের হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রবালের মধ্যে রেড কোরাল বা লাল প্রবালই সবচেয়ে মূল্যবান বলে পরিচিত। ছোট আকারের এই প্রবালগুলিকে সমুদ্রের তলায় দেখতে অনেকটা গাছ থেকে ঝুলে থাকা লাল ফুলের গুচ্ছ বলে মনে হয়। রেড কোরাল সংগ্রহের জন্যে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কয়েকটি সহরে রত্ন-ব্যবসায়ীরা রীতিমত বড় বড় কিপারী স্থাপন করেছে। এগুলি ছাড়াও লিফ কোরাল, স্টার্ণ কোরাল, টিউব কোরাল ইত্যাদি আরো বহু রকমের প্রবাল দেখা যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল স্তূপ, অর্থাৎ বেলা শৈল, প্রবাল প্রাচীর এবং প্রবাল বলয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইন, সার জন মারে, ডালি প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নিজস্ব তত্ত্ব ও যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু এর কোনটিই পুরাপুরি ও নিখুঁতভাবে এই রহস্যের ব্যাখ্যা করতে পারে নি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলির যাচাই করতে গিয়ে প্রত্যেকটি তত্ত্বেরই কিছু না কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে। তবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডালি 1915 খৃষ্টাব্দে প্রবাল স্তূপের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন—কিছু ত্রুটি থাকলেও সেটিকেই সর্বাধুনিক নির্ভরযোগ্য মতবাদ বলে স্বীকার করা হয়। অধ্যাপক ডালির মতে, হিমযুগের প্রারম্ভে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সম্পূর্ণ বরফে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং সমুদ্রজলের উষ্ণতা ও উচ্চতা দুটিই অকস্মাৎ অতিরিক্ত রকম বৃদ্ধি পায়, ফলে প্রবাল স্তূপগুলিও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বিরাট সমুদ্র তরঙ্গের প্রবল আঘাতে উপকূল ও দ্বীপগুলির চারধারে সিঁড়ির মত অসংখ্য

ধাপের সৃষ্টি হয় এবং উঁচু পর্বতশৃঙ্গগুলিও ক্রমে ক্ষয় পেতে থাকে। হিমযুগের অবসানে সমুদ্রগুলি তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে সমুদ্র-কীট দলে দলে এসে সমুদ্রের জলবেগে সৃষ্ট এই ধাপগুলিতে আশ্রয় নেয় এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের প্রবাল স্তূপ সৃষ্টি করে।

অশোক সেন

পারদর্শিতার পরীক্ষা

নীচে 10টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে—কোন্‌টি সঠিক বলতে হবে। প্রতি প্রশ্নে 10 নম্বর আছে। তুমি মোট যত নম্বর পাবে, সেই অনুযায়ী বিজ্ঞানে তোমার পারদর্শিতার একটা মোটামুটি হিসাব করতে পারবে। 80 বা তার উপরে নম্বর পেলে পারদর্শিতা খুব বেশী, 60 বা 70 পেলে পারদর্শিতা বেশী, 40 বা 50 পেলে পারদর্শিতা হলো চলনসই, আর তার নীচে নম্বর পেলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

1. আকাশে যে রামধনু সচরাচর দেখা যায়, তার সবচেয়ে উপরের অংশের রং হলো

   ক) লাল।

   খ) নীল।

   গ) বেগুনী।

2. চন্দ্রগ্রহণের সময়

   ক) পূর্ণগ্রহণ কখনোই সম্ভব নয়।

   খ) আংশিক গ্রহণ কখনোই সম্ভব নয়।

   গ) বলয়-গ্রহণ কখনোই সম্ভব নয়।

3. জলে ভিজা কাপড় ঠাণ্ডা লাগে, কারণ

   ক) জলের তাপমাত্রা সব সময়ই কম থাকে।

   খ) ভিজা কাপড় থেকে বাষ্পীভবনের লীন তাপ সংগৃহীত হয়।

   গ) কাপড়ের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়।

4. চিনির সরবতের হিমাঙ্ক হচ্ছে

   ক) 0° সেন্টিগ্রেড।

   খ) 0° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে কম।

   গ) 0° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশী।

5. সোডার জলে দ্রবীভূত থাকে
   - ক) হাইড্রোজেন।
   - খ) নাইট্রোজেন।
   - গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড।

6. 22 ক্যারাট সোনায় বিশুদ্ধ সোনা থাকে
   - ক) শতকরা 71.9 ভাগ।
   - খ) শতকরা 79.1 ভাগ।
   - গ) শতকরা 91.7 ভাগ।

7. মনুষ্যদেহে যকৃতের অবস্থান হচ্ছে উদরের
   - ক) মধ্য ভাগে।
   - খ) ডান দিকে।
   - গ) বাম দিকে।

8. ভিটামিন-এ সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আছে
   - ক) কমলালেবুতে।
   - খ) ঢেঁকিছাঁটা চাউলে।
   - গ) কড-লিভার অয়েলে।

9. বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ
   - ক) শতকরা 0.03 ভাগ।
   - খ) শতকরা 0 3 ভাগ।
   - গ) শতকরা 3.0 ভাগ।

10. মানুষের পরিত্যক্ত নিঃশ্বাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ
   - ক) শতকরা 0.45 ভাগ।
   - খ) শতকরা 4.5 ভাগ।
   - গ) শতকরা 45 ভাগ।

(উত্তরের জন্যে 316নং পৃষ্ঠা দেখ)

[illegible] ও [illegible]*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

পৃথিবীর উৎপত্তি

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, আমরা প্রতিনিয়ত চলাফেরা করি, সেই পৃথিবীটা হচ্ছে একটা বিরাট গোলক, যার ব্যাসার্ধ প্রায় 4,000 মাইল। পৃথিবীকে সৌরজগৎ থেকে আলাদা করে দেখলে বিশাল মনে হয়। কিন্তু সৌরজগতে পৃথিবী হচ্ছে সামান্য একটা ছোট গ্রহ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সুদূর অতীতে নিশ্চয়ই কোন এক বিচিত্র ঘটনার মধ্যেই এই পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলীর জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর জন্ম হলো কি করে, এর উৎপত্তি কোথায়? —এই প্রশ্ন সুদূর অতীত থেকেই বিজ্ঞানীমহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং বিজ্ঞানীরা এসম্বন্ধে সঠিক উত্তর খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা ব্যাখ্যা করেছেন—বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মূলতঃ তিনটি প্রকল্পের (Hypothesis) কথা উল্লেখযোগ্য— (ক) নীহারিকা প্রকল্প (Nebular Hypothesis); (খ) অতি ক্ষুদ্র গ্রহ প্রকল্প (Planetesimal Hypothesis) এবং (গ) গ্যাসীয় টাইডাল প্রকল্প (Gaseous Tidal Hypothesis)।

(ক) নীহারিকা প্রকল্প—1755 ও 1796 খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে বিজ্ঞানী কাণ্ট (Kant) ও ল্যাপ্লাস (Laplace) সর্বপ্রথম তত্ত্বগতভাবে পৃথিবীর উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁদের এই তত্ত্বকে নীহারিকা প্রকল্প আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সুদূর অতীতে মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান কোন এক সুবৃহৎ অগ্নিতপ্ত গ্যাসীয় নীহারিকার (Nebula) অস্তিত্ব ছিল। ক্রমিক শীতলীভবনের ফলে এই নীহারিকার সংকোচন ঘটে এবং ফলে এর নিজ অক্ষে ঘূর্ণন গতি (Speed) বেড়ে যায়। যত বেশী শীতল হয়, নীহারিকার তত বেশী সংকোচন ঘটে এবং ঘূর্ণন গতি বাড়তে থাকে। ফলে কেন্দ্রাতিগ বল (Centrifugal force) ক্রমশঃ বেড়ে যায় এবং নীহারিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল (Equatorial zone) ফুলে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বলয় (Ring) নিহারিকার পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বলয়ের পদার্থ একত্রিত হয়ে গোলকের আকার ধারণ করে এবং নীহারিকার চারদিকে ঘুরতে থাকে পূর্বের বলয়-পথে (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঠিক একইরূপে দশটি বলয়ের জন্ম হয়েছে। এদের মধ্যে নয়টা আবার বিভিন্ন গ্রহের আকার ধারণ করেছে এবং অবশিষ্ট একটা বলয় টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে গিয়ে নক্ষত্ররাশির সৃষ্টি করেছে। নীহারিকার অবশিষ্ট উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত কেন্দ্রীয় পদার্থ সূর্যের জন্ম দিয়েছে। এভাবেই সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছে। এখানে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না যে, গ্রহরাশি (Planets) প্রথমে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল এবং

ক্রমান্বয়ে ঠাণ্ডা হবার কালে এগুলি প্রথমে তরল এবং শেষ পর্যন্ত কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। সুদীর্ঘ 200 বছর যাবৎ বিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এই প্রকল্প বিজ্ঞানীমহলে ক্রমশঃই অসমর্থনযোগ্য হয়ে উঠেছে; কারণ এই প্রকল্প সৌরজগতে

1নং চিত্র
নীহারিকা প্রকল্প
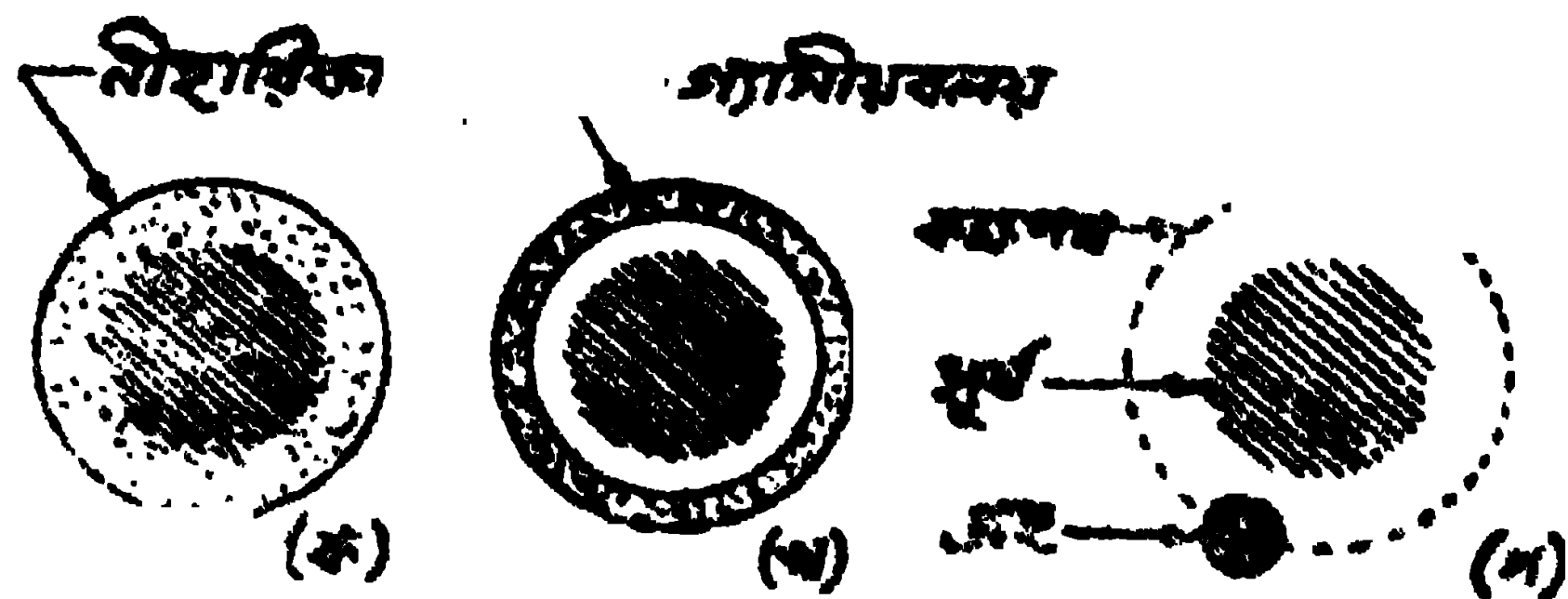
কৌণিক ভরবেগের অবিনাশিতা সূত্রকে (Principle of conservation of angular momentum) সিদ্ধ করে না। এছাড়া নীহারিকা প্রকল্প যদি নির্ভুল হতো, তবে প্রাচীন নীহারিকার ধ্বংসাবশেষ, কেন্দ্রীয় অংশ যেটাকে আমরা সূর্য বলে জেনেছি, তা বর্তমানে আরও তীব্রবেগে ঘুরতে থাকবার কথা এবং ঠিক একইভাবে অন্য আর একটা বলয় এবং পরে তা থেকে ভিন্ন গ্রহের জন্ম নেওয়াই স্বাভাবিক হতো।

(খ) অতি ক্ষুদ্র গ্রহ প্রকল্প—বহুকাল পরে 1904 খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চ্যাম্বারলিন (Chamberlin) এবং মলটোন (Moulton) পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও বেশী সমর্থনযোগ্য প্রকল্পের অবতারণা করতে সক্ষম হন। এই প্রকল্পকে অতি ক্ষুদ্র গ্রহ প্রকল্প নামে অভিহিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের মতে, বহু প্রাচীন কালে সূর্য ও অন্য কোন এক সুবৃহৎ নক্ষত্রের মধ্যে পরস্পর প্রতিক্রিয়ার (Mutual interaction) ফলেই বিভিন্ন গ্রহের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্পে জানা যায় যে, সুবৃহৎ আকারের কোনও এক নক্ষত্রের ক্রমশঃ সূর্যের কাছে এগিয়ে আসবার ফলে সূর্যের উপরিতলে ঢেউয়ের আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু-নীচু বিকৃতি দেখা যায়। এগুলি শেষ পর্যন্ত গ্যাসীয় বোল্টের আকারে সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং বহু দূরে দূরে অবস্থান করে। গ্যাসীয় সৌর পদার্থের উপাদানে গঠিত এসব বোল্টগুলি ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ অতি ক্ষুদ্র গ্রহে (Planetesimals) পরিণত হয়। এই অতি ক্ষুদ্র গ্রহের ঝাঁক বিভিন্ন ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে (Elliptical orbit) সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং এভাবে প্রদক্ষিণ করতে করতে কোন এক সময়ে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে এদের মিলন ঘটে। এভাবে অতি ক্ষুদ্র গ্রহরাশি নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বৃহৎ আকারের গ্রহে রূপান্তরিত হয়। অতি ক্ষুদ্র গ্রহরাশি চলবার পথে

নিজেদের মধ্যে প্রবলবেগে ধাক্কা খায় এবং নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে প্রচুর তাপের অভ্যুদয় ঘটায়। এই তাপ পরবর্তী ধাক্কা খাবার আগেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বভাবতঃই সৃষ্ট গ্রহ সর্বদাই কঠিন আকারে থাকতে সক্ষম হয়। যদি কোনও সময় অতিক্ষুদ্র গ্রহের মধ্যে ধাক্কা খাবার প্রবণতা বেড়ে যায় এবং উদ্ভূত তাপ যদি তাড়াতাড়ি বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তবে গ্রহগুলি গলিত পদার্থে পরিণত হয় এবং মাঝে মাঝে উল্কা-পিণ্ডের আকারে ঝরে পড়ে (2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।
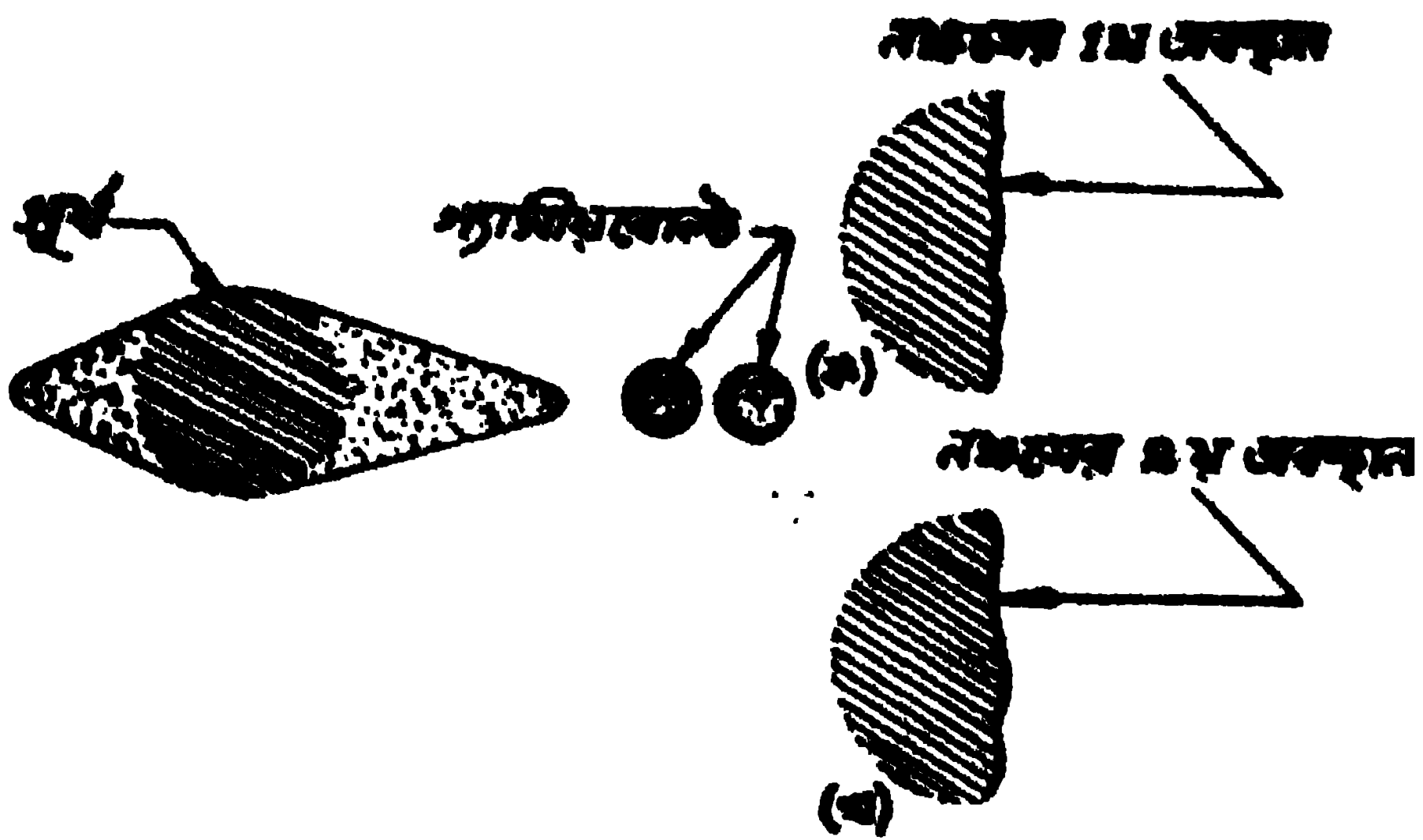
2নং চিত্র
অতি ক্ষুদ্র গ্রহ প্রকল্প

(গ) গ্যাসীয় টাইডাল প্রকল্প — এই প্রকল্প সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য। এই প্রকল্পের স্রষ্টিকর্তা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জিন্স (Jeans) এবং জেফ্রি (Jeffrey)। এই প্রকল্প (খ)-এ বর্ণিত প্রকল্প অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন। জিন্স এবং জেফ্রির মতবাদ অনুযায়ী—সুদূর অতীতে কোনও এক সুবৃহৎ নক্ষত্র শূন্যে নিজের পথে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের সান্নিধ্যে হঠাৎ এসে পড়ে। এই সুবৃহৎ নক্ষত্র আস্তে আস্তে যতই সূর্যের কাছে অগ্রসর হয়, ততই এক ধরণের আকর্ষণজনিত বল (Tidal pull) সূর্যের উপরিতলে অনুভূত হতে থাকে এবং সূর্যের উপরিতলের কিছু অংশ এই টানে স্ফীত হয়। নক্ষত্র যতই সূর্যের কাছে আসতে থাকে, ততই এই টান বেড়ে যায় এবং তার ফলে স্ফীত অংশ ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে যায়। সূর্যের কাছে নক্ষত্রটি চরম সীমায় পৌঁছাবার পর নক্ষত্র নিজ কক্ষপথে আবার সূর্য থেকে পিছিয়ে যেতে সুরু করে। ঠিক এমন সময়ে সূর্যের উপরিভাগের স্ফীত অংশ নক্ষত্রের প্রচণ্ড আকর্ষণশক্তির ফলে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিপের মত বিশেষ আকার ধারণ করে—মাঝখানটা মোটা ও দুই প্রান্ত সরু। এই প্রচণ্ড ভারী গ্যাসীয় বিচ্ছিন্ন অংশ প্রকৃতিতে একেবারেই অস্থায়ী এবং এটা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। সর্বসমেত এভাবে দশটি টুকরার সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলির মধ্যে নয়টি হচ্ছে বিভিন্ন গ্র

জন্মদাত্রী। অবশিষ্ট একটি অংশ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে গ্রহাণুপুঞ্জের (Planetoids) জন্ম দিয়েছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গোলকের আকার ধারণ করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে প্রথমে তরল ও পরে কঠিন রূপ ধারণ করে(3নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। তদানীন্তন কালে এই প্রকল্প বিজ্ঞানীমহলে বেশ আদৃত হয়েছিল এবং বিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

3নং চিত্র
গ্যাসীয় টাইডাল প্রকল্প
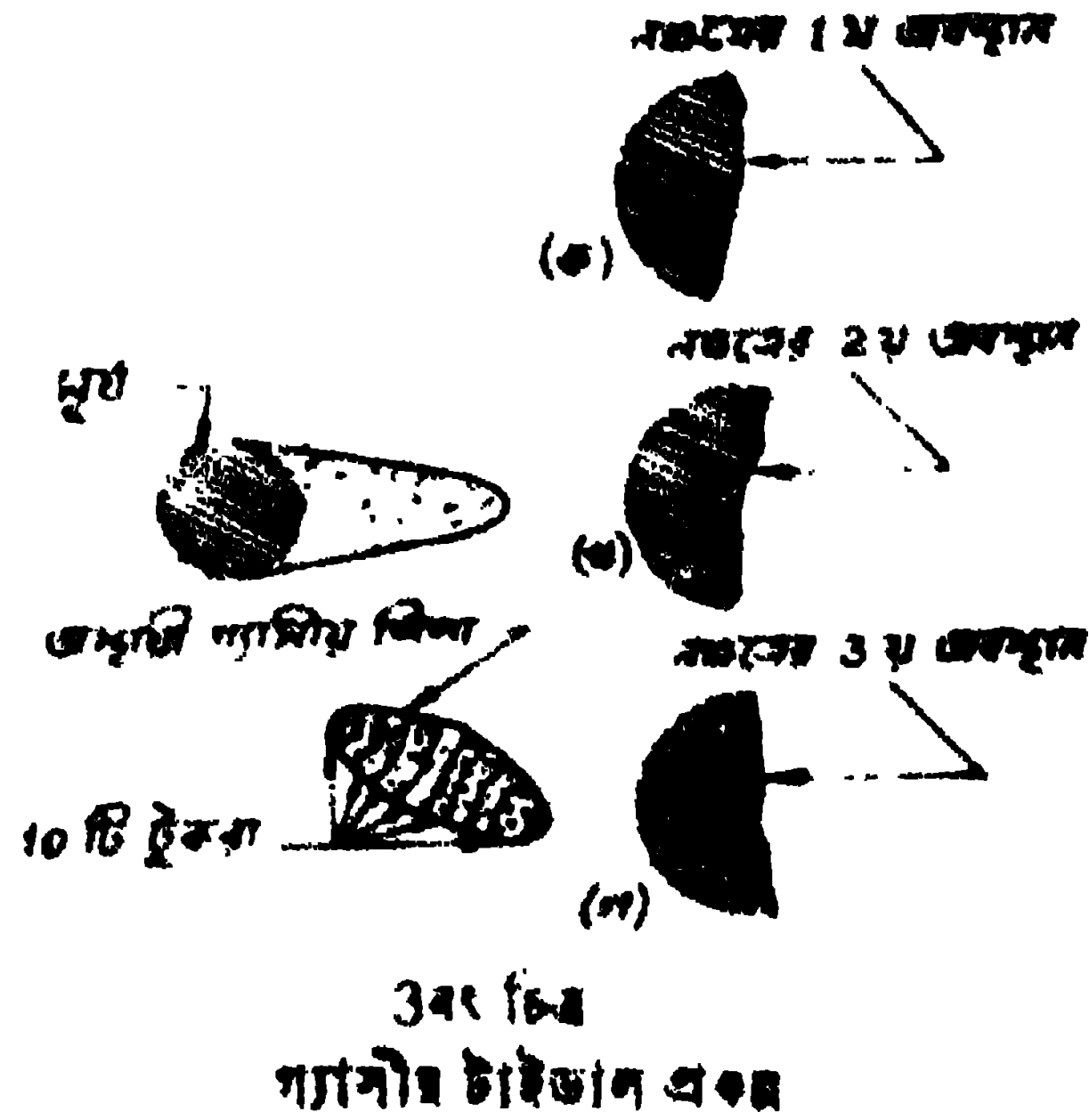
বহুকাল পরে এই প্রকল্পও ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ওটো শ্মিড্ট্ (Otto Schmidt) এবং সি. ভন. ওয়েট্সেকার (C. Von. Weitzsacker) বলেন যে, মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত বিভিন্ন পদার্থ থেকেই এসব গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। ওয়েট্সেকার বলেন যে, এক রকম থালাকৃতির মেঘ (ভিন্নভিন্ন গ্যাসকণা যার উপাদান) ক্রমাগত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। প্রদক্ষিণকালে মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন গ্যাসকণা নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে ক্রমশঃ বড় হতে থাকে এবং এরা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রহে পরিণত হয়। শ্মিড্ট্ স্বীকার করেন যে, প্রথমে বিভিন্ন সাইজের প্রোটো-প্ল্যানেটারি (Proto-Planetary) বস্তুর সমাবেশ ঘটে এবং পরে তাদের পরস্পর সংযুক্ত হওয়াই বিভিন্ন গ্রহ উৎপত্তির মূল কথা। সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব, সৌরজগতে কৌণিক ভরবেগ (Angular momentum) বন্টন, সূর্যের চারধারে বিভিন্ন গ্রহের প্রদক্ষিণের কারণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যা শ্মিড্ট্ প্রকল্পে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও বেশী সন্তোষজনকভাবে আলোচনা করবার জন্যে এখনও বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট চেষ্টা চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত হ'তে পারবেন এবং পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত সুদৃঢ় তত্ত্বের অবতারণা করতে সক্ষম হবেন।

শ্রীশুভঙ্কর দত্ত

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক)
2. (গ)
3. (খ)
4. (খ)
5. (গ)
6. (গ)

[একেবারে বিশুদ্ধ সোনাকে 24 ক্যারাট বলা হয়।]

7. (খ)
8. (গ)
9. (ক)
10. (খ)

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ডায়াবেটিস রোগটা কি ?

কমলেশ চাটার্জী ও দীপেন চৌধুরী, রামপুরহাট।

উত্তর 1. : রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া এবং প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি নির্গমন—এগুলিই ডায়াবেটিস রোগের প্রধান উপসর্গ। এর ফলে শরীরে কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ, প্রোটিন ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের বিপাকের বিভিন্ন রকম গোলযোগ দেখা যায়।

আমরা যে সব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, শরীর সেগুলি বিভিন্ন পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে। এই পরিপাকের জন্যে প্রয়োজনীয় উত্তেজক রস শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের বিটা নামক কোষ থেকে একপ্রকার হর্মোন বা উত্তেজক রস নিঃসরিত হয়। এই উত্তেজক রসকে বলা হয় ইনসুলিন। এই ইনসুলিন কার্বোহাইড্রেটের বিপাকের ক্ষেত্রে একান্তই অপরিহার্য। এর অভাব ঘটলে চিনি বিপাকের জন্যে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। যে কোন কারণে যদি কোন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায়, ইনসুলিনের ক্ষরণও আনুপাতিক হিসাবে

যাতে এবং রক্তে চিনির পরিমাণ একটা স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে এসে পড়ে। এইভাবে ইনসুলিন রক্তে চিনির সমতা বজায় রাখে।

ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে বিটাকোষ থেকে নিয়মিত ইনসুলিনের ক্ষরণ না হওয়ায় রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এভাবে রক্তে চিনি অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গেলে প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা 9

বিবিধ

1973 সালে বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার

1973 সালে বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন যৌথভাবে যথাক্রমে ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তাঁর 'অপরাধী জগতের শব্দকোষ' এবং 'অপরাধী জগতের ভাষা' এবং ডক্টর অমলেন্দু মিত্র তাঁর 'রাঢ়ের সংস্কৃতি' পুস্তকের জন্যে। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য 5000 টাকা। উভয় লেখককে এই পুরস্কার সমান দু-ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে।

অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন স্মারক বক্তৃতা

গত 7ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজস্থ সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ সিমলার হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক পি-এল-ভাটনগর দ্বিতীয় বার্ষিক 'অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ঘূর্ণায়মান তরল ও বায়ব পদার্থ'। কলিকাতা গণিত সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

শিশু সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার

1973 সালে সপ্তদশ জাতীয় শিশু সাহিত্য পুরস্কার প্রতিযোগিতায় শ্রীসুনির্মল রায়, শ্রীসুলেখা বিধান ও শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডলের লেখা বিজ্ঞান-পুস্তক 'জীবনের বিস্ময়' বাংলা ভাষায় পুরস্কার-বিজয়ী পুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য 1000 টাকা।

দ্বিতীয় বার্ষিক ফলিত গণিত গবেষণা আলোচনা-চক্র

গত 4ঠা মার্চ বিজ্ঞান কলেজের সাহা ইনস্টিটিউটে দু-দিনব্যাপী 'প্লাজ্‌মার পদার্থবিজ্ঞান এবং আহিত কণিকার সমাবেশ' সম্পর্কে নিখিল ভারত আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ফলিত গণিতের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন সমবেত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক পি. এল. ভাটনগর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভাষণ দেন।

নিরামিষের মাংস

ইউ. এন. আই. কর্তৃক নূতন দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—মাংস না খেয়েও এবার নিরামিষভোজীরা প্রোটিনের অভাব মেটাতে পারবেন। একজন মার্কিন খাদ্য-বিজ্ঞানী এই নতুন মাংসের আবিষ্কর্তা। এই মাংস তৈরি

হয়েছে শূয়োর থেকে। নিরামিষ মাংস খেতে একেবারে হুবহু সাধারণ মাংসের মত। এতে প্রোটিনের পরিমাণও বেশী।

গামারশ্মি প্রয়োগে মৎস্য-সংরক্ষণ

সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা এ. পি. এন. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—রুশের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের একদল বিজ্ঞানী মৎস্য মজুত ও সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের গামা-বিকিরণ গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর কারদাশেভ ভারত পরিভ্রমণ শেষ করে মস্কো ফিরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভাবা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা একটি গবেষণা জাহাজে চড়ে মাছের উপর গামারশ্মি প্রয়োগ করে কতকগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

গামারশ্মি প্রয়োগ করে সে সব মাছ অল্প তাপের মধ্যে রেখে দেখা গেছে যে, তাদের মূল স্বাদ অটুট থাকে এবং এভাবে দীর্ঘকাল মজুদ রাখাও যায়।

বিকিরণ ব্যবস্থায় রক্ষিত এসব মাছ খেয়ে মানবদেহে কোনরূপ বিরূপ ক্রিয়াও দেখা যায় নি।

বেশী ভিটামিন খাবার কুফল

নতুন দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—অতিমাত্রায় ভিটামিন খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, বৃটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। সোসাইটির সভাপতি মিঃ জে. পি. কার বলেছেন—যখন-তখন ভিটামিন ট্যাবলেট খাবার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। ভিটামিন এ ও ডি তৈরি করবার ব্যাপারে সতর্ক করে দেবার জন্যে তিনি সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ভেষজ প্রশাসন-এর (এফ. ডি. এ.) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দীর্ঘ দিন ধরে বেশী পরিমাণ ভিটামিন-এ খাবার ফলে মস্তিষ্কে চাপ বৃদ্ধি করে এবং এথেকে মস্তিষ্কে টিউমার হতে পারে। অতিমাত্রায় ভিটামিন-এ (যেমন—কড লিভার অয়েল ও হ্যালিবাটলিভার অয়েলে থাকে) খেলে শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি প্রতিহত হতে এবং ভিটামিন ডি-তে মানসিক গঠন বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখা গেছে।

গোবর থেকে প্রোটিন-খাদ্য

নতুন দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—গোবর থেকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রোটিন তৈরির এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই প্রোটিন থেকে গবাদি পশু, শূকর এবং মুরগীর জন্যে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করা যাবে বলে ম্যাঞ্চেস্টারে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

130 ডিগ্রী উত্তাপে গোবর উত্তপ্ত করলে যে সেলুলোজ ওলেগনিন তৈরি হয়, গোবরের বীজাণুগুলি তা খেয়ে নেয়। এই তাপদানের ফলে গোবর এবং তার অভ্যন্তরস্থ বীজাণু প্রোটিনপুষ্ট হয়ে ওঠে। এই গোবর শুষ্ক করলে এর 60 শতাংশ বর্ণহীন প্রোটিনের গুঁড়ায় পরিণত হয়।

বর্তমানে খামারের গবাদি পশু ও গবেষণাগারে ইঁদুরের উপর এই প্রোটিন-খাদ্য প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

শৃগাল-মানব

কলম্বো থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার গভীর অরণ্য কাতারা খামারের উপকণ্ঠে এক বৃদ্ধা এক শৃগাল-মানবকে উদ্ধার করেছে। বালকটির বয়স আনুমানিক বারো বছর। সে দু-হাত এবং দু-পা দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। জানোয়ারের মত তীব্র আওয়াজ করে।

বৃদ্ধাটি এখন এই পশু-মানবের পালিকা মাতা। সে বলছে—ছেলেটি কাঁচা মাংস খেতে চায়। মিষ্টি বা সব্জিতে তার রুচি নেই।

জনৈক পশু-বিশেষজ্ঞ বলছেন: এই মানব সন্তানটি হয়তো কোন শেয়ালের তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শাখা গঠনের নিয়মাবলী

1. শাখার আদর্শ ও উদ্দেশ্য মূল পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী হইবে।

2. শহর বা গ্রামে, সর্বত্রই শাখা স্থাপন করা যাইবে, তবে কোন শহর, মফস্বল শহর বা গ্রামে একাধিক শাখা স্থাপন করা যাইবে না। কোন শাখা স্থাপন করিতে হইলে মূল পরিষদের কর্মসচিবের লিখিত অনুমোদন আবশ্যক।

3. স্থান অনুযায়ী শাখার নাম হইবে:—যেমন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বহরমপুর শাখা)। শাখার চিঠিপত্রে শাখার কার্যালয় এবং মূল পরিষদের কার্যালয়, উভয়ের ঠিকানাই লিখিত থাকিবে।

4. শাখার সভ্য সংখ্যা:—অন্ততঃ দশজন সভ্য লইয়া একটি শাখা গঠিত হইবে। প্রত্যেক শাখার সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচজন মূল পরিষদের সদস্য থাকিতে হইবে। কোন অঞ্চলে মূল পরিষদের সদস্য থাকিলে তিনি স্বতঃই সেই অঞ্চলের শাখার সভ্য হইতে পারিবেন।

5. শাখার কার্যকরী সমিতি ও কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী:—5/6 জন সদস্য লইয়া শাখার কার্যকরী সমিতি গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে লইয়া শাখার কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী গঠিত হইবে।

6. মূল পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী এবং শাখার কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলীতে একই ব্যক্তি থাকিতে পারিবেন না।

7. শাখার সভ্য চাঁদা:—কোন শাখা ইচ্ছা করিলে সাধারণ সভ্য ও ছাত্র সভ্যদের জন্য পৃথক পৃথক চাঁদার হার স্থির করতে পারেন। তবে শাখার বার্ষিক সভ্য চাঁদা অন্যূন 3·00 টাকা হইবে। মূল পরিষদের সদস্যদের পক্ষে শাখাকে কোন চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে না।

8. প্রত্যেক শাখা হইতে মূল পরিষদকে 20·00 টাকা বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে।

9. মূল পরিষদ হইতে প্রত্যেক শাখাকে বিনা মূল্যে প্রতি মাসে এক কপি "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা পাঠান হইবে। ইহা ছাড়া উক্ত পত্রিকা ও পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে শাখাকে শতকরা 25 ভাগ কমিশন দেওয়া হইবে।

10. যাঁহারা যুগপৎ মূল পরিষদের এবং কোন শাখার সভ্য, তাঁহাদের সভ্য চাঁদা মূল পরিষদের কার্যালয়ে দিতে হইবে। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা তাঁহাদিগকে সরাসরি পাঠান হইবে। কোন শাখার প্রচেষ্টায় কেহ মূল পরিষদের নূতন সভ্য হইলে তাঁহার সভ্য চাঁদার শতকরা 15 ভাগ কমিশন সেই শাখা পাইবে।

11. শাখার আর্থিক দায়দায়িত্বের জন্য মূল পরিষদ কোনরূপ দায়ী থাকিবে না।

12. বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজনে শাখাকে মূল পরিষদ হইতে যথাসাধ্য সাহায্য করা হইবে।

13. শাখা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

14. মূল পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে শাখাকে আমন্ত্রণ জানান হইবে।

15. মূল পরিষদের সংগঠন উপসমিতিতে প্রত্যেক শাখার সম্পাদক বা তাঁহার প্রতিনিধি থাকিবেন।

16. শাখার পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রকাশনার ব্যবস্থা, অনুষ্ঠানের আয়োজন, সরকারী অনুদানের জন্ত আবেদন ইত্যাদি বিষয়ে মূল পরিষদের কর্মসচিবের লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন।

17. প্রতি বৎসর শাখার কার্যবিবরণী ও পরীক্ষিত হিসাব পরিষদের মূল কার্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

18. মূল পরিষদের কর্মসচিব বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে পরিষদের কোন সদস্য পর্যবেক্ষক রূপে শাখার যে কোন সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

19. মূল পরিষদের কার্যকরী সমিতি প্রয়োজনবোধে যে কোন শাখাকে বাতিল করিতে পারিবেন।

20. কোন শাখা বন্ধ হইয়া গেলে উহার সকল দায়দায়িত্ব চুকাইয়া যদি কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তবে সেইগুলি মূল পরিষদে বর্তাইবে।

21. মূল পরিষদের কার্যকরী সমিতি প্রয়োজনবোধে উপরিউক্ত নিয়মগুলি পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জন করিতে পারিবেন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষড়বিংশতিতম বর্ষ | নভেম্বর, 1973 | একাদশ সংখ্যা

ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

'রামেন্দ্র'র পথ না জগদীশ-প্রফুল্ল'র পথ'—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারী, 1948) প্রখ্যাত ধন-বিজ্ঞানী বিনয়-কুমার সরকার উপরিউক্ত শিরোনামায় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য—'কোন পথে চলিবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ—প্রচারের পথে, না গবেষণার পথে?' সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে গেল। নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সুমহান নেতৃত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। উপরিউক্ত প্রবন্ধের পটভূমিকায় পরিষদের রজত জয়ন্তী বর্ষশেষে ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে সামান্য পর্যালোচনা করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অধ্যাপক সরকার 'আদার বেপারী' হয়েও তাঁর প্রবন্ধে 'জাহাজে'র খবর পুরাপুরি সব কিছুই পরিবেশন করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জন্ম সময় পর্যন্ত—প্রায় দেড়শো বছরে বাংলা দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য ইতিহাস—তাঁর এই প্রবন্ধ। উপসংহারে তিনি একটি প্রস্তাব পেশ করে গেছেন—

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার আধাআধি বিজ্ঞান প্রচারের কাজে বাঁধিয়া রাখা চলিতে পারে...পত্রিকার অপর অর্দ্ধেকটা বাঁধিয়া রাখা উচিত বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল প্রকাশের জন্ত"

এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় মৌলিক গবেষণার নিবন্ধাদির জন্তে গবেষক-কর্মী ও গবেষক-ছাত্রদের

উদ্দেশ্যে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের নিবেদন উল্লেখ-যোগ্য (প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে পরিষদের সভাপতির ভাষণ—ফেব্রুয়ারী, 1960)। কিছুটা সাড়া পাওয়া গেল এবং তারই সার্থক রূপায়ণে আমরা পেলাম 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 'রাজশেখর বসু সংখ্যা' (বিশেষ সংখ্যা—1960)—বাংলা ভাষায় সম্ভবতঃ প্রথম গবেষণা-পত্রিকা। দুঃখের বিষয় প্রারম্ভিক সফলতা সত্ত্বেও এই প্রকল্প চালু রাখা নানান কারণে সম্ভব হয় নি। বর্তমানে আমাদের দেশে বাঙালী গবেষক-সংখ্যা আদৌ নগণ্য নয়, উপরন্তু গবেষণার বিষয়বস্তুও বহুমুখী এবং বিদেশী ভাষায় প্রচারিত বাঙালী গবেষকদের গবেষণা-নিবন্ধের সংখ্যাধিক্য উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে তাঁদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক সরকারের উক্তি আবার স্মরণ করি—

"অন্ততঃ কোন বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিবার পরেই বাঙালী বিজ্ঞানসেবীরা তাহার চুম্বক বাংলায় প্রকাশ করিতে শুরু করুন। নিজ নিজ গবেষণার চুম্বক নিজের লেখা বাংলা প্রবন্ধে বাহির করিতে থাকিলে তাহারা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে গবেষণার পথে বেশ কিছু চালাইতে পারিবেন। তাহা হইলে বাঙালী বাচ্চার পক্ষে বিংশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝির উপযুক্ত কর্তব্য পালন করা ঘটিয়া উঠিবে।"

শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা আজ উপনীত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 'উপযুক্ত কর্তব্য' পালনে আমরা এখনো পুরাপুরি সফল হই নি*। আমরা আশাবাদী, তাই বিশ্বাস রাখি, বাঙালী গবেষকবৃন্দ এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করে জাতীয় স্বার্থে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হবেন।

* * *

ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে এর পরেই মনে পড়ছে বাংলা পরিভাষার কথা। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পরিষদের বর্তমান অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর লেখা উপরিউক্ত শিরোনামার প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী ছিল। বিগত দেড়শো বছরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের কার্যে বহু মনীষীই পরিভাষা প্রসঙ্গে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। অধ্যাপক ভাদুড়ী তাঁর প্রবন্ধে সে বিষয় যথাযথ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি ছাড়াও বর্তমানে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে সর্বপ্রকার বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। দেখা যায়, উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে এবং প্রয়োজনের তাগিদে গ্রন্থকারেরা অনেক ক্ষেত্রে যেমনখুশী মত নতুন নতুন পরিভাষা রচনা করেছেন। ফলে পরিভাষার দৈন্য কিছুটা ঘুচলেও সমস্যাটা অন্যভাবে আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই বৈজ্ঞানিক শব্দের বিভিন্ন গ্রন্থকার বা প্রবন্ধ-লেখক ভিন্ন ভিন্ন রূপদান করেছেন—এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ না করেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এমতা-বস্থায় পাঠকবর্গ, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী বহুলাংশে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। একটা কিছু করা দরকার, তা না হলে সমস্যাটা প্রকট থেকে প্রকটতর হতে বাধ্য। এই সমস্যার আশু সমাধান আজ অপরি-হার্য বলে মনে করি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং পাঠ্যপুস্তকে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা পরিভাষার

* প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীআশীষ সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত 'গবেষণা' পত্রিকায় গত কয়েক বছর ধরে প্রধানতঃ জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানাবিধ গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে এবং সম্প্রতি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'বিশ্ব-বিজ্ঞান' দপ্তরে শ্রীসমরজিৎ করের তত্ত্বাবধানে অনুরূপ প্রচেষ্টা চলছে।

একটি বিশদ সংকলন করে উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং যাতে এই সুসমন্বিত পরিভাষা সংকলন সর্বজন-গ্রহণযোগ্য হয় ও স্বীকৃতি লাভ করে—তার জন্যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই কর্মযজ্ঞের জন্যে চাই প্রচুর অর্থ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বাধীনে নিরলস নিঃস্বার্থ কর্মিবৃন্দ। সরকারের অর্থ সাহায্য পেলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই মহান কর্মযজ্ঞের গুরু দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে, সে আশা আমরা নিঃসন্দেহে পোষণ করতে পারি না কি?

• • •

সর্বশেষে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও কিশোর বিজ্ঞানী' প্রসঙ্গে পর্যালোচনা সময়োপযোগী বলে মনে করি। "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক্, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশ্যক"—কবিগুরুর এই উক্তির যথাযথ মর্যাদা দিতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রথম থেকেই উদ্যোগী ছিল। 'ছেলে-মেয়েরা যাতে সহজে বুঝতে পারে অথবা হাতে-কলমে কিছু কিছু সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সহজবোধ্য ও সহজ-সাধ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুন, 1948 সংখ্যা থেকে 'ছোটদের বিভাগে' (বর্তমানে এই বিভাগটি কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর নামে অভিহিত)। একটানা পঁচিশ বছর এই ধরনের সার্থক প্রচেষ্টার সাফল্য আমাদের দেশে সম্ভবতঃ এই প্রথম। 'করে দেখ', 'ভেবে দাখ', 'কঠিন কাজ সহজে করার উপায়' এবং 'কথায় ও চিত্রে' প্রভৃতি বহু-বিধ সচিত্র চিত্তাকর্ষক রচনার মাধ্যমে অনেক কিশোর বিজ্ঞানী অনুপ্রাণিত হয়েছে। এই কার্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বর্তমান প্রধান সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের (গ. চ. ভ.) অবদান পরিষদ চিরকাল কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করবে। সম্প্রতি পরিষদের 'হাতে-কলমে' বিভাগটিও কিশোরদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে স্কুল ও কলেজে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ফলেই যে ছেলেমেয়েদের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও চিন্তা-ধারার বিকাশে এবং নিজের হাতে পরীক্ষা-মূলকভাবে কিছু করবার উৎসাহ বর্ধিত করেছে, সে কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না (আমাদের খুবই আশা ও আনন্দের কথা এই যে, বর্তমানে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের আরো অনেক সংস্থা এই কার্যে ব্রতী হয়েছে। আমাদের বক্তব্য, কিশোর বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যে উদ্যম ও উৎসাহের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তার সার্থক রূপা-য়ণের সুব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। উপযুক্ত মানের পরীক্ষাগার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সব সময়ের জন্যে সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বর্তমান আর্থিক এবং অন্যান্য সঙ্গতি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। জাতীয় স্বার্থে এবং দেশের কল্যাণে যে প্রতিষ্ঠান সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই মহান ব্রত পালন করে আসছে, তার সেই ধারাকে অপ্রতিহত এবং প্রগতিকে অব্যাহত রাখতে সরকারী সাহায্য লাভ এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা থেকে নিশ্চয়ই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বঞ্চিত হবে না।

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে জীবন সৃষ্টি

দীপক বসু*

রাতের আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে ছোট-বড় অগণিত নক্ষত্র। এদের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তারই নাম আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্র। সেখানে কি আছে? বহু দিন পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল, সে স্থান সম্পূর্ণ শূন্য। ক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের ফলে সে ধারণা বদলেছে। দেখা গেছে—সে স্থান কার্বন, গ্র্যাফাইট জাতীয় অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণিকার দ্বারা গঠিত। এগুলিকে বলা হয় আন্তর্নাক্ষত্রিক ধূলিকণা। এসব কথা অবশ্য বেশ কিছু দিন আগেই জানা গেছে। বর্তমানে বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চলে কয়েকগুলি বিশেষ অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে সরল বা সাধারণ অণুও আছে, আবার জটিল সব জৈব অণুর অস্তিত্বের কথাও জানতে পারা গেছে। প্রশ্ন উঠেছে—মহাশূন্যে এই সব জটিল জৈব অণুর সৃষ্টি হলো কি ভাবে? সরল ও ছোট অণুর সংযোগ বা রাসায়নিক বিবর্তনের ফলে কি? জটিল থেকে জটিলতর হতে হতে তাহলে কি এক সময়ে জীবন সৃষ্টি সম্ভব? আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চলে বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার এই অভিনব আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে অণুগুলির সম্পর্ক জানতে হলে পদার্থবিদ্যার গোড়ার কথা কিছু মনে করতে হবে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা জানি যে, ইলেকট্রনের অবস্থানের উপর নির্ভর করে পরমাণু বিভিন্ন শক্তি স্তরে অবস্থান করতে পারে। অণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনজনিত শক্তিস্তর ছাড়া আরও শক্তিস্তর থাকা সম্ভব; যেমন—স্পন্দনজনিত (অণুর অভ্যন্তরে পরমাণুর স্পন্দন) ও ঘূর্ণনজনিত (একটি অণু সম্পূর্ণরূপে ঘূর্ণিত হতে পারে)। ফলে অণুর শক্তিস্তর বলতে হলে তার ইলেকট্রনের অবস্থা, স্পন্দনের অবস্থা ও ঘূর্ণনের অবস্থা—এই তিন প্রকার অবস্থার

ঘ-3, ঘ-2, ঘ-1, ঘ0 ... স-3, স-2, স-1, স=0, ই-2, স-3, স-2, স-1, স=0

1নং চিত্র
কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী অণুর বিভিন্ন শক্তিস্তর।
ই—ইলেকট্রনজনিত, স—স্পন্দনজনিত,
ঘ—ঘূর্ণনজনিত

কথা বলতে হবে। 1নং চিত্রে দুটি ইলেকট্রন-জনিত স্তর দেখানো হয়েছে (ই−1 ও ই−2)। প্রতিটি ইলেকট্রনজনিত স্তরের সঙ্গে রয়েছে

---

* Radio Astronomy Section, Mackenzie University, Saopaulo, Brazil

কতকগুলি স্পন্দনজনিত স্তর (স−1, স−2 ইত্যাদি)। প্রতিটি স্পন্দনজনিত স্তরের সঙ্গে রয়েছে কতকগুলি ঘূর্ণনজনিত স্তর (ঘ−1, ঘ−2 ইত্যাদি)। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে—ঘূর্ণনজনিত স্তরের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ইলেকট্রনজনিত স্তরের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব থেকে অনেক কম।

এখন, অণু (বা পরমাণু) উচ্চতর শক্তিস্তর থেকে নিম্নতর শক্তিস্তরে পতিত হলে (এই পতন নানা কারণে ঘটাতে পারে) অতিরিক্ত শক্তি বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গরূপে বিকিরিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ কোন অণুর (বা পরমাণুর) উপর পতিত হলে অণু তরঙ্গের থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে। এই শক্তি শোষণের ফলে সে নিম্নতর শক্তিস্তর থেকে উচ্চতর শক্তিস্তরে উঠে যাবে। এক কথায় এক শক্তিস্তর থেকে অন্য শক্তিস্তরে উত্থান বা পতন ঘটলে অণু যথাক্রমে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ শোষণ বা বিকিরণ করে থাকে। শোষিত বা বিকিরিত তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা নির্ভর করে স্তর দুটির মধ্যে শক্তির ফারাকের উপর। হিসাব করলে দেখা যায় যে, ঘূর্ণনজনিত স্তরের মধ্যে উত্থান-পতনের ফলে শোষিত বা বিকিরিত তরঙ্গ ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ রূপে (মাইক্রো-তরঙ্গ) পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ইলেকট্রন-জনিত স্তরের মধ্যে উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হবে আলোক ও অতিবেগুনী রশ্মিতে এবং স্পন্দনজনিত স্তরের মধ্যে উত্থান-পতন—অবলোহিত রশ্মিতে। ঘূর্ণনজনিত স্তরগুলি সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে বলে এগুলির মধ্যে উত্থান-পতনের ফলে খুব কাছাকাছি নানা দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মাইক্রো-তরঙ্গের শোষণ ও বিকিরণের সম্ভাবনা খুব বেশী। ফলে আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চলে যদি কোন অণু থেকে থাকে এবং সেগুলির মধ্যে উপরিউক্ত উপায়ে যদি বিকিরণ বা শোষণক্রিয়া চলতে থাকে, তবে পৃথিবীতে বসে তা পর্যবেক্ষণ করতে হলে বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে করাই বাঞ্ছনীয় (যদিও আলোক, অতিবেগুনী ও অবলোহিত রশ্মিতেও বিকিরণ ও শোষণ পরিলক্ষিত হবে)। আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণে তাই বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

1932 সালে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার কার্ল ইয়ান্‌স্কি দৈবাৎ আবিষ্কার করেন যে, আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল থেকে বেতার-তরঙ্গ আসছে। এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা নামে বিজ্ঞানের নূতন শাখার সূত্রপাত হয়। এখানে বেতার-তরঙ্গ বলতে বোঝায়—যে ধরনের তরঙ্গ আমাদের বাড়ীর বেতার গ্রাহক-যন্ত্র বা রেডিওতে ধরে আমরা গান-বাজনা শুনে থাকি। বাড়ীর বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের মত বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরও গ্রাহক-যন্ত্র আছে। তবে এই ক্ষেত্রে এই যন্ত্র অনেক বেশী শক্তিশালী। কারণ জ্যোতিষ্ক থেকে আগত তরঙ্গমালা খুবই ক্ষীণ। দূরাগত তরঙ্গমালা প্রথমে ধরা পড়ে বিশাল এরিয়ালে। সেখান থেকে যায় গ্রাহক-যন্ত্রে এবং সবশেষে তরঙ্গমালাকে লিপিবদ্ধ করা হয় লেখনীযন্ত্রের সাহায্যে। আলোক দূরবীক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে এই এরিয়াল-গ্রাহক-লেখনী সম্মিলিত যন্ত্রের নাম রাখা হয়েছে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র। বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্ক থেকে আগত বেতার-তরঙ্গকে পর্যবেক্ষণ করবার নাম বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা। আজ আমরা জানি যে, সূর্য, গ্রহমণ্ডল, ছায়াপথ, দূরের নীহারিকামণ্ডলী—এরা সকলেই বেতার-তরঙ্গের উৎস। তাছাড়া 'কোয়াসার' ও 'পাল্‌সার' জাতীয় কিছু বিশেষ ধরনের জ্যোতিষ্কের সন্ধান পেয়েছেন বেতার-জ্যোতির্বিদগণ।

2নং চিত্রে একটি বেতার-জ্যোতিষ্ককে (যে জ্যোতিষ্ক থেকে বেতার-তরঙ্গ বিকিরিত হয়)

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে কোন একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ধরবার জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। মনে করা যাক, জ্যোতিষ্ক এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যবর্তী কোন স্থানে রয়েছে এক খণ্ড মেঘের মত আন্তর্নাক্ষত্রিক পদার্থ এবং এই মেঘের মধ্যে রয়েছে উপরিউক্ত কোন বিশেষ ধরণের অণু। উপরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের যে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যাবে যে, একেক ধরণের অণুসমন্বিত মেঘ থেকে একেকটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের মাইক্রো-তরঙ্গ বিকিরিত হবে। এরূপ অবস্থায় বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি জ্যোতিষ্ক এবং মেঘ—এই উভয় উৎস থেকে বিকিরিত তরঙ্গই গ্রহণ করবে।
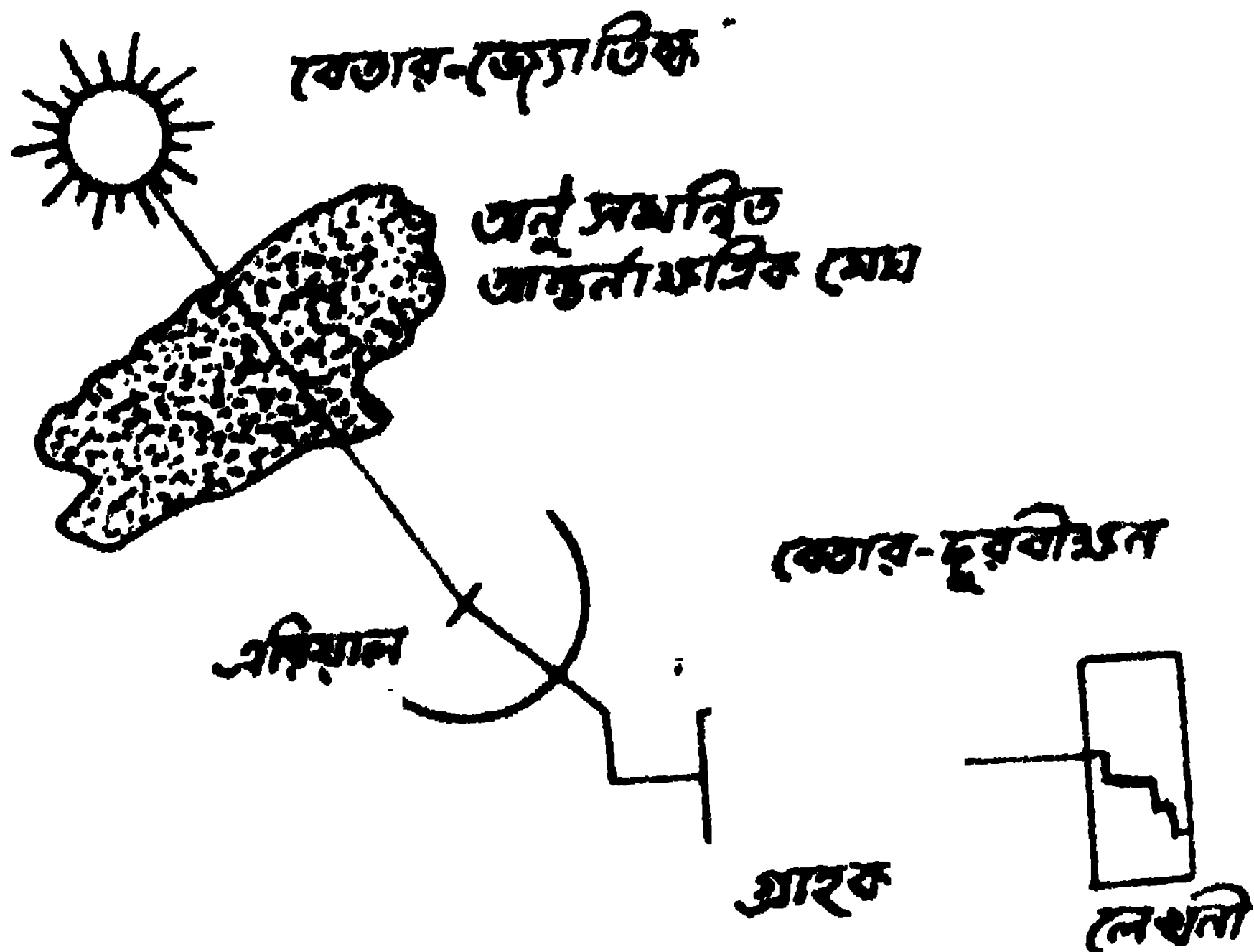
2নং চিত্র
পর্যবেক্ষণ প্রণালী

আবার আমাদের জানা আছে, যে পদার্থ কোন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ বিকিরণ করে, সে একই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ শোষণও করে থাকে। তাই মেঘ যে দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বিকিরণ করছে, জ্যোতিষ্ক থেকে আগত সেই দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ মেঘের মধ্য দিয়ে আসবার সময় মেঘ তা শোষণও করে নেবে। ফলে অণুসমন্বিত মেঘ বিকিরণ ও শোষণ—দুই করবে। এখন প্রশ্ন হলো, শেষ পর্যন্ত কে জিতবে—শোষণ না বিকিরণ? স্বভাবতই তা নির্ভর করছে, জ্যোতিষ্ক ও মেঘ—এদের মধ্যে কার বিকিরণ অধিকতর শক্তিশালী, তার উপর। যদি মেঘের বিকিরণ অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হয়, তবে শোষণ পরিলক্ষিত হবে। আর জ্যোতিষ্ক অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হলে শেষ পর্যন্ত বিকিরণ পরিলক্ষিত হবে। বিভিন্ন অণু কোন্ কোন্ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বিকিরণ বা শোষণের জন্যে দায়ী, বিজ্ঞানীরা তা কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে নির্ধারণ করেছেন। বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উপরিউক্ত উপায়ে সেই দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করলেই আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে অণুর উপস্থিতি ধরা পড়বে।

আগেই বলা হয়েছে, নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী স্থানের নাম আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চল। আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোট বড় যত নক্ষত্র আমরা দেখতে পাই, সকলেই আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত

(এখানে মনে রাখতে হবে যে, ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ছায়াপথ ছাড়া আরও অগণিত ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে)। 3নং চিত্রে কুণ্ডলীর আকৃতিবিশিষ্ট

3নং চিত্র
কুণ্ডলী আকৃতির আমাদের ছায়াপথ ও সেখানে সূর্যের অবস্থান।

আমাদের ছায়াপথের একটি ছবি দেখানো হয়েছে। সূর্য রয়েছে (অর্থাৎ আমরা রয়েছি) একপাশে। চিত্রে নির্দিষ্ট দিকে ছায়াপথ ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের বেগ কিন্তু সর্বত্র সমান নয়। পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর ঘূর্ণনের বেগ যেমন বিষুবরেখার কাছে সর্বাধিক এবং দুই মেরুর দিকে ক্রমশঃ কমে আসে, ছায়াপথের ক্ষেত্রেও তেমনি কেন্দ্রের কাছে ঘূর্ণনের বেগ সবচেয়ে বেশী। যত বাইরের দিকে যাওয়া যায়, বেগ তত কমে আসে। অণু-সমন্বিত মেঘগুলি ছায়াপথের কুণ্ডলীর বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে আছে এবং কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দূরত্বে থেকে বিভিন্ন গতিবেগে কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। ফলে এদের গতিবেগ জানলে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব। গতিবেগ জানবার একটা সহজ উপায়ও আছে। 'ডপ্লার প্রক্রিয়া' অনুযায়ী আমরা জানি যে, তরঙ্গের উৎস ও পর্যবেক্ষকের মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি থাকলে তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিপরীতপক্ষে, কম্পন-সংখ্যার পরিবর্তন জানা থাকলে তা থেকে গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভব। ফলে নির্দিষ্ট অণুর ক্ষেত্রে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের দ্বারা নির্ধারিত বিকিরণ বা শোষণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে কিছুটা এধার-ওধার সরালে ডপ্লার প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরিবর্তিত কম্পন-সংখ্যাজনিত তরঙ্গ ধরতে পারা যাবে। তা থেকে গতিবেগ ও গতিবেগ থেকে দূরত্ব এবং এভাবে অণুসমন্বিত মেঘখণ্ডের ছায়াপথে অবস্থান পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে (4নং চিত্র)। অবশ্য পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করে এবং এদের প্রভাব হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে। আমাদের ছায়াপথ ছাড়া অন্য ছায়াপথেও কিছু কিছু অণু-সমন্বিত মেঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্বভাবতঃই সে ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ প্রণালী আরও কিছুটা জটিল।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে প্রথম অণুর সন্ধান পান আলোক-জ্যোতির্বিদগণ। 1941 সালে CH ও CN দুটি 2-পরমাণুবিশিষ্ট অণু আবিষ্কৃত হয় আলোক-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। এর পর দীর্ঘ 23 বছর কেটে যায় বেতার-তরঙ্গে অণুর সন্ধান পেতে। 1963 সালে OH প্রথম 2-পরমাণুবিশিষ্ট অণু ধরা পড়ে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে। ইতিমধ্যে অবশ্য হাইড্রোজেন পরমাণুর (অণু নয়) অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল 1955 সালে 21 সে. মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। OH আবিষ্কারের পাঁচ বছর পরে 1968 সালে পাওয়া গেল অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং তার পরের বছর জলীয় বাষ্প (H_2O)। এর পর থেকে

গত কয়েক বছরের মধ্যে আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন অণুর সংখ্যা অতি দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে (1নং টেবিল দ্রষ্টব্য)। এত অল্প সময়ে এতগুলি আবিষ্কার সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

সেখানে সংঘাতের সম্ভাবনাও কম। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ঘন পরিবেশে কয়েকটি কণিকার সংঘর্ষের ফলে অণুর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। পরে এরা কোনভাবে নক্ষত্রের

4নং চিত্র
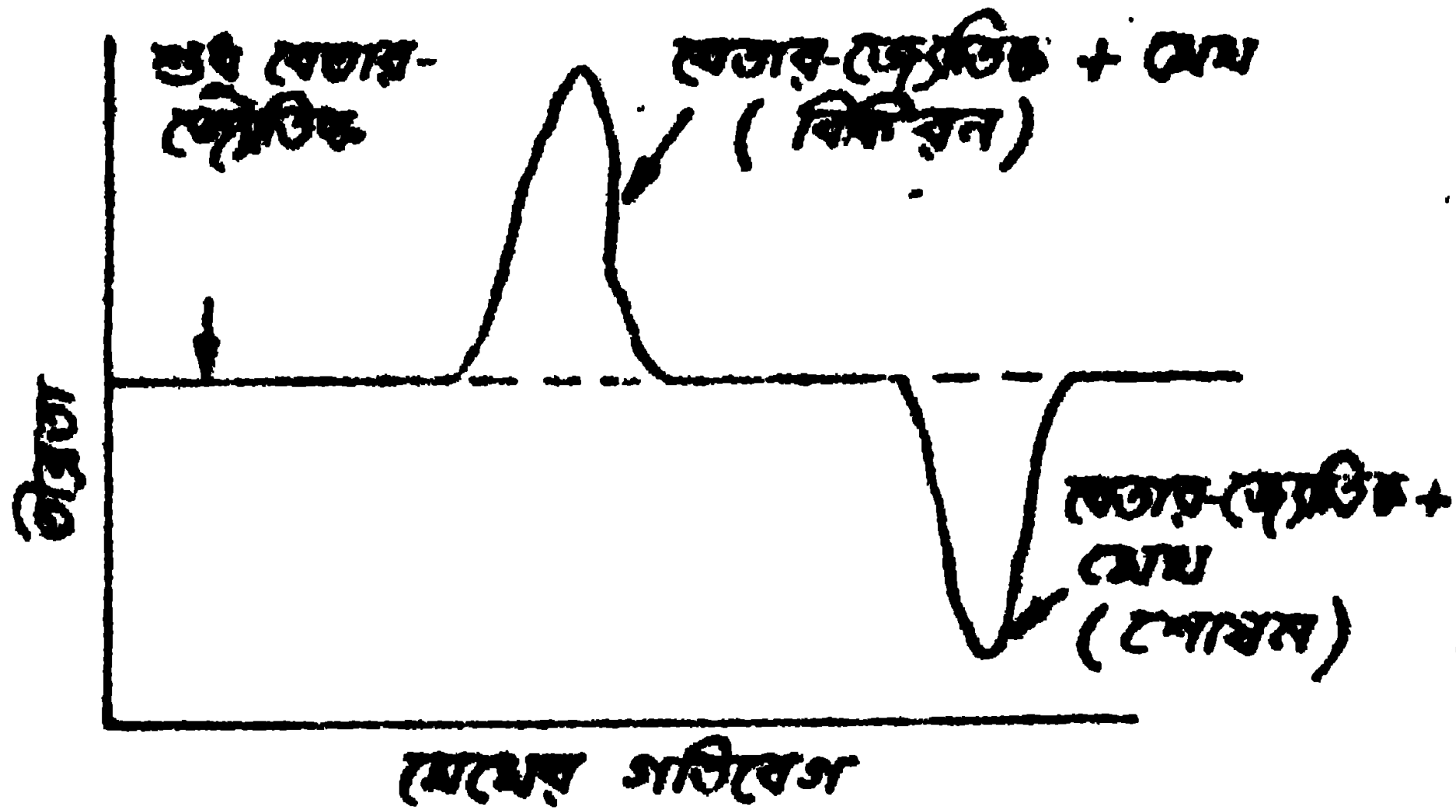
পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন অবস্থায় বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেখনীতে প্রাপ্ত রেখচিত্রের নমুনা।

এই সব জটিল অণুর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সব চেয়ে জটিল প্রশ্ন হলো—অণুর উৎস অর্থাৎ অণু কোথা থেকে আসছে বা কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে? আন্তর্নাক্ষত্রিক ধূলিকণার কথা আগেই বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, ধূলিকণার গায়ে একটি একটি করে পরমাণু একত্রিত হয়ে অণুর সৃষ্টি করে। তারপর অতিবেগুনী রশ্মি বা মহাজাগতিক রশ্মির আঘাতে অণু ধূলিকণার গা থেকে খসে পড়ে। এভাবে মহাশূন্যে মুক্ত অণুসমষ্টি যেন বিকিরণ বা শোষণক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে থাকে।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়া ছাড়া আরও দু-রকম উপায়ে অণুর সৃষ্টি হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। দুটি পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতের ফলে অণুর সৃষ্টি করতে পারে। তবে আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে ঘনত্ব খুব কম বলে

ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। সমস্যার শেষ এখানেই নয়। অণু সৃষ্টি হবার পর তার প্রতিরক্ষা দরকার। তা না হলে শক্তিশালী রশ্মির আঘাতে অণু আবার ভেঙে যেতে পারে। রশ্মির হাত থেকে কিভাবে অণু রক্ষা পাচ্ছে? এই সব সম্বন্ধে জোর গবেষণা চলছে।

যে সব অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের বিষয় পর্যালোচনা করলে সত্যই অবাক হতে হয়। মানুষ গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ছোট ছোট অণুকে যুক্ত করে বড় ও জটিল অণু সৃষ্টি করার যে ভাবে ধাপে ধাপে চেষ্টা করেছে ও করছে, প্রকৃতিও কি মহাশূন্যে একইভাবে এগিয়ে চলেছে? এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মহাশূন্যের 'আবহাওয়া' গবেষণাগারের আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চলের তাপমাত্রা 100° কেলভিন (গবেষণাগারে 300° কেলভিন) ও চাপ বায়ুর চাপের 10^{-}[illegible] অংশ মাত্র। সেই আবহাওয়ায় জটিল অণুর সৃষ্টি ও উপস্থিতি বিজ্ঞানীকে আরও ভাবিয়ে তুলছে। শুধু তাই না, আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে যদি রাসায়নিক বিবর্তন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়, তবে এর শেষ কোথায়? জীবন সৃষ্টি? জ্যোতির্বিদ্দের একার বিচার আর কুলাচ্ছে না। তাই ডাক পড়েছে পদার্থবিদ্, রসায়নবিদ্ ও জীববিদ্দের। জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা তো আছেই। বিজ্ঞানের নূতন শাখার সৃষ্টি হতে চলেছে—জ্যোতির্রসায়ন, জ্যোতির্জীববিদ্যা ইত্যাদি। সকলে উঠে-পড়ে লেগেছে প্রকৃতির এই অভিনব রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে। দেখা যাক, কত দিন এই রহস্য থাকে।

টেবিল নং—1

অণুর নাম	সূত্র	কম্পন সংখ্যা (GHz)
হাইড্রক্সিল	OH	1·6, 1·7, 4·8, 6·0, 8·1, 13·4
অ্যামোনিয়া	NH_3	23·7, 23·9, 24·1, 25·0
জলীয় বাষ্প	H_2O	22·2
ফরম্যালডিহাইড	H_2CO	4·6, 4·8, 14·5, 28·9, 140·8, 145·6, 150·5
কার্বন মনোক্সাইড	CO	109·8, 110·2, 115·3
—	CN	113·5
হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড	HCN	86·3, 89·2
সায়ানো অ্যাসিটিলিন	HC_3N	9·1
মিথাইল অ্যালকোহল	CH_3OH	0·8, 24·9, 25·0, 25·1, 25·3
ফরমিক অ্যাসিড	$HCOOH$	1·68
কার্বন সালফাইড	CS	146·9
সিলিকন অক্সাইড	SiO	130·3
মিথাইল অ্যাসিটিলিন	CH_3C_2H	85·5
আইসোসায়ানিক অ্যাসিড	$HCNO$	21·9, 87·9
কার্বনীল সালফাইড	OCS	109·5
মিথাইল সায়নাইড	CH_3CN	110·3, 110·4
ফরমামাইড	NH_2HCO	4·6
অ্যাসিড অ্যালডিহাইড	CH_3HCO	1·1
X—ওজেন	?	89·2

এক্স-রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রপাত

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

সূর্য থেকে যে সকল বিদ্যুৎ-চৌম্বক রশ্মি বিকিরিত হয়, তাদের মধ্যে কেবলমাত্র আলোক-তরঙ্গের সর্বাংশ ও বেতার-তরঙ্গের কিয়দংশ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায়, অন্য সকল রশ্মিই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে শোষিত হয়ে যায়। আকাশের অপর যে কোন উৎস থেকেই ঐ রশ্মিসমূহ পৃথিবী অভিমুখে আসে, তাদের সকলের ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ একই পরিণতি ঘটে। ফলে ভূপৃষ্ঠে বসে শুধু আলোক সঞ্চারী জ্যোতিষ্ককে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যেতে পারে এবং বেতার-সঞ্চারী জ্যোতিষ্কদের কারো কারো অস্তিত্ব বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং আলো ও বেতার-তরঙ্গ বিকিরণকারী কোন জ্যোতিষ্ক এক্স-রে তরঙ্গও বিকিরণ করে কিনা, তা জানতে হলে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে গিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। আবার যে সব জ্যোতিষ্কের আলো বা বেতার-রশ্মি নেই অথচ এক্স-রে তরঙ্গ আছে, তাদের অস্তিত্ব অন্বেষণ করতে হলেও ঐ ঊর্ধ্বাকাশে গিয়েই পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সূর্য ব্যতীত অপর কোন জ্যোতিষ্ক থেকে এক্স-রে তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয় কিনা, তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন বহু জ্যোতির্বিদ্ কিছুকাল আগে থেকেই। অবশেষে White Sands Missile Range থেকে উৎক্ষিপ্ত একটি যন্ত্রবাহী রকেট 1962 সালের 18ই জুন সন্ধান দিল যে, বৃশ্চিক নক্ষত্রপুঞ্জে একটি বস্তু বর্তমান, যে এক্স-রে বিকিরণ করে।' কাজেই এই তারিখটিকে এক্স-রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্মদিন বলা যায়।

এই পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন American Science+Engineering Inc. এবং Massachusets Institute of Technology (M. I. T) নামক সংস্থাদ্বয়ের কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী। যদিও বস্তুটির অবস্থিতির স্থান সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করা তখন সম্ভব হয় নি, তথাপি এটি যে বৃশ্চিকপুঞ্জেই অবস্থিত, তাতে সন্দেহ ছিল না। তাই বস্তুটির নামকরণ করা হলো Sco. x-1। এর পর পরীক্ষা-প্রণালী সূক্ষ্মতর করা হয় এবং আরো কয়েকটি এক্স-রে বিকিরণকারী অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়—তাদের মধ্যে ক্র্যাব নীহারিকা একটি। কিন্তু বস্তুগুলির সঠিক অবস্থান-বিন্দু না জানায় দূরবীক্ষণের সাহায্যেও বোঝা গেল না—ঐ সব স্থানে কোন জ্যোতিষ্ক আছে কি নেই। ওয়াশিংটনের Navel Research Laboratory-র জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ক্র্যাব নীহারিকায় দৃষ্টি রাখলেন—যখন চন্দ্র ধীরে ধীরে তার উপর দিয়ে ভ্রমণকালে তাকে আবৃত করে গ্রহণ লাগায়। এইভাবে ক্র্যাব নীহারিকার যে অঞ্চল থেকে এক্স-রে তরঙ্গ উৎসারিত হয়, তার নির্দেশনা পেলেন। আবার রকেট উৎক্ষেপণ করে M. I. T-এর বিজ্ঞানীরা 1966 সালের 8ই মার্চ বৃশ্চিক পুঞ্জের এক্স-রে বস্তুটিরও সঠিক অবস্থান-বিন্দু স্থির করলেন। এথেকেই আলোক-দূরবীক্ষণ দৃষ্ট হলো Sco. x-1 বস্তুটি এবং জানা গেল এটি ত্রয়োদশ দীপ্তিমাত্রার একটি নীল তারকা।

কিছুকাল পরে একটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে—নাম ঘূর্ণায়মান মডিউলেশন কলিমেটর (Rotating Modulation Collimator)। যন্ত্রটির সাহায্যে এক্স-রে বস্তুদের অবস্থান-বিন্দু প্রায় নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব হয়েছে।

1969 সালের 2রা অক্টোবর পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে যে রকেট উৎক্ষিপ্ত হলো, তাতে ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পাঁচটি এক্স-রে উৎস আবিষ্কৃত হয়েছিল। আলো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের খুঁজে বের করা গেল না, কিন্তু গ্রীন ব্যাংকের বেতার-বিজ্ঞানীরা ঐ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বেতার-প্রভবের সন্ধান পেলেন।

এই সকল ক্ষুদ্রায়তন এক্স-রে প্রভব তো আছেই, তাছাড়া পশ্চাদপটের সমগ্র আকাশই যেন শক্তিসম্পন্ন এক্স-রে তরঙ্গমালায় সমাচ্ছন্ন। উইসকনসিন (Wisconsin) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্স-রে-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, পশ্চাৎপটের বিচ্ছুরিত এক্স-রে তরঙ্গগুলির সবকটিই এই ছায়াপথ থেকেই উৎপন্ন এবং তাও মুখ্যতঃ উত্তর মেরুর তারকাব্যূহ (North Polar Spur) থেকে সমাগত।

কেনিয়ার নিকটবর্তী সান মার্কোস্ (San Marcos) দ্বীপ থেকে 1970 সালের ডিসেম্বর মাসে উহুরু (Uhuru) নামক একটি নকল চাঁদ উর্ধাকাশে কক্ষে স্থাপন করা হয়। এক্স-রে প্রভব অনুসন্ধানের জন্যে এটিই প্রথম নকল চাঁদ। 1972 সালের জুলাই মাসেও এটি সম্পূর্ণ সক্রিয় ছিল এবং অনুসন্ধানকার্যেও যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছে। উহুরু কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদির আংশিক বিশ্লেষণেই এযাবৎ 116টি নূতন এক্স-রে প্রভবের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই নূতন জ্যোতিষ্কগুলির এক-চতুর্থাংশই ছায়াপথের কেন্দ্রীয় সমতলে অবস্থিত নয়। তার মানে, তারা সম্ভবতঃ বহির্বিশ্বের জ্যোতিষ্ক। অচিরে আরো অধিক সংখ্যক এক্স-রে প্রভব আবিষ্কৃত হবে—এমন সম্ভাবনা সুনিশ্চিত।

দীপ্তিমান প্রভবের অনুসন্ধান, অবস্থান, দূরত্ব ও বর্ণালী পর্যবেক্ষণের জন্যে যেমন আলোক-দূরবীক্ষণের প্রয়োজন, বেতার-প্রভবের ঐ সকল পরিস্থিতির জন্যে যেমন বেতার দূরবীক্ষণের ব্যবস্থা আবশ্যক, এক্স-রে প্রভব সম্পর্কে তথ্য নির্ণয়ের জন্যেও তেমনি যে পরিকল্পনা বর্তমানে উদ্ভাবিত হয়েছে, তার নাম সমানুপাতিক গণকযন্ত্র (Proportional Counter)। আলোক-তরঙ্গ ও বেতার-তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে আসে বলে আলোক-দূরবীক্ষণ ও বেতার-দূরবীক্ষণ ভূপৃষ্ঠের উপর থেকেই ব্যবহার করা চলে, কিন্তু এক্স-রে তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় না বলে উর্ধাকাশ রকেটশীর্ষে বা কোন মহাকাশযানে অর্থাৎ নকল চাঁদে উল্লিখিত গণকযন্ত্র স্থাপন করা আবশ্যক। গণকযন্ত্রে যে শক্তিতে এক্স-রে ফোটন (Photon) আপতিত হয়, তারই সমানুপাতে সংকেত সৃষ্টি করে। সমানুপাতিক গণকযন্ত্রের বিন্যাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। প্রত্যেকটিকে সন্ধানী যন্ত্র বলা হয়।

চতুর্দিক আবদ্ধ আধারে কোন গ্যাস ভর্তি করে সন্ধানী যন্ত্র নির্মিত। বিদ্যুৎ-বর্তনী (Electric Circuit) থেকে আধারে তড়িৎ সংযোগের দ্বারা ঐ গ্যাসের মধ্যে একটা প্রবল বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র সংরক্ষিত হয়। আধারের গায়ে একটি জানালা আছে। জানালার ফাঁককে যে পর্দার দ্বারা আবৃত রাখা হয়, সেটি একটি পাত্‌লা ধাতব পাত অথবা প্লাষ্টিক পাত। এক্স-রে তরঙ্গ যখন ঐ পাত্‌লা পাতের মধ্য দিয়ে গিয়ে আধারের ভিতরের গ্যাসের কোন কণাকে আঘাত করে, তখন ঐ গ্যাস আয়নিত হতে থাকে। শুরু হয় ইলেকট্রন ও ধন-আয়নের প্রবাহ। বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রে ধন-আয়নের গতি বিদ্যুৎ-বর্তনীতে যে সংকেত সৃষ্টি করে, তাতেই এক্স-রে তরঙ্গের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বিদ্যুতাহিত কণার সংকেত—যেগুলি এক্স-রে তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট নয় কিংবা গামা (Gama) তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট, সেগুলিকে অবশ্যই পৃথক করে চিনতে পারা ও বাদ দেওয়া আবশ্যক।

বিদ্যুৎ-বর্তনীতে প্রযুক্তিবিদ্গণ এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যে, সন্ধানী যন্ত্রে উৎপন্ন সংকেতের আকারে অর্থাৎ সমান সময় অন্তর অন্তর তার প্রাবল্যের মাত্রা সংখ্যায় তারা নিরূপিত হয়ে যায়।

সংখ্যাগুলি টেলিমিটার প্রণালীতে (Telemetry) পৃথিবীর গবেষণাগারে আসে এবং সেখানে সে সমূহ পরপর যথাযথভাবে সাজিয়ে এক্স-রে ফোটন প্রভবের একটি স্পেক্ট্রাম (Spectrum) বা চিত্র রচিত হয়। একে বলা হয় সংকেত স্পন্দনের উচ্চতাবিন্যাস (Pulsheight Distribution)। এটি দেখেই জ্যোতির্বিদেরা নানা উপায়ে এক্স-রে প্রভবের প্রকৃতি নির্ণয় করেন। এক্স-রে প্রভব-গুলিকে কঠিন (Hard) ও কোমল (Soft) আখ্যায় শ্রেণী বিভক্ত করা যেতে পারে। উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফোটনের সংখ্যায় স্বল্পতা ঘটলে চিত্রে খাড়া রেখার আবির্ভাব হবে এবং প্রবাহে উচ্চশক্তি ফোটনের সংখ্যায় যত আধিক্য থাকবে, চিত্রের রেখা তত নিম্নগামী হবে। খাড়া রেখায় বোঝা যায় এক্স-রে প্রভবটি কোমল এবং নিম্নগামী রেখা বুঝিয়ে দেয় যে, এক্স-রে প্রভবটি কঠিন। সাধারণতঃ সমানুপাতিক গণকযন্ত্রে প্রাপ্ত স্পেক্ট্রাম হচ্ছে শক্তি প্রবাহের চিত্ররূপ, যা প্রশস্ত পটভূমির উপর দিক পরিবর্তনকারী ও অবিচ্ছিন্ন একটি সম্প্রসারণশীল রেখা (Continuum) [1নং চিত্র]। পর্দা বদলে অথবা যন্ত্রের মধ্যস্থিত গ্যাস বদল করে ফোটনের শক্তির সমানুপাতিক সংকেত পাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার তিন-চারটি সন্ধানী যন্ত্র পাশে পাশে লাগিয়ে স্থাপন করলে প্রথমটিতে নিম্নশক্তির ফোটন আবদ্ধ ও শোষিত হয়, দ্বিতীয়টিতে উচ্চতর শক্তির ফোটন আবদ্ধ ও শোষিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে এইরূপ চলতে থাকে। জ্ঞাতব্য তথ্য এভাবেও সংগ্রহ করা অনেক সময় আবশ্যক হয়।

এক্স-রে প্রভবের অবস্থান বিন্দু আকাশে কি করে নির্ণীত হতে পারে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সকলে প্রায় একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সন্ধানী যন্ত্রের সম্মুখে তো আকাশের বিস্তৃত ক্ষেত্র। এই দৃশ্য ক্ষেত্রকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সঙ্কুচিত করে নেন। কি করে করেন—তারই উপায় বিবৃত হলো। যথা কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে সম্মুখস্থ আকাশের তারকাটি কোথায় অবস্থিত, তা ঠিক বোঝা যায় না কিংবা বহুর মধ্যে একটিকে বেছেও নেওয়া যায় না। কিন্তু কাচখানার সামনে যদি একটি সরু নল রাখা

1নং চিত্র

কখনও কখনও টেলিমিটার যন্ত্রের ত্রুটি বা কর্মক্ষমতার স্বল্পতাহেতু অন্য কোন সূক্ষ্ম প্রণালীতে শক্তি-প্রবাহের পরিমাপ করতে বাধ্য হতে হয়। সে ক্ষেত্রে এক্স-রে প্রভব কর্তৃক বিকিরিত শক্তির আনুপাতিক প্রাবল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এরূপ হলে সন্ধানী যন্ত্রের জানালার হয়, তাহলে ঐ নলের মধ্য দিয়ে যখন কোন তারকার কিরণ আসবে, তখনই কেবল কাচের সেই অংশ অপেক্ষাকৃত বেশী উজ্জ্বল হবে এবং এই উজ্জ্বল্যে অপর কোন তারকার দাগ নেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ধানী যন্ত্রের জানালার পর্দার সামনে কোন নল না লাগিয়ে প্রাচীরের

হয় থাকে ঝিলমিলি, যা দেখতে খানিকটা কাঠের বাড়ীর খড়খড়ির মত। ঝিলমিলির পাখীগুলি থাকে সীসকের তৈরী। ফলকগুলি পরস্পরের সমান্তরাল, কিন্তু প্রতি দুটি ফলকের মধ্যে একটু করে ফাঁক রাখা হয়। প্রতিটি ফাঁকের সামনে অনাবৃত থাকে দীর্ঘাকৃতির এক চিলতে আকাশ। পশ্চাদপটের আকাশ থেকে সব সময়েই সামান্য শক্তি-প্রবাহ গণকযন্ত্রে প্রবেশ করে মৃদু সংকেত সৃষ্টি করছে, কিন্তু কোন ফাঁকের সামনে যদি কোন এক্স-রে প্রভব পড়ে, তাহলেই সংকেত জোরালো হয় এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থাটিকে স্লাট কলিমেটর (Slat Collimator) বলা হয়। এভাবে প্রভবের অস্তিত্ব জানা গেলেও তার স্থিতিস্থান বা অভিমুখ জানা যায় না অথবা একই ফাঁক দিয়ে একাধিক প্রভবের শক্তি-প্রবাহ এলো কিনা—তাও জানা যায় না। ঐ স্লাট কলিমেটরকে (2নং চিত্র) অনুভূমিকভাবে আকাশ-

2নং চিত্র
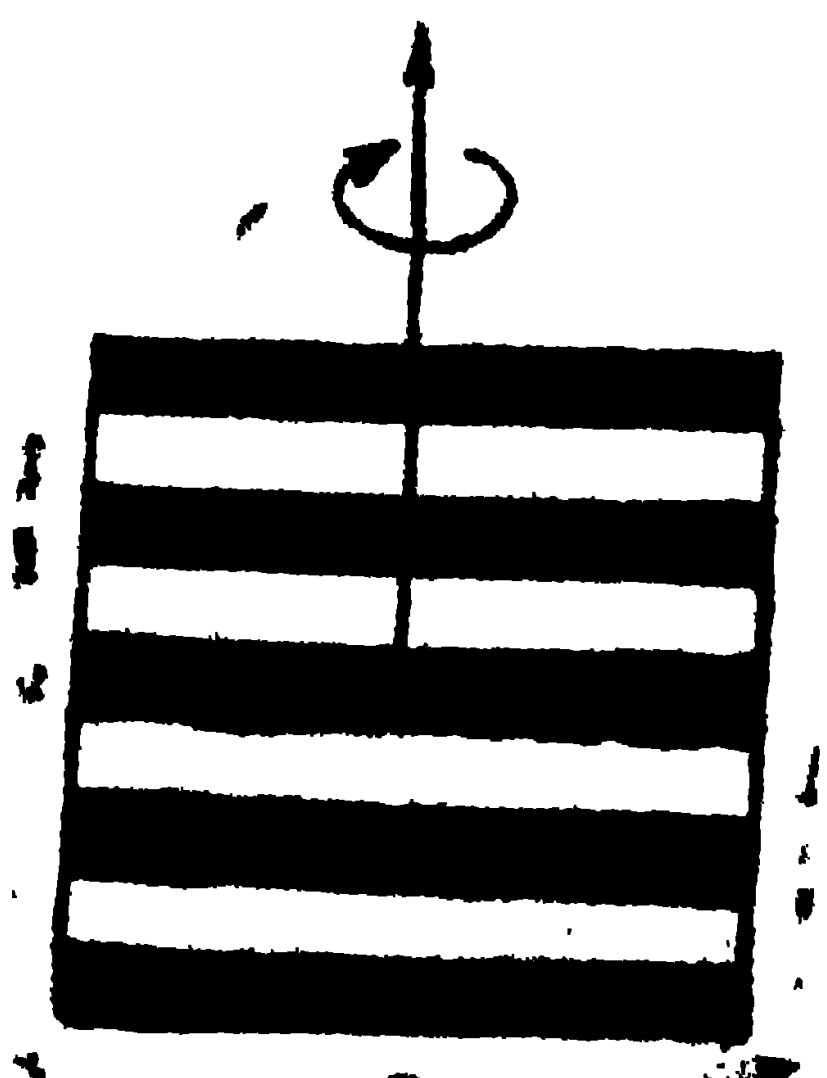
মুখী রেখে ফলকের সমকোণে আকাশস্থ কল্পিত রেখার চতুর্দিকে লাটিমের ন্যায় ঘুরিয়ে আবর্তন করালে আবিষ্কৃত ঐ এক্স-রে প্রভবের অবস্থান বিন্দুর মোটামুটি নির্দেশনা পাওয়া যায়। কিন্তু এটি তার স্থিতিস্থানের সঠিক নিশানা নয়। ফলে সন্নিকটে অন্য কোন দৃশ্য জ্যোতিষ্ক থাকলে আলোক-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাকেই স্লাট-কলিমেটরের আবিষ্কৃত এক্স-রে প্রভব বলে ভুল হতে পারে; অর্থাৎ প্রকৃত প্রভবটি সম্পর্কে দ্বিধা থেকে যায় (2নং চিত্র)।

আবিষ্কৃত জ্যোতিষ্কের স্থানাঙ্ক সূক্ষ্মভাবে জানবার জন্যে যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে, তার নাম ঘূর্ণ্যমান মডিউলেশন কলিমেটর (Rotating Modulation Collimator)। এই যন্ত্রটিকে স্লাট কলিমেটরের উন্নত সংস্করণ বলা যেতে পারে। এই যন্ত্রে স্লাট কলিমেটরের ঝিলমিলির প্রতিটি খাড়া ফলকের পরিবর্তে একটি করে গ্রিড (Grid) অর্থাৎ একগুচ্ছ সমান্তরাল সরু তার ঘন সন্নিবিষ্টভাবে স্থাপন করা হয়। অনুরূপ দ্বিতীয় অপর এক ঝিলমিলি প্রথমটির সমান্তরাল কিছুটা উপরে সংস্থাপিত রাখা হয়। উপরিউক্ত স্লাট কলিমেটরের মত এই ক্ষেত্রেও গ্রিডগুলির সমকোণে আকাশস্থ কল্পিত একটি রেখা অবলম্বনে ঝিলমিলিদ্বয়সহ অনুভূমিক গণকযন্ত্রটিকে বারবার আবর্তন করানো হয়। এই অবস্থায় প্রাপ্ত সংকেত থেকে উৎস বিন্দুর দিগংশ (Azimuth) ও ধ্রুবাংশ (Polar Distanoe) ঘূর্ণন রেখার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা সম্ভব এবং তা থেকে আকাশগোলকে জ্যোতিষ্কটির প্রকৃত স্থানাঙ্ক অর্থাৎ দিগংশ ও উন্নতি (Altitude) হিসাব করে নেওয়া যায়। এভাবে প্রভবের অবস্থান 10 সেকেণ্ড দূরত্বের মধ্যে জানা যায় বলে কোন দ্বৈত মীমাংসার সম্ভাবনা থাকে না।

ঘূর্ণ্যমান মডিউলেশন কলিমেটরের সাহায্যে আকাশে প্রভবের অবস্থান প্রায় নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট হওয়া ছাড়াও অন্য একটি মস্ত সুবিধা এই যে, গণক যন্ত্রে সংকেতসমূহ স্পষ্টতর হয়। কিন্তু এই যন্ত্রে কেবল দূরাগত এক্স-রে প্রভবেরই

অনুধাবন করতে পারে। বৃহদাকৃতির জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ নীহারিকাদির শক্তি-প্রবাহ দূর-বিস্তৃত বলে এই যন্ত্রে তার কোন সাড়া জাগে না। সুতরাং তেমন বৃহৎ প্রভবের সন্ধানও এই যন্ত্রে পাওয়া সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার না করে এই রকম একটা জটিল প্রণালী গ্রহণ করা হচ্ছে কেন? উত্তরটা সোজা। এক্স-রে প্রভবের সন্ধান কার্যে যে সংবেদী (Sensitive) দূরবীক্ষণের প্রয়োজন, সেটি ওজনে এত ভারী হবে যে, কোন রকেটের সাহায্যে গ্রহণ অসম্ভব। ভবিষ্যতে তদুপযুক্ত কোন মহাকাশ-যান বা রকেট যদি প্রস্তুত হলে ঐরূপ দূরবীক্ষণের ব্যবহারই করা হবে আশা করা যায়।

এই পর্যন্ত* 120টিরও বেশী এক্স-রে প্রভব আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ছায়াপথের অন্তর্গত। কিছু সংখ্যক ছায়াপথ-বিশ্বের বহির্ভূত। প্রভবসমূহের অনেকেই দূরাগত, আবার বৃহদাকৃতির জ্যোতিষ্কও বর্তমান। ক্র্যাব নীহারিকার কেন্দ্রস্থলে একটি নিউট্রন তারকা এক্স-রে তরঙ্গ বিকিরণ করে। এটি আবার একটি পালসারও (Pulsar) বটে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য এক্স-রে প্রভবের মধ্যে একটি কোয়াসারও (Quasar) আছে, যার জ্যোতিষিক পরিচয় 3c– 73। বহির্বিশ্বের বৃহৎ মেগালানিক মেঘমালা (Magellanic Clouds) নামক দুটি দ্বীপজগৎ থেকেও এক্স-রে বিকিরণ ধরা পড়েছে। সেন্টরাই নক্ষত্রপুঞ্জের একটি যুগলের (Binary) দুটি তারকাই এক্স-রে প্রভব (Cen X–3)। পৃথিবী থেকে দেখা যায়—তারা একে অন্যকে গ্রহণ লাগায়। গ্রহণের সময়ে এক্স-রে বিকিরণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারকাদ্বয় যখন পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়, তখন তাদের সম্মিলিত এক্স-রে বিকিরণ বেশ প্রবল হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ এক্স-রে প্রভবই আলোক-দূরবীক্ষণ বা বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে নি।

কৃষিতে অ্যাজোটোব্যাক্টার জীবাণু-সার

কমলেন্দু সিংহ* ও নীহারেন্দু সিংহ**

আজকাল বায়োফার্টিলাইজার (Biofertilizer) এবং জীবাণু-সার (Bacterial fertilizer)—এই দুটি কথা প্রায়ই শোনা যায়। অর্থগত দিক থেকে দুটি কথার অর্থ প্রায় একই। মাটির উর্বরাশক্তি বাড়াতে গেলে যেমন মাটিতে জৈব বা অজৈব সার প্রয়োগ করা হয়, ঠিক তেমনি এই বিশেষ ধরণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু (Bacteria) বা শ্যাওলা (Algae) মাটিতে প্রয়োগ করলে বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনকে বন্ধন করে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই এদের জীবাণু-সার বা বায়োফার্টিলাইজার বলা হয়। এই বায়োফার্টিলাইজার দু-প্রকারের—(ক) জীবাণু-সার, (খ) শ্যাওলা-সার। আবার জীবাণু-সারকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়:—(1) মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু (Free living nitrogen fixing bacteria), (2) মিথোজীবী জীবাণু (Symbiotic bacteria)

(1) মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু—এই প্রকারের জীবাণু মাটিতে স্বাধীনভাবে বসবাস করে বাতাসের মৌলিক নাইট্রোজেন

* হুগলী মহসীন কলেজ, হুগলী
** বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

বন্ধন করে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই জাতীয় জীবাণু প্রতি একরে প্রতি বছরে 3 থেকে 10 কিলো পর্যন্ত নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে এবং তা প্রায় 15 থেকে 50 কিলো অ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান। এই জাতীয় জীবাণু হলো অ্যাজোটোব্যাক্টর (Azotobacter), ক্লস্ট্রিডিয়াম (Clostridium), বাইজেরিংকিয়া (Biejerinkia), ডারজিয়া (Derzia) ইত্যাদি।

(2) মিথোজীবী জীবাণু—এই জাতীয় জীবাণু শিম বা ডালকলাই জাতীয় গাছের মূলে গুটি বা অর্বুদ (Nodule) তৈরী করে তাতে বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই জাতীয় গাছের মূলে যদি ভাল অর্বুদ হয়, তাহলে একর প্রতি 40 থেকে 125 কিলো. পর্যন্ত বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে এবং তা প্রায় 200 থেকে 625 কিলো অ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান। এই জাতীয় জীবাণুর নাম হলো রাইজোবিয়াম (Rhizobium) [এর বিশদ বিবরণ জাহ্নবী দাসের (1973) জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়েছে]।

এই দুই প্রকারের জীবাণু ছাড়াও আর এক রকমের নীল-সবুজ শ্যাওলা (Blue-green algae) আছে, যারা পুকুরে, জলাশয়ে বা ধানক্ষেতে বসবাস করে বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। এদের বলা হয় শ্যাওলা-সার। আমাদের দেশে কৃষির ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ধানচাষের বেলায় এর ব্যবহার হচ্ছে।

পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগ কর্তৃক শিম্বিজাতীয় শস্য, বিশেষতঃ সয়াবীনের বেলায় রাইজোবিয়াম জীবাণুসার ব্যবহারের ফলে কৃষকগণ এর উপকারিতা সম্বন্ধে কিছুটা অবগত হয়েছেন। কিন্তু অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণু-সারের ব্যবহার পদ্ধতি এবং তার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকে অবহিত নন। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানায় এই দুই রকমের জীবাণু-সারের ব্যাপক ব্যবহারে প্রচুর উপকার হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের কিছু কিছু উৎসাহী কৃষক ধান, পাট ও আলুর বেলায় এই অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণু-সার ব্যবহার করছেন।

বিদেশে—বিশেষতঃ রাশিয়া, রুমানিয়া পোল্যাণ্ড, জার্মেনী, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে এই অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণু-সারের ব্যবহার আজ সবচেয়ে বেশী। এই সব দেশে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করতে পারা গেছে যে, শিম্বি জাতীয় শস্য ছাড়া, যেমন—ধান, গম, ভুট্টা, আলু, তুলা, কপি প্রভৃতি শস্যে এই অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণু-সার ব্যবহার করে শস্যের উৎপাদন শতকরা 10 থেকে 140 ভাগ বেড়ে যায়। এই সব শস্যের উৎপাদন অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণু-সার ব্যবহার করে কতটা বেড়েছে, তার কিছু উদাহরণ 1নং টেবিলে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু উদাহরণ 2নং টেবিলে দেখানো হলো। এই সব গবেষণার ফল থেকে আমাদের দেশেও ডালকলাই শস্য ছাড়া যে কোন শস্যের বেলায় এই অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণু-সারের ব্যবহার বেড়ে গেছে। শুধু শস্য-উৎপাদন বৃদ্ধি নয়—মাটির গঠন, রাসায়নিক এবং ভৌত গুণাগুণ বৃদ্ধির মূলে এই সব জীবাণুর বিরাট কার্যকারিতা আছে, যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণু তৈরির পদ্ধতি—এই রকমের জীবাণু গবেষণাগারে এক বিশেষ ধরণের তরল মাধ্যমে (Liquid medium) শর্করা এবং নাইট্রোজেন ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত করা (Sterilization) হয়। ঐ তরল মাধ্যমে এই জাতীয় কিছু জীবাণু ছেড়ে দেওয়া হয় এবং কেবল এই জাতীয়

জীবাণু বাড়তে বাড়তে প্রতি সি. সি 10^{9} সংখ্যক জীবাণু যখন দাঁড়ায়, তখন প্রায় গঁদের (Gum) মত ঘন হয়ে যায়। তখন এই তরল কাল্চার জীবাণু-যুক্ত জৈব সার মিশ্রিত বিশেষ ধরণের মাটিতে অথবা পিট্ মাটিতে (Peat soil) মিশিয়ে পলিথিন প্যাকেটে 100 গ্র্যাম করে ভর্তি করে সরবরাহ করা হয়। এই এক প্যাকেট মাটিতে মিশ্রিত কাল্চার 1 থেকে 2 কিলো পর্যন্ত বীজে মাখানো যেতে পারে। এই কাল্চার ছ-মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। পশ্চিম বঙ্গে কেবলমাত্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে রাইজোবিয়াম এবং অ্যাজোটোব্যাক্টার—এই দুই ধরণের জীবাণু-সার তৈরী করা হয়। এখান থেকে এই কাল্চার পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়ে থাকে।

বীজে জীবাণু-সার মাখাবার পদ্ধতি—

আগেই বলেছি, এই জাতীয় কাল্চার বা জীবাণু-সার শিম্বিজাতীয় (মুগ, মুসুর, ছোলা, মটর, চীনাবাদাম, সয়াবীন ইত্যাদি) শস্য ছাড়া যে কোন শস্যের বেলায় ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—ধান, গম, যব, ভুট্টা, পাট, তুলা, কপি, আলু প্রভৃতি। অ্যাজোটোব্যাক্টার জীবাণু-সার ব্যবহার পদ্ধতি ঠিক শিম্বিজাতীয় বীজে রাইজোবিয়াম জীবাণু-সার ব্যবহার পদ্ধতির মতই। বীজ বপনের পূর্বে 1/2 কিলো বীজকে 15/20 মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখবার পর এই জল একেবারে ফেলে দিতে হয়। তারপর এক প্যাকেট (100 গ্র্যাম) পরিমাণ মাটিতে মেশানো জীবাণু-সার ঢেলে দিয়ে হাত দিয়ে উত্তমরূপ মেশাতে হয়। এই জীবাণু মানুষের কোন ক্ষতি করে না। বীজের খোসা জলে ভেজা থাকবার ফলে তার উপরে জীবাণু-সারের আস্তরণ লেগে যায়। এর পর বীজ বপন করা যেতে পারে। বীজের উপর প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণ যাতে না পড়ে তার জন্যে বীজ বপনের পরেই মই দিয়ে (Laddering) বীজকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে মাটি তৈরির সময় 10 থেকে 15 গাড়ী যে কোন ধরণের জৈব সার প্রয়োগ করলে এই জাতীয় জীবাণুর বেলায় খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

এই জাতীয় জীবাণু-সার ব্যবহার করতে একর প্রতি খরচ পড়ে 4-6 টাকা। এই 4-6 টাকার বিনিময়ে শস্য উৎপাদন বাড়তে পারে শতকরা 10 থেকে 40 ভাগ এবং একর প্রতি নাইট্রোজেন যুক্ত করতে পারে 3 থেকে 10 কিলো পর্যন্ত, যা প্রায় 15 থেকে 50 কিলো অ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান।

বীজে এই ধরণের জীবাণু-সার ব্যবহার করবার ফলে গাছের যখন প্রচুর মূল বের হয়, তখন মূলের ঠিক উপরে এবং মূলের ঠিক আশেপাশের মাটিতে (Rhizoplane and Rhizosphere region) এই জাতীয় জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। এমনি মাটিতে যে সংখ্যায় আণুবীক্ষণিক জীবাণু (Microorganisms) থাকে, তার প্রায় 10/15 গুণ বেশী থাকে ঐ মূলের ঠিক উপরকার মাটিতে। তার কারণ গাছের মূল মাটিতে বৃদ্ধির সময় মূল থেকে কিছু কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন এবং শর্করাজাতীয় জিনিষ মূলের বাইরে বের করে দেয়। এই জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য জীবাণুর বাঁচবার এবং সংখ্যায় বৃদ্ধির জন্যে খুব সাহায্য করে। তার ফলে মূলের উপরে এবং খুব কাছে-কাছে থেকে প্রচুর বায়বীয় নাইট্রোজেন যুক্ত করতে পারে এবং সেই নাইট্রোজেন গাছ অতি সহজে গ্রহণ করতে পারে। তারপর মাটিতে যে জৈব সার প্রয়োগ করা হয়েছে তা এই জাতীয় জীবাণুর বাঁচবার এবং বৃদ্ধির জন্যে খুব সাহায্য করে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই জাতীয় জীবাণু যদি এক গ্র্যাম শর্করা গ্রহণ করে তার পরিবর্তে 20 মিলিগ্র্যাম পর্যন্ত বায়বীয় নাইট্রোজেন যুক্ত করতে পারে।

এই জাতীয় জীবাণুর বেলায় মাটিতে কার্বনের পরিমাণের সঙ্গে নাইট্রোজেন বন্ধন করবার ক্ষমতা খুব সম্পর্কযুক্ত। তাই অ্যাজোটোব্যাক্টার জীবাণু-সার ব্যবহারের বেলায় জৈব সার প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। মাটি যাতে বেশী অম্লাত্মক বা ক্ষারাত্মক না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। মাটিতে যাতে ভাল বায়ু চলাচল করতে পারে, তার জন্যে মাঝে মাঝে নিড়ানী দেবার প্রয়োজন আছে।

জমিতে শস্য উৎপাদনের পর গাছের যে গোড়া মাটিতে থেকে যায়, তা পচে গেলে সেই সব সার এই জাতীয় জীবাণুর বৃদ্ধির খুব সহায়ক হয় এবং তখন প্রচুর নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। অনেক জায়গায় এই সব শস্যের গোড়াকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি মাটিতে তা ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তার ফল ভাল হতে পারে। অবশ্য পূর্বে মূলে কোন পোকা বা অন্য রোগের আক্রমণ হয়েছে জানলে ঐ গাছের গোড়া তুলে পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। যে সব জায়গায় প্রচুর গমের চাষ হয়, সেই সব জায়গায় শুধু গমের শীষটা কেটে নেয় এবং বাকী সমস্ত গাছটা মাঠেই থেকে যায়। এই সব ক্ষেত্রে এই জাতীয় জীবাণুর সঙ্গে সেলুলোজ এবং লিগ্‌নিন জাতীয় জিনিষ পচাতে (Decomposing) পারে এমন জীবাণু বা ছত্রাক মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে ছোট বড় সহরে sewage plant বসিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সহরের আবর্জনা পচিয়ে ভাল সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সব পরিকল্পনার দ্বারা সহরের আবর্জনাকে সেলুলোজ, স্টার্চ এবং লিগ্‌নিন পচাতে পারে, এমন আণুবীক্ষণিক জীবাণুর দ্বারা পচিয়ে তারপর এই জাতীয় মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু বাড়তে দিলে উত্তম সার তৈরী হয়। এই জাতীয় সারকে স্লাজ (Sludge) বলে। এই জাতীয় সারের নাইট্রোজেনের পরিমাণ 5 থেকে 15 পর্যন্ত হতে পারে (যেখানে অ্যামোনিয়াম সালফেটের নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা 20-21 ভাগ), কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই আবর্জনা ফেলে দিয়ে নষ্ট করা হয়। উন্নত দেশগুলিতে কিন্তু সার তৈরীতে এর সদ্ব্যবহার করা হয়।

এখন আমাদের দেশে ব্যাপক উচ্চ ফলনশীল ধান এবং গমের চাষ হচ্ছে। তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকগণ শুধু অজৈব সারের ব্যাপক ব্যবহার করে আপাততঃ ভাল ফল পাচ্ছেন। এই ভাবে বছরের পর পর একই জমিতে যদি কেবল অজৈব সার ব্যবহার করা হয়, তবে কয়েক বছর পরে মাটির গঠন, রাসায়নিক এবং ভৌত অবস্থা এমন পর্যায়ে আসবে, যখন ঐ অজৈব সার ব্যবহার করেও আগের মত আশানুরূপ ফল কিছুতেই পাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে এও দেখা গেছে যে, এই সব উচ্চ ফলনশীল শস্য প্রায়ই খুব রোগ-প্রবণ (Suseptible to diseases) হয়ে থাকে। তার প্রতিরোধের জন্যে ব্যাপক কীটঘ্ন, ছত্রাক নাশক এবং জীবাণু নাশক ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার করবার ফলে মাটির মধ্যে যে সব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব থাকে যেমন ক্ষুদ্র প্রাণী, ছত্রাক, জীবাণু শ্যাওলা প্রভৃতির সংখ্যা হ্রাস করে যাবে। মাটির গঠন, রাসায়নিক এবং ভৌত অবস্থা চাষ-আবাদের উপযোগী করে রাখতে গেলে এই সব আণুবীক্ষণিক জীবের একান্ত প্রয়োজন এবং এদের বাঁচতে গেলে এবং মাটিতে রাখতে হলে জৈব পদার্থের প্রয়োজন একান্ত আবশ্যক। ভবিষ্যতের মাটির এই অবস্থার কথা চিন্তা করে অনেক আগেই বহু কৃষিবিদ্ সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অজৈব সার ব্যবহারের সঙ্গে জৈব সার পর্যাপ্ত ব্যবহার না করলে অদূর ভবিষ্যতে কৃষির ক্ষেত্রে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা

আছে। কাজেই এই বিষয়ে সরকার এবং কৃষকদের অনেক আগেই সতর্ক হওয়া উচিত।

1নং টেবিল

ইউ. এস. এস. আর.-এর বিভিন্ন ফার্মের পরীক্ষার ফল (Samoilova—1959)

শস্যের নাম	অ্যাজোটোব্যাক্টার ব্যবহার করবার ফলে শতকরা উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ, (শতাংশ)
(1) গম	18
(2) ভুট্টা	18
(3) আলু	22
(4) বাঁধাকপি	16
(5) বার্লি	10
(Mishustin and Shilnikova—1969)	
(6) ফুলকপি	143
(7) টম্যাটো	28
(Mishustin and Naumova—1962)	
(8) গম	15
(9) আলু	20
(10) ওট	14
(11) তুলা	10
(12) ধান	65—(Sorokina—1946)

2নং টেবিল

ভারতে পরীক্ষার ফল

শস্যের নাম	অ্যাজোটোব্যাক্টার ব্যবহার করবার ফলে শতকরা উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ	References
(1) বাঁধাকপি	33 5	IARI Report (1963-64)
(2) ধান	17·7	Manna et al, Rice News Teller 10, 13.
(3) ভুট্টা (F.Y.M)	5·7	Shende (1972) Int. Symp. Soil Productivity Benarus.
(4) ভুট্টা	2-80	Thakre and Saxena (1972) Indian. J. Microbid. 12, 11.
(5) বজরা	33-57	Sundara Rao et al (1963) Indian J. Agric. Sci 33, 279
(6) ধান	29	Shende (1965) Ph.D thesis, Moscow.
(7) মটর	60	Sundara Rao et al (1963) Indian J. Agric. Sci 33, 279

শক্তির উৎস—রিয়্যাক্টর

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

শক্তি ও বিদ্যুৎ

পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে শক্তি হলো কাজ করবার সামর্থ্য, কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে শক্তি গভীর অর্থবহ। কোন দেশ বা সমাজ কিভাবে শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ করে অথবা শক্তি সেখানে কিভাবে ব্যবহৃত হয়—এই সব কিছুর উপর সেই সমাজের প্রকৃতি ও উন্নতির পরিমাপ করা যেতে পারে। মানুষের বর্তমান সভ্যতা যন্ত্র-ভিত্তিক আর তার কেন্দ্রবিন্দু হলো শক্তি। তাপ-আলো-বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আহরণ করি, এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকারে রূপান্তরিত করতে পারি। আধুনিক যুগে শক্তির ব্যবহার তাই জটিল যন্ত্রভিত্তিক।

আদিম যুগে যে শক্তি মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করেছে, তা হলো সূর্যের আলো ও তাপ। পরবর্তী যুগে আগুনের ব্যবহার নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রাচীন কালে সূর্য যেমন দেবতার সম্মান পেয়েছে, তেমনি আগুনও দেবতার দানরূপে গৃহীত হয়েছে। কঠোপনিষদে দেখা যায়, বাজশ্রবা ঋষির ছেলে স্বর্গ থেকে আগুন আহরণ করে এনেছিলেন। আগুনের আর এক নাম নাচিকেত, তাই তিনি নচিকেতা নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গ্রীক পুরাণে দেখা যায়, প্রমেথিউস দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন। প্রাচীন কালে আগুন ব্যবহারের গুরুত্ব এই সব উপাখ্যান থেকে অনুমান করা যায়।

আদি যুগে আগুনের উৎস ছিল কাঠ বা বনজঙ্গল থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যেত। পরবর্তী কালে কয়লার আবিষ্কার হয়েছে। তাছাড়া জলস্রোতের গতিবেগ, বায়ুস্রোত এই সব শক্তির ব্যবহারও মধ্যযুগে বেশ প্রসার লাভ করেছিল। কয়লা দিয়ে ইঞ্জিন চালানো ও বিদ্যুৎ উৎপাদন—এই দুটি ঘটনা মানুষের ইতিহাসে নিয়ে এসেছে বিপ্লব। আধুনিক সভ্যতা ও শিল্প-বিপ্লবের মূলে তাই কয়লা একটি অপরিহার্য মূল্যবান সম্পদ। ক্রমশঃ পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার মানুষকে অধিকতর শক্তিমান করে তুলেছে। বর্তমান পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎসরূপে যা ব্যবহৃত হচ্ছে, তা হলো কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস জল-বিদ্যুৎ ও নিউক্লীয় শক্তি। যন্ত্রের সাহায্যে এই সব উৎস থেকে শক্তি আহরণ করে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরীকরণ ও বিদ্যুতের ব্যবহারে শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন, মানুষের সভ্যতাকে ভবিষ্যতে বাঁচিয়ে রাখবে সন্দেহ নেই।

বিদ্যুৎ-শক্তির উৎস এই সব উপকরণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ও জীবনধারণের মান উন্নততর করবার তাগিদে যদি ফুরিয়ে যায়, তবে কি সভ্যতা বেঁচে থাকবে--না, পৃথিবীর মানুষ রক্ষা পাবে? এই প্রশ্ন বিশ শতকের গোড়ায় প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই শতাব্দীতে নিউক্লীয় শক্তির ব্যবহার সম্ভব হওয়ায়, পৃথিবীর ইউরেনিয়াম, থোরিয়ামের সামগ্রিক সঞ্চয়ের হিসাব থেকে জোর দিয়ে বলা যায় যে, একমাত্র নিউক্লীয় শক্তিই মানুষের সভ্যতাকে অন্ততঃ আগামী 300 বছর বাঁচিয়ে রাখবে। তাছাড়া কয়লার সঞ্চয়ও পৃথিবীতে কিছু কম নেই।

---

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও তাদের উন্নততর জীবনযাত্রার মান হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে, গত 1950 খৃষ্টাব্দে সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি খরচ হয়েছে, আগামী 2000 খৃষ্টাব্দে তার প্রায় 11 গুণ বেশী শক্তির প্রয়োজন হবে। গত 1950 খৃষ্টাব্দে মোট ব্যয়িত শক্তির 62·4 শতাংশ পাওয়া গিয়েছিল কয়লা থেকে, 25·2, 10·8 ও 1·6 শতাংশ যথাক্রমে তেল, গ্যাস ও জল-বিদ্যুৎ থেকে। তখনও নিউক্লীয় শক্তির উল্লেখযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয় নি। উন্নত দেশগুলির এখন সমস্যা হলো শক্তির উৎস এমন হবে—যাতে জলবায়ু ও পরিবেশ দূষিত না হয়। কয়লা থেকে কার্বন মনোক্সাইড, মিশ্রিত গন্ধক প্রভৃতি মানব পরিবেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই কয়লার ব্যবহার যতদূর সম্ভব এড়িয়ে 2000 খৃষ্টাব্দে 11 গুণ বর্ধিত শক্তির মাত্র 16·8 শতাংশ নেওয়া হবে কয়লা থেকে, আর 17·5 শতাংশ নিউক্লীয় শক্তি থেকে। বাকীটুকু পূরণ করা হবে তেল, গ্যাস ও জল-বিদ্যুৎ থেকে যথাক্রমে 34·6, 29 ও 2·1 শতাংশ হারে। 2000 খৃষ্টাব্দে নিউক্লীয় শক্তি ব্যবহারের বর্ধিত পরিমাণ লক্ষ্য করতে হবে। এই শক্তি হলো পরমাণু-কেন্দ্রের বিভাজনজনিত—যা ইউরেনিয়াম ইত্যাদি খনিজ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ভূগর্ভে এই সব শক্তির উৎসের মোট পরিমাণ হিসাব করে দেখা যায় যে, আমাদের ভাণ্ডারে প্রায় 1 লক্ষ 25 হাজার কোটি টন কয়লার সমান বিভিন্ন শক্তির উৎস মজুত আছে। এই মোট পরিমাণের 59 শতাংশ কয়লা আর ইউরেনিয়াম অক্সাইড 34·4 শতাংশ। বাকীটুকু তেল, গ্যাস ও জল-বিদ্যুৎ। এই হিসাবে থোরিয়াম ধরা হয় নি। থোরিয়াম থেকে নিউক্লীয় রিয়্যাক্টরের প্রসার ব্যাপক হয়ে উঠলে মোট সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ও ব্যবহার্য নিউক্লীয় শক্তির পরিমাণ কিছু বেড়ে যাবে।

শক্তির উৎস—রিয়্যাক্টর

যে দুটি মৌলিক খনিজ পদার্থ থেকে নিউক্লীয় শক্তি আহরণ করা যায়, তা হলো ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। ইউরেনিয়ামের দুটি আইসোটোপ U-235 U-238। U-235 থেকে সোজাসুজি মৃদুগতি নিউট্রনের সাহায্যে বিভাজন প্রক্রিয়া চলে। এর প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াসের বিভাজনে বাড়তি আরও একাধিক নিউট্রন পাওয়া যায়। এই সব নিউট্রন পরপর আরও নিউক্লিয়াসের বিভাজনের দ্বারা একটি শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে। এই রকম বিভাজনের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়, তা জল প্রভৃতি কোন তরল পদার্থের মাধ্যমে তাপরূপে চালিত করা হয়, যা বাষ্প উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। এই উত্তপ্ত বাষ্প দিয়ে চালানো হয় টারবাইন, যা থেকে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। দরকারী কথা হলো—দ্রুতগতি নয় মৃদুগতি, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় 5000 থেকে 10000 মাইল গতিবেগসম্পন্ন নিউট্রনই এই শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চালাবার উপযোগী। তাই U-335 জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করলে বিভাজন থেকে উদ্ভূত নিউট্রনের গতিবেগ কমাবার জন্যে জল, ভারী জল বা গ্র্যাফাইট ইত্যাদির প্রয়োজন। অবশ্য প্রথম বিভাজনটি ঘটাবার জন্যে মহাজাগতিক এই রকম দু-একটি নিউট্রনই যথেষ্ট।

U-235 ছাড়া আরও যে সব আইসোটোপে অনুরূপ বিভাজন সম্ভব—সেগুলি হলো:

U-233, Pu-239 ও Pu-241

এসব পদার্থও U-235-এর মত আভাবিক তেজস্ক্রিয়, কিন্তু শুধু কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত হতে পারে, U-235-এর মত খনিতে পাওয়া যায় না। এই তিনটি পদার্থ ছাড়া আরও তিনটি আইসোটোপ, যা সরাসরি বিভাজনযোগ্য না হলেও নিউট্রন শোষণ করে বিভাজনযোগ্য পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। এগুলি হলো Th-232,

U-238, Pu-240। এদের উর্বর পদার্থ বলা হয়—অর্থাৎ নিউট্রনীয় বিভাজনের আধার। প্রথম দুটি অবশ্য স্বাভাবিক খনিজ পদার্থ। তৃতীয়টি Pu-239 থেকে আবার কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা যেতে পারে। 1নং সারণীতে উল্লেখিত কোন্ পদার্থের নিউক্লিয়াস একটি নিউট্রন সহযোগে বিভাজিত হলে গড়ে কতগুলি নিউট্রনের জন্ম দিতে পারে—তার একটা হিসাব পাওয়া যাবে।

1নং সারণী

	মৃদু নিউট্রন ঘণ্টায় 5-10 হাজার মাইল গতিবেগ	দ্রুত নিউট্রন ঘণ্টায় 3-4 কোটি মাইল গতিবেগ
U—233	2·3	2·3
U—235	2·1	2·0
Pu—239	1·9	2·4
Pu—241	2·1	2·7

সব রিয়্যাক্টরেই দ্রুত ও মৃদু নিউট্রন তৈরী হয়। কিন্তু U-235-এর ক্ষেত্রে বিভাজন প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা কেবল মৃদু নিউট্রন দিয়েই সম্ভব আর মৃদু নিউট্রনে সে ক্ষেত্রে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়াও চলতে পারে; কারণ একটি নিউট্রনের আঘাতে ঐ নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় আরও বাড়তি গড়ে 2·1টি নিউট্রন পাওয়া যায়। তাই U-235 জ্বালানী ব্যবহার করলে নিউট্রন মন্দনের জন্যে সাধারণ বা উচ্চচাপে জল অথবা গ্র্যাফাইট প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া সাধারণ ইউরেনিয়াম খনিজে U-235 থাকে মাত্র শতকরা 0·7 ভাগ, বাকীটুকু U-238। U-235-কে U 238 থেকে পৃথক করাও একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার—কারণ এরা একই মৌলিক পদার্থ বলে রাসায়নিক পদ্ধতিতে এদের পৃথক করা যায় না। তাই ফ্লোরিন সহযোগে ইউরেনিয়ামের বাষ্প মৌলিক বিশ্লেষ করে বেছে ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় একটি সছিদ্র পর্দার (Membrane) মধ্য দিয়ে চালিত করলে U-238 একটু ভারী বলে ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ে—আর U-235 একটু বেশী এগিয়ে যায়। এই রকম বহু কক্ষের মাধ্যমে চালিত হলে তবেই U-235 কিছুটা আলাদা করা যায়। এই পৃথকীকরণ সমস্যা এড়াবার জন্যে দুই আইসোটোপ মিশ্রিত সাধারণ খনিজ ইউরেনিয়ামও ব্যবহার করা হয়—সে ক্ষেত্রে U-238 অংশটি থাকে অকেজো। ফলে এই রকম রিয়্যাক্টরে শক্তি উৎপাদনের নিপুণতা কিছুটা কমে।

প্রজননকারী রিয়্যাক্টর

এই সব মৃদু রিয়্যাক্টর ছাড়া দ্রুতগামী নিউট্রন দিয়ে রিয়্যাক্টর চালানো যায়, সে ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে প্রয়োজন প্লুটোনিয়াম অথবা U-233। কিন্তু Pu-239 বা U-233 কোন স্বাভাবিক পদার্থ নয়। Th-232 ও U-238 নিউট্রন সহযোগে যথাক্রমে U-233 ও Pu-239 তৈরী করতে পারে। 1নং সারণীতে দেখা যাবে যে, U-233-এর বেলায় মৃদু ও দ্রুত দু-রকম নিউট্রন দিয়েই শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চলতে পারে—কিন্তু Pu-239-এর ক্ষেত্রে দ্রুত নিউট্রন প্রয়োজন। কিন্তু এই সব কৃত্রিম পদার্থ দিয়ে রিয়্যাক্টর চালাবার দুটি সমস্যা। প্রথমটি হলো উর্বর পদার্থ U-238 বা Th-232 থেকে যথাক্রমে বিভাজনযোগ্য Pu-239 অথবা U-233 প্রজনন করা এবং দ্বিতীয়টি হলো শেষোক্ত দুটি পদার্থ দিয়ে রিয়্যাক্টর চালানো। এই দুটি সমস্যারই একযোগে

সমাধান হতে পারে যদি U-235 রিঅ্যাক্টরের আবরণরূপে U-238 বা Th-232 রাখা যায় এবং নিউট্রন যাতে বৃথা ব্যয়িত না হয়, তার ব্যবস্থা করা। তাহলে এই রকম রিঅ্যাক্টর থেকে শুধু শক্তি নয়, বাড়তি জ্বালানী Pu-239 বা U-233ও পাওয়া যেতে পারে। এই রকম রিঅ্যাক্টরের নাম দেওয়া হয়েছে প্রজনক (Breeder) বা জনন-কারী রিঅ্যাক্টর। এতে যে জ্বালানীটুকু খরচ হবে, তার চেয়ে বেশী জ্বালানী উৎপাদিত হবে। এ যেন যাদুকরের সাহায্যে টাকা দ্বিগুণ করবার খেলা। অথচ এই রকম জননকারী রিঅ্যাক্টর পরীক্ষামূলকভাবে সাফল্য লাভ করেছে। দ্রুত জননকারী রিঅ্যাক্টরে জ্বালানী থাকবে Pu-239 অথবা U-233 আর যে উর্বর পদার্থ থেকে নূতন জ্বালানী তৈরী হবে, তা হলো যথাক্রমে U-238 অথবা Th-232। অবশ্য Th-232 থেকে U-233 পেতে হলে মৃদু জননকারী রিঅ্যাক্টরও চলতে পারে—কারণ 1নং সারণীতে দেখা যাবে যে, U-233-এর বিভাজনে গড়ে 2.3টি মৃদু বা দ্রুত দু-রকম নিউট্রনই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ার জন্যে প্রতি বিভাজনে একের বেশী নিউট্রনই যথেষ্ট, কিন্তু নূতন জ্বালানী প্রজননের বাড়তি কাজটুকু করবার জন্যে আবার আর একটি অথবা তার বেশী নিউট্রন আবশ্যক। তাই দ্রুত রিঅ্যাক্টরের বেলায় Pu-239 ও U-238 এবং দ্রুত ও মৃদু দু-ক্ষেত্রেই U-233 ও Th-232-র সমাবেশে জননকারী রিঅ্যাক্টর তৈরী করা সম্ভব।

LMFBR, HTGR, LWBR

Liquid Metal Fast Breeder Reactor হলো নিউক্লীয় শক্তির উৎসের এক নূতন রূপ, যা শুধু শক্তিই উৎপাদন করবে না—সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন করবে নূতন জ্বালানী। এই রকম রিঅ্যাক্টরের দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয় দুটি সংখ্যা দিয়ে—এক : জননের অনুপাত ও দুই : দ্বিগুণকরণের সময় (Doubling time)। বিয়োজিত জ্বালানীর প্রতিটি নিউক্লিয়াসের বিভাজনে উর্বর পদার্থের যে কয়টি নিউক্লিয়াস বিভাজন-যোগ্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়—তা হলো জননের অনুপাত। এই অনুপাত যত বেশী হবে, রিঅ্যাক্টর ততই দক্ষ প্রমাণিত হবে। দ্বিগুণকরণের সময় হলো সেই সময়, যাতে জ্বালানী ও উর্বর পদার্থের সমান জ্বালানী উৎপাদিত হতে পারে। সাধারণতঃ এই সময় 10 বছরের কম হয়।

সাধারণতঃ যে জল দিয়ে তাপ পরিবহন তথা নিউট্রন মন্দনের কাজ সাধারণ মৃদু রিঅ্যাক্টরে করা হয়, সেই জলের পরিবর্তে LMFBR-এ তরল ধাতু, যথা সোডিয়াম ব্যবহার করা হয়। কারণ এই রিঅ্যাক্টরে নিউট্রন যাতে মন্দীভূত না হয়, অথচ তাপ পরিবহনে অসুবিধা না ঘটে, তা করা হয়। সোডিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক ও বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা এই কাজের খুবই উপযুক্ত। এই রিঅ্যাক্টরের আবরণে U-238 আংশিকভাবে Pu-239-এ রূপান্তরিত হলে এই দুটির মিশ্রণ দিয়ে আবার নূতন জ্বালানীর কাজ চালানো যাবে।

এই ধরনের রিঅ্যাক্টরের দক্ষতা সাধারণ U-235 থেকে বেশী অথচ তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল উৎপন্ন হয় কম। পরীক্ষামূলকভাবে এই রকম রিঅ্যাক্টর সাফল্য লাভ করলেও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এর ব্যবহার 1985-এর আগে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তার প্রধান কারণ হলো দ্রুতগতি নিউট্রনের সংঘাতে ধাতুর বাঁধন খর্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। ইস্পাত ফেঁপে উঠে ও অব্যবহার্য হয়ে যায়। রিঅ্যাক্টরের অংশ হিসাবে যে সব ধাতু ব্যবহার না করলে চলে না, দ্রুত নিউট্রনের প্রভাবে সেগুলি অক্ষত রাখবার সমস্যা থেকেই দ্রুত জননকারী রিঅ্যাক্টরের প্রচলন বিলম্বিত হচ্ছে। অবশ্য এই সমস্যার সমাধান না হবার কারণ নেই। আশাবাদীদের কাছে তাই জননকারী রিঅ্যাক্টরের প্রথম বাণিজ্যিক সংস্করণটি আমেরিকার ওক্‌রিজে

1985 খৃষ্টাব্দে সফল রূপ নেবে। পরীক্ষামূলক এই রকম বেশ কয়েকটি রিয়্যাক্টর বিভিন্ন দেশে চালু আছে। High Temperature Gas Reactor বা উচ্চ তাপ বায়ব রিয়্যাক্টর একটি বৃহৎ জননকারী রিয়্যাক্টর, যার প্রাথমিক জ্বালানী U-235 ও Th-232 থেকে U-233 জ্বালানী মৃদু নিউট্রন দিয়ে তৈরী করা যায়। তাপ পরিবহনের জন্যে এতে ব্যবহৃত হয় হিলিয়াম বায়ব ও নিউট্রন মন্দনের জন্যে গ্র্যাফাইট। আমেরিকায় 40 মেগাওয়াটের এই রকম একটি রিয়্যাক্টর 1967 খৃষ্টাব্দে সাফল্য লাভ করবার পর আর একটি 330 মেগাওয়াট পরীক্ষামূলক রিয়্যাক্টরের নির্মাণকার্য এগিয়ে চলেছে—ইতিমধ্যেই কাজ শেষ হবে। এর সাফল্যের উপর থোরিয়াম দিয়ে বৃহত্তর রিয়্যাক্টর চালাবার সম্ভাবনা নির্ভর করছে।

Light Water Breeder Reactor-এ সাধারণ জল দিয়ে যাতে Th-232-U-233 জননকারী রিয়্যাক্টর চালানো যায়, তার পরীক্ষাও চলছে। 1975 খৃষ্টাব্দে হয়তো এই পরীক্ষার প্রাথমিক ফলাফল জানা যাবে। এই পরীক্ষা সফল হলে পৃথিবীর সমগ্র থোরিয়াম সঞ্চয়ের অন্ততঃ শতকরা 50 ভাগ শক্তির উৎসরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও দ্রুত ও বৃহৎ জননকারী রিয়্যাক্টর নিয়ে আরও নানা রকম গবেষণা চলেছে—যার সুফল এই শতাব্দীতেই বর্ধিত নিউক্লীয় শক্তির ব্যবহার সম্ভব করবে।

আমেরিকার অ্যাটমিক এনার্জী কমিশনের মতে, সাধারণ ইউরেনিয়াম জ্বালানী অন্ততঃ সে দেশে এই শতাব্দীতেই ফুরিয়ে যাবে—কারণ তার ব্যবহার যথেষ্ট বেড়ে গেছে। আমেরিকা বর্তমানে যে 370 বিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তিকেন্দ্র ব্যবহার করে, তার 30 ভাগের উৎস হবে ইউরেনিয়াম। এখনই সে দেশে 28টি নিউক্লীয় শক্তিকেন্দ্র আছে, 49টি এখনও পথে, আরও 67টি তৈরী হচ্ছে। এই সবই চলবে ইউরেনিয়াম দিয়ে। ফলে ইউরেনিয়ামের ঘাটতি পড়বে অবশ্যই। তাই জননকারী রিয়্যাক্টর অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

সারা পৃথিবীর পক্ষে রিয়্যাক্টর যে ভবিষ্যৎ শক্তির প্রধান উৎস, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাছাড়া পৃথিবীতে আরও যে সব পুরাতন শক্তির উৎস সঞ্চিত আছে অথবা বিজ্ঞানীরা যে সব উৎসের সন্ধান করছেন, তা সফল হলে এবং সে সব ব্যবহার করতে পারলে পৃথিবীর সভ্যতা বহুকাল বেঁচে থাকবে সন্দেহ নেই।

সঙ্কলন

সয়াবীন

এই যুগের খাদ্যতালিকায় সয়াবীন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। একদিন ছিল যখন সয়াবীনের কদর কেউ বোঝে নি। এখন কিন্তু প্রোটিনে ভরপুর এই সজিটির মর্ম সকলেই বুঝেছেন। যে সব দেশে খাদ্যাভাব প্রকট, সে সব দেশের খাদ্যতালিকায় সয়াবীন আশীর্বাদস্বরূপ। সস্তায় শরীরে প্রোটিন যোগাতে সয়াবীনের তুলনা নেই।

বহুমুখী গুণের অধিকারী এই সয়াবীন। রান্নার ও স্যালাড তৈরীতে সয়াবীনের তেল অদ্বিতীয়। সয়াবীনের খাবার মাছ, মুরগী ও গবাদিপশুর পক্ষে পুষ্টিকর আহার। সয়াবীনের দুধ থেকে ছানা, দই, সন্দেশ কি না তৈরি হচ্ছে! তাল রুটি তৈরীতে সয়াবীন কাজে লাগছে। আরও কত নতুন নতুন খাবার তৈরী হচ্ছে সয়াবীন দিয়ে।

কিন্তু এটুকুই সব নয়। সয়াবীনের আরও অনেক বিস্ময়কর গুণ আছে। শ্রমশিল্পে এর ব্যবহারের কথা চিন্তা করলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। সয়াবীনের তেল পরিশোধিত করে তা রং, বার্নিশ, প্লাস্টিক, সাবান, দাড়ি কামাবার ক্রীম, ছাপার কালি, নানা প্রকার ভেষজ দ্রব্য ইত্যাদি অনেক কিছু তৈরীতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইদানীং সয়াবীন উৎপাদনের উপর অনেক দেশেই জোর দেওয়া হচ্ছে। শতাব্দীকাল ধরে সয়াবীন চাষের উপর যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কিন্তু এখন সয়াবীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ফসল। 1960 সাল থেকে 1970 সাল পর্যন্ত 10 বছরে সয়াবীন চাষের জমির পরিমাণ চার ভাগের তিন ভাগ বেড়েছে। এর উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ, আর রপ্তানী বেড়েছে তিন গুণেরও বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে এখন 130 কোটি বুশেল বা 3 কোটি 50 লক্ষ টন সয়াবীন উৎপন্ন হচ্ছে।

সয়াবীন ও সয়াবীনজাত দ্রব্যের সবচেয়ে বড় রপ্তানীকারী এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 1972 সালের 30শে জুন পর্যন্ত এক বছরে 200 কোটি ডলার মূল্যের সয়াবীন ও সয়াবীনজাত দ্রব্য রপ্তানী করা হয়েছে।

পৃথিবীতে সয়াবীনের মোট উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ এখন উৎপন্ন হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এই উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী তারা রপ্তানী করছে বিদেশে।

1972 সালে 5 কোটি বুশেল, অর্থাৎ 1 কোটি 35 লক্ষ টন কাঁচা সয়াবীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিদেশে রপ্তানী হয়েছে। রপ্তানীর পরিমাণ 1971 সাল অপেক্ষা 20 শতাংশ বেশী। সোভিয়েট ইউনিয়ন গত বছর আগষ্ট মাসে 10 লক্ষ টন সয়াবীন আমেরিকা থেকে কিনেছে।

গবাদি পশু ও মুরগীর খাদ্য হিসাবে সয়াবীনের খাদ্যের চাহিদা প্রচুর। সয়াবীনের তেলের চেয়ে সয়াবীনের খাদ্যের রপ্তানীর পরিমাণও অনেক বেশী।

কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি সয়াবীনের তেল ও সয়াবীনজাত খাদ্যের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। এই সব দেশ এক বছরে 54 কোটি ডলারেরও বেশী দামের 45 লক্ষ টন সয়াবীন এবং 2 লক্ষ 6 হাজার ডলার মূল্যের 800 টন সয়াবীনের তেল কিনেছে।

এর পরেই জাপানের স্থান। 1956 সালে প্রায় 6 লক্ষ টন সয়াবীন কিনেছিল

আমেরিকা থেকে। গত কয়েক বছরে ভারত, বাংলা দেশ, টিউনিসিয়া ও পাকিস্তান যথেষ্ট পরিমাণ সয়াবীনের তেল কিনেছে আমেরিকার কাছ থেকে। মরক্কো, ইরান এবং চীনও কিনেছে। তবে এদের ক্রয়ের পরিমাণ অনেক কম।

সয়াবীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্রেজিল এখন যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে ব্রেজিলের রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। সয়াবীন রপ্তানীকারী দেশ হিসাবে ব্রেজিলের স্থান এখন দ্বিতীয়।

সয়াবীন উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের স্থানও নগণ্য নয় এবং বছরে 62 লক্ষ টন সয়াবীন উৎপাদন করে, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন করে 5 লক্ষ 94 হাজার টন।

ছোটখাটো উৎপাদকদের মধ্যে রয়েছে ক্যানাডা, মেক্সিকো, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, রুমানিয়া, তাইওয়ান, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ।

1972 সালে সমগ্র বিশ্বে সয়াবীনের উৎপাদন 41 লক্ষ টন বেড়েছে। বর্ধিত উৎপাদনের অনেকখানিই সম্ভব হয়েছে আমেরিকা ও ব্রেজিলের অধিক উৎপাদনের দরুণ।

সয়াবীন যেভাবে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তাতে মনে হয় অন্যান্য বহু দেশেও এর উৎপাদন ক্রমেই বাড়বে। গ্রীষ্মপ্রধান ও আধা-গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সয়াবীনের চাষ সম্ভব।

তবে সয়াবীনের প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে। যুক্তরাষ্ট্রেই এর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হলো তুলাবীজ তেল, ভুট্টার তেল, পীনাট তেল, সাফ্লাওয়ার তেল।

এছাড়া রয়েছে রাশিয়া, ইউরোপ ও আর্জেন্টিনার সূর্যমুখী বীজের তেল, ক্যানাডা ও ইউরোপের রেপসীড তেল, পেরু ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মাছের তেল এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার বাদাম তেল, নারিকেল তেল ইত্যাদি।

সারা বিশ্বে এই সব জাতীয় তেল আমেরিকার সয়াবীনের তেলের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করছে।

তৈল বীজজাত তেলের চাহিদা সারা পৃথিবীতে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে কয়েকটি দেশ, যেমন— অষ্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছে।

অষ্ট্রেলিয়া তার সূর্যমুখী বীজের উৎপাদন খুবই বাড়িয়েছে। 1969-70 সালে উৎপাদন যেখানে ছিল 16,802 টন, সেখানে 1970-71 সালে উৎপাদন 82 হাজার টন ছাড়িয়ে গেছে।

ফিলিপাইনের নারিকেল তেলের উৎপাদন এবং রপ্তানীও অনেক বেড়েছে। পেরুর মৎস্য-শিল্পেরও বেশ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, যাতে বিদেশে রপ্তানীর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ তেল ও খাদ্য উৎপাদন করা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সয়াবীন বেশ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। তবে কৃষি-বিজ্ঞানীরাও নিশ্চেষ্ট বসে নেই। তাঁরা চেষ্টা করছেন ভুট্টা ও সরগামের মত সঙ্কর সয়াবীন উৎপাদন করতে। তাহলে এর উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রোটিনের গুণগত মান দুই-ই বাড়বে।

বিশ্বের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর গবেষণা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির নেওয়ার্কে অবস্থিত রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাচ্ছেন যে গবেষণা চলছে, তা বিশ্বের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। এখানকার গবেষণাকার্যে গাছের ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে জোড়-কলম করবার ব্যাপারে মালীদের প্রাচীন প্রথার সাহায্য তো নেওয়া হচ্ছেই, তাছাড়া গাছের কোষ-গঠন ও বিন্যাস সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে নতুন নতুন

জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন, তাও কাজে লাগানো হচ্ছে।

ডক্টর ফিলিপ ভিনসেন্ট অ্যামিরাটো স্বাধীন গবেষণার মাধ্যমে প্রজনন পদ্ধতি ব্যতীতই গাছপালা উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। ডক্টর অ্যামিরাটো নতুন কলেজ অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস-এর একজন সহকারী অধ্যাপক। তিনি নেওয়ার্কে রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের লেবোরেটরীতে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

শত শত বছর ধরে মালীরা অযৌন পদ্ধতিতে জোড়কলম ব্যবহার মাধ্যমে নতুন নতুন গাছপালা সৃষ্টি করছে।

নতুন কোষ উৎপাদনের নবলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রচুর পরিমাণে চারাগাছ জন্মানো যায় বলে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর অ্যামিরাটো মনে করেন। এর ফলে খাদ্যোপযোগী ফসলের ফলনও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেছেন, সকল জীবই কোষের দ্বারা গঠিত। ছোট একটি চারাগাছ নিয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একটি তামাক গাছ। যথাযোগ্য পুষ্টিবিধায়ক ও গাছের বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে কোষগুলিকে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। তারপর কোষ বৃদ্ধির মাধ্যমটি পাল্টে দিয়ে ঐ কোষগুলি শিশু চারাগাছে রূপান্তরিত করা হয়। এই নবজাত চারাগুলি এদের জন্মদাতা পূর্বের গাছগুলিরই হুবহু দ্বিতীয় সংস্করণ।

তিনি তামাক আর গাজর গাছ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে সাফল্য লাভ করেন। এখন তিনি মিষ্টি আলু বা রাঙা আলুর গাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছেন।

তিনি বলেছেন, প্রায় একটি ফলের দানার মত ছোট আকারের একটি টিস্যু বা তন্তু আমি কেটে নিলাম। এই তন্তুতে প্রায় 20 হাজার কোষ থাকে। আর তিন সপ্তাহের মধ্যে এগুলি থেকে সৃষ্টি হয় 40 লক্ষ কোষ। তারপর বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রক্রিয়ার পর প্রতিটি কোষ সুসংগঠিতভাবে বিভক্ত হয় আর তা থেকে অবিকল বীজের অনুরূপ এক-একটি ধারায় ভ্রূণের জন্ম হয়। এগুলি চারার আকারে ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে। স্বাভাবিক চারাগাছের মতই এগুলি রুইয়ে দেওয়া যায়। স্বাভাবিক গাছের মতই এগুলিতে ফুল, ফল ও বীজ জন্মায়।

ডক্টর অ্যামিরাটো বলেছেন, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে এই পদ্ধতির সম্ভাবনা প্রচুর। তিনি বলেছেন, উদাহরণস্বরূপ সঙ্কর জাতীয় ভুট্টা নেওয়া যেতে পারে। এদের উৎপাদন ক্ষমতা নেই বলে এদের পরিমাণ বাড়ানো অসুবিধাজনক। উচ্চ প্রোটিনযুক্ত গম অথবা রোগ-নিরোধক চাল বা হিম-নিরোধক টোম্যাটো প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই এক জাতীয় কোন চারাগাছ থেকে কোষ নিয়ে যদি ভ্রূণ জন্মানো যায়, তাহলে তা থেকে প্রয়োজনমত যত খুশী চারাগাছ পাওয়া যেতে পারে।

সম্প্রতি ডক্টর অ্যামিরাটো বিশেষ এক জাতের মিষ্টি আলু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। মধ্য আমেরিকা আর আফ্রিকার বিরাট এলাকা জুড়ে এই মিষ্টি আলু লোকদের অধিকাংশ প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

বিশেষ ধরনের কন্দজাতীয় ফসল নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে ডক্টর অ্যামিরাটো সাফল্য লাভ করবেন বলে আশা পোষণ করছেন। তাঁর আশা ফলপ্রসূ হলে মিষ্টি আলু ও কন্দজাতীয় অন্যান্য গাছের ফলন প্রচুর বেড়ে যাবে আর এই আলুই যাদের প্রধান খাদ্য—তাদের খাদ্যের অভাব ঘটবে না।

ডক্টর অ্যামিরাটো বিশেষ আকৃতি, গঠন আর বিশেষ রঙের চারাগাছ জন্মাবার ক্ষেত্রে চাষীদের

সঙ্গে কাজ করেছেন। যে সব গাছ বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক, সেই সব গাছ নিয়েই এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, বাগানের পর বাগান গোলাপ গাছে কলি হয়ে ওঠে, তাতে অজস্র সুন্দর ফুল ফোটে। সেই ফুল শুকিয়ে একদিন গাছ থেকে ঝরে পড়ে—সেই জাতীয় গোলাপে তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই। সুগন্ধী প্রসাধন সামগ্রী তৈরীর জন্যে যে গোলাপে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, সেই জাতীয় গোলাপ গাছের কোষ বৃদ্ধির ব্যাপারেই তিনি আগ্রহী। কেবল ও রবারজাতীয় গাছের বংশবৃদ্ধির ব্যাপারেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে বলে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর অ্যাব্রিরাটো মনে করেন।

ক্লোনজাত গাছের সুব্যবস্থা নিয়েও ডক্টর অ্যাব্রিরাটো অনুশীলন করছেন। বীজের একটা বড় সুবিধা এই যে, এগুলি সংরক্ষিত রাখা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া সম্বলিত দেশে এগুলি পাঠানো যায়। অথচ এর ফলে ঐ বীজ নষ্ট হয়েও যায় না অথবা অকালে এগুলি অঙ্কুরিতও হয় না।

কোনরূপ বৃদ্ধি ছাড়াই শিশু চারাগাছকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখবার পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা তিনি ভাবছেন। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে কিছু সাফল্যও তিনি অর্জন করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু অনুসন্ধানের ব্যাপার যা আছে, তা নিয়ে তিনি ব্যাপৃত আছেন।

রকেটের জ্বালানী

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

ভূমিকা

1957 খৃষ্টাব্দ বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এর আগে মানুষ জল, স্থল, অন্তরীক্ষ জয় করলেও মহাকাশ ছিল অজেয়। 1957 খৃষ্টাব্দেই প্রথম মানুষ মহাকাশে পাড়ি জমাবার পথ উন্মোচন করলো। রাশিয়ার তৈরী প্রথম মহাকাশযানটি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেল চাঁদের কাছে, ধরা পড়লো চাঁদের আকর্ষণে, কৃত্রিম উপগ্রহরূপে সেটি চন্দ্র পরিক্রমা করতে থাকলো। তারপর থেকে 15 বছরের মধ্যে মানুষ মহাকাশযানে চড়ে একাধিকবার চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছে। এর জন্যে মহাকাশযানগুলিতে প্রচণ্ড গতিবেগের সঞ্চার করতে হয়েছে। তা না হলে পৃথিবীর আকর্ষণের বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব হতো না। মহাকাশযানগুলিতে গতিবেগ সঞ্চার করে রকেট এবং রকেটের গতিবেগ নির্ভর করে ব্যবহৃত জ্বালানীর উপর।

শুধু চন্দ্র জয়েই মানুষ সন্তুষ্ট নয়, সে চায় মহাকাশে আরও দূর থেকে দূরান্তরে পাড়ি দিতে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে। আর তার জন্যে চাই প্রচণ্ড গতিবেগের অধিকারী হওয়া। আর তাই রকেটগুলির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে রকেটে ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন জ্বালানী সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হবে।

সর্বপ্রথম যে রকেটটির কথা জানা যায়, সেটিতে জ্বালানী হিসাবে বারুদ ব্যবহার করা হয়েছিল।

*পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কুচবিহার

থাকলেও বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট উত্তপ্ত গ্যাস রকেটের নির্গমনপথে অতি দ্রুত নির্গত হয় এবং তার ভিতর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে রকেটটি সম্মুখগতি লাভ করে। এই সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, রকেট থেকে নির্গত গ্যাস বাইরের বাতাসে বল প্রয়োগ করে, যার ফলে রকেটটিতে গতির সঞ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে শূন্যেই রকেট তার সর্বোচ্চ কার্যকরতা অর্জন করে। রবার্ট এইচ. গডার্ড গাণিতিক উপায়ে পরীক্ষার সাহায্যে এই তথ্য প্রমাণ করেন। রকেট গতিশীল হবার কারণ, নির্গত গ্যাস কর্তৃক বাইরের বাতাসে বল প্রয়োগ নয়, রকেট থেকে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস নির্গত হবার সময় রকেটটির উপর যে প্রতিক্রিয়াবলের সৃষ্টি হয়, তার ফলেই রকেটটি সম্মুখগতি লাভ করে। নির্গত গ্যাসের বেগ যত বেশী হবে, রকেটের উপর প্রতিক্রিয়াবলও তত বেশী হবে এবং রকেটটির বেগও তত বেশী হবে।

রকেটের ইঞ্জিনের সঙ্গে অন্যান্য ইঞ্জিনের, যথা—জেট, গ্যাসোলিন প্রভৃতি—ইঞ্জিনের একটি মূলগত পার্থক্য রয়েছে। তা হলো এই যে, রকেট তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিজেই বহন করে, যার ফলে তা শূন্যেও চলতে পারে। রকেটের দহন প্রকোষ্ঠে (Combustion chamber) অক্সিজেন সরবরাহকারীর সঙ্গে জ্বালানীর মিলনে যে উত্তপ্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়, তা রকেটের নির্গমমুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে রকেটটিকে গতিশীল করে। কিন্তু অন্যান্য আভ্যন্তরীণ-দহন ইঞ্জিনে, যথা—গাড়ী, জেট, ব্যোমযান প্রভৃতির ইঞ্জিনে জ্বালানীর দহনের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বাইরের বায়ুমণ্ডল থেকে সংগৃহীত হয়।

রাসায়নিক জ্বালানী

বর্তমানে রকেটে প্রধানতঃ রাসায়নিক জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। এই জ্বালানী কঠিন অথবা তরল প্রকারেরই হতে পারে। রকেট তার গতি-শক্তি অর্জন করে জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তি থেকে। জ্বালানীর উপযোগিতা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেই জ্বালানী তত বেশী উপযোগী অর্থাৎ যা রকেটকে যত বেশী বেগ দান করতে সক্ষম, যার দহনে যত বেশী তাপ নির্গত হয় এবং দহনে সৃষ্ট পদার্থসমূহ যত বেশী হাল্কা হয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, নির্গত গ্যাসের বেগ যত বেশী হবে, রকেটের অর্জিত গতিবেগও তত বেশী হবে। সুতরাং জ্বালানীর পরিমাণ এক রেখেও যদি নির্গত গ্যাসকে বেশী বেগবান করা যায়, তবে রকেটের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে। তাই যে জ্বালানী দহনের পর যত বেশী তাপ এবং যত হাল্কা পদার্থ সৃষ্টি করবে—সে জ্বালানী তত বেশী উপযোগী। রকেটে প্রযুক্ত ঘাত্‌কে প্রতি সেকেণ্ডে ব্যয়িত জ্বালানীর পরিমাণের দ্বারা ভাগ করে রকেটের আপেক্ষিক ঘাতের (Specific impulse) পরিমাপ করা হয় এবং তা সেকেণ্ড এককে প্রকাশ করা হয়। 400 সেকেণ্ড আপেক্ষিক ঘাতবিশিষ্ট রকেটের জ্বালানীকে ভাল জ্বালানী বলা হয়। রাসায়নিক জ্বালানী ব্যবহারকারী রকেটের সর্বোচ্চ তত্ত্বীয় আপেক্ষিক ঘাত 400 সেকেণ্ড।

কঠিন জ্বালানী

কঠিন জ্বালানীর কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নাইট্রো-সেলুলোজ ও নাইট্রো-গ্লিসারিন মিশ্রণের। এটিকে সাধারণতঃ দ্বি-ভিত্তি (Double-base) জ্বালানী বলা হয়। দ্বি-ভিত্তি জ্বালানীসমূহের দহন খুব দ্রুত সংঘটিত হয় এবং তা ব্যবহারের পক্ষে বেশ উপযোগী। তবে অসুবিধা এই যে, এই জ্বালানী প্রস্তুতির পদ্ধতি জটিল এবং বিপজ্জনক। এই জ্বালানী সাধারণতঃ ছোট রকেটে ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় ধরণের কঠিন জ্বালানীকে বলা হয় কম্পোজিট (Composite) জ্বালানী। এতে জ্বালানীকে অক্সিজেন সরবরাহকারী পদার্থের সঙ্গে খুব ভালভাবে মিশ্রিত করে এক্সপেনডেব্‌ল্‌ ট্যাঙ্কে (Expendable tank) রাখা হয়। এই ট্যাঙ্ক একাধারে মজুদ প্রকোষ্ঠ, রকেট কাঠামো এবং দহন প্রকোষ্ঠরূপে কাজ করে। সাধারণতঃ কম্পোজিট ধরণের জ্বালানী হিসাবে হাইড্রোকার্বন শিলাজতুজাতীয় পদার্থ (Asphalt type material), রবার যৌগ, প্লাষ্টিক প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। থায়োকল, প্যারাফিন মোম এবং পলিইউরেথেন প্রভৃতি আজকাল প্রায়শঃই ব্যবহার করা হয়। অক্সিজেন সরবরাহকারীরূপে সাধারণতঃ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম ক্লোরেট অথবা অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট ব্যবহৃত হয়।

যে রকেটে কঠিন জ্বালানী ব্যবহৃত হয়, তার আবরণটি নলাকার আকৃতিবিশিষ্ট হয়। এই আবরণের মধ্যে জ্বালানী ভরা থাকে। জ্বালানীর মধ্য দিয়ে রকেটের দৈর্ঘ্য বরাবর একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে জ্বালানীর দহন ঘটায়। দহনের ফলে সৃষ্ট উত্তপ্ত গ্যাস তীব্রবেগে রকেটের পিছন দিকের নির্গমন পথে বেরিয়ে আসে এবং রকেটটি সম্মুখদিকে গতিশীল হয়। পিছনের নির্গমনপথের ঠিক সোজাসুজি রকেটের সামনের দিকে কয়েকটি ছিদ্র থাকে। রকেটের সম্মুখ দিকে চলবার সময় এই ছিদ্রগুলি বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু তাদের খোলা হলে জ্বালানীর দহনে সৃষ্ট গ্যাস রকেটের সামনের ছিদ্রমুখ এবং পিছনের নির্গমমুখ দিয়ে একই সঙ্গে বেরোতে থাকে। ফলে গ্যাস নির্গমনের জন্যে রকেটটির উপর যে প্রতিক্রিয়া ঘাতসমূহের সৃষ্টি হবে, তারা পরস্পরকে প্রশমিত করবে এবং রকেটটির উপর মোট ঘাতের মান হবে শূন্য। কিন্তু এই রকেটে ঘাতের পরিমাণ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। তবে দামে কম, বেশী নির্ভরযোগ্য এবং সহজে চালনা করা যায় বলে তাদের এই ক্রটি কিছুটা লাঘব হয়ে যায়। তাছাড়া কঠিন জ্বালানী ব্যবহারের একটি প্রধান সুবিধা হলো এই যে, এতে রকেটের রক্ষণাবেক্ষণ খুবই কম করতে হয় এবং রকেটকে অতি দ্রুত ব্যবহার করা যায়। কঠিন জ্বালানীর রকেটে জ্বালানীর দহনে রকেটকে প্রচুর পরিমাণে চাপের সম্মুখীন হতে হয়। এজন্যে রকেটের আবরণ খুব দৃঢ় করা প্রয়োজন। তাই এই ধরণের রকেট বেশ ভারী হয়।

তরল জ্বালানী

তরল জ্বালানী ব্যবহারকারী রকেট কঠিন জ্বালানী ব্যবহারকারী রকেট অপেক্ষা অনেক জটিল হলেও তাদের কার্যক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী। তরল জ্বালানী দুই প্রকারের—একক ও দ্বৈত (Mono-propellant & Bi-propellant)। প্রথমটি হলো কোন অস্থায়ী তরল, যথা—হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রভৃতি, যারা সহজেই বিয়োজিত হয়ে গ্যাস ও প্রচুর পরিমাণে তাপের সৃষ্টি করে। সৃষ্ট উত্তপ্ত গ্যাস রকেটের নির্গমন মুখ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এসে রকেটকে গতিশীল করে। যখন হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করলে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড তার বিয়োজনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। দ্বৈত জ্বালানীতে তরল জ্বালানীর সঙ্গে তরল অক্সিজেন সরবরাহকারী একত্রে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের জ্বালানী হলো কেরোসিন, অ্যালকোহল, হাইড্রাজিন ও তার যুক্তযৌগসমূহ (Derivatives), তরল হাইড্রোজেন প্রভৃতি। এদের অক্সিজেন সরবরাহকারীসমূহ হলো নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড, তরল অক্সিজেন প্রভৃতি। রকেটে জ্বালানী ও তার অক্সিজেন সরবরাহকারী এমনভাবে নির্বাচিত করা হয়, যাতে রকেটটি

প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

উপরিউক্ত জ্বালানীসমূহের মধ্যে কেরোসিন, হাইড্রাজিন, অ্যালকোহল প্রভৃতি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল হওয়ায় ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে একটিতে সঞ্চয়াধারে (Storage tank) অথবা রকেটের ট্যাংকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে সঞ্চিত রাখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে অক্সিজেন সরবরাহকারী রূপে নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন টেট্রাক্সাইড প্রভৃতিকে সঞ্চিত রাখা হয়।

গবেষণার ফলে এমন জ্বালানী পাওয়া সম্ভব হয়েছে, যাতে জ্বালানীর সঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহকারীর একত্র সংস্পর্শ মাত্র দহন শুরু হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দহনক্রিয়া সংঘটিত করবার জন্যে রকেটে কোন পৃথক ব্যবস্থা রাখবার প্রয়োজন থাকে না।

এবার তরল জ্বালানীর রকেটের গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কারণ তাহলে কঠিন জ্বালানীর তুলনায় তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধাগুলি সহজেই বোঝা যাবে। এই সব রকেটের ইঞ্জিনের তিনটি অংশ থাকে—দহন প্রকোষ্ঠ, জ্বালানীর আগমন ও নির্গমনমুখ। সঞ্চয়াধারে সঞ্চিত জ্বালানীকে উচ্চ চাপের গ্যাস অথবা পাম্পের সাহায্যে দহন প্রকোষ্ঠে আনা হয়। যানবাহী মহাকাশযানের রকেটে বর্তমানে প্রথম পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে চাপ প্রদানকারী হিসাবে হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা হয়। রকেটের আবরণ অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে যাতে গলে না যায়, সে জন্যে রকেটের ইঞ্জিনকে শীতল করবার ব্যবস্থা থাকে। এজন্যে রকেটের খোলককে দুই স্তরবিশিষ্ট করা হয় এবং স্তরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দিয়ে তরল জ্বালানীকে সঞ্চয়াধার থেকে দহন প্রকোষ্ঠে চালিত করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তরল জ্বালানী ব্যবহারকারী রকেটের ইঞ্জিনে জ্বালানীর পরিমাণ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। সুতরাং ইঞ্জিনে জ্বালানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে রকেটের বেগও নিয়ন্ত্রিত করা যায়—এমন কি, রকেটকে ইচ্ছামত চালানো বা থামানো যায়। কঠিন জ্বালানী ব্যবহারকারী রকেটের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসায়নিক জ্বালানী ব্যবহারকারী রকেটের সর্বোচ্চ তত্ত্বীয় আপেক্ষিক ঘাত হলো 400 সেকেণ্ড। সুতরাং মহাকাশে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হলে রাসায়নিক জ্বালানী অকার্যকর হবে। তাই উন্নত ধরনের জ্বালানী এবং রকেটের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই এল পারমাণু-কেন্দ্রীন-জ্বালানী (Nuclear propulsion) ও বিভিন্ন ধরণের বৈদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন।

পারমাণু-কেন্দ্রীন-জ্বালানী

রাসায়নিক জ্বালানীর তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই পারমাণু-কেন্দ্রীন-জ্বালানী পরিমাণে অনেক কম প্রয়োজন এবং পারমাণু-কেন্দ্রীন-জ্বালানী ব্যবহারকারী রকেটের আপেক্ষিক ঘাত 1200 সেকেণ্ড অর্থাৎ রাসায়নিক জ্বালানী ব্যবহারকারী রকেটের প্রায় তিনগুণ। ফলে রকেটটি অপেক্ষাকৃত বেশী ভার বহনক্ষম। এই ধরণের রকেটে পরমাণু-কেন্দ্রীন-বিভাজনের (Nuclear fission) ফলে উদ্ভূত তাপের দ্বারা তরল হাইড্রোজেন, তরল হিলিয়াম অথবা তরল অ্যামোনিয়া উত্তপ্ত গ্যাসে পরিণত হয়ে ফোয়ারার আকারে নির্গমপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং রকেটটি গতিশীল হয়। পরমাণুশক্তি চালিত রকেটে ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি জ্বালানী ব্যবহার করা হয়। এই রকেটের চলবার জন্যে কোন অক্সিজেন সরবরাহকারীর প্রয়োজন যে নেই, তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এখানে অক্সিজেন

সরবরাহকারীর স্থান অধিকার করে কেন্দ্রীন-বিক্রিয়ক (Nuclear reactor), যা পারমাণবিক জ্বালানীর কেন্দ্রীন বিয়োজন ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন। তাই পরমাণু-কেন্দ্রীন চালিত রকেটের ওজন অনেক কম হয় এবং অক্সিজেন সরবরাহকারীর স্থানটিও বেঁচে যায়। অবশ্য ছোট রকেটের ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না, কারণ পরমাণু কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় পরমাণু-কেন্দ্রীন-বিক্রিয়কের ওজন কম নয় এবং তা বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করে। একমাত্র খুব বড় রকেটের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। এই ক্ষেত্রে পরমাণু-কেন্দ্রীন-বিক্রিয়কের ওজন এবং আয়তন যথাক্রমে ঐ আকারের রাসায়নিক জ্বালানীচালিত রকেটে অবস্থিত অক্সিজেন সরবরাহকারীর ওজন ও আয়তনের তুলনায় কম।

পরমাণু-কেন্দ্রীনের বিভাজনের পরিবর্তে পরমাণু-কেন্দ্রীন একীভবনের (Nuclear fussion) সাহায্যে পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেটের আপেক্ষিক ঘাত অনেক গুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু তার সমস্যা এই যে, পরমাণু-কেন্দ্রীন একীভবনের জন্যে গ্যাসের তাপমাত্রা অত্যধিক বেশী হওয়া প্রয়োজন এবং অত বেশী তাপমাত্রা সহনশীল কোন কঠিন পদার্থের কথা আমাদের জানা নেই। উপযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা গ্যাসকে ধরে রাখবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা করেছেন, কিন্তু তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অতি উত্তপ্ত গ্যাসসমূহের কেন্দ্রীন একীভবন সংঘটিত হবার মত অবস্থার সৃষ্টি হবার আগেই তারা চৌম্বক ক্ষেত্রের বন্ধন ছিন্ন করে। পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেট গড়ে তোলবার গবেষণা বৈজ্ঞানিকেরা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি কমিশন এবং নাসার যৌথ উদ্যোগে ব্যবহারযোগ্য কেন্দ্রীন-রকেট ইঞ্জিন প্রস্তুতির একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আর এক ধরণের পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেট আছে, যাদের ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি চালিত রকেটের আবরণ থেকে কিছু দূরে উদ্ভূত হয়ে রকেটটিকে গতিশীল করে। এই ধরণের রকেটের অন্যতম হলো ওরাইয়ন (Orion) এবং কনেক্স (Conex)। ওরাইয়নে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পারমাণবিক বোমাকে রকেটের পিছন দিকে কিছু দূরে বিস্ফোরিত করা যায় এবং রকেটটি বিস্ফোরিত বোমা থেকে নির্গত তরঙ্গের আঘাতে সম্মুখ দিকে গতিশীল হয়। কনেক্সে একটি ঘাতপ্রকোষ্ঠে বোমাগুলিকে রাখা হয়। এটি অপেক্ষাকৃত জটিল হলেও ওরাইয়ন অপেক্ষা বেশী কার্যকর ও কম ব্যয়সাপেক্ষ।

বিদ্যুৎ-চালিত ইঞ্জিন

গ্রহান্তরে যাবার জন্যে মনুষ্যবাহী মহাকাশযানকে ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল বেগ অর্জন করতে হবে এবং মহাকাশযান চালনাকারী রকেটগুলিকে এমন হতে হবে—যাতে কম জ্বালানীতেই তারা দীর্ঘদিন ধরে দ্রুতবেগে চলতে পারে। বিদ্যুৎ-চালিত ইঞ্জিন, যথা—আয়ন-রকেট ইঞ্জিন অনুপমভাবে এই সর্তগুলি পূরণ করে। বর্তমান কালে ত্বরণযন্ত্রের (Accelarator) সাহায্যে আহিত বস্তুকণা অথবা আয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়। এই ঘটনাটিকে আয়ন-রকেট ইঞ্জিনে প্রয়োগ করা হয়। এই জন্যে উপযুক্ত তড়িৎ উৎস-সহ একটি কণা-ত্বরণযন্ত্র রকেটের মধ্যে রাখা হয়। এই ধরণের রকেটে সিজিয়াম অথবা পারদকে উত্তপ্ত করে গ্যাসীয় অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তারপর অতি উত্তপ্ত তারজালির উপর চালনা করে তা আহিত করা হয়। এই সব আয়নকে ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে অতি উচ্চ বেগে ত্বরান্বিত করা হয় এবং তারা নির্গমমুখ দিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে এসে রকেটে উচ্চ বেগ সঞ্চার করে।

এই ধরণের রকেটের আপেক্ষিক ঘাত 20,000 সেকেণ্ড।

প্লাজ্মা-রকেট

আর এক ধরণের বৈদ্যুতিক রকেট হলো প্লাজ্মা-রকেট। এই রকেটে আধান-নিরপেক্ষ প্লাজ্মাকে চালক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নিরপেক্ষ প্লাজ্মা হলো পদার্থের এমন একটি অবস্থা, যখন পদার্থটি অতি উত্তপ্ত গ্যাস হিসাবে অবস্থান করে এবং গ্যাসটি এমনভাবে আহিত অবস্থায় থাকে, যাতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের পরিমাণ সমান সমান হয়। নিরপেক্ষ প্লাজ্মা একটি অতি উত্তম পরিবাহী। সুতরাং প্লাজ্মাটির উপর পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত একটি তড়িৎ-ক্ষেত্র এবং একটি চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে প্লাজ্মাটি একটি বল অনুভব করবে। এই বলের দ্বারা ত্বরান্বিত হয়ে প্লাজ্মাটি অতি উচ্চ বেগ অর্জন করতে পারে এবং তারপর রকেট থেকে দ্রুতবেগে নির্গত হয় এবং রকেটটিও দ্রুত গতিশীল হয়। প্লাজ্মা-রকেটে মোট ঘাত ও রকেটের ওজনের অনুপাত আয়ন-রকেট অপেক্ষা বেশী হলেও প্লাজ্মা রকেটের আপেক্ষিক ঘাত অপেক্ষাকৃত কম।

আর্ক-জেট ইঞ্জিন

বৈদ্যুতিক রকেট ইঞ্জিনের আর একটি নক্সা হলো আর্ক-জেট ইঞ্জিন। এতে রকেটের চালক পদার্থকে বৈদ্যুতিক আর্কের দ্বারা কয়েক হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে উত্তপ্ত গ্যাসকে নির্গমনমুখ দিয়ে বের করে দেওয়া হয় এবং রকেটটি উচ্চ গতিবেগ অর্জন করে। এই ধরণের রকেটের অর্জিত বেগ এবং আপেক্ষিক ঘাত আমাদের জানা কোনও রাসায়নিক অথবা পারমাণবিক রকেটের তুলনায় অনেক বেশী।

উপসংহার

এপর্যন্ত বহু রকমের জ্বালানী ও সেই জ্বালানী চালিত রকেটের আলোচনা করা হলো—তার কোনটির সাহায্যেই এত বেশী গতিবেগ অর্জন করা সম্ভব নয়, যার দ্বারা মানুষের পক্ষে সৌরজগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা করে ফিরে আসা সম্ভব হয়, অন্য কোন নক্ষত্রলোকে পাড়ি দেওয়া তো দূরের কথা। একাজে আমাদের আরও উন্নত মানের জ্বালানী ও রকেটের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

উদ্ভিজ্জ আঁশের গুণাগুণ

রতিকান্ত মাইতি*

সূচনা

উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনধারণের পথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় ও জীবনধারণের সব কিছু উপাদান আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের কাছ থেকে পাই। আদিম মানুষ খাদ্য ও ঔষধের সন্ধানে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতো। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্যে গাছের বাকল, পাতার বসন প্রভৃতির ব্যবহার শুরু করে। মানুষ ক্রমশঃ বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ-তন্তু থেকে আঁশ বের করে পরিধেয় বস্ত্রাদি বয়নের কৌশল উদ্ভাবন করলো।

আঁশ বা তন্তু

এখন আঁশ বা তন্তুর কথায় আসা যাক। কোন উদ্ভিদ-তন্তুর গুণাগুণ ও কার্যকারিতা প্রধানতঃ নির্ভর করে—(1) চাষের উপযোগিতা ও তার উৎপাদন ক্ষমতার উপর; (2) পচনক্রিয়ার (Retting) সাহায্যে সহজে আঁশ নিষ্কাশন করবার পদ্ধতির উপর; (3) উন্নতমানের আঁশের ফলনের উপর এবং (4) বাণিজ্যে তার চাহিদা ও দামের উপর। সুতরাং আঁশ-উৎপাদক উদ্ভিদের সফলতা নির্ভর করবে তার উন্নতমানের আঁশ উৎপাদনের ক্ষমতার উপর।

প্রতিটি গাছের কাণ্ডে কিছু কিছু আঁশ আছে, কিন্তু তা যদি নিম্নমানের হয় বা সহজ পচন-পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্কাশন করা না যায়, তবে বাণিজ্যে তার কোন মূল্য নেই।

উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ আঁশকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- (ক) কাণ্ডজাত আঁশ; (খ) পাতার আঁশ; (গ) ফল ও বীজ থেকে পাওয়া আঁশ।

(ক) কাণ্ডজাত আঁশ (Bast fibre)—এই জাতীয় আঁশ আমরা গাছের কাণ্ড থেকে পাই। সাধারণতঃ পচনক্রিয়ার সাহায্যে আমরা কাণ্ড থেকে আঁশ নিষ্কাশন করি। সাধারণতঃ যখন 50% গাছে ফুল ফোটে ও ছোট শুটি ধরে, তখন গাছ কাটবার উপযোগী হয়। কাণ্ডগুলি কেটে বিভিন্ন গোছায় বাঁধা হয়। পাতা ও ডালপালাগুলি কাণ্ড থেকে কেটে ফেলে সেই বাণ্ডিলগুলিকে জলে জাগ (Sceeping) দেওয়া হয়। নানা প্রকার জীবাণু ও ছত্রাকের সাহায্যে পচনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তারা কাণ্ডের কোষে সঞ্চিত খাদ্য গ্রহণ করে নরম কোষগুলিকে পচিয়ে দেয়। তার ফলে লিগনিন ও সেলুলোজে (Ligno-cellulose) গঠিত শক্ত আঁশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চাষীরা আঁশগুলিকে শক্ত পাটকাঠি (Wood) থেকে পৃথক করে নেয়। পচনক্রিয়ার ফলে নানাবিধ জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। যে সব জীবাণু ও ছত্রাক এই পচনক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো Pectinolytic জীবাণু।

পচনকাল নির্ভর করে বিভিন্ন উদ্ভিদের কোষগত গঠন ও উদ্ভিদের অবস্থিত রাসায়নিক দ্রব্যের উপর। যখন আঁশগুলি একটু জলের মধ্যে সামান্য ঘষলেই কাণ্ড থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখনই আঁশ নিষ্কাশনের উপযুক্ত সময়। আঁশগুলি জলে ভালভাবে ধুয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে

---

* জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নীলগঞ্জ, ব্যারাকপুর, 24 পরগণা।

নেবার পর একত্রিত করে পৃথক পৃথক বোঝা বাঁধা হয়।

সব উদ্ভিজ্জ তন্তু উপরিউক্ত প্রথায় নিষ্কাশন করা হয় না; যেমন—রেমি (Boehmeria nivea) ও লিনেন (Flax-Linum usitatissimum)। রেমির আঁশ আমরা গবেষণাগারে এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করি, যাকে বলা হয় Degumming process বা আঠালোজাতীয় পদার্থ বিমুক্তকরণ। রেমির সেলুলোজ তন্তুর উপর জীবাণুগুলির আকর্ষণ থাকায় পচনক্রিয়ার প্রভাবে জীবাণুগুলি সেলুলোজযুক্ত আঁশগুলিকে খেয়ে ফেলে; তাই রাসায়নিক পদ্ধতিতে রেমির আঁশ নিষ্কাশন করা হয়। আঠালোজাতীয় পদার্থ নিষ্কাশন করে ফেলা হয়।

আঠালোজাতীয় পদার্থ বিমুক্তিকরণ পদ্ধতির আগে রেমির কাণ্ডগুলি একটি যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বাকল বা ছালগুলিকে ভিতরের কাঠি থেকে পৃথক করা হয়, Decorticator নামক যন্ত্রের সাহায্যে। তারপর নিষ্কাশিত আঁশ জলে ধুয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আঁশগুলিকে আঠামুক্ত করা হয়।

লিনেন বা Flax-এর ক্ষেত্রে আঁশ নির্গমনের জন্যে দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রথমে কাণ্ডগুলি জলে ডুবিয়ে রাখা হয় 2-3 দিনের জন্যে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অর্ধ-পচন প্রক্রিয়া (Half-retting process)। এই প্রক্রিয়ায় আঁশগুলি ছালের মধ্য কোষসমষ্টি থেকে কিছুটা আলগা হয়ে যায়। ঐ অর্ধ-পচনের পর কাণ্ডগুলিকে রৌদ্রে শুকিয়ে ফেলা হয়। পরে সুবিধা মত শুকনো কাঠিগুলি পেষণযন্ত্রের (Scutching machine) মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আঁশগুলি পাটকাঠি ও ছাল থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এর পরে চিরুণির সাহায্যে আঁশগুলি কাঠির গুঁড়া ও অবাঞ্ছিত বস্তু থেকে পৃথক করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার আঁশের গঠনগত প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমাদের জানতে হবে, আঁশের মান কার উপর নির্ভর করে।

আঁশের মানের মাপকাঠি

কৃত্রিম আঁশের মান আমরা ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রস্তুত করে ঠিক রাখতে পারি। কারণ প্রতিটি কৃত্রিম আঁশের গঠন নির্দিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হয় বলে তাদের রাসায়নিক গঠন নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন আঁশের মান নির্ভর করে অনেকগুলি কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর। তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

1. বল (Strength)—উৎকৃষ্টমানের আঁশ বেশী শক্ত হওয়া দরকার। কারণ তা থেকে আমরা যে কাপড় তৈরী করবো, তা টেকসই ও মজবুত হবে।

2. সূক্ষ্মতা (Fineness)—আঁশ যত সূক্ষ্ম বা সরু হবে, ততই তার মান উন্নত হবে। কারণ সূক্ষ্ম কাপড় (Yarn) তৈরীর পক্ষে সূক্ষ্ম সূতা বেশী উপযোগী।

3. জালিকা (Meshiness)—কাণ্ডজাত আঁশসমূহের এটা একটা বিরাট দোষ আছে। এই জালিকা যার যত বেশী হবে, চিরুণি যন্ত্রে (Carding machine) তা তত বেশী বাধার সৃষ্টি করবে। কারণ আমরা জানি, চিরুণি যন্ত্রের কাজ হলো জালিকাকার আঁশগুলিকে সমান্তরালভাবে পৃথক করা, যাতে বয়ন যন্ত্রে (Spinning machine) অতি সহজে পাক খেয়ে সূতা তৈরী করতে পারে। তাই যে গাছের আঁশ বেশী জালিকা সৃষ্টি করে, তা চিরুণি যন্ত্রে অনেকবার চালাতে হয় বলে খরচও বেশী হয় এবং আঁশের অপচয় হয় বেশী।

4. আঁশের উপবিভাগের প্রকারভেদের উভয়-মাঝের আঁশের মাপ যত কম অসমান থাকবে (Irregularities), তত কাপড়ের মান ভাল হবে।

অথচ সম্পূর্ণ মসৃণ থাকলে যন্ত্র দ্বারা প্যাঁচানো-ক্রিয়া (Twisting action) ভাল হয় না, আঁশগুলি সরে যায়। তাই আঁশের গায়ে সামান্য অমসৃণ (Frictional surface) থাকলে ভাল হয়।

5. দৃঢ়তা (Rigidity)—আঁশ অপেক্ষাকৃত কম দৃঢ় হলে ভাল।

6. রং (Colour)—পাটের রং যত বেশী উজ্জ্বল হবে, তত ভাল।

7. ঔজ্জ্বল্য (Lustre)—ঔজ্জ্বল্য আঁশের পক্ষে উন্নত মান নির্দেশ করে। দেখা গেছে যে, যে আঁশ যত বেশী উজ্জ্বল, সে আঁশ তত বেশী দৃঢ়, তাই আঁশের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে দৃঢ়তার অনুমান করা যায়।

8. খুঁৎ (Defects)—আঁশের মান নির্ভর করে আঁশগুচ্ছের খুঁতের পরিমাণের উপর। খুঁৎ বা দোষ যত কম হবে, আঁশের মান তত উন্নত হবে। খুঁৎকে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি: যেমন—শক্ত গোড়া (Root cuttings), শক্ত গাঁট (Specks), ছালি (Barky), চলমান গাঁট (Runners), (আঠালো ডগা) (Croppy end), পশমী আঁশ (Mossy fibre), শক্ত হুঙ্কা (Hunka)।

আঁশের এই খুঁৎগুলি অনেক কারণে ঘটতে পারে; যেমন—পাট যদি পুরাপুরি পচানো না হয় বা আঠা বা ছালমুক্ত না হয়, তখন আঁশগুচ্ছ আঠালো (Gummy) হয়। শক্ত গোড়া নির্ভর করে পেরিডার্মের (Periderm) পরিমাণের উপর; কারণ পেরিডার্ম পচানোর সময় সহজে জল শোষণ করতে বা ভিতরে ঢুকতে দেয় না। কাজেই পচনকার্যে সহায়ক জীবাণুগুলি সহজে কাণ্ডের মধ্যে ঢুকতে পারে না। শক্ত গাঁট জাতীয় খুঁৎ সাধারণতঃ নির্ভর করে যদি কোন গাছের কাণ্ড শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয় বা পোকামাকড় ঐ অংশের ক্ষতিসাধন করে। আঠালো ডগার দুটি কারণ হতে পারে—(1) জাগ দেবার সময় যদি কোন উপায়ে কাণ্ডের ডগাগুলি জলের উপরে থেকে শুকিয়ে যায় ও পরে জলের মধ্যে রাখা হয়, তবে আঁশগুচ্ছের (Reed) ডগার দিকটার পচন ভাল হয় না, (2) যদি কোন কারণে কাণ্ডের বাণ্ডিলগুলি জলে পচাতে দিতে দেরী হয় ও বাণ্ডিলগুলি বেশ কিছু দিন উপর দিকে খোলা করে মাঠের মধ্যে রাখা হয়, তখন ডগাগুলি রৌদ্রে শুকিয়ে যায়। ফলে পচানোর সময় তা ভালভাবে পচানো যায় না। এর কারণ পচনকার্যে সহায়ক জীবাণুর কাছে কাণ্ডের ডগাগুলিকে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, উন্নত মানের আঁশ হবে বলশালী, মজবুত, সূক্ষ্ম, নমনীয়, অপেক্ষাকৃত মসৃণ উপরিভাগ, সুন্দর রং, একরূপতে ও যতটা সম্ভব খুঁৎহীন। ভারতীয় মানক সংস্থা আঁশের মান অনুসারে সাদা ও তোষা পাটকে 8 ভাগে বিভক্ত করেছেন, যেমন—সাদা পাটের ক্ষেত্রে W_1 থেকে W_8 ও তোষা পাটের ক্ষেত্রে T_1 থেকে T_8 পর্যন্ত, W_1 ও T_1 সবচেয়ে উন্নত মানের পাট। W_1 ও T_1 বাণিজ্যে সবচেয়ে উন্নত মানের পাট ও দামী।

আঁশের প্রকারভেদ ও মান

এখন বাজারজাত বিভিন্ন গাছের আঁশের প্রকারভেদ ও মান সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক।

বাজারজাত আঁশের মধ্যে সর্বোচ্চ হলো পাট (তোষা ও সাদা)। তোষা বা মিঠে পাট আমরা পাই Corchorus olitorius থেকে ও সাদা বা তেতো পাট পাই Corchorus capsularis থেকে। তারপরে যথাক্রমে মেস্তা বা বিমলি (Hibiscus camabimus), রোজেলি (Hibiscus sabdariffa), শণ পাট (Crotalaria juncea), ইউরেনা (Urena), রেমি (Boehmeria nivea), লিনেন (Linum usitatissimum)

ইত্যাদি। এছাড়া আরও নানা প্রকার উদ্ভিদ থেকে আঁশ পাওয়া যায়, যেমন—Hibiccus sp., Sida sp., Abutilon sp., Penapetes sp., Abroma sp., কিন্তু এদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঁশগুলি নিম্নমানের হয়।

উৎপত্তির দিক থেকে আমরা কাণ্ডজাত আঁশকে দু-ভাগে ভাগ করতে পারি—

1) প্রাথমিক তন্তু (Primary fibres)—এই জাতীয় তন্তু সাধারণতঃ কাণ্ডের শীর্ষ প্রাথমিক উৎপাদক কোষ Procambium থেকে উৎপন্ন হয়। রেমি, লিনেন, শণপাট, হেম্প (Cannabis) এই শ্রেণীভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে আঁশদণ্ড (Fibre filament) সাধারণতঃ লম্বালম্বিভাবে যুক্ত একক কোষগুলির (Ultimate fibre) সমন্বয়ে গঠিত বা আঁশ-কোষগুলি পাশাপাশি আলাদাভাবে থেকে আঁশগুচ্ছ তৈরি করে।

2) মাধ্যমিক তন্তু (Secondary fibres)—এই জাতীয় আঁশের উৎপত্তি হয় ক্যাম্বিয়ামের (Cambium) কার্যকারিতার ফলে। তার ফলে বাকলের মধ্যে তৈরী হয় মাধ্যমিক আঁশ, ভিতরে কাষ্ঠল কোষ (Wood), যা পাট নিষ্কাশনের পর তৈরী করে পাটকাঠি।

প্রথম শ্রেণীর আঁশগুলি (Primary fibres) গাছের ছালের মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো থাকে। আঁশের কোষগুলি সাধারণতঃ পৃথকভাবে বা এক সঙ্গে গুচ্ছভাবে নরম কোষগুলির মাঝে সাজানো থাকে, যেমন—রেমি, লিনেন ও শণপাট। শণপাট ছাড়া এই জাতীয় উদ্ভিদের ছাল থেকে সাধারণতঃ পচন-ক্রিয়ায় আঁশ বের করবার অসুবিধা আছে। লিনেন ও রেমির ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়, যা আগেই উল্লেখ করেছি।

শণপাট (Sunnhemp)—শণপাটের আঁশ খুব শক্ত, বকের পালকের মত সাদা ঝকঝকে হয়, তবে আঁশ গুচ্ছগুলি মোটা হওয়ায় পাট বয়ন যন্ত্রে বোনা যায় না। তাই সাধারণ কৃষকেরা তা দড়ি তৈরীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। শণপাটের দড়ি খুব মজবুত ও শক্ত হয়। শণ পাটের আঁশের কোষগুলি খুব লম্বা হয়, যা গড়ে 5·5 মিলিমিটার পর্যন্ত এবং লম্বা ও চওড়ার অনুপাত 177। শণপাটের সেলুলোজ শতকরা 70-75% বেশী সেই কারণে এবং কোষের লম্বা ও চওড়ার অনুপাত বেশী হওয়ায় দামী কাগজ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়; যেমন—সিগারেটের কাগজ ও নোট তৈরীর কাগজে ব্যবহৃত হয়।

লিনেন (Flax)—তিসির পাট বা লিনেন কাপড় তৈরীর উপযোগী, কারণ লিনেনের সেলুলোজের পরিমাণ খুব বেশী ও লম্বা ও চওড়ার অনুপাত বেশী (1300)। তাই তা সহজে বুনন করে সুতা প্রস্তুত করতে পারে, কিন্তু Flax-এর ফসল কেবল আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভাল হয় (যেমন ইউরোপ), কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গাছগুলি প্রচুর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তিসিতে পরিণত হয়। তিসির গাছ থেকে আমরা হয়তো আঁশ পেতে পারি, কিন্তু তা অতিশয় নিম্নমানের ও কলে বয়নেরও অনুপোযোগী। অধিকন্তু শাখা-প্রশাখাযুক্ত কাণ্ড থেকে আঁশ বের করাও সহজে হয় না।

রেমি—সব উদ্ভিদজাত আঁশের মধ্যে রেমি একটা উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। এর প্রধান কারণ হলো, রেমি পাটের আঁশগুলি সবচেয়ে লম্বা (25 মিলিমিটার থেকে 250 মিলিমিটার ও লম্বা/চওড়ার অনুপাত 3000) এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ও মজবুত হয়। এই একমাত্র আঁশ, যা কৃত্রিম আঁশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আঁশগুলি বকের পালকের মত সাদা ও রং করবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। একটিমাত্র রেমির কোষ একটি আঁশদণ্ড (Filaments) তৈরী করে এবং এই একটি আঁশদণ্ড একটি সাধারণ গাছের গোড়া

থেকে তলা পর্যন্ত বিস্তৃত। আঁশের কতকগুলি দোষ আছে, যেমন—কোষের প্রস্থ খুব বেশী (100μ পর্যন্ত) ও কোষ-প্রাচীর খুব মোটা হয়। তাছাড়া আঁশের গাত্র মসৃণ হওয়ায় পাকানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন সুতা তৈরী হয়, তখন দুই আঁশ পরস্পরকে পাকে আটকে রাখতে পারে না। তাই রেমির আঁশ একা সুতা তৈরী করতে পারে না, অন্য কৃত্রিম আঁশের (Synthetic fibre) সঙ্গে মিশিয়ে সুতা তৈরী করা যায়। প্রজনন প্রক্রিয়ায় রেমির উন্নতিসাধন করতে হলে আমাদের গবেষণার কয়েকটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে; যেমন—রেমির আঁশ যেন সরু হয়, আঁশের বাইরের গাত্র যেন একটু অমসৃণ থাকে, কোষ-প্রাচীর যেন সরু হয়। এই বিষয়ে আমরা যদি সফলতা লাভ করতে পারি, তাহলে রেমিকে অতি সহজে তুলার বদলে সুতা তৈরী ও কাপড় তৈরীর কাজে ব্যবহার করতে পারবো এবং তাতে রেমি থেকে যে কাপড় তৈরী হবে, তা যে কোন কৃত্রিম বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফলতা লাভ করতে পারবে। তাই বৈজ্ঞানিকদের এই বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। আর একটি বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে যে, ছালের প্রস্থচ্ছেদে যেন আঁশের কোষের সংখ্যা প্রতি একক অংশে বেশী হয়। এই বিষয়ে পাট-কৃষি গবেষণাগারে কর্তব্যরত কৃষি-বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট এগিয়ে গেছেন। পাট-কৃষি গবেষণাগারের অন্তর্গত আসাম (সরভোগ) রেমি গবেষণাগারে রেমির বিভিন্ন প্রকার (Variety) বের করা হয়েছে, যার আঁশ খুব সরু এবং কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে আঁশ-কোষের সংখ্যা অনেক বেশী।

যে সব উদ্ভিদগোষ্ঠী শুধু cambium-এর দ্বারা উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে Malvales শ্রেণী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এর অন্তর্গত Malvaceae, Tiliaceae এবং Sterculiaceae-এর ছালে প্রচুর পরিমাণে আঁশ উৎপন্ন হয়।

এই শ্রেণীর উদ্ভিদের বাকলে সুবিন্যস্তভাবে আঁশ-কোষগুলি সজ্জিত থাকে। রেমির মত এদের আঁশদণ্ড একটি কোষ দিয়ে তৈরী হয় না। সাধারণতঃ 5 থেকে 40 পর্যন্ত কোষ আঁশের প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায়। এক-একটা কোষ গড়ে 2.5 থেকে 3.5 মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। আঁশ-কোষগুলির (Ultimate fibre) মাঝখানে একটি গহ্বর থাকে এবং দু-পাশের অগ্রভাগ সূচের মত সরু হয়। এই অগ্রভাগ নানা আকারের হয়। একটি বাড়ী যেমন অনেকগুলি ইটের সাহায্যে তৈরী হয়, সেরূপ একটি আঁশদণ্ড অনেকগুলি কোষের সমবায়ে তৈরী হয়। সূচের মত আঁশ-কোষগুলির অগ্রভাগ হেমিসেলুলোজ ও পেক্টোজ জাতীয় আঠালো বস্তুর দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অসংখ্য কোষের দ্বারা গঠিত এইরূপ আঁশগুচ্ছ গাছের ছালের মধ্যে লম্বালম্বিভাবে এখানে-ওখানে যুক্ত হয়ে একটা জালিকার সৃষ্টি করে। আঁশগুলি যখন পচন-ক্রিয়ার সাহায্যে নির্গত হয়, তখনও জালিকাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদে জালিকার গঠন বিভিন্ন প্রকার হয় এবং গঠন-প্রণালীর উপর নির্ভর করে আঁশের দাম।

আঁশের শ্রেণী-বিভাগ

বিভিন্ন ম্যালভেসি গোষ্ঠীভুক্ত (Malvaceae) আঁশের উপর গবেষণা করে ঐ আঁশগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

1) সবচেয়ে উন্নত মানের উদাহরণ Hibiscus vitifolius, Malachra capitata, Urena lobata, U. sinuata, Sida rhombifolia।

এই গোষ্ঠীর মধ্যে H. vitifolius এবং Malachra capitata সবচেয়ে উন্নত মানের, কারণ এদের আঁশগুলি বেশী জালিকার সৃষ্টি না করে লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে। এছাড়া আঁশগুলি খুব সরু, মসৃণ ও উজ্জ্বল সাদা

মধ্যে হয়। এই উদ্ভিদগুলি সহজে ও অল্প সময়ে পচনশীল (4 থেকে 8 দিন), আঁশ কোষগুলি খুব সুগঠিত, লম্বা ও চওড়ার অনুপাত 160 থেকে 180, যা বুননকার্যে খুব সহায়ক হয়ে ওঠে। H. vitifolius-এর আঁশ খুব চৈকনাই এবং রং করবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এর আঁশগুচ্ছ খুব হাল্কা। তাই গালিচা তৈরীর কাজে খুব সহায়ক হতে পারে।

কঙ্গো পাট (Urena lobata) খুব সূক্ষ্ম, রেশমের ও শক্ত হয়, লম্বা/চওড়ার অনুপাত 170, কিন্তু তার প্রধান দোষ হলো বেশী জালিকাযুক্ত আঁশ। Urena sinuata অপেক্ষাকৃত সুগঠিত আঁশ তৈরী করে, পক্ষান্তরে Urena lobata-র আঁশ অপেক্ষাকৃত অমসৃণ (Irregular) হয়।

Sida rhombifolia-র আঁশ রেশমের সূক্ষ্ম, ঝকঝকে, কম জালিকাযুক্ত ও শক্ত আঁশ উৎপন্ন করে, কিন্তু আঁশগুচ্ছের (reeds) গোড়ার দিকটা ফিতার মত হয়, যা বয়ন যন্ত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

2) মধ্যম মানের আঁশ—মেস্তা (H. Cannabinus), রোজেলি (H sabdariffa), চীনা পাট (Abutilon sp.), H. acetosella.

এই গোষ্ঠির মধ্যে মেস্তার ফলন ভাল ও শক্ত এবং ঝকঝকে আঁশ প্রস্তুত করে। কিন্তু এর খুঁৎ হলো আঁশগুচ্ছ খুব বেশী জালিকাযুক্ত এবং অবিন্যস্ত উপরিভাগ (Irregular surface) এবং খুঁৎও কম নেই। এর পর আছে রোজেলি (H. sabdariffa), যা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের, যেমন—বেশী জালিকাযুক্ত, প্রচুর খুঁৎযুক্ত (Root cuttings, specks) ও মোটা আঁশ। সবচেয়ে বড় দোষ হলো গাছ পরিণত হতে বহু দিন লাগে (280 দিন)। সুতরাং মেস্তা ও রোজেলের উন্নতিসাধন করতে হলে বৈজ্ঞানিকদের কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—(1) কম সময়ে পরিপূর্ণতাপ্রাপ্তি, (2) সূক্ষ্ম আঁশ, (3) কম জালিকা (4) অপেক্ষাকৃত নরম আঁশ।

চীনা পাটের (Abutilon indicum) ভাল গুণ হলো ঝকঝকে রূপোর মত রং, কম খুঁৎযুক্ত আঁশ-কোষগুলি খুব লম্বা (লম্বা ও চওড়ার অনুপাত 242), এর আঁশগুচ্ছ ও আঁশ কোষ সুগঠিত। তবে সবচেয়ে বড় দোষ হলো এর আঁশগুচ্ছ প্রায় গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত বিভাজিত (প্রায় বইয়ের পাতার মত সাজানো থাকে)। এই বিভাজিত আঁশ চিরুনি যন্ত্রে চালানো খুব কঠিন।

3) নিম্নমানের আঁশ—H. tetraphyllus, Abelmoschus esculentus, Abelmoschus sp., H. radiatus, H. ficulneus, H. panduraeformis, H. pungens, H. surratensis.।

এই শ্রেণীর আঁশের দৃঢ়তা বেশী, কিন্তু পাটের দাঁড়া মোটা ও শক্ত হয়, তাছাড়া এদের নানা প্রকার দোষ ও খুঁৎ আছে; যেমন—শক্ত গোড়া, গাঁট শক্ত রজ্জুবৎ ও চলমান গাঁটের পরিমাণ বেশী। তাই পাটের কলে চিরুনী যন্ত্রে ও বয়ন যন্ত্রে কাপড় তৈরী করবার পক্ষে অনুপযোগী। আঁশের গঠনও খুব অবিন্যস্ত। এই শ্রেণীর মধ্যে কেবল H. tetraphyllus ও A. esculentus-এর আঁশ অপেক্ষাকৃত ভাল। ভিণ্ডি (H. esculentus) আঁশ ঝকঝকে, রেশম পোকার মত সাদা ও খুব ভারী, আঁশ-কোষ লম্বা বেশ বেশী (লম্বা 5 মিলিমিটার, লম্বা ও চওড়ার অনুপাত 183)

H. radiatus-এর আঁশ মোটা, শক্ত ও ভারী হয়। তাছাড়া আঁশের শরীরে অনেক খুঁৎ আছে আর H. panduraeformis, H. pungens ও H. surratensis-এর আঁশ সবচেয়ে নিম্নমানের হয়। এদের আঁশগুলি খুব কম

মোটা ও এক সঙ্গে গোছা পাকিয়ে থাকে। তাই তাদের কোন কাজে ব্যবহার করা যায় না।

Tiliaceae—এই গোত্রের আঁশ একটা মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। আমরা তিতা (Capsularis) ও মিঠা পাট (Olitorius) এর থেকে পাই। বাণিজ্যে এই পাটকে হোয়াইট (White) ও তোষা (Tossa) পাট বলে। এই শ্রেণীর আঁশ অধিকতর বলশালী, তাদের দামও খুব উঁচু। তাই বাণিজ্যে এদের চাহিদা খুব বেশী। আমাদের দেশ থেকে পাট বিদেশে রপ্তানী করে সরকার প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন। বস্তা, থলি, গালিচা ও বিভিন্ন কাজে পাটের সমাদর বিদেশে আছে। অবশ্য বিভিন্ন বৈদেশিক সরকার নানা প্রকার কৃত্রিম আঁশ তৈরী করে নিজেদের দেশে আমদানী কমিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। তাই কৃষি-বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যাতে তাঁরা উন্নত মানের পাটের আঁশ তৈরী করতে পারেন, যা কৃত্রিম আঁশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সস্তা হবে।

মিঠা পাটের আঁশ সাধারণতঃ সোনালী রঙের হয়, উজ্জ্বল চকচকে বেশী জোরালো হয়, আঁশের ধারায় খুঁতও খুব কম। তিতা পাটের মান মিঠা পাটের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। এর রং সাদা ও চকচকে হয়। এর আঁশে বেশ কিছু খুঁত আছে, যেমন—শক্ত গোড়া, গাঁট, কালি, যা আমরা তোষা পাটে খুব কম দেখতে পাই। আঁশের গঠন তোষার তুলনায় অনিয়মিত হয় ও কালিকা বেশী হয়। তিতা পাটের মান বাড়াতে হলে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পাট কম কালিক, সুগঠিত ও নিখুঁত হয়। পাট-কৃষি গবেষণাগারে প্রজনন-প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকার তিতা পাট উৎপন্ন করেছেন, যাদের মান বিভিন্ন প্রকারের। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও নিম্নমানের আঁশ আমরা তাদের থেকে পাই। এখন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে আঁশের মান ও ফলন এক সঙ্গে পাওয়া যায়। মিঠা পাটের মধ্যে জে আর ও 632, জে আর ও 878 ও আই আর 1। তিতা পাটের মধ্যে ফাল্গুনী ও জে আর সি 7449-এর মান উন্নত।

রঞ্জন-রশ্মি ও গামা-রশ্মির সাহায্যে নানা প্রকার পরিব্যক্ত (Mutant) পাটের উৎপত্তি হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। Spontaneous crumpled ও Ornamental-এর আঁশের মান তাদের উৎপাদক জে আর ও 632-এর চেয়ে ভাল, কিন্তু ফলন অনেক কম। জে আর সি 212 থেকে উদ্ভূত Bushytop ও Cobaltgummy-র আঁশের মান খুব নীচু, আঁশগুলির রং, ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি খুব নিম্নমানের। এদের আঁশ-কোষের গঠনও খুব অসুষম হয়ে থাকে।

Sterculiaceae—এদের থেকে আমরা আঁশ উৎপাদক উদ্ভিদ খুব কম পাই। তার মধ্যে Pentapetes phoenicea ও Abroma augusta-র উল্লেখ করা যেতে পারে। Pentapetes-এর আঁশ সোনালী ও রুক্ষ হয়ে থাকে। এর আঁশগুচ্ছ খুব খাটো ও কমজোরী হয়। Abroma অবশ্য শক্ত ও চকচকে আঁশ উৎপাদন করে, কিন্তু আঁশগুচ্ছে প্রচুর খুঁত আছে, যেমন—শক্ত গোড়া, গাঁট শক্ত চামড়া, তাই পাটের বদলে ব্যবহার করা অসম্ভব। Helicteres-এর আঁশ সবচেয়ে নিম্নমানের। এর আঁশ আঠালো জিনিষে ভরা, এত শক্ত যে—তাদের পৃথক করে ব্যবহারোপযোগী করা সম্ভব নয়।

পাতার আঁশ (Leaf fibres)—পাতা থেকেও আমরা আঁশ পেতে পারি। তালজাতীয় গাছের (Palm) পাতার বোঁটা থেকে আঁশ পাওয়া যায়, যেমন—নারিকেল (Cocos nucifera) ও তাল (Borassus flabellifer)। এই আঁশগুলি খুব মোটা ও অমসৃণ হয়, তাই ঝাড়ু তৈরীর কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

পাতাজাত আঁশের প্রধান বিশেষত্ব হলো আঁশগুলি শক্ত হয় না, জালিকা সৃষ্টি করে না, তারা ফ্লোয়েমের মত একক ও পরস্পর থেকে পৃথক। পাতার মেসোফিল কোষের মধ্যে পাতার গোড়া থেকে লম্বালম্বি সাজানো থাকে।

পাতাজাত আঁশের মধ্যে সিসল (Sisal) গোত্রীয় উদ্ভিদ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন গাছের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায়, যার মধ্যে Agave sisalana, Agave amaniensis, A. veracruge, A. cantala, Sansevieria ও Furcraea প্রধান। এদের মধ্যে Agave sisalana-র আঁশের দাম সবচেয়ে ভাল এবং আঁশ খুব মজবুত, শক্ত ও মোটা, ফলনও বেশী। Agave amaniensis ও A. cantala-এর আঁশ অপেক্ষাকৃত সরু ও কম মোটা, A. veracruge-এর আঁশ সরু ও দুর্বল। সিসলজাতীয় আঁশের একক কোষ বেশ লম্বা এবং লম্বা ও চওড়ার অনুপাত বেশী। কোষগুলি একরূপভাবে দুই দিকে সরু, কোথাও অসমান নয়। Sansevieria ও Furcraea থেকে আমরা যে আঁশ পাই, তা সরু ও খুব দুর্বল। Furcraea-এর কোষের গহ্বরের চওড়া ও আঁশ-কোষের চওড়ার অনুপাত বেশী হওয়ায় কাগজ তৈরীর উপযোগী।

ফল ও বীজ থেকে পাওয়া আঁশ (Fruit এবং seed fibre)—ফল থেকে যে সব আঁশ প্রস্তুত হয়, তার মধ্যে নারিকেলের আঁশ (Coir) প্রধান (Cocos nucifera)। শক্ত দড়ি তৈরীর কাজে এটি ব্যবহারযোগ্য। লবণাক্ত জলে এর কোষ নষ্ট না হওয়ায় গভীর সমুদ্রে জাহাজ বাঁধবার দড়ি তৈরীর জন্যে এটি বিখ্যাত। এই আঁশ নারিকেলের Mesocarp থেকে উৎপন্ন হয়। পাকা নারিকেলের খোসা সমুদ্রের জলে জাগ দেওয়া হয়, তাতে নরম কোষগুলি সহজেই নষ্ট হয়ে যায় ও শক্ত আঁশ বের হয়ে আসে। নারিকেলের আঁশ লিগনিন ও সেলুলোজের দ্বারা গঠিত ও অনেকগুলি একক আঁশ-কোষ দিয়ে প্রস্তুত।

বীজ থেকে যে আঁশ আমরা পাই, তার মধ্যে তুলা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বস্ত্রশিল্পে তুলার অবদান অনস্বীকার্য। গর্ভকেশরের কোষের দেয়াল থেকে লম্বাকার কোষগুলি বের হয়ে তুলা তৈরী করে। তুলার আঁশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পাকানো বা আঁকা-বাঁকা নলের মত দেখা যায়, ভিতরে আছে কোষগহ্বর, যা অসমান। তুলা খাঁটি সেলুলোজ দিয়ে গঠিত এবং একটি মাত্র কোষ একটি আঁশও তৈরী করে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল, বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরণের আঁশ পেতে পারি। প্রত্যেকটি আঁশের গঠনগত বৈশিষ্ট্য আলাদা। তাদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করবে কোন্ কাজে তারা ব্যবহারের উপযোগী। ব্যবহার অনুসারে আমরা উদ্ভিজ্জ আঁশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত আঁশ (Textile fibres)—কাপড়চোপড় তৈরীর কাজে যে আঁশ ব্যবহৃত হবে, তা খুব সূক্ষ্ম এবং সেলুলোজের পরিমাণ বেশী হবে, আঁশগুলির বহির্ভাগ কিছুটা অসমান হবে—যাতে পাকানোক্রিয়ার সুবিধা হয়, লম্বা ও চওড়ার অনুপাত 2000 থেকে 3000 হবে। তুলা, রেমি ও লিনেন এই কাজের উপযোগী।

বস্তা ও থলে তৈরীর কাজে ব্যবহৃত আঁশ (Gunny fibre)—এর জন্যে আঁশগুলি শক্ত, সূক্ষ্ম, অপেক্ষাকৃত কম লিগনিনযুক্ত ও বিশুদ্ধ হবে, আঁশগুলি সাধারণতঃ অনেক কোষের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়; পাট, মেস্তা, রোজেলি, বনো পাট, H. vitifolius, M. capitata, Sida rhombifolia-কে আমরা এই কাজে সহজে ব্যবহার করতে পারি।

দড়িশিল্পে (Cordage fibre)—সাধারণতঃ মোটা জাতের আঁশ, যা পাটের বদলে বোনা যায় না, তা দড়ি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা যায়; যেমন—গাছপাটের সব আঁশগোষ্ঠী, শণ-পাট H. tetraphyllus, Abutilon, H. radiatus ও Abroma augusta

কাগজশিল্পে (Paper industry): ব্যবহৃত আঁশ এই কাজে ব্যবহৃত আঁশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই; যেমন—সেলুলোজের পরিমাণ বেশী হওয়া উচিত, কোষপ্রাচীর ও কোষের চওড়ার অনুপাত বেশী হওয়া প্রয়োজন। রেমি, তুলা, লিনেন ও শণপাটকে আমরা দামী কাগজ তৈরীর কাজে ব্যবহার করি। ভিণ্ডি (H. esculentus) ও চীনাপাট (Abutilon) কাগজ তৈরীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। [illegible] বাঁশ আমরা কম দামী কাগজ তৈরীর কাজে ব্যবহার করতে পারি।

[এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অনেকাংশে লেখকের অনুসন্ধানের ফলের উপর ভিত্তি করে লিখিত]

কৃষি-সংবাদ

থায়াবেণ্ডাজোল (T B Z) বেশী দিন ধরে ফল সংরক্ষণে সাহায্য করে

ভারতে ফল ও সব্জীর বার্ষিক উৎপাদন প্রায় 200 লক্ষ টনের মত হলেও এর শতকরা 20 থেকে 25 ভাগই উপযুক্ত সংরক্ষণ কৌশলের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। প্রধানতঃ ছত্রাকসংক্রান্ত পচনের জন্যেই সংরক্ষিত ফল ও সব্জী খাবার অযোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সংরক্ষণ করবার আগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ফলগুলিতে ছত্রাক-প্রতিরোধক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এতদিন পর্যন্ত থায়াবেণ্ডাজোল মানুষ ও পশুর কৃমিনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সম্প্রতি দেখা গেছে যে, ভাণ্ডারজাত ফলের পচন রোধ করতেও এটি বিশেষভাবে কার্যকরী।

হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান-পালন (হর্টিকালচার) বিভাগে সংরক্ষিত ফলের রোগ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত একটি ছত্রাকনাশক নির্বাচন করবার জন্যে কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়। এই সমস্ত পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিকের মধ্যে থায়াবেণ্ডাজোল (TBZ) সবচেয়ে কার্যকরী বলে দেখা গেছে। ফলগুলি 2-3 মিনিট ধরে থায়াবেণ্ডাজোল মেশানো জলে ডুবিয়ে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপর ঘরের তাপমাত্রায় বা হিমায়িত কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়। গাছ থেকে ফল তোলবার 24 ঘণ্টার মধ্যে আনাব-এ-শাহী আঙুরে রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয়। অন্যান্য ফলে এই সময়ের ব্যবধান রাখা হয় 48 ঘণ্টা। থায়াবেণ্ডাজোল বিশেষ করে ম্যাণ্ডারিন কমলালেবু, মিষ্টি কমলালেবু ও পাহাড়ী কলার সংরক্ষণজনিত পচন রোধ করতে খুবই কার্যকরী বলে দেখা যায়। এর দ্বারা বিভিন্ন ফলের পচনের পরিমাণ প্রায় শতকরা 65-95 ভাগ কমে যায়। ১নং তালিকায় এই সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হলো।

ম্যাণ্ডারিন কমলালেবু পেনিসিলিয়াম জাতীয় রোগ বা ছাতা ধরবার ফলে সবচেয়ে বেশী নষ্ট হয়। থায়াবেণ্ডাজোল দিয়ে এই ধরনের ছাতা-ধরা রোগ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই দূর করা যায় বলে দেখা গেছে। টি বি জেড (1000 পি পি এম) ওয়াক্সোল 0-12-এর সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে কমলালেবুগুলির উপর প্রলেপ দিলে শুধু পচনই রোধ করে না, ফলগুলির উজ্জ্বল্য, স্বাদ ও তাজা-

তাহাও বজায় রাখে এবং এর পরে সেগুলি হিমঘরে আরও অন্ততঃ দশ দিন বেশী সময় ভালভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

কলা ও লেবুজাতীয় ফল পলিথিনের মোড়কে রাখলে দেরীতে পাকে। কিন্তু অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্যে ফলগুলির সহজেই রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। সংরক্ষণ করবার আগে ফলগুলি টি বি জেডে (1000 পি পি এম) ডুবিয়ে নিলে এই সমস্যা দূর করা যায়। আনাব-এ-শাহী আঙুরে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ওষুধ ও টি বি জেড (200 পি পি এম) ব্যবহার করতে হবে।

জানা গেছে যে, থায়াবেণ্ডাজোল ছত্রাকনাশক প্রভাব হিসাবে খুব কার্যকরী হলেও এর বিষের প্রভাব খুব বেশী না এবং এটি ব্যবহার করলে ফলগুলির কোন রকম স্বাদগত অবনতি হয় না এবং বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, নানা ধরণের ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এই থায়াবেণ্ডাজোল কলা, আঙুর ও লেবু জাতীয় ফল দীর্ঘ দিন ধরে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।

প্রতি 100টি ফলে ওষুধ প্রয়োগের জন্যে খরচ পড়ে 30 থেকে 50 পয়সা। দেশের মধ্যেই এই রাসায়নিকটি বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা হলে খরচের অনুপাত আরও কমে যাবে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি ভবন, নতুন দিল্লী]

1নং তালিকা

চিকিৎসিত ফলের নাম	ছত্রাকনাশক	নিয়ন্ত্রিত রোগ	অচিকিৎসিত ফলের তুলনায় রোগের প্রকোপ কমে যাবার শতকরা ভাগ		সংরক্ষিত জীবনকাল	
			ঘরের তাপমাত্রায় (26—30°সে)	হিমায়িত তাপমাত্রায়*	ঘরের তাপমাত্রায় (26—30°সে)	হিমায়িত তাপমাত্রায়
1। ম্যাণ্ডারিন কমলালেবু	টি বি জেড 1000 পি পি এম	ব্লু এবং গ্রীন মোল্ড	80	75	7 দিন	40 দিন
	টি বি জেড 1000 পি পি এম + ওয়াক্সোল 0-12	ব্লু এবং গ্রীন	—	80	—	50 দিন
2। মিষ্টি কমলালেবু	টি বি জেড 500 পি পি এম	"	90	90	10 দিন	60 দিন
3। আনাব-এ-শাহী আঙুর	টি বি জেড 200 পি পি এম	ব্লাক মোল্ড রট	80	95	7 দিন	20 দিন
4। পাহাড়ী কলা	টি বি জেড 1000 পি পি এম	অ্যানথ্রাকনোজ	69	70	8 দিন	20 দিন
		বাট অ্যাণ্ড ইনফেকশন	75	75	—	—
5। বেঁটে জাতের ক্যাভেণ্ডিশ কলা	"	অ্যানথ্রাকনোজ	45	40	8 দিন	20 দিন
		বাট অ্যাণ্ড ইনফেকশন	75	75		

*ম্যাণ্ডারিন কমলালেবু—5-70° সে ; মিষ্টি কমলালেবু—2-4° সে ; আনাব-এ-শাহী আঙুর—0° সে ; পাহাড়ী বেঁটে জাতের ক্যাভেণ্ডিশ কলা—13-15° সে।

ভারতের খনিজ সম্পদ—হীরক

অরবিন্দ দাস*

হীরক বহু মূল্যবান খনিজ সম্পদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই হীরক সম্বন্ধে অবহিত ছিল। এখানে হীরক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রকৃতি—খনির অভ্যন্তরে পাথরের সঙ্গে অথবা কোন কোন নদী তীরস্থ বালুকার সঙ্গে মেশানো থাকে এই হীরক বা হীরা। হীরকযুক্ত পাথরের টুকরা উত্তমরূপে চূর্ণ করে জলে মেশানো হয়। এরপর চর্বিমাখানো আনত একটা প্রকাণ্ড টেবিলের উপর দিয়ে উক্ত মিশ্রণ প্রবাহিত করা হয়। ভারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরার টুকরাগুলি নীচে থিতিয়ে গিয়ে চর্বিতে আটকে যায়। এরপর কয়েকবার ধৌত করে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড সংগ্রহ করা হয়।

কৃত্রিম উপায়েও হীরক প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু তার উপকরণের কথা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। চিনিজাত অঙ্গার দিয়েই ময়সাঁ (Moissan, 1893) লেবোরেটরীতে এই অমূল্য রত্নটি প্রস্তুত করেন। এই রত্নটির মূলে রয়েছে অঙ্গার—সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ সামগ্রীটি। সত্যই এটা এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহোক, বর্তমানে বিদ্যুৎ-চুল্লীতে লৌহ-চূর্ণ ও উক্ত অঙ্গারের মিশ্রণকে প্রায় 3000° সে.-এ বহুক্ষণ ধরে গলিত করে তাকে গলিত সীসার মধ্যে হঠাৎ ঠাণ্ডা করলে (Chilling) কিছু অঙ্গার অত্যধিক চাপে (70,000 – 100,000 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ) হীরকে পরিণত হয়। পরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্বারা লৌহ দ্রবীভূত করে পৃথক করে দিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকের স্ফটিক পাওয়া যায়। তবে এর সঙ্গে কিছু অবিশুদ্ধি থেকে যায়।

ব্যবহার—রত্ন হিসাবেই কিন্তু হীরকের একমাত্র ব্যবহার নয়। শিল্পে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কাচ কাটতে হীরা তো ব্যবহার করা হয়ই, প্রচণ্ড কঠিন বলে ছিদ্র করবার যন্ত্র ও খুব শক্ত ইস্পাতকে আকার দিতে হীরক ব্যবহৃত হয়। এর ঘর্ষণক্ষমতা (Abrasive property) অপরিসীম। যদি একটি চাকার হীরার গুঁড়া লিনসিড আঠা দিয়ে লাগিয়ে চাকাটি ভীষণ বেগে ঘোরানো যায়, তবে ঐ চাকার গায়ে যত শক্ত জিনিষই রাখা যাক, তাকে পালিশ করা যেতে পারে। এমন কি, অপর হীরার টুকরাগুলিও এভাবে পালিশ করা হয়ে থাকে। অবিশুদ্ধিযুক্ত হীরা (2·1% গ্র্যাফাইটযুক্ত) কার্বনডো (Carbondo) রত্ন হিসাবে অপ্রযুক্ত হলেও দৃঢ় ধাতু, পাহাড় বা পাথর কাটা ও জিনিষ মসৃণ করবার কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম—বিশুদ্ধ হীরক অতিশয় স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। এর প্রতিসরাঙ্ক (Refractive index) খুব বেশী (প্রায় 2·42, জলের মাত্র 1·33) বলেই আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ক্ষমতাও যথেষ্ট, আর তার জন্যেই হীরাকে এত উজ্জ্বল দেখায়। হীরকের টুকরাগুলি কেটে বহুতল করলে কোণ বৃদ্ধির সঙ্গে এর ঔজ্জ্বল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রশ্ন হলো—হীরা আসল কি নকল—তা কেমন করে বুঝা যায়? এক্স-রশ্মির কথা আমরা জানি। আসল হীরার ভিতর দিয়ে এক্স-রশ্মি যেতে পারে, কিন্তু স্বচ্ছ কৃত্রিম কাচ বা ঐরূপ নকল হীরার ভিতর দিয়ে যেতে পারে না।

---

* রসায়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, 24-পরগণা

হীরককে মৌল কার্বনের রূপভেদ বলা হয়। গ্র্যাফাইট, হীরক, কাঠকয়লা, কোক প্রভৃতি সবই কার্বনের রূপভেদ। বাহ্যতঃ এই বিভিন্ন রকমের কার্বনের ভিতর পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু সমপরিমাণ ওজনের বিভিন্ন প্রকারের কার্বন নিয়ে জারিত করলে কেবলমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর আয়তন এক। এই বিভিন্ন পদার্থগুলি যে একই মৌলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ মাত্র, এটাই তার প্রমাণ।

হীরক যথেষ্ট ভারী এবং পরিচিত সর্বাধিক কঠিন পদার্থগুলির মধ্যে এটি হলো অন্যতম। কিন্তু হীরক কেন এত কঠিন? হীরকের স্ফটিক হলো ঘনাকার। এক্স-রশ্মির পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণু তার চারটি সমযোজ্যতার সাহায্যে অপর পরমাণুগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ঐ চারটির প্রত্যেকটি আবার আর চারটি পরমাণুর সঙ্গে এঁটে থাকে। যোজকগুলি চতুষ্কোণ আকারে 109 ডিগ্রী 28 মিনিট কোণ করে প্রসারিত। দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যের ব্যবধান 1·54 A° (1 A° = 10^{-8} সে. মি)। হীরকের স্ফটিককে তাই একটি বিরাট অণু (Giant or macromolecule) মনে করা যেতে পারে। হীরকের অসাধারণ কাঠিন্য এই বিশেষ গঠনের জন্যেই হয়েছে। আর এরূপ গঠনের জন্যেই কোন রাসায়নিক বিকারকের দ্বারা হীরক বিশেষ আক্রান্ত হয় না।

বর্ণহীনতা ও স্বচ্ছতার দ্বারা হীরকের মূল্যায়ন হয়ে থাকে। সোনার মত হীরকের ওজন ক্যারাট হিসাবে মাপা হয় (এক আন্তর্জাতিক ক্যারাট = 0·20 গ্রাম)।

ভারতীয় হীরক—পৃথিবীর হীরকের বেশীর ভাগ সরবরাহ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। 90% হীরক আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়। এখানকার কিম্বার্লির হীরকখনি জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু অসুবিধাটা হলো—সবচেয়ে সমৃদ্ধ হীরকখনিতেও 60 টন কাঁচা-মালে মাত্র 1 আউন্স পরিমাণ হীরক থাকে। ব্রেজিল বা ট্রান্সভালের হীরকখনি আবিষ্কৃত হবার পূর্বে ভারতবর্ষের হীরকের প্রভূত খ্যাতি ছিল। মাত্র চার-শ' বছর আগে সম্রাট আকবরের আমলেও হীরকশিল্পে আয় হতো বার্ষিক 12 লক্ষ টাকা! সে দিনের ভারতবর্ষের যে সকল হীরকখণ্ড বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল, সেগুলি হলো—কোহ্-ই-নূর (186 ক্যারাট), বিশাল মোগল (280 ক্যারাট), নিজাম (277 ক্যারাট), ওরলফ (193 ক্যারাট), নীল আশা (44·5 ক্যারাট) ও পিট (410 ক্যারেট)। আর পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক আবিষ্কৃত হয় 1905 সালে কিম্বার্লির খনি থেকে; নাম—কুলিনান (Cullinan), ওজন—3032 ক্যারাট। এর এক-এক খণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তখনকার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে; যেমন—তদানীন্তন বৃহদাকার পিটকে (The Pitt) যখন ক্ষুদ্রাকার 135·75 ক্যারাট ওজনের খণ্ডে পুনরায় কাটানো হয়; তখন তার মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল বিদেশী মুদ্রায় 480,000 পাউণ্ড!

দীর্ঘকাল ইংরেজ রাজত্বে প্রাচীন ভারতের হীরকসমৃদ্ধ স্থান বুন্দেলখণ্ড (পান্না-হীরার জন্যে) ও মাদ্রাজ (গোলকুণ্ডা হীরার জন্যে) আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এবং অতীত গৌরবের সাক্ষীতে পরিণত হতে চলেছে—তবে সুখের বিষয়, একেবারে নিঃশেষিত হয় নি। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে পান্না, কুর্নুল, বেলারী ও মধ্যভারতে অবস্থিত সামলিক ও বলভাসের খনি থেকে রত্নোপযোগী ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহারযোগ্য সামান্য পরিমাণ হীরক সংগ্রহ করা হয়। গড়ে বার্ষিক উৎপাদন প্রায় 2,000 ক্যারাট মাত্র। তবে এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য খবর হলো—কয়েক বছর পূর্বে পান্না অঞ্চলে অতি ক্ষারকীয় শিলা পাইপের (Pipe of ultra basic rock) সন্ধান পাওয়া গেছে। কিম্বার্লির

হীরকসমৃদ্ধ অঞ্চলের উৎসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। তাকেই হীরকশিল্পে হয়তো আবার আমাদের একদিন গৌরবময় দিন ফিরে আনবে।

এবার হীরকের অবস্থান সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণার কথা আলোচনা করা যাক। ভারত-বর্ষের বিন্ধ্য প্রণালীতেই (Vindhyan system) ডায়মণ্ডিফেরাস স্তরের (Diamondiferous strata) অবক্ষেপ (Deposit) পরিদৃষ্ট হয়। তবে পূর্বে আলোচিত অঞ্চলসমূহের কোন কোন নদীতীরের বালুকা বা নুড়ির সঙ্গে হীরার ছোট ছোট টুকরা পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের উচ্চতর বিন্ধ্যপর্বতের দুটি হীরকসমৃদ্ধ অঞ্চল হলো—কৈমুর (Kaimur sandstone) থেকে রেওয়া শ্রেণী (Rewah series) পর্যন্ত বিস্তৃত শিলাখণ্ডের স্তর (Conglomerate Band) রেওয়া থেকে ভাণ্ডার শ্রেণী (Bhander series) পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, বিন্ধ্যপর্বতের গর্ভে কিন্তু এই ধরণের হীরকের জন্ম হয় নি। এই হীরকের আদি ধাত্র (Matrix) সম্ভবতঃ যেখানে বা কেলাসিত হয়েছিল, তা হলো—বিজাওয়ার শ্রেণীর (Vijawar series) কালীর আগ্নেয়গিরির পরিধিতে—একথা বেরিয়ে আসে গবেষণা থেকে। ভূতত্ত্ববিদ্ ডি. এন. দুবের মতে, এই বিজাওয়ার শ্রেণীতে কেলাসিত হীরক আগ্নেয়-নুড়ির সঙ্গে ভূখণ্ড দিয়ে বহুকাল ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে গোলকুণ্ডা বা পান্না অঞ্চলে। কি আশ্চর্য এই প্রকৃতির খেয়াল!

পরিবেশ দূষিতকরণে শব্দের ভূমিকা

দীপক চক্রবর্তী

এই যুগে শব্দ ছাড়া একটি মুহূর্তও আমরা কল্পনা করতে পারি না। যে শব্দ মোটেই শ্রুতিমধুর নয়, যে শব্দ অবাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছনীয় তাকেই আমরা সাধারণতঃ 'আওয়াজ' কিংবা প্রতিকূল শব্দ বলে থাকি। বর্তমান সভ্যতার অন্যতম সঙ্গী হলো এই আওয়াজ। মানুষ অবশ্য চিরদিনই শব্দপ্রিয়, নীরবতা তার কাছে অসহ্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত প্রসার ও অগ্রগতির ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে দ্রুত গতিসম্পন্ন বিমান, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী প্রভৃতি। তার ফলেই এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনে আওয়াজের প্রভাব গেছে বেড়ে। জনবহুল শহর ও শিল্পনগরীতে মাত্রাতিরিক্ত আওয়াজ পরিবেশকে দূষিত করছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে আওয়াজের জন্যে অফিসে কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার ক্ষতির পরিমাণ যেখানে ছিল বিশ লক্ষ ডলার, এখন সেখানে সেই ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে দ্বিগুণ। শ্রবণশক্তির পক্ষে এই আওয়াজ ক্ষতিকর সন্দেহ নেই। তার জন্যেই শিল্পপতিরা শ্রমিকদের মধ্যে বধিরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চিন্তিত হয়ে উঠেছেন—কেন না, শ্রমিকদের বধিরতার জন্যে মালিকপক্ষকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। এখন এই শব্দের পরিমাণ কি করে কমানো যায়, সেই চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছেন কিছু সংখ্যক স্থপতি, নগর পরিকল্পনাবিদ্ আর জনস্বাস্থ্য বিভাগের বাস্তুকার।

শব্দের প্রাবল্য বোঝাতে ডেসিবেল ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশে যে ক্ষীণতম বা সাধারণতম শব্দের চাপ একটি অল্প বয়সের কান ধরতে পারে, সেই শব্দের মাত্রার পরিমাণ 10^{-16}/

ওয়াট (সে. মি.)², যা হলো শ্রবণসাধ্যতার প্রারম্ভ মান। এই পরিমাণ শক্তিকে শূন্য ডেসিবেল ধরে শব্দের মাত্রার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। কোন শব্দের পরিমাণ ডেসিবেল-এ দেওয়া থাকলে সেই পরিমাণ শব্দ, শ্রবণসাধ্যতার সীমার কতগুণ, তা বের করা যায় নিম্নোক্ত সমীকরণ ব্যবহার করে :

$$\frac{P}{Po} = 10^{x/10}$$

যেখানে P=শব্দের পরিমাণ, Po=শ্রবণসাধ্যতার সীমা এবং X=ডেসিবেলে শব্দের পরিমাণ। এই সূত্র অনুযায়ী 100 ডেসিবেল শব্দের শ্রবণসাধ্যতার সীমার 10^{10} গুণ বেশী বা 10^{-6} ওয়াট/(সে. মি.)²। শব্দের মাত্রা 100-120 ডেসিবেল হলে মানুষ অস্বস্তিবোধ করে এবং সেই মাত্রা যদি আরও বেড়ে 130-140-এ ওঠে, তাহলে সেটা মানুষের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে।

কলকাতার নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরণের আওয়াজ সহ্য করতে হয়, যেমন—ট্রামের ঘরঘরানি, বাইকের তীব্রনিনাদ, বাস ও ট্রাকের বৈদ্যুতিক হর্নের আওয়াজ, পাইলিং-এর শব্দ প্রভৃতি। মাইক মারফৎ যে গান-বাজনা শুনি, তার পরিমাণ প্রায় 105 ডেসিবেল, যার ফলে দুশ্চিন্তা, স্মৃতিভ্রংশতা, ক্লান্তি—এমন কি, পেটের গণ্ডগোল পর্যন্ত হতে পারে। ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজ (প্রায় 110 ডেসিবেল) নিদ্রাহীনতা, আলসার প্রভৃতির কারণ ঘটায়। দমদম বিমানঘাঁটির এক মাইলের মধ্যে জেট প্লেনের আওয়াজ (প্রায় 120 ডেসিবেল) ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ফলে শরীরের ক্ষতি হয়। নিউরোটিক রোগীদের এক সমীক্ষায় জানা যায়, বৃটেনে শব্দের দরুণ নিউরোসিস রোগে ভোগে প্রতি চারজনে একজন পুরুষ এবং প্রতি তিনজনে একজন মহিলা। ফ্রান্সে অতিরিক্ত শব্দের দরুণ মানসিক বিকারের হাসপাতালগুলিতে প্রতি পাঁচজনে একজন নিছক রোগী ভর্তি হচ্ছে। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে মাত্রাতিরিক্ত শব্দের মধ্যে বাস করলে হৃৎপিণ্ডসংক্রান্ত ব্যাধি বৃদ্ধি পায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়—এমন কি হৃদযন্ত্রেও গণ্ডগোল হয়। অতিরিক্ত শব্দের ফলে পাকযন্ত্রেও অনেক সময় গণ্ডগোল দেখা দেয় এবং তার ফলে অন্ত্রগুলি ঢিলে হয়ে আলসার রোগের সৃষ্টি করে। প্রমাণিত হয়েছে যে, অতিরিক্ত আওয়াজের ফলে মানুষের স্বাদ নেবার শক্তি—এমন কি, দৃষ্টিশক্তিও কমে যায়। অতিরিক্ত আওয়াজের ফলে মানুষের প্রধান স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বেশীর ভাগ চিকিৎসকের মতে, প্রতি তিনটি নিউরোসিস রোগের একটি এবং প্রতি চারটি মাথাধরার একটি কারণ হচ্ছে শব্দ।

ফরাসী বিশেষজ্ঞ প্রোফেসর তিন বছর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কোন অফিসে যদি গোলমাল 20 ডেসিবেল কমানো যায়, তাহলে সেই অফিসের কর্মদক্ষতা শতকরা 9 ভাগ বেড়ে যায় এবং বানান ভুলের সংখ্যা শতকরা 29 ভাগ কমে যায়।

যদিও আওয়াজ পশুজগৎকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার কোন পরিসংখ্যান নেই, তবুও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু কৃষক অভিযোগ করেছেন যে, প্লেন অথবা বড় বড় রাস্তায় গাড়ী যাতায়াতের ফলে যে অতিরিক্ত শব্দ হয়, সে শব্দে মুরগী এবং গরুর উৎপাদন শক্তি হ্রাস পায়।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ভারতে আওয়াজের পরিমাণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে কম। তবে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হচ্ছে; যথা—দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানা, ব্যাঙ্গালোরে বিমান নির্মাণ কারখানা প্রভৃতি এবং তার ফলেই শব্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সব জায়গায়।

বহু গ্রামের মধ্যে দিয়ে বড় বড় সড়ক নির্মিত হয়েছে। এর ফলে একদা যে গ্রাম ছিল শব্দহীন, এখন নিয়মিত গাড়ী যাতায়াতের ফলে সেগুলি কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রুতিযন্ত্রণাকর শব্দের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে বাড়ীঘর তৈরী করতে হবে বিমানবন্দর এবং বড় বড় রাস্তা থেকে দূরে। শিল্পসংস্থা, পরিবহনসংস্থা, শহর-পরিকল্পক, পৌর কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি জনসাধারণের যৌথ সহযোগিতা ছাড়া শহরের অতিরিক্ত শব্দ দূর করা অসম্ভব। প্রয়োজন হলে কোলাহলহীন পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

মানুষ যেভাবে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, বর্তমানে তাকে ঠিক তেমনিভাবে শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হবে—এই কথা বলেছেন বিখ্যাত রোগজীবাণুবিদ্‌ রবার্ট কক্‌। আমাদের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে গেলে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন শব্দহীন শান্ত পরিবেশের।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আবর্জনা থেকে জ্বালানী গ্যাস

ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের টেরিটাউন (নিউ ইয়র্ক) গবেষণাগার এমন এক পদ্ধতি বের করেছে, যার দ্বারা পরিত্যক্ত জিনিষকে বিপুল মাত্রায় জ্বালানী গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায়। এই গ্যাস কল-কারখানার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। দৈনিক পাঁচ টন করে পরিত্যক্ত জিনিষ দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এই পদ্ধতির এক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এক বছরেরও বেশী এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার কোন এক কোম্পানীর কারখানায় এই নিয়ে পুরোপুরিভাবে কাজে হাত দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আবর্জনা-বিনাশ পদ্ধতিতে একগাদা পরিত্যক্ত জিনিষকে মাত্র একমুঠো প্রয়োজনীয় বালুকণায় পরিণত করে। কিন্তু তা থেকে উৎপন্ন হয় পাঁচগুণ বেশী শক্তি। এক শ' পাউণ্ড আবর্জনা কমে মাত্র দুই পাউণ্ড দানা বালুকায় রূপান্তরিত হতে পারে। শহর অঞ্চলের নিত্যকার আবর্জনা—যেমন মাছের আঁশ, তরকারির খোসা, কাগজের টুকরা, কাঠের কুচি, রবার, নানা ধাতুর বস্তু, কাচ ভাঙা ও এমনি ধরণের নানা পরিত্যক্ত জিনিষ খাড়া একটি চুল্লীতে দিয়ে অক্সিজেনে জ্বালিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

প্রধানতঃ বালু ও কাচের বালুকণা জমি ভরাট, রাস্তা ও দালান তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে বলে ঐ কোম্পানী অভিমত প্রকাশ করেছে।

নতুন ধরণের বস্ত্র

25 বছরেরও বেশী হয়েছে অ্যাপয়াক কর্পোরেশন (স্ট্যামফোর্ড, কানেক্টিকাট, যুক্তরাষ্ট্র) পরীক্ষামূলকভাবে এক উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েছে। এটি হচ্ছে নতুন ধরণের এক জাতীয় বস্ত্র। এই কর্পোরেশনের বোর্ডের সভাপতি ডক্টর কার্ল ই. বার্নেস এই বস্ত্রের উদ্ভাবক। এই বস্ত্রের নাম হয়েছে 'টাফ নিট'।

ডক্টর বার্নেস বলেছেন, এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বস্ত্র। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্ত্রের এ যেন এক মিলনসেতু। এর দ্বারা ব্যবহার-

বাড়ীর সব রকম সুবিধাই রয়ে যাবে। অসুবিধার কিছুই নেই।

পেট্রোকেমিক্যাল থেকে টাকসিন তৈরী হয়েছে। প্রচলিত নাইলনের সঙ্গে এর মিল নেই। টাকসিন দিয়ে পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সকলের জন্যেই পোষাক তৈরী করা যেতে পারে।

এই বস্ত্র বায়ুর জলীয় বাষ্প খুব বেশী করে টেনে নিতে পারে। তার ফলে এই পোষাক পরে খুব আরাম পাওয়া যায় এবং অগ্নি-নিরোধক ক্ষমতাও আছে।

তারবিহীন টেলিফোন

মোটোরোলা, ইনকর্পোরেটেড (নিউ ইয়র্ক) সহজে বহনযোগ্য এক ধরণের টেলিফোনের প্রবর্তন করেছেন। এই টেলিফোন হাতে বহন করা যায়। এর কোন তারের বালাই নেই। আর এর ওজন হচ্ছে মাত্র 28 আউন্স।

জটিল কম্পিউটার ব্যবস্থায় এই টেলিফোনের কাজ হয়। টেলিফোনে কারো সঙ্গে কথা বলতে হলে রাস্তায় চলতে চলতে অথবা চলন্ত গাড়ী থেকে কোন বাড়ীতে বা অফিসে ইচ্ছামত সংযোগ স্থাপন করা যায়। কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের অধীনে সুপরিকল্পিতভাবে বসানো বহু সংখ্যক রেডিও-ট্রান্সমিটার ও রিসিভারে রেডিও টেলিফোন সংকেত পাঠায়। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার টেলিফোনের সেই ডাক সাধারণ টেলিফোনে সরাসরি পৌঁছে দেয়। সাধারণ টেলিফোনের আহ্বানও 'হাত-ফোনে'র ক্যারিয়ারে পৌঁছে দেওয়া যায়।

মোটোরোলা কোম্পানীর জনৈক কর্তাব্যক্তি মার্টিন কুপার বলেছেন, নতুন ধরণের এই ফোনে তারের প্রয়োজন নেই। আজকাল খবরাখবর তারের সাহায্যে পাঠানো হয়। শুধু তাই নয়, টেলিফোন স্থাপন করতে হয়; তা ছাড়া সেটি বসাবার ঝামেলা তো আছেই। তার কয়েকটি একত্র জুড়ে দেওয়া সার্কিট এবং কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণ টেলিফোন ব্যবস্থার হাঙ্গামা ঝামেলার কাজ অতি সংক্ষেপে সেরে নিতে পারা যাবে।

ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দূরে পাঠানো যাবে

ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লেখা হলে বা কোন স্কেচ বা ছবি আঁকা হলে সেগুলি টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে অনেক মাইল দূরবর্তী পর্দায় প্রতিফলিত করে দেখানো যায়। এই ধরণের ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। হয়তো শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যখন কোন সম্মেলনের বহনযোগ্য টেলিফোনের সাহায্যে কথা ও সাংকেতিক চিত্র সঙ্গে সঙ্গে অফিস, সম্মেলন কক্ষ, ক্লাশ ঘর এবং বক্তৃতাগৃহে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

হল্মডেলের (নিউ জার্সি) বেল টেলিফোন লেবরেটরীর পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার টেলিরাইটিং পদ্ধতির একটি নমুনা উদ্ভাবন করেছেন। এর কর্মধারা হচ্ছে—এই ধরণের খড়ি, কলম, পেন্সিল অথবা স্টাইলাস প্রভৃতি লেখার সরঞ্জামের সঙ্গে ছোট একটা লোকেশন ইণ্ডিকেটর জুড়ে দেওয়া হয়। বোর্ডের লেখার জায়গায় হাতটাকে যেভাবে নড়া-চড়া করা হয় ইণ্ডিকেটর তার পুরোপুরি অনুসরণ করে। টেলিফোনের লাইনের অপর প্রান্তে রক্ষিত সংবেদনশীল একটি আলোকচিত্রের ফিল্মে এই প্রান্তের সকল সংবাদ যান্ত্রিক উপায়ে চিত্রিত হয়ে যায়। আর তা একই সঙ্গে একটি পর্দায় দেখা যায়। ফিল্মেই এই লেখাচিত্র ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্যও রেখে দেওয়া যেতে পারে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—1973

সপ্তবিংশতিতম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা
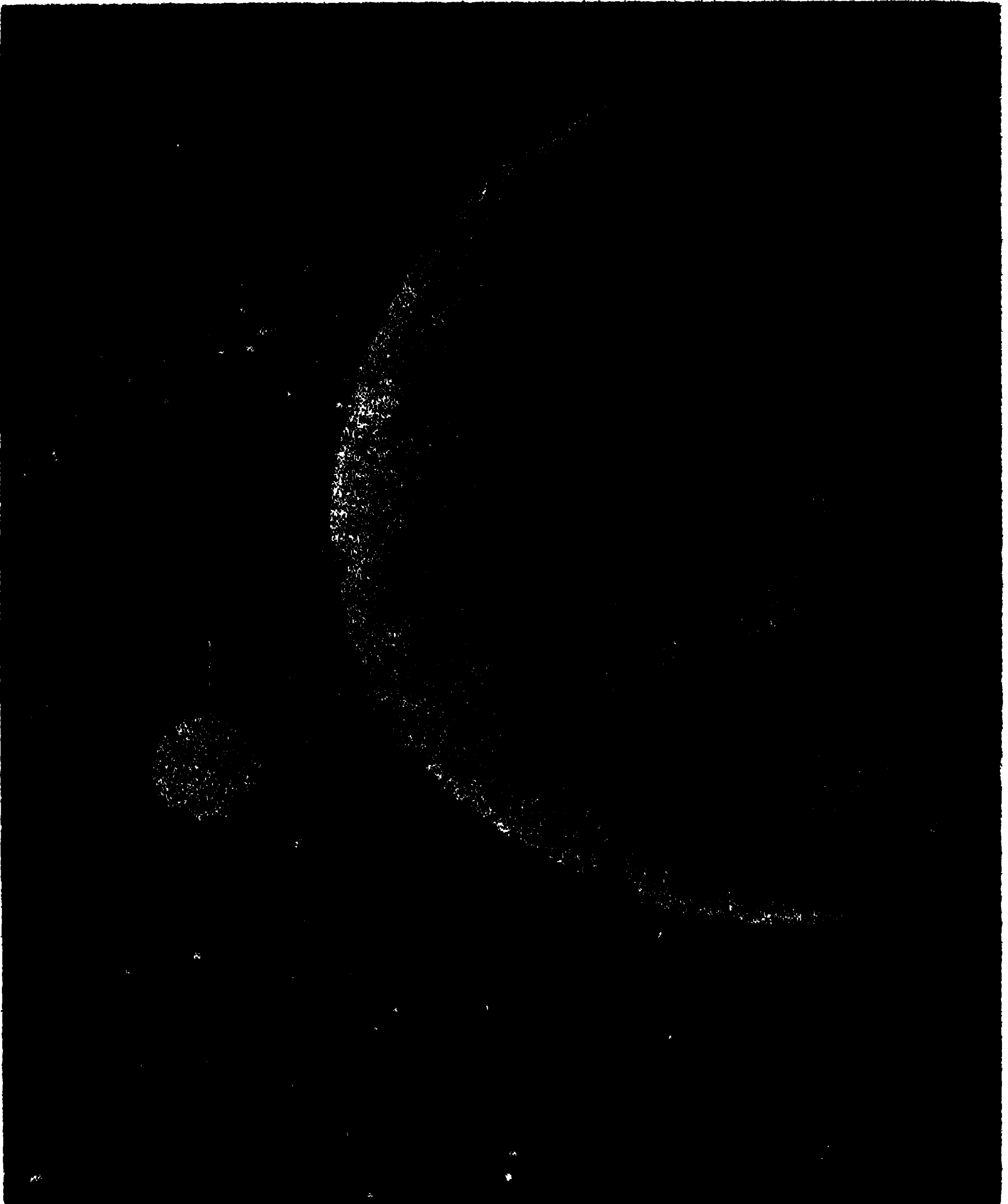
সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশে যে লাল অংশটি দেখা যায়, সে সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে ফ্লোরিডা থেকে গত 2রা মার্চ (1972) পায়োনিয়ার-10 নামক স্পেসক্র্যাফটটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়। ঐই স্পেসক্র্যাফট থেকে প্রায় 20টি রঙীন ফটোগ্রাফ পৃথিবীতে প্রেরিত হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া ডিসেম্বর মাসের (1973) প্রথম দিকে স্পেসক্র্যাফটটি বৃহস্পতি গ্রহকে অতিক্রম করে যাবার সময় পৃথিবী থেকে এই গ্রহটির অদৃশ্য অনালোকিত অংশ অর্থাৎ উষাকালীন অবস্থার পরিমাপগত বিবরণও সংগ্রহ করবে। ছবির বাঁ-দিকের সাদা বৃত্তাকার অংশটির দ্বারা সূর্যের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

পাখীর বাসা

মানুষ বাসা বাঁধে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে। কারোর স্থায়ী বাসা অর্থাৎ নিজের তৈরী বা বাপ-পিতামহের বাড়ী, কারোর শশুরের ভিটা, কারোর বা অস্থায়ী অর্থাৎ ভাড়া-করা বাসা। এর মধ্যে হোটেল, বোর্ডিং, মেস ইত্যাদিও পড়ে।

পাখীরা মানুষের মত অর্থনীতির ধার ধারে না। তারা বাসা বাঁধে জাতি বা প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। কারণ একই বংশের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির পাখার বাসা বিভিন্ন রকমের। তাদের বাসার আয়তন, গড়ন, উপাদান সবই আলাদা।

পাখার বাসা নিয়ে অনেক কাজ করবার আছে। প্রথমে নানা জাতীয় পাখার বাসা সংগ্রহ করতে হবে। এর পর মাপ নিতে হবে সম্পূর্ণ বাসার অর্থাৎ লম্বা, চওড়া ও উচ্চতা এবং খোদলের লম্বা, চওড়া ও গভীরতার। সব বাসার আবার খোদলের মাপ নেওয়া যাবে না। তার প্রবেশপথ ও ডিমগৃহের মাপ নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জানতে হবে ওই বাসার উপাদান কি কি? তৃতীয়তঃ কমপক্ষে ঐ পাখীর বাসা আরও দশটি সংগ্রহ করে দেখতে হবে, মাপের কোন হেরফের হয় কিনা এবং হলে কেন হয়? কোন্ গাছ থেকে ঐ বাসাটি সংগ্রহ করা হয়েছে? মাটি থেকে বাসাটি কত উঁচুতে ছিল? এই হলো জানবার এক দিক।

অপর দিকে সুরু থেকে বাসা বানাতে ঐ পক্ষী-দম্পতি কতবার খড়কুটা ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনছে এবং সেই সময়ের ব্যবধান। দিনে কখন এই কাজ হচ্ছে, তাও দেখতে হবে। তাতে জানতে পারবে বিশ্রাম এবং খাদ্য সংগ্রহের সময়।

পাখীদের অনেক গোত্র বা বর্গ আছে। এই বর্গকে বা গোত্রকে ইংরেজীতে বলে অর্ডার। সবচেয়ে বড় গোত্র বা বর্গ হলো দণ্ডচারী—প্যাসেরিফর্মেস অর্থাৎ যারা গাছের ডালে পা আঁকড়ে থাকে। এই বর্গে অনেক বংশ অর্থাৎ ফ্যামিলি দেখা যায়। এই বর্গের দু-একটি পাখীর বাসার কথা বলছি। তাতে বুঝতে পারবে এই বংশের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির বাসা বাঁধবার কায়দা সম্পূর্ণ আলাদা।

ধরা যাক, দণ্ডচারী বর্গের অন্তর্গত সারিক বংশের কথা। সারিক বংশের বৈজ্ঞানিক নাম—স্টার্নিদি। সারিক বংশ অর্থাৎ শালিক, ময়না ইত্যাদি প্রজাতির পাখী। এই বংশের অনেক পাখীকে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। তার মধ্যে তিনটি প্রজাতির কথা বলছি।

শালিক বা ভাতশালিক—যাকে চিনতে আমরা কখনই ভুল করি না, তার বৈজ্ঞানিক নাম—অ্যাক্রোডোথেরেস ট্রিস, ইংরেজী—কমন মাইনা। একটু লক্ষ করলেই দেখতে

পারে, তারা বাসা বাঁধে বাড়ীর আনাচে-কানাচে, আলসে বা কার্নিশের তলায়, দেয়াল বা কুয়ার ভিতরের গর্তে অথবা গাছে। ছোট খোপ ও লুকানো কোণ অথবা চিল, পাতিকাক বা কাঠবিড়ালীর পরিত্যক্ত বাসাতেও এদের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। পাড়াগাঁয়ে অনেক বাড়ীর দেয়ালের গায়ে মাটির ভাঙ্গা হাঁড়ি বা কলসী ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে শালিক এসে বাসা বাঁধতে পারে।

শালিকের বাসার কোন ছিরিছাঁদ নেই। শুক্‌নো ঘাস, খড়, কাঠি, পালক, বহু রকম আবর্জনা—ময়লা কাগজ, ছেঁড়া ন্যাকড়া, দড়ির টুকরা—এমন কি, সাপের খোলসের অংশও এদের বাসার মধ্যে পাওয়া যায়। এদের প্রজননের সময় এপ্রিল থেকে অগাষ্ট মাস।

সারিক বংশের অন্য এক প্রজাতি গাংশালিক বা রামশালিক। বৈজ্ঞানিক নাম—অ্যাক্রোডোথেরেস জিনিজিনিয়ানাস, ইংরেজী—ব্যাঙ্ক মাইনা। এরা শালিকের চেয়ে আকারে একটু ছোট। খাওয়া-দাওয়া স্বভাব প্রায় ভাটশালিকের মত। সময় সময় একসঙ্গে চরতে দেখা যায়। চাষের ক্ষেত বা মাঠের ধারে বাজারের ময়লা-আবর্জনা বা গরু-মহিষ চরবার জায়গায় দেখা গেলেও নদীর ভাঙন-পাড়, দিঘির ধার কিংবা পুরনো ইটের পাঁজার মধ্যে শুষ্ক বদ্ধ জলের কিনারায়, অর্থাৎ জলের ধারে এদের দেখা যায় বেশী।

শালিক অপেক্ষা এদের সামাজিক জীবন আরও নিবিড়। কেবল চরবার সময়েই একসঙ্গে হয় না, বাসাও বাঁধে দলবদ্ধ হয়ে। চেনবার সুবিধার জন্যে এদের স্বভাবের একটু পরিচয় দেওয়া হলো।

গাং বা রামশালিক নদীর উঁচু পাড়ে বা বাঁধের খাড়া দিকে গর্ত করে বাসা বাঁধে। কয়েক দল আবার পরিত্যক্ত কুয়ার ভিতর বা ইটের পাঁজার মধ্যে সুড়ঙ্গ করে বাস করে। সুড়ঙ্গের শেষে তিন ইঞ্চি ব্যাসের ডিম পাড়বার স্থান। সুড়ঙ্গটি সাত-আট ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং গলিঘুঁজি থাকে, যাতে সবাই সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে কোন অসুবিধা বোধ না করে। রীতিমত কলোনীর ব্যাপার। এদের প্রজননের সময় মে থেকে অগাষ্ট।

তোমরা গাংশালিক কম দেখে থাকলেও গো-শালিক প্রচুর দেখেছ নিশ্চয়ই। ওই যে সাদা-কালো শালিক। ওদের দেখা যায় ভাটশালিকের মত ক্ষেতের ধারে মাঠে-ঘাটে দলবেঁধে ঘুরতে। চারদিকের আবহাওয়া একটু মন্দ দেখলেই উড়ে গিয়ে বসে গাছের ডালে। ভাটশালিকের সঙ্গে তফাৎ কেবল—এরা বাড়ীর ভিতরে ঢোকে না, জানালায় বসে না। মানুষের বসতির কাছে বাস করলেও এরা একটু খোলা জায়গা পছন্দ করে।

এরা দলবেঁধে বাসা বাঁধে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আট থেকে ত্রিশ ফুট উঁচু আম-জাম বা ঐ ধরণের গাছের উপর। এদের দল ছোট-বড় দুই-ই হয়। সাধারণতঃ আট থেকে দশটা এক-একটা দলে থাকে। আবার কখনো জোড়ায় জোড়ায় চরতে দেখা যায়।

সো-শালিকের বাসার কোন ছিরিছাঁদ নেই, যেমনাকার, উপকরণ—খড়, ঘাস, কাঠি, শিকড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি। সবচেয়ে অদ্ভুত যেটা—সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে ওদের বাসায় দেখা যায় ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। এই ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালিটা যে কেন ঝোলায়, তা কেউ জানে না। এটাই এদের বাসার বৈচিত্র্য।

বাসার ঠিক মাঝে ডিম পাড়বার জায়গাটায় পালক বা নরম ঘাসের আস্তরণ দেয়। গাছের কোকর বা দেয়ালের গর্তে বাসা বাঁধে কচিৎ।

শালিক বংশের আর একটি প্রজাতির কথা বলছি। এদেরও তোমরা দেখতে পাবে শিমুল ও রক্তমাদার ফুল ফুটলে সেই ফুলের উপর দলে দলে মধু খেতে আসে। এরা আকারে ছোট। লম্বায় প্রায় সাড়ে সাত ইঞ্চি। দেহের উপরের পালক রুপালি ধূসর, তলার সমস্ত পালক লালচে।

এদের নাম দেশী পাওয়ে। বৈজ্ঞানিক নাম—ষ্টুরনাস মালাবারিকাস, ইংরেজী—গ্রে-হেডেড মাইনা।

দেশী পাওয়ে অন্যান্য শালিক গোষ্ঠির মত মানুষের কাছাকাছি একদম আসে না। এরা একটু লাজুক প্রকৃতির, গাছের মগডালে থাকতে ভালবাসে, সেই জন্যে সহজে দৃষ্টিপথে পড়ে না। রক্তমাদার ও শিমুলের ফুল যখন ফোটে, তখন এক গাছের মাথা থেকে আর এক গাছের মাথায় জোড়ায় জোড়ায় বা ছোট দলে পরস্পরকে তাড়া করে বেড়ায়। খাবার সময় একটু হৈ-চৈ বা কিচির-মিচির না করে থাকতে পারে না। এমনিতে ক্যাচ্ ক্যাচ্ করে, কিন্তু মিষ্টি সুরেলা গলা আছে। সে কারণে অনেক সৌখীন লোককে এই পাখী পুষতে দেখা যায়। কাঁধে করে যে পাখাওয়ালারা কলকাতার রাস্তায় পাখী বিক্রি করে, তাদের খাঁচাতেও দু-একটি পাওয়ে প্রায়ই দেখা যায়।

কুড়ি থেকে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে বড় গাছের কোকরে এদের বাসা। চারদিকে গাছ, মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় একটি কি দুটি বড় গাছ। এই ধরণের বড় গাছে বাসা বাঁধতে এরা ভালবাসে। এমনিতে গাছে কোকর হয়েছে বা পরিত্যক্ত বসন্ত বৌরির গর্তে এরা বাসা বাঁধে। কখনও দেখা যায় পুরনো বা মরা গাছের গায়ে কোন কারণে একটু ছোট গর্ত হয়েছে, সেটাকে ঠুকরে বাড়িয়ে তার মধ্যে বাসা করে। বাসার আস্তরণ ঘাস ও সবুজ নরম পাতা। বাসা বানায় স্ত্রী-পুরুষ দু-জনে মিলে, তা' দিয়ে ডিম ফোটায় শুধু স্ত্রী পাখী। প্রজননের সময় মার্চ থেকে জুন।

বাংলার পাখীদের মধ্যে শুধু নয়, ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাসা-নির্মাতা পাখীর কথা বলে আজ শেষ করবো। এই পাখীর বাসা চাক্ষুষ দেখেছিলাম। 1931 সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ হবে। বনগাঁ লাইনের গোবরডাঙ্গার পরেই চাঁদপাড়া চলেছি কোর্টে হংকং ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব ম্যানেজার বুড়ো ডব্লু-ডব্লু ডড্রেল বাড়ীতে। ব্যাঙ্ক থেকে অবসর নিয়ে তিনি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাখীর খাদ্য পিঁপড়ের ডিম ইত্যাদি

চালান দিতেন—সেই সঙ্গে কিছু পশুপাখীও। প্রতি দিন প্রায় দু-শ' পিঁপড়ের ডিম চালান যেতো। বুড়ো ডড্সন সাহেব আমাদের ভালবাসতেন। আমরা যেতাম পাখীর খোঁজে। উনি কিছু কিছু পাখী আমাদের উপহার দিতেন।

যাক—চলেছি তো চাঁদপাড়ার পথে। আটকে গেছি হাবড়ার লেভেল ক্রসিং-এ। ট্রেন যাবে তাই বন্ধ। ক্রসিং-এর পাশেই একটা তালগাছ। তার উপর থেকে ঝুলছে অদ্ভুত ধরণের কয়েকটি পাখীর বাসা। পাখীর বাসা বললে আমাদের মনে যে ছবি ভেসে উঠে—তা একদমই নয়। সাপুড়েদের বাঁশি, তুবড়ি বা বকযন্ত্রের লম্বা নলটা নীচের দিকে মুখ করে যেন টাঙানো আছে। অবাক হয়ে দেখছি। বাসাগুলি শুকনো ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের টানা-পোড়েন দিয়ে কি অদ্ভুত সুন্দরভাবে বোনা। গোটা দশেক তালগাছটার ডাল থেকে ঝুলছে।

হঠাৎ দেখি হলুদ আর পাটকিলে রঙের একটা চড়ুইয়ের মত পাখী কোথা থেকে উড়ে এসে লম্বা ঝুলন্ত মোটা নলটার মুখের ভিতর দিয়ে সটান ঢুকে গেল। লক্ষ্য করলাম, বাসার প্রবেশপথ বা নলের মুখে বসে পরে সুবিধামত ঢুকলো না। আর পাখী-গুলিও ওইভাবে সটান ঢুকে গেল। বুঝলাম এটা ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পাখীটা দণ্ডচারী বর্গের অন্তর্গত চঞ্চুসূচী বংশের। প্লসিইনি চঞ্চুসূচী নামেই উপবংশের সুগৃহগণ বা প্লসিউস জিনাসের এক প্রজাতি। বৈজ্ঞানিক নাম—প্লসিউস ফিলিপ্পিনাস, বাংলায়—বাবুই বা তালবাবুই—ইংরেজীতে বলে কমন উইভার-বার্ড, বায়া। এই চঞ্চুসূচী বংশে বাবুই যেমন একটা প্রজাতি, তেমনি চড়ুই, মুনিয়ারা অপর সব প্রজাতি। কিন্তু বাসা বানাতে এমন ওস্তাদ পাখী ভারতে আর নেই।

তোমাদের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে অল্প কথায় ওদের বাসা বানানো আমরা যেভাবে পর্য-বেক্ষণ করেছি, তা তোমাদের বলছি। বাবুইয়ের প্রজননকাল এপ্রিলের শেষার্ধ থেকে অক্টোবর। বাসার উপকরণ ভারতের এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম। ঘাসের শিষ, ধান, খেজুর, তাল, নারকেল, সুপারী, আখ, বাজরা, ভুট্টা ও কলা পাতার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফালি হলো মোটামুটি উপাদান। কলকাতা ও নিকটবর্তী চব্বিশ পরগণার কাছে দেখেছি, নারকেল গাছের লম্বা পাতা পা দিয়ে চেপে মোটা চঞ্চু—যার গড়ন পাতা ফালি করবার উপযুক্ত, তাই দিয়ে সরু পাতা ফালি করে প্রাথমিক ঝুলন্ত ছাঁচ বা ফর্মা বানায়। তারপর মাথার দিক এবং সর্বশেষে প্রবেশদ্বার বোনে সরু পাতা ফালি করে। ডিম পাড়বার ঘর বোনে সরু ঘাস ও ধানের পাতা দিয়ে। সবকিছু কাঁচা অবস্থায় বোনে। কারণ নরম পাতা দিয়ে বোনবার সুবিধা। অনেক সময় দেখা যায় পুরনো বাসা রিপু করেছে কাঁচাপাতা দিয়ে। শুকনো আর সবুজ পাতার নতুন বোনা বেশ ধরা যায়।

বাসা বানাবার সময় পুরুষ পাখী দিনে বারো-তেরো ঘণ্টা খাটে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয় অবশ্য। তাও কোন সময় আধ ঘণ্টার বেশী নয়। সে সময়টা খাদ্য সংগ্রহে,

পালক খুঁটে প্রসাধনে, নিছক বিশ্রাম বা কোন স্ত্রী পাখার পিছনে পূর্বরাগে ব্যয় করে। পাঁচ-ছয় দিনে বোটামুটি বাসা তৈরী শেষ করে। কোন স্ত্রী পাখী সেই বাসা পছন্দ করে সঙ্গী নির্বাচন করলে তখন বাকী কাজ শেষ হয়। কিন্তু স্ত্রী পাখী না এলে সে বসে থাকে না। প্রথম বাসার কাছেই সে আর একটি বাসা বুনতে শুরু করে।

স্ত্রী-বাবুই-ও সময় হয়ে এসে পৌঁছায় পুরুষ পাখীদের আস্তানায়। পুরুষ-পাখীদের মধ্যে পরস্পরে মারামারি ও প্রতিযোগিতা লেগে যায়—কে কাকে আকৃষ্ট করতে পারে বেশী। দেখাতে থাকে হরেক রকমের ওড়বার কায়দা। সারকাসে ট্রাপিজ খেলার মত বাসা আঁকড়ে ধরে থাকে, বাদুড় ঝোলা ঝুলতে থাকে। দেখা যায় বাসাটাকে পায়ে আঁকড়ে ধরে ডানা ঝাপ্‌টে শূন্যে তুলে স্ত্রী পাখীর কাছে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছে; অর্থাৎ বলতে চায়, কেমন বানিয়েছি একবারটি দেখ। পছন্দ হয় কি? যখন বোঝে স্ত্রী পাখীটি তার কেরামতিতে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন নানাবিধ আনন্দধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে তার বাসায়।

পুরুষের উল্লসিত কলরবের আমন্ত্রণে স্ত্রী পাখীটি মোটেই বিচলিত হয় না। অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বাসার কোণে এসে বসে। চঞ্চু দিয়ে টেনে বা ছিঁড়ে পরখ করে দেখে পরবর্তী জীবনে তার এই বাসা চলবে কিনা। তাই পরীক্ষার সময় আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে পুরুষ পাখীটি চুপ করে দেখে। অন্য কোন পুরুষ এই সময় বাসার কাছে এলে তেড়ে তাড়ায়।

প্রায়ই দেখা যায় স্ত্রী পাখাটির বাসা পছন্দ নয়। তারপর অন্য অপেক্ষমান পুরুষ পাখীর কাছে যায়। আবার পরীক্ষা করে। এমনিভাবে সেই কলোনীর সমস্ত বাসাই পছন্দ করে দেখে কোন্‌টা ভাল। তারপর উড়ে চলে যায় কোন রায় না দিয়ে।

স্ত্রী পাখীটি একটি লাইনও বুনতে পারে না, কিন্তু কোন্ বাসা সবচেয়ে ভাল বোনা, সে বিষয়ে তার বিচার-জ্ঞান খুব পরিষ্কার। সেদিনই কিংবা তার পরের দিন ফিরে আসে তার পছন্দমত বাসায়। বাকী বোনবার কাজটুকু শেষ করে পুরুষ পাখীটি।

আবার একটি খুব ভাল বোনা বাসার জন্যে দুটি স্ত্রী পাখীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মারামারি হতে দেখা যায়। যাদের বাসা তৈরী ভাল হয় না, তারা সে বছর নিঃসঙ্গ ভাবেই কাল কাটায়।

অষ্টম দিনে পেয়ালার আকারের ডিম পাড়বার ঘরটা সম্পূর্ণ হয়। স্ত্রী পাখীটি সংগ্রহ করে আনে নরম পালক ও তুলা। তাই দিয়ে বাসার ভিতরটা নরম করে বিছায়। পুরুষ পাখী ডিম-ঘরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে। স্ত্রী পাখী দুই থেকে চারটি সাদা ডিম পাড়ে।

অজন্তা ঘোষ

পারদর্শিতার পরীক্ষা

বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়ে 20টি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে—কোন্‌টি সঠিক বলতে হবে। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 5 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে তোমার যতগুলি উত্তর ঠিক হবে, সেই হিসাবে বিজ্ঞানে তোমার পারদর্শিতা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবে।

1. এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে মোটামুটিভাবে কতগুলি পরমাণুকে পাশাপাশি রাখা যাবে?—10 হাজার, 10 লক্ষ, 10 কোটি।

2. প্রোটন ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় কত গুণ ভারী?—200, 2000, 20000।

3. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কত কিলোমিটার?—4000, 4600, 6400।

4. পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত মাইল?—2 লক্ষ 40 হাজার, 3 লক্ষ 80 হাজার, 4 লক্ষ 20 হাজার।

5. চাঁদের চারপাশে অনেক সময় যে উজ্জ্বল বলয় দেখা যায়—যাকে চাঁদের হাট বা চন্দ্রশোভা বলে—তার উৎপত্তির মূলে কি রয়েছে?—আলোর প্রতিফলন, আলোর প্রতিসরণ, আলোর ব্যতিচার।

6. মঙ্গল গ্রহের কয়টি উপগ্রহ?—2, 4, 6।

7. বরফ গলে জল হলে আয়তন কি হয়?—বেড়ে যায়, একই থাকে, কমে যায়।

8. টর্চের ব্যাটারী কোন্ বৈদ্যুতিক কোষের পরিবর্তিত রূপ?—ভোল্টীয় কোষ, ড্যানিয়েল কোষ, লেকল্যান্স কোষ।

9. কোন্ মাধ্যমটিতে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশী?—বায়ু, জল, লোহা।

10. বায়ুর শতকরা প্রায় কত ভাগ নাইট্রোজেন?—20, 40, 80।

11. চুনের রাসায়নিক নাম কি?—ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

12. অ্যামোনিয়াম জলীয় দ্রবণের সঙ্গে কোন্‌টি মিশালে লাল ম্যাজিক রং (ড্যান্সিং কালার) তৈরী হয়?—লিটমাস, ফেনলফ্‌থ্যালিন, মিথাইল অরেঞ্জ।

13. হাইড্রোজেনের আইসোটোপ কয়টি?—1, 2, 3।

14. π-এর কোন্ মানটি অপেক্ষাকৃত সঠিক?—3. 1413, 3. 1416, 3. 1419।

15. কোন্‌টিতে প্রোটিন সবচেয়ে বেশী আছে?—মসুর ডাল, মুগের ডাল, সয়াবিন।

16. কোন্ উদ্ভিদ বায়ুর নাইট্রোজেনকে সরাসরি নিজের কাজে লাগায়? ধান গাছ, ভুট্টা গাছ, মটর গাছ।

17. উদ্ভিদ রাত্রিবেলা কোন্ গ্যাসটি ত্যাগ করে? অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড।

18. ফার্ণ গাছে তো ফুল ফোটে না; তাহলে এর বংশবিস্তার হয় কি থেকে? মূল, কাণ্ড, পাতা।

19. সাপুড়ে যখন বাঁশি বাজিয়ে সাপের খেলা দেখায়, তখন সাপ কেন মাথা দোলাতে থাকে?—সাপুড়ের বাঁশির শব্দ শুনে, সাপুড়ের দেহভঙ্গী দেখে, মাথা দোলানো সাপের স্বভাব বলে।

20. মানুষের হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে কোন্ জায়গায় থাকে? কিছুটা বাঁ দিকে, কিছুটা ডান দিকে, ঠিক মাঝখানে।

(উত্তরের জন্যে 690নং পৃষ্ঠা দেখ)

জ্ঞানানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

অ্যামাজন নদী ও তার আবিষ্কারের কাহিনী

অ্যামাজন নদী পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে দুর্গম ও আয়ত—তবুও মানুষ তার উৎসের সন্ধানে গেছে—অ্যামাজনকে আবিষ্কারের নেশায়, তাকে জানবার জন্যে। এর ফলে সংগৃহীত হয়েছে নানান তথ্য। তাই অ্যামাজন আজ আর অজানা নাম নয়।

অ্যামাজন পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নয়, তবে প্রশস্ততম ও গভীরতম। দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ এই নদীর বিশালত্ব, বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য একে পৃথিবীর বিস্ময় করে তুলেছে। এই নদীকে নানা জনে বিভিন্ন আখ্যা দিয়েছেন—'Prince, King, Monarch—among rivers'—সেগুলির মধ্যে অন্যতম। কেউ কেউ আবার এই নদীকে 'Mediteranean of South America' বলেও অভিহিত করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পেরুর লিমা থেকে 60 মাইল দূরে অ্যাণ্ডিস পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বে বিষুব রেখার ঠিক দক্ষিণে অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের সঙ্গে মিশেছে। আর পরিপথে অজস্র উপনদী, শাখানদী অ্যামাজনকে আরো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় করেছে। এই নদীর জলোচ্ছ্বাসের বিপুলতা দেখে একে সাগর বলে মনে হতে পারে। বস্তুতঃ অ্যামাজন নদীর প্রথম আবিষ্কারক এই নদী দেখে বিস্ময়ে বলেছিলেন "O Rio Mar"—অর্থাৎ সাগর-নদী।

উৎসমুখে এই নদীর নাম Maranon। অ্যাণ্ডিজের বরফাবৃত চূড়া থেকে উৎপন্ন হয়ে সমতল ভূমিতে পড়ে 1000 মাইলেরও বেশী দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিক ঘেঁষে Ucayali নদীর সঙ্গে মিশেছে। এই মিলিত প্রবাহ অ্যামাজন নাম ধারণ করে 2,800 মাইল দক্ষিণ আমেরিকার প্রশস্ততম স্থান বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়ে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। এই নদীর মোট দৈর্ঘ্য 4,000 মাইল। নীল নদের চেয়ে দৈর্ঘ্যে একটু ছোট। কিন্তু এই নদীর জলধারা নীলের চেয়ে 60 গুণেরও অধিক। এক শতেরও বেশী উপনদী ও শাখানদী এই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনটি উপনদী Jarui, Purus, Medeira—দৈর্ঘ্যে 2000 মাইলেরও বেশী; অর্থাৎ এরাই এক-একটা বড় বড় নদীর সমান। দশটিরও বেশী উপনদী ও শাখানদীর দৈর্ঘ্য 1000 মাইলেরও বেশী। এই নদীর জলধারা 'মিল্ক-চকোলেট' রঙের হলেও খাবার উপযুক্ত। অ্যামাজন নদী থেকে এক গ্লাস জল তুলে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, গ্লাসের তলায় কোনরূপ তলানী পড়ছে না। অ্যামাজনে স্রোত খুব বেশী। গড়পড়তা স্রোত ঘণ্টায় 2½ মাইলের উপর। এই নদীর প্রশস্ততা 2-3 মাইলের সমান। কোন কোন স্থানে 8-10 মাইল, অ্যাটলান্টিকের মুখে 180 মাইল। গভীরতা স্থানবিশেষে 120 ফুট থেকে 200 ফুটের উপর। অ্যামাজনের শাখা ও উপনদী মিলিয়ে 14,000 মাইলেরও বেশী জল-পরিবহনযোগ্য।

অ্যামাজন নদীর আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছিলেন যে পর্তুগীজ যুবক, নাম তাঁর Francisco de-Orellana। তিনি স্বেচ্ছায় নয়, বেশ অনেকটা বাধ্য হয়েই এই নদী আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেন। 1539 সালের কথা, পেরু তখন স্পেনের Alonozo Pizavro-র দখলে। সেই বছরের শেষের দিকে হঠাৎ তিনি তাঁর ভাই Gonzalo-কে প্রায় সাড়ে তিন-শ' স্প্যানিশ সৈন্য ও এক হাজার 'ইণ্ডিয়ান' সঙ্গে দিয়ে Quito-র পূর্বে অবস্থিত গভীর বন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। তাঁদের ধারণা ছিল—সেখানে দারুচিনিসমৃদ্ধ সম্পদ লুকায়িত আছে। এই দুর্গম যাত্রাপথে ক্রমে তাঁরা Coca নদীর ধারে এসে পড়লেন এবং কিছু দিনের জন্যে সেখানেই বসতি গাড়লেন। কেউ কেউ আবার Coca নদী ধরে এগুতে থাকলেন। এই সময় তাঁরা পথে কয়েক জন অপরিচিত ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে জানতে পারলেন, অদূরে অবস্থিত এক ধনী দেশের কথা। Gonzalo তখন তাঁর সৈন্যদলের মধ্য থেকে Orellana-কে দলনেতা করে গোটা পঞ্চাশেক সৈন্য দিয়ে সেই দেশে যাবার আদেশ দিলেন। দিন তিনেকের মধ্যে Orellana-র দলবল Coca নদীর মুখে এসে পড়ে পূর্বকল্পনামত কোন কিছুর সন্ধান পেলেন না। Orellana তখন চিন্তা করে দেখলেন যে, যদি তিনি এই সংবাদ Gonzalo-র কাছে বহন করে নিয়ে যান, তবে Coca নদীর স্রোতের বিপরীতে বয়ে যেতে বহু দিন তো লাগবেই, তাছাড়া Gonzalo-র

এই খবরে বিশেষ খুশী হবেন না। যেখানে এসে পৌঁচেছেন, সেখানে অপেক্ষা করা নিরর্থক চিন্তা করে তিনি তার সাথীদের কাউকে কিছু না বলে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখবেন ঠিক করলেন। যাত্রাপথে ক্রমে Coca নদী ছাড়িয়ে Napo নদী ধরে অবশেষে অ্যামাজনে পড়লেন। ক্রমাগত সাত মাসের উপর অ্যামাজন ধরে সর্বশেষে তারা অ্যাটলান্টিকে ভিড়লেন। এই দুর্গম যাত্রাপথে তাদের কষ্ট ও বিপদের অন্ত ছিল না। কোন কোন সময়—ক্ষুধার তাড়নায় তাঁদের বেল্ট ও জুতার চামড়া সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। অ্যামাজনের কূলে যে সব ইণ্ডিয়ান বাস করে, কখনো কখনো তারা দলে দলে Orellana-দের স্প্যানিশ নৌকার উপর আক্রমণ চালিয়েছে। কোন কোন ইণ্ডিয়ান বসতিতে অবশ্য আতিথেয়তা ও খাবার জুটেছে এবং নতুন করে শক্ত নৌকা বানাবার সুযোগ হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—1541 সালের 26শে অগাস্ট তাঁরা অ্যাটলান্টিকের নীল জলে পড়েছিলেন। কোনক্রমে ত্রিনিদাদ পৌঁছে অবশেষে কুবাগুয়াতে (Cubagua) এলেন। স্পেনের রাজার কাছ থেকে তাঁর আবিষ্কারের স্বীকৃতিপত্র পেলেন। ফেরবার পথে তাঁর মৃত্যু হয় এবং সাথীরাও কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে, তার হদিশ মেলে না।

এই তো গেল অ্যামাজন নদীর আবিষ্কারের কথা। এই নদীর নাম কেন অ্যামাজন হলো—সেই প্রসঙ্গেও নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। অ্যামাজনের কূলে বসবাসকারী ইণ্ডিয়ানরা নদীকে 'Parana' বলতো। 'Parana' অর্থাৎ সাগর। 1500 সালের মার্চ মাসে Pincon নামে জনৈক ব্যক্তি প্রথম অ্যামাজন দর্শন করেন বলে দাবী করেন। তাঁর সেই দাবী 'Capitulation of Pincon' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত আছে (তিনি এই নদী অতিক্রম করেন নি বলে অ্যামাজন আবিষ্কারের গৌরব পান নি)। তিনি এই নদীর নাম দেন 'Santa Maria de la Mar Dulce' অর্থাৎ সেন্ট মেরি অব ফ্রেশ ওয়াটার সি। তার পর বহু দিন পর্যন্ত এই নদীর নাম উৎস-মুখের নামানুযায়ী Maranon বলেই অভিহিত হতো। অবশেষে অ্যামাজন নদীর আবিষ্কারক Orellona-র সমসাময়িক Friar Carvajel নামে জনৈক কাহিনীকার এই নদীর নাম দেন Amazon; অর্থাৎ পুরুষালী গুণবিশিষ্ট মেয়ে যোদ্ধা। কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। গ্রীক পুরাণের বহু জায়গায় Amazon অর্থাৎ মেয়ে যোদ্ধার উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে, এই কাহিনীকার Friar Carvajel-ও নাকি এই অ্যামাজন নদীর কূলে ঐ রূপ মেয়ে যোদ্ধা দেখেছিলেন এবং তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি এই নদীর নাম দেন অ্যামাজন (Amazon)। কথিত আছে অ্যামাজন নদীর কূলে বহু দিন পর্যন্ত এই মেয়ে যোদ্ধা উপজাতিরা বাস করতো। তারা নাকি পুরুষ বিদ্বেষী ছিল। প্রথমে পুরুষদের রূপে আকৃষ্ট করে পরে অ্যামাজনের জলে ডুবিয়ে মারতো। বর্তমানে এদের কোন সন্ধান তো পাওয়াই যায় না বরং অনেকেই এর সত্যতা

অস্বীকার করেন। যাহোক, এই নদীর নাম সেই থেকেই অ্যামাজন চলে আসছে।

অ্যামাজন নদীর অববাহিকায় যে বিশাল উপত্যকা, তাকে অ্যামাজন অঞ্চল আখ্যা দেওয়া হয়। এই অঞ্চল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বনসম্পদে ভরপুর। টিক্, মেহগিনি, গোলাপ কাঠ, রাবার প্রভৃতি মূল্যবান গাছ ব্যতীত আরও কত রকমের গাছপালা, লতাপাতা ও পশুপাখীর সন্ধান যে সেখানে পাওয়া যায়, তা আজও কেউ সঠিক-ভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি। অ্যামাজন অঞ্চলে যে আদিম ইন্ডিয়ানেরা বাস করে, তারা এখনও মানুষের সভ্যতার বাইরে রয়ে গেছে। অ্যামাজনের দুর্গম অঞ্চল এখনও বিস্ময় ও অজানার অন্ধকারে লুকায়িত। বস্তুতঃ অ্যামাজন হয়তো এই পৃথিবীর শেষ অনাবিষ্কৃত অঞ্চল।

মেখিকা। বসু

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. 10 কোটি
2. 2000
3. 6400
4. 2 লক্ষ 40 হাজার
5. আলোর প্রতিসরণ

[বায়ুমণ্ডলের স্তরভেদ ভরে বহুকণার চাঁদের আলোর প্রতিসরণ হয়ে উজ্জ্বল বলয়টির সৃষ্টি করে।]

6. 2

[উপগ্রহ দুটির নাম : ফোবস ও ডাইমস।]

7. কমে যায়
8. লেক্ল্যান্স কোষ
9. লোহা

[বায়ু, জল ও লোহার মধ্যে শব্দের বেগ মোটামুটিভাবে প্রতি সেকেণ্ডে যথাক্রমে 335 মিটার, 1450 মিটার ও 5130 মিটার।]

10. 80
11. ক্যালসিয়াম অক্সাইড
12. কেরাটিন ব্যাসিন

13. 2

[আইসোটোপ দুটির নাম: ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম।]

14. 3.1416

15. সয়াবিন

16. মটর গাছ

17. কার্বন ডাই-অক্সাইড

18. পাতা

19. সাপুড়ের দেহভঙ্গী দেখে

[যদিও অনেক সময় বলা হয় যে, সাপুড়ের বাঁশির শব্দে মুগ্ধ হয়ে সাপ মাথা দোলায়, কিন্তু আসলে সাপের কান নেই, সাপ শুনতে পায় না।]

20. কিছুটা বাঁ দিকে

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1: বাব্‌ল্‌-চেম্বার বা বুদ্‌বুদ-কক্ষ কি নীতিতে কাজ করে?

সুশীল দত্ত, শ্যামল দত্ত, আরতি দত্ত, হাওড়া।

উত্তর 1. মৌলিক কণাগুলির স্বরূপ জানবার ব্যাপারে মেঘ-কক্ষ, গাইগার কাউন্টার, ফটোগ্রাফিক অবদ্রব পদ্ধতি ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন মৌলিক কণার বৈশিষ্ট্যই জানা সম্ভব। কিন্তু উচ্চশক্তি-সম্পন্ন তড়িৎ-কণার ক্ষেত্রে এই সকল ব্যবস্থা কার্যকরী করবার ব্যাপারে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়—যেগুলি সমাধানের অযোগ্য।

মহাজাগতিক রশ্মি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন কণিকাগুলির শক্তি প্রচণ্ড। তাছাড়া বর্তমানে কণাত্বরায়ক যন্ত্র থেকেও প্রচণ্ড শক্তিশালী মৌলিক কণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই সব কণিকার গতিপথ মেঘ-কক্ষে অত্যন্ত কম হয় এবং এদের সংখ্যাও খুব কম। মেঘ-কক্ষে গ্যাসের ঘনত্ব অত্যন্ত কম হওয়ায় পর্যবেক্ষণযোগ্য যথেষ্ট ঘটনা এতে ঘটে না। কাজে কাজেই বেশী ঘনত্বসম্পন্ন পর্যবেক্ষণ কক্ষের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনের বশবর্তী হয়েই ডোনাল্ড আর্থার গ্লেজার বুদ্‌বুদ-কক্ষ আবিষ্কার করেন, যা বর্তমানে খুবই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কোন তরলের উপরিতলের চাপ বাড়ালে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে। অত্যন্ত উচ্চচাপে এবং উচ্চতাপে কোন তরল পদার্থের উপরের চাপ যদি হঠাৎ কমিয়ে দেওয়া যায়,

তাহলে তার স্ফুটনাঙ্ক স্বভাবতঃই অনেক কমে যায় এবং তরলের তৎকালীন তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী হওয়ায় তরলের মধ্যে স্বতঃই স্ফুটন আরম্ভ হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় তরলের অতি উত্তপ্ত অবস্থা। দেখা গেছে, অতি উত্তপ্ত অবস্থায় তরল পদার্থের স্ফুটন সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় না। স্ফুটন আরম্ভ হতে একটু সময় লাগে। ঐ সময়ের মধ্যে অতি উত্তপ্ত তরলে কোন উচ্চগতিসম্পন্ন মৌলিক কণা পাঠানো হলে ঐ কণা মাধ্যমের সঙ্গে সংঘাতে আয়নের সৃষ্টি করবে, যার ফলে তরল পদার্থটিতে মৌলিক কণার গতিপথ বরাবর দৃশ্যমান বুদ্বুদের সৃষ্টি হয় এবং এর ছবি তোলা সম্ভব। ছবিটি গতিপথকে চিহ্নিত করে। মেঘ-কক্ষের অনুরূপ পদ্ধতিতে বুদ্বুদ-কক্ষ থেকে পাওয়া কণার গতিপথকে বিশ্লেষণ করে মৌলিক কণার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। বুদ্বুদ-কক্ষে তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয় বলে আয়নকারী কণিকার সঙ্গে মাধ্যমের সংঘাত খুব বেশী এবং তাড়াতাড়ি হয়। ফলে উচ্চগতিসম্পন্ন মৌলিক কণাগুলির বৈশিষ্ট্য বুদ্বুদ-কক্ষের সাহায্যে জানা সম্ভব। এটাই হলো বুদ্বুদকক্ষের কর্মনীতি।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

1973 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

এই বছর (1973) পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মিলিতভাবে জাপানের ডক্টর লিও ইসাকী, আমেরিকার ডক্টর আইভার গিভার এবং বৃটেনের ডক্টর ব্রায়ান ডি. যোসেফসন।

রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন যুগ্মভাবে বৃটেনের ডক্টর জিওফ্রে উইলকিনসন এবং পঃ জার্মেনীর আর্নষ্ট ওটো ফিশার।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে মিলিতভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দু-জন অষ্ট্রিয়ান ও একজন ডাচ। এঁরা হলেন কার্ল ফন ফ্রিশ, কনরাড লরেঞ্জ এবং নিকোলাস টিনবারজেন (ডাচ)।

আসবাব তৈরীর অভিনব উপকরণ

পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে ডেস্ক, আর মানুষের মাথার চুল দিয়ে চেয়ার তৈরী হয়েছে। ক্যানজাস ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের (যুক্তরাষ্ট্র) কিছু-জন রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এসব এখন আর আজগুবী কল্পনা কিছু নয়। লিয়াং ফ্যান, ডেভিড রেটজলফ ও ওয়েন ডেওয়ারপুন প্রভৃতি গবেষকেরা মাথার চুল, নর্দমার পাঁক-কাদা আর খবরের কাগজকে এমন একটি পদার্থে রূপান্তরিত করেছেন, কাঠের পরিবর্তে যা অনায়াসে ব্যবহার করা যায়।

এই প্রক্রিয়ার প্রধান উপকরণ একজাতীয় বিশেষ ধরনের তরল পদার্থ। পারমাণবিক

বিক্রিয়ার সাহায্যে এই পদার্থটি কঠিন প্লাস্টিকে পরিণত হয়। ঐ তরল পদার্থটির সঙ্গে পরিত্যক্ত কাগজের টুকরো মেশালে ঠিক যেন আসল কাঠ হয়ে যায়। নর্দমার কাদা মেশানো হলে নতুন উৎপন্ন এই প্লাস্টিক গন্ধহীন হয়। পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে জীবাণু মুক্ত হয়ে থাকে। ঐ সব পরিত্যক্ত জিনিসে তৈরী এই প্লাস্টিক কংক্রিটের মত শক্ত। একে করাত দিয়ে চেরা যেতে পারে, তুরপুন দিয়ে ছেঁদা করা চলে, অথবা কাঠের মত সহজেই যে কোনও রকম করে গঠন করা যেতে পারে—ইঞ্জিনিয়ারেরা এই সব বলেছেন।

প্লাস্টিকের বাড়ী

বালি, জল ও পেট্রোল শোধনে যে সব আবর্জনা জমে, তাই থেকে একটি ছোট গৃহ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান মেটিরিয়াল সিস্টেমস করপোরেশন (এসকনডিডো, ক্যালিফোর্নিয়া) এক রকমের প্লাস্টিক পদার্থ তৈরী করেছে। এই পদার্থটি গৃহ নির্মাণের কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট জোসেফ এনম্যান দাবী করেন যে, প্লাস্টিকে তৈরী বাড়ীর কাঠামো প্রয়োজনের তুলনায় 15 গুণ বেশী শক্ত হয়। এরকম বাড়ী ভেঙে পড়ে না, তাই ভূমিকম্পের সময়ও এই বাড়ী নিরাপদ।

মিঃ এনম্যান এই ধরণের প্লাস্টিককে কারিগরী ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদান বলে উল্লেখ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রে 150টি বাড়ীতে এই প্লাস্টিক মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাড়ীগুলি বাক্সের মত খণ্ডে নির্মাণ করা হয় এবং তারপর জমিতে নিয়ে গিয়ে সেগুলির সংযোজন করা হয়।

তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় কম খরচে তৈরীর উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রচলিত গৃহ-নির্মাণের উপাদান ও অংশসমূহের পরিবর্তে কারখানায় আগে থেকে তৈরী অংশ পরে সংযোজন করে এই বাড়ী তৈরী হয়।

পরলোকে রত্নমণি চট্টোপাধ্যায়

আজীবন দেশসেবক বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা রত্নমণি চট্টোপাধ্যায় গত 25শে সেপ্টেম্বর 81 বছর বয়সে কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবনে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু 1921 সালে গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসবার পর তাঁর অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। 1942 সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকালে তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর দুর্ভিক্ষত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর তিনি একবার পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার সদস্য হন। বাংলা হরিজন পত্রিকার সম্পাদকরূপে গান্ধী সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গান্ধীবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা হিসাবে তিনি অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। গান্ধী জন্মশতবার্ষিকীর প্রকাশনা উপসমিতির তিনি ছিলেন সভাপতি।

গান্ধীজীর মত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কয়েকটি বিশেষ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, 1973

পরিষদ ভবন

28শে সেপ্টেম্বর, 1973

শুক্রবার বৈকাল, 5-30 মিঃ

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 32 জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যতম সহঃসভাপতি শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

1. কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়ন্ত বসু মহাশয় এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানাইয়া গত 1972-73 সালের জন্যে পরিষদের বিবিধ কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি প্রারম্ভে বলেন যে, গত জুলাই মাসে পরিষদের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাই মোটামুটিভাবে 1972-73 সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। (উক্ত বিবরণী 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অগাষ্ট '73 সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।) যাহা হউক, তিনি পরিষদের বিবিধ কাজ-কর্ম ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণী প্রদান করেন।

এই বিবরণীতে তিনি পরিষদের আদর্শানুযায়ী মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা, প্রদর্শনী, পাঠাগার ও 'হাতে-কলমে' বিভাগ পরিচালনা প্রভৃতি কর্মধারা বর্ণনা করেন। আলোচ্য বৎসরে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার যে রজত-জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং পাঠাগার কর্তৃক যে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ জানান যে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ঘোষিত নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণীর উপযোগী ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ে একটি পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য পরিষদ সম্প্রতি উদ্যোগী হইয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ কাজের বাস্তব রূপায়ণের জন্য কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করেন।

2. হিসাব-বিবরণী ও ব্যয়-বরাদ্দ

গত 1972-73 সালের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বর্ত পত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেন। উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক উক্ত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বর্ত

পত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত বর্তমান 1973-74 সালের জন্য পরিষদের আনুমানিক আয়-ব্যয় বা বাজেটপত্র সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনার পরে উক্ত আয়-ব্যয়পত্র উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

3. কার্যকরী সমিতি গঠন

1973-74 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষবর্গ ও সদস্যদের মনোনয়নপত্রের চূড়ান্ত তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন এবং সভ্যগণ কর্তৃক তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। উক্ত তালিকা অনুযায়ী পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সদস্যরূপে নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়।

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী :

সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃসভাপতি শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীঅমূল্যধন দেব
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীমহাদেব দত্ত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
কর্মসচিব—শ্রীজয়ন্ত বসু
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সদস্য

1 শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
2 " গণেশচন্দ্র নন্দী
3 " দিলীপকুমার ঘোষ
4 " দেবেন্দ্রবিজয় দেব
5 " দেবাশীষ বসু
6 " বলাইচাঁদ কুণ্ডু
7 " ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
8 " মাধবেন্দ্রনাথ পাল
9 " মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
10 " রমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
11 " রাধাকান্ত মণ্ডল
12 " শঙ্কর চক্রবর্তী
13 " সমীরকুমার ঘোষ
14 " সুনীলকুমার সিংহ
15 " হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

4. হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের 1973-74 সালের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিবার জন্য হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) রূপে পরিষদের পূর্বতন হিসাব-পরীক্ষক মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর নাম প্রস্তাবিত হয় এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

5. অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

1 শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
2 " মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
3 " রাধাকান্ত মণ্ডল
4 " দিলীপকুমার ঘোষ
5 " আশুতোষ গুহঠাকুরতা